দেবেশ রায়ের উপন্যাসে জীবনের অন্তর্বয়ন

গবেষক

মুনিরা সুলতানা

রেজিস্ট্রেশন নম্বর : ৪৮

শিক্ষাবর্ষ : ২০১৪-২০১৫

বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচ. ডি. ডিগ্রির জন্য প্রস্তুত অভিসন্দর্ভ

ডিসেম্বর, ২০১৮

ভূমিকা

দেবেশ রায়ের উপন্যাসে জীবনের অন্তর্বয়ন শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক, ডক্টর বেগম আকতার কামাল-এর তত্ত্বাবধানে ২০১৪-২০১৫ শিক্ষাবর্ষের পি.এইচ.ডি গবেষণাপত্র রূপে রচিত। বর্তমান অভিসন্দর্ভের সামগ্রিক পরিকল্পনা-প্রণয়ন ও রূপরেখা নির্মাণে তাঁর নির্দেশনা ও অনুপ্রেরণা আমার গবেষণার অন্যতম প্রবর্তনা। ঔপন্যাসিক দেবেশ রায় সম্পর্কিত তাঁর সংগ্রহে থাকা সমস্ত গ্রন্থ; তাঁর নিজ রচনা; প্রকাশিত বিভিন্ন গ্রন্থ, পত্রিকা ও তথ্যাদি সরবরাহ করে তিনি প্রতিনিয়ত আমাকে এ কাজে গতিশীল রেখেছেন। এ গবেষণায় আমার সমস্ত সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রম করার চেষ্টায় তাঁর অবদান অপরিসীম।

আমি সশ্রদ্ধ চিত্তে স্মরণ করছি আমার শিক্ষক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ডক্টর সৈয়দ আকরম হোসেন-এর ঋণ, যাঁর সুচিন্তিত পরামর্শ ও নির্দেশনা আমার গবেষণাকর্মটিকে করেছে পরিশীলিত। এছাড়া উপন্যাস বিবেচনায় গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গে প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা দিয়েছেন আমার পরম শ্রদ্ধেয় শিক্ষক জাতীয় অধ্যাপক আনিসুজ্জামান। তাঁর কাছে আমি বিশেষভাবে ঋণী।

দেবেশ রায়ের উপন্যাসে জীবনের অন্তর্বয়ন শীর্ষক অভিসন্দর্ভে 'উপসংহার' ব্যতীত চারটি অধ্যায় রয়েছে। প্রথম অধ্যায় দুটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত– এক. 'উপন্যাসে জীবনের অন্তর্বয়ন : প্রেক্ষাপট ও ধারা', দুই. 'দেবেশ রায়ের শিল্পদৃষ্টি ও উপন্যাস তত্ত্ব।' প্রথম অধ্যায়ের প্রথম পরিচ্ছেদে উপন্যাসের সংজ্ঞার্থ, ধরন তথা প্রকৃতি এবং উপন্যাসে জীবনের রূপায়ণ প্রভৃতি বিষয়ক আলোচনা করে পাশ্চাত্য উপন্যাসের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস বর্ণনা; উপন্যাস-শিল্প সংক্রান্ত নন্দনতাত্ত্বিক মতাদর্শের কালানুক্রমিক বৈচিত্র্য সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। সেই সাথে কয়েকজন বিশিষ্ট উপন্যাস-তাত্ত্বিকের শিল্পদর্শনও ব্যাখ্যা করা হয়েছে। বাংলা উপন্যাসের সংক্ষিপ্ত রূপরেখা নির্দেশ করে দেবেশ রায়ের শিল্পচিন্তা ও উপন্যাস বিষয়ক মতাদর্শের রূপ-রূপান্তর এবং তাঁর স্বকীয় উপন্যাসরীতি আলোচিত হয়েছে দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে।

গবেষণা-অভিসন্দর্ভের দ্বিতীয় অধ্যায়ের শিরোনাম 'অন্তহীন বৃত্তান্তে জীবন'। এ অধ্যায়ে দেবেশ রায়ের বৃত্তান্ত শীর্ষক চারটি উপন্যাস যথা : *তিস্তাপারের বৃত্তান্ত* (১৯৮৮), *মফস্বলি বৃত্তান্ত* (১৯৮৯) এবং *সময় অসময়ের বৃত্তান্ত* (১৯৯৩) এবং *আত্মীয় বৃত্তান্ত* (১৯৯০) সম্পর্কে অলোচনা করা হয়েছে।

'বৃত্তান্ত' নামধারী এ উপন্যাসসমূহে জীবনের অনিঃশেষ বিস্তার কেমন করে শিল্পায়িত হয়েছে তা ব্যাখ্যাত হয়েছে। মধ্যযুগের বর্ণনাধর্মী আঙ্গিক বা 'ন্যারেটিভ প্যাটার্ন' বিশেষত মঙ্গলকাব্য, পাঁচালি, লোককাব্য, কিচ্ছা-কাহিনীর ভিতরে থাকা গল্প বর্ণনার ভঙ্গিমাটি বৃত্তান্তকার দেবেশের অনুপ্রেরণার অন্যতম উৎস। দেশ ও কালকে উন্মোচিত করার লক্ষ্য, চরিত্রের ব্যক্তিগতকে নৈর্ব্যক্তিকে মেলানো এবং সেই সঙ্গে একজন বৃত্তান্তকারের আয়োজিত সংগঠন ও স্বপ্ন– এসবের মধ্যেই উপন্যাসের সংজ্ঞাকে প্রতিষ্ঠা বা পুনরুদ্ধার করতে চেয়েছেন দেবেশ রায়। গবেষণা-অভিসন্দর্ভের তৃতীয় অধ্যায় সূচিত হয়েছে 'প্রতিবেদন-শীর্ষক উপন্যাসে জীবনায়ন' নামে। এ অধ্যায়ে দেবেশের 'প্রতিবেদন'-শীর্ষক চারটি উপন্যাস যেমন : *খরার প্রতিবেদন* (১৯৯২), *দাঙ্গার অসম্পূর্ণ প্রতিবেদন* (১৯৯৩), *শিল্পায়নের প্রতিবেদন* (১৯৯৬) ও *একটি ইচ্ছামৃত্যুর প্রতিবেদন* (১৯৯৪) বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। অনেকটা রিপোর্টাজধর্মী এই উপন্যাসগুলোতে কী প্রক্রিয়ায় চারপাশের ঘটমান জীবন-বাস্তবতার 'উপন্যাসন' ঘটেছে, তা বিশ্লেষণের চেষ্টা করা হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায়ের দুটি পরিচ্ছেদ ক. 'ইতিহাসিত মানুষ' এবং খ. 'শরীরী-বৈকল্যের মনস্তত্ত্ব'; যেখানে দেবেশ রায়ের বিবিধ উপন্যাস আলোচনা করা হয়েছে। প্রথম পরিচ্ছেদে দেবেশ রায়ের দুটি উপন্যাস *ইতিহাসের লোকজন* এবং *বরিশালের যোগেন মণ্ডল*-এর আলোচনা প্রসঙ্গে তাঁর ইতিহাস-চেতনা, রাজনীতি-ভাবনা প্রভৃতি বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের শিরোনাম– 'শরীরী-বৈকল্যের মনস্তত্ত্ব'। এ অংশে সৃষ্টিবিজ্ঞান হিসেবে শরীরের আদি ও অদ্ভুত নিয়ম এবং চেতনার সাথে সম্পৃক্ত অথবা বিবিক্ত শরীরের প্রক্রিয়াকে দেবেশ কী করে এক নিরপেক্ষ নির্মোহ বিজ্ঞান এবং একইসাথে শিল্পদৃষ্টিতে বিবেচনা করেছেন; তা পর্যালোচনা করা হয়েছে। নর-নারীর শারীরিক সম্পর্ক কিংবা যৌনতা বিষয়ক ভাবনার প্রকাশেও প্রথাগত নন তিনি।

উপসংহার-অংশে গবেষণালব্ধ পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণের সারমর্ম বিন্যস্ত হয়েছে। আমরা বুঝতে চেয়েছি দেবেশ রায়ের জীবনদৃষ্টিক্ষম প্রজ্ঞা, তাঁর স্বকীয় রূপায়ণের স্বরূপ এবং শৈল্পিক স্বাতন্ত্র্য। বস্তুত এটাই প্রতীয়মান হয় যে, সময়ান্বিত ব্যক্তি ও মানব-সম্পর্কের জটিলতা, দ্বন্দ্ব ও মনস্তত্ত্ব ব্যাখ্যায়নে দেবেশ রায় বাংলা উপন্যাসে সৃষ্টি করেন এক নতুন ধারা। গবেষণা-পদ্ধতি অনুযায়ী সবশেষে যুক্ত করা হয়েছে গ্রন্থপঞ্জি।

অভিসন্দর্ভ রচনাকালে আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার ব্যবহার করেছি। উক্ত গ্রন্থাগারের কর্তৃপক্ষ ও কর্মচারীবৃন্দকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। আমার কৃতজ্ঞতা জানাই এ অভিসন্দর্ভের কম্পিউটার মুদ্রাকর মো. সাইফুল হাসান শামীমকে, তার যত্নশীল পরিশ্রমের জন্য। আমার মা ও বাবা, যাঁদের নিরন্তর উৎসাহ, পরিচর্যা ও নিবিড় স্নেহে প্রস্তুত আমার জীবনবোধ ও মন, তাঁদের প্রতি ঋণ অপরিশোধ্য। আমার এ অভিসন্দর্ভ আমার পরম শ্রদ্ধেয় নানা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের কৃতী ছাত্র ও দেবেন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ, মানিকগঞ্জ–এর অর্থনীতি বিভাগের প্রাক্তন অধ্যাপক মো. আজহারুল ইসলাম সিদ্দিকী ও নানী নুরুন্নাহার সিদ্দিকার পবিত্র স্মৃতির উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত। গবেষণা-চলাকালীন সময়ে আমাকে সাহায্য করে উৎসাহ যুগিয়েছেন মো. রেজাউল করিম। সকলের প্রতি আমি গভীরভাবে কৃতজ্ঞ।

০৯ ডিসেম্বর, ২০১৮

মুনিরা সুলতানা
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

অধ্যায়সূচি

ভূমিকা

প্রথম অধ্যায়			১-৫৩
প্রথম পরিচ্ছেদ	॥	উপন্যাসে জীবনের অন্তর্বয়ন : তাত্ত্বিক প্রেক্ষাপট	১-২৫
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	॥	দেবেশ রায়ের শিল্পদৃষ্টি ও উপন্যাস-তত্ত্ব	২৬-৫৩
দ্বিতীয় অধ্যায়	॥	অন্তহীন বৃত্তান্তে জীবন	৫৪-১১৮
তৃতীয় অধ্যায়	॥	প্রতিবেদন-শীর্ষক উপন্যাসে জীবনায়ন	১১৯-১৬৮
চতুর্থ অধ্যায়		বিবিধ উপন্যাস	১৬৯-২৩০
প্রথম পরিচ্ছেদ	॥	ইতিহাসিত মানুষ	১৬৯-২০৩
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	॥	শরীরী-বৈকল্যের মনস্তত্ত্ব	২০৪-২৩০
উপসংহার			২৩১-২৩৪
পরিশিষ্ট			২৩৫-২৪২

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, **মুনিরা সুলতানা** কর্তৃক উপস্থাপিত **‘দেবেশ রায়ের উপন্যাসে জীবনের অন্তর্বয়ন’** শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি আমার তত্ত্বাবধানে রচিত। এই অভিসন্দর্ভ বা এর কোনো অংশ অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানে বা বিশ্ববিদ্যালয়ে কোনো ডিগ্রির জন্য উপস্থাপিত হয়নি।

ড. বেগম আকতার কামাল
গবেষণা-তত্ত্বাবধায়ক ও অধ্যাপক
বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

প্রথম অধ্যায় : প্রথম পরিচ্ছেদ

উপন্যাসে জীবনের অন্তর্বয়ন : প্রেক্ষাপট ও ধারা

শিল্পীর জীবনধারণা সৃজনশীল কল্পনার সঙ্গে একাত্ম হলে সৃষ্টি হয় সার্থক সাহিত্য। উপন্যাস সামগ্রিক জীবনেরই শিল্পরূপ। এর অন্যতম লক্ষ্য– ব্যক্তিমানুষের সম্পর্ক, সময়ান্বিত জীবন, সমাজ-প্রতিবেশ ও বাস্তবতার জিজ্ঞাসাপূর্ণ সমালোচনা। সুচিন্তিত জীবন-সমালোচনা শিল্পের নিয়মেই রূপায়িত হয় সার্থক উপন্যাসে। এছাড়া উপন্যাসের শিল্পগৌরব নিহিত থাকে চরিত্রমাধ্যমে বিন্যস্ত তাৎপর্যময় বক্তব্যে। চরিত্রবিকাশের সাথে সাথে ঔপন্যাসিকের ডিসকোর্স বা প্রতিবেদন, চরিত্রের অভিজ্ঞতায় অনুস্যূত হয়ে পড়ে।

আঠার শতক থেকে বিশ শতকের মধ্যে প্রসারিত এই শিল্প-শাখা বহু প্রশাখায় ছড়িয়ে পড়েছে; ফলে নির্দিষ্ট সাহিত্যিক শ্রেণি (Genre) হিসেবে উপন্যাসের সাংগঠনিক লক্ষণ বা চিহ্নের বৈশিষ্ট্য বিবর্তিত হয়েছে; উপাদানের বা উপস্থাপনার আবশ্যিকতা কিংবা তাৎপর্যেরও বদল হয়েছে। সাহিত্যরূপসমূহের মধ্যে উপন্যাসের আয়তনেই প্রথম আন্তঃসংঘাতপূর্ণ সমাজ ও সংস্কৃতির জটিলতা ধরা পড়ে। উপন্যাস এক বৃহৎ ও মুক্ততার আঙ্গিক। জীবনের বহুকৌণিক অবয়ব ও বহুরূপী বাস্তবতাকে ধারণ করাই যেন উপন্যাসের জন্ম-ধর্ম। ফলে আঙ্গিকের মধ্যেই এই শিল্পরূপ যেকোনো কালের উপযোগী হয়ে ওঠার সম্ভাবনা লালন করে। উপন্যাসই একমাত্র শিল্প যার উপজীব্য হচ্ছে গোটা ব্যক্তিমানুষ এবং তার জীবনের সর্বাত্মক রূপায়ণ।

ব্যক্তিমানুষের প্রাতিস্বিক সত্তা ও বোধের জন্মের সাথেই জড়িয়ে আছে উপন্যাসের শিল্পসত্তার আবির্ভাবের ইতিহাস। আর প্রাতিস্বিক মানুষের স্বতন্ত্র বোধের সাথে সমাজের, ব্যক্তির, পরিবেশের, চলমান জীবনের, কখনও কখনও ইতিহাসের সাথে সম্পর্ক সংঘর্ষের, দ্বন্দ্বের; যদিও সে দ্বন্দ্ব হতে পারে সমাজগতির নিয়মনিয়ন্ত্রিত কিংবা আপতিক। আর এই দ্বন্দ্ব অবশ্যম্ভাবী এবং বহুমাত্রিকতায় অন্তঃশীল। অন্যান্য শিল্পসাহিত্য মাধ্যম যেমন নাটক, কবিতা ইত্যাদির সাথে উপন্যাসের পার্থক্য ঘটে অনুভূতির প্রকাশভঙ্গিমার সূত্রেই। নাটক বা কবিতার মতো ঘটনার বা অনুভূতির শীর্ষবিন্দু বা সংকট

Dhaka University Institutional Repository

মুহূর্ত ঔপন্যাসিকের একমাত্র কেন্দ্রবিন্দু হয় না। ক্রমোন্নতি ও বিকাশের মাধ্যমে জীবনের সমগ্র রূপ শিল্পায়িত করাই হচ্ছে এর লক্ষ্য। একমাত্র উপন্যাসেই মানুষের গোচর-আগাচর বহিরঙ্গ-অন্তরঙ্গ ব্যক্ত-অব্যক্ত জীবন উদ্ভাসিত হয়। জীবনকে অ-প্রতিরোধে মেনে নিয়ে নয়, পুঙ্খানুপঙ্খ পরীক্ষা ও সমালোচনার মনোভাবে যাচাই করে জীবনের সমগ্রতা তুলে ধরার প্রচেষ্টার মধ্যে উপন্যাসের উদ্ভব ত্বরান্বিত হয়েছে।

ব্যক্তিমানুষকে তার সমাজ, রাষ্ট্র, বিশ্ব ও ইতিহাসের দ্বান্দ্বিক সক্রিয়তার অঙ্গ হিসেবে চিহ্নিত করেন ঔপন্যাসিক; ব্যক্তি বা চরিত্র এই প্রক্রিয়ায় উপস্থাপিত হলে তার সামগ্রিক পরিপ্রেক্ষিত, কাঠামোর সাথে সম্পৃক্ত অথচ পৃথক চরিত্রের সাধারণ বৈশিষ্ট্যও প্রকাশিত হয় উপন্যাসে। আর ব্যক্তিকে তার সংলগ্ন বৃহত্তর পটে বিন্যস্ত করার অর্থ– তার বাস্তবতার অস্ফূট ও পরিস্ফূট সকল নকশার অন্তর্বয়ন করা; ঔপন্যাসিকের বাস্তবজ্ঞানের, বোধের এবং ভঙ্গির তর-তম-এর ওপরই শ্রেষ্ঠত্ব কিংবা মাহাত্ম্য অনেকটা নির্ভরশীল। অখণ্ড সময় ও একই সাথে সাময়িকতায় জীবনের তাৎপর্য অনুসন্ধানের প্রয়োজনেই উপন্যাসের পরিসর হয় দীর্ঘ, তাই এর শিল্পরূপও নিরন্তর সম্ভাবনাময়।

উপন্যাস জীবনের অন্তর্বয়নের এক আধুনিক রূপকল্প। তবে এর পূর্ব-পরিচিহ্ন ছড়িয়ে আছে কথকতা, গাথা, রোজনামচা, রোমাঞ্চকর রচনাদি প্রভৃতির ধারায়। পুঁজিবাদী কাঠামোতে ব্যক্তিত্ব-বিকাশের হাত ধরে উপন্যাস এই আধুনিক রূপ নিয়েছে। "উপন্যাস নাটকীয় নয়, কাব্যিক নয়, মহাকাব্যিক নয়, অথচ এ-সব অঙ্গীকৃত হয়ে আছে উপন্যাসীয় প্রকরণে। নাটকের ক্রিয়া বা সংলাপ, গীতিকবিতার আত্মমুখিতা, মহাকাব্যের কাহিনীর নিরন্তর প্রবহমানতা এবং বিরাট সমাজ ও সামাজিককের ব্যাপ্ত পটভূমি উপন্যাসে বর্তমান, তবু উপন্যাস এ-সবের অতিরিক্ত একটি অনন্য শিল্পরূপ যার প্রাণ আন্দোলিত হয় জীবনসামগ্র্য রূপায়ণের অনন্য তাগিদে।" (কার্তিক, ২০১৪ : ২৩)। উপন্যাসের বৈশিষ্ট্য নিরূপণ করতে গিয়ে সমালোচকেরা কখনো কোনো উপন্যাসকে আখ্যা দেন কাব্যিক, কখনো নাট্যিক, কখনো দৃশ্যময়। যদিও উপন্যাসের ক্ষেত্রে এ ধরণের বৈশিষ্ট্য-সন্ধান আসলে ভ্রান্তিমূলক, বিশেষত সমকালে। ব্রিটিশ কবি ও তাত্ত্বিক ক্রিস্টোফার কডওয়েল (১৯০৭-১৯৩৭) তাঁর *Illusion and Reality* গ্রন্থে শিল্পরূপ হিসেবে কাব্য ও উপন্যাসের ভাষার পার্থক্য নির্দেশ করে বলেন :

Dhaka University Institutional Repository

> Poetic world is the logos, the word-made-flesh, the active will ideally ordering, whereas the novel's word is the sign, the reference, the conversationally pointing gesture. Poetry concentrates on the immediate affective associations of the word, whereas the story goes first to the object or entity symbolized by the word. (Philip, 2003 : 282)

জীবনের কোনো বাঁধাধরা ছক নেই– তা দ্বন্দ্বময়, আবেগময় এবং বিচিত্র সমস্যাসঙ্কুল হতে পারে, সুতরাং উপন্যাসে প্রতিফলিত জীবনও অতি বিচিত্র। প্রায় প্রতিটি উপন্যাসই একটি স্বতন্ত্র জীবনখণ্ড হয়ে ওঠে। জীবন ও উপন্যাসের সম্পর্ক বিষয়ে সমালোচক লেখেন :

> ব্যবহারিক জীবনের পরিসরে মানুষের অভিজ্ঞতার ক্ষুধা, জীবনের পিপাসা কখনোই মেটে না। এইখানেই আসে উপন্যাস তার সৃজনশীল মায়াদর্পণ নিয়ে, জীবনকে দেখা এবং দেখানোর প্রতিশ্রুতি নিয়ে। (সত্যেন্দ্রনাথ, ২০০০ : ১৪)

উপন্যাসে জীবনই হবে বিন্যস্ত বা অন্তর্বয়িত; তবে উপন্যাসের জন্ম থেকে যে বিবর্তনিক প্রক্রিয়া– তাতে এই শিল্প মাধ্যমে জীবন-বয়নের উপস্থাপনা (approcah) ধীরে ধীরে পরিবর্তিত ও রূপান্তরিত হয়েছে। প্লট, চরিত্র, সংলাপ, ঘটনা ও প্রতিবেশ সমৃদ্ধ আদি প্যাটার্ন-এর ধারণা এবং বাধ্যতা আধুনিক ও উত্তরাধুনিক কালে ক্রমান্বয়ে বদলে গেছে। আমেরিকান ঔপন্যাসিক ও উপন্যাস-তাত্ত্বিক হেনরি জেম্‌স (১৮৪৩-১৯২৬) তাঁর 'The Art of Fiction' (১৮৮৪) প্রবন্ধে বলেছিলেন যে, "A Novel is in its broadest definition a personal, a direct impression of life." উপন্যাস তাঁর কাছে "the best form of art to express the truth of life।" জীবন সম্পর্কে হেনরি জেম্‌সের যে মৌল ধারণা তা থেকেই উপন্যাসের জীবন-বিন্যাস রূপ নিয়েছে। প্রকারান্তরে সব উপন্যাসকেই সাধারণ অর্থে লেখকের জীবনের, সমকালের অংশ বলা যায়। কারণ অজ্ঞাতসারে প্লট, চরিত্র এবং বক্তব্যের মধ্যে অভিপ্রেত সমাহার ঘটায় জীবনবিন্যাস। উপন্যাসের জীবনায়ন, চরিত্র, ঘটনা কিংবা ঘটনাহীনতা সর্বোপরি বর্ণনভঙ্গি ও ভাষা– সবটাই ঔপন্যাসিকের জীবনদৃষ্টি (view of life) দ্বারা প্রভাবিত। এইচ. জি. ওয়েলসের মতে, "জীবনশিল্পী ঔপন্যাসিক সমকালের প্রেক্ষিতে সংগ্রামশীল

Dhaka University Institutional Repository

মানবাত্মার জীবনজিজ্ঞাসাকেই রূপ দেন– চরিত্রগুলির আত্মিক সংগ্রামের রসরূপই উপন্যাসের শিল্প।" (উদ্ধৃত, রবীন্দ্রনাথ, ১৯৭১ : ৭৩)। সমগ্র জীবন থেকেই জীবনের শিল্পরূপ তথা জীবনের উপন্যাসীয় বিন্যাস ধীরে ধীরে বিকশিত হয়ে ওঠে। সে কারণে আধুনিককালে আখ্যান বা কোনো উপন্যাসকে 'চরিত্রপ্রধান' 'বক্তব্যপ্রধান' 'আইডিয়াপ্রধান' বলে একটা মাত্র অভিধায় নির্দিষ্ট করা যায় না; কিংবা অনেকটা অবলুপ্ত হয়েছে উপন্যাসের শাখাগত শ্রেণিবিন্যাসও; যথা- সামাজিক উপন্যাস, ঐতিহাসিক উপন্যাস, পারিবারিক উপন্যাস প্রভৃতি অভিধা। প্লট-চরিত্র-প্রকাশরীতি নির্ভর 'অ্যাকাডেমিক' উপন্যাসবিচার রীতিও সমকালীন সমালোচনার কেন্দ্রীয় লক্ষ্য নয়। শিল্পের অভিপ্রায়ের পরিবর্তনই এর মূল কারণ। উপন্যাসের কথন-কাঠামো উপন্যাস-সংরূপের প্রধান ব্যাপার। কথন প্রক্রিয়াকে চিহ্নিত করাই উত্তরাধুনিক উপন্যাস সমালোচনার অন্যতম লক্ষণ। পাঠকের নিজস্ব পাঠকৃতি উপন্যাসের বহুমাত্রিকতা ও বহুআয়তনিক পরিসরকে চিহ্নিত করে দেয়।

উপন্যাসের জন্ম ও বিকাশ : ঊনিশ শতক

আখ্যান বা গল্পের জন্ম অনেক আগে হলেও সাহিত্য মাধ্যম হিসেবে ফর্মের নির্দিষ্টতায় ও বৈশিষ্ট্যে উপন্যাসের জন্ম আঠার-ঊনিশ শতকে। সময়ের ঐতিহাসিকতা নির্ণয়ে বলা হয়, সামন্ত সমাজ থেকে বুর্জোয়া সমাজের অভ্যুত্থানেই উপন্যাসের জন্ম সম্ভব হয়েছে; উপন্যাস নতুন সমাজ মানসের সৃষ্টি। এক কথায়, নবোত্থিত শিক্ষিত নগরবাসী মধ্যবিত্ত গোষ্ঠী ও বুর্জোয়া সমাজই উপন্যাসের প্রকৃত জন্মদাতা। ব্যক্তিচেতনা, সমাজবোধ, বাস্তবধর্মিতা, ব্যঙ্গ-পরিহাস, দুঃখবোধ সবই সমাজের ক্রমবিকাশের লক্ষণ।

উপন্যাসে মনস্তাত্ত্বিক জগতের প্রকাশ কিংবা জীবন-বাস্তবতার রূপায়ণ ঘটতে থাকে আঠার শতকের মাঝামাঝি থেকেই। কারণ-কার্য শৃঙ্খলা মেনে গড়ে ওঠা প্লট, চরিত্র এবং বাস্তবতার রূপাবয়ব– সব মিলেই উপন্যাসের গঠনভঙ্গি পরিণত ও সমৃদ্ধ হতে শুরু করে। এ সময়ের উল্লেখযোগ্য ইংরেজ ঔপন্যাসিক হলেন– ড্যানিয়েল ডিফো (১৬৬০-১৭৩১), স্যামুয়েল রিচার্ডসন (১৬৮৯-১৭৬১), হেনরি ফিল্ডিং (১৭০৭-১৭৫৪), লরেন্স টার্ন (১৭১৩-১৭৬৮) প্রমুখ। উপন্যাস সম্পর্কে হেনরি ফিল্ডিং-এর ধারণা ছিল যে নভেলে 'True to life' অর্থাৎ জীবনে ও সমাজে যেমন ঘটে তেমনটা ফুটিয়ে তুলতে হবে, এর বেশি বা কম নয়।[১] (উদ্ধৃত, দেবীপদ, ১৯৮২ : ৩৫)।

Dhaka University Institutional Repository

সমসাময়িক ফরাসি উপন্যাস বিষয়বস্তু ও রচনাশৈলীর উৎকর্ষে পূর্ণাঙ্গ হয়ে ওঠে। ইউরোপ এবং পশ্চিমা সভ্যতার ইতিহাসে ফরাসি বিপ্লব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। একে পশ্চিমা গণতন্ত্রের ইতিহাসে একটি জটিল সন্ধিক্ষণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়, যার মাধ্যমে পশ্চিমা সভ্যতা নিরঙ্কুশ রাজনীতি এবং অভিজাততন্ত্র থেকে নাগরিকত্বের যুগে পদার্পণ করে। এই আন্দোলন সংঘটিত হওয়ার পেছনে ফরাসি দার্শনিক ও সাহিত্যিকদের অসামান্য অবদান রয়েছে। পুরো আঠার শতক ধরে ইউরোপে এক বিপ্লবী চেতনার উন্মেষ ঘটেছিল। ফরাসি বিপ্লবের আগে প্রায় এক শতাব্দী ধরে ফ্রান্স আলোড়িত হয়েছে পুরনো আর নতুন চিন্তার দ্বন্দ্বে। ফ্রান্সকেন্দ্রিক সংস্কারপন্থী অভিজাত চিন্তাবিদ ছিলেন মঁতেস্কু (১৬৮৯-১৭৫৫), ভলতেয়ার (১৬৯৪-১৭৭৮), জ্যাঁ জ্যাক রুশো (১৭১২-১৭৭৮) প্রমুখ। শিল্প সাহিত্যসৃষ্টির ধারাতেও এ কারণে পরিবদল ঘটেছে। ফরাসি উপন্যাস প্রকৃতপক্ষে, স্তাঁদাল যাঁর মূল নাম– ম্যারি-হেনরি-বেইল (১৭৮৩-১৮৪১) এবং অনরে দ্য বালজাকের (১৭৯৯-১৮৫০) রচনাতে পূর্ণাঙ্গতা পেয়েছে, তাঁদের দু'জনেরই আবির্ভাব ১৭৮৯-এর রক্তক্ষয়ী বিপ্লবের পরে। বালজাকই প্রথম ঔপন্যাসিক, যিনি সমাজ-পরিমণ্ডলের সর্বময়তাকে রূপায়িত করবার প্রয়াসকেই উপন্যাসের অভিপ্রায় করে তুলেছিলেন। ফ্রাঁসোয়া র‍্যাঁবলের (১৪৮৩-১৪৯৪) মধ্য দিয়ে মধ্যযুগ থেকে আধুনিক পর্বে পৌঁছে যায় ফরাসি সাহিত্য। উনিশ শতকে ফরাসি উপন্যাসে মনস্তাত্ত্বিক বাস্তবতায় প্রতিষ্ঠা করেন স্তাঁদাল। চার্চ ও রাজতন্ত্র-বিরোধী প্রগতিশীল দৃষ্টি কিংবা অর্থনৈতিক রূপান্তর ও শ্রেণিচরিত্রের বিকাশ– এক কথায় বস্তুনিষ্ঠ দৃষ্টি ও সত্যনিষ্ঠ রূপায়ণ ঘটেছে এই শতকেই। এ পর্বের ফরাসি উপন্যাসে বিশেষত রুশো দিদেরার (১৭১৩-৮৪) উপন্যাসে সমাজ-রাষ্ট্র ধর্ম শিক্ষা প্রভৃতি বিষয় ধারণাগুলোর সম্পৃক্তি ও প্রবণতা সম্পর্কে বলা হয়েছে :

> …the relation of the novel to life, to science and to what later became known as social Science has remained a lively question in the sociology of art forms. (Morroe, 1977 : 2)

Reality এবং Fiction তথা Art-এ Fiction নিয়ে উনিশ শতক থেকেই শিল্পতাত্ত্বিকেরা নানা মত দিয়েছেন, যা উত্তরিত সময়ের প্রতিফল। মধ্যবিত্ত শ্রেণি কিংবা উপন্যাস পাঠকের জন্য গুণগত ও পরিমাণগত সম্প্রসারণ প্রয়োজন ছিল উপন্যাসের, সেটা এ সময়েই ঘটেছে– যেমন বাস্তবধর্মী, ব্যক্তি-

Dhaka University Institutional Repository

স্বাতন্ত্র্যধর্মী বা ইতিহাসধর্মী উপন্যাসের বিকাশ। উপন্যাসে জীবনধর্মিতা এক ধ্রুব সত্য– স্তাঁদাল, বালজাক, ভিক্টর হুগো প্রমুখের সাহিত্যকর্ম ও চেতনায়– অভিব্যক্তিতে তা ফুটে উঠল। এতে উপন্যাসে বর্ণিত সমাজ ও সৃষ্ট ব্যক্তি চরিত্রেরা জীবন্ত হয়ে উঠল। এছাড়া আঠারো শতকের যুক্তিবাদ, বুদ্ধিবাদের পর ঊনিশ শতকের প্রথমার্ধে রোমান্টিক ভাবধারার বৈচিত্র্য পরিলক্ষিত হয়। ফলে এ পর্যায়ের সাহিত্যকর্মে ব্যক্তিমানুষের বিদ্রোহ কিংবা সাধারণ মানুষের উপস্থিতি সহানুভূতির সাথে রূপায়িত হয়েছে। আবার ঊনিশ শতকের মধ্যপর্বের মধ্যেই বাস্তবধর্মিতার চারিত্র্য বদলে গেল রোমান্টিকতা-বিরোধিতায়।

এ পর্বে ফরাসি ঔপন্যাসিক গুস্তাভ ফ্লবেয়র (১৮২১-১৮৮০), এডমণ্ড গঁকুর (১৮২২-৯৬) ও জুল গঁকুর (১৮৩০-১৮৭০), এমিল জোলা (১৮৪০-১৯০২) প্রমুখ ঔপন্যাসিকের সৃষ্টিকর্ম অগ্রগণ্য। এছাড়া ছিলেন আর্দ্রে জিদ (১৮৬৯-১৯৫১), মার্সেল প্রস্ত (১৮৭১-১৯২২), জ্যাঁ পল সার্ত্রে (১৯০৫-১৯৮০), আলবেয়ার ক্যামু (১৯১৩-১৯৬০)। সমকালীন ফরাসি উপন্যাসে বুর্জোয়া মধ্যবিত্ত সমাজ আচরিত ও পোষিত তথাকথিত 'আদর্শ' সম্পর্কে অবজ্ঞা ও দ্রোহ, জীবন-দর্শন, বুদ্ধিধর্মী অহংমুখী চেতনা, অর্থময় অস্তিত্ববাদ বা চিন্তা প্রভৃতি প্রকাশ পেল। সাম্রাজ্যবাদ, ফ্যাসিজমের বিরোধিতা এবং মানবতাবাদী দর্শনের প্রকাশ ঘটল সাহিত্যে। সেই সাথে সময়-চেতনায় ইতিহাসের অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক ব্যাখ্যা, মানুষের শ্রেণিসংগ্রাম, শ্রেণিসংঘাত প্রভৃতির যৌক্তিক বিশ্লেষণও ছিল। শিল্পচর্চায় 'ন্যাচারালিজম' প্রাধান্য পেয়েছে, বিশেষত এমিল জোলা ও গঁকুর ভাতৃদ্বয়ের রচনায়। ফ্রান্সে 'ন্যাচারালিজম' ছিল একাধিক ধারার মধ্যে একটি উপন্যাস-রীতি, যার সমান্তরালেই ছিল প্রতীকি রীতি আর মনের অন্তর্গত তলের ভাবনাস্রোতের ধারাভাষ্য নিয়ে লেখা উপন্যাস।

উপন্যাস-শিল্পে রাশিয়ান ঔপন্যাসিকেরাও অনন্য ভূমিকা রেখেছেন। ঊনিশ শতকে আলেকজান্ডার পুশকিন (১৭৯৯-১৮৩৭), নিকোলাই গোগোল (১৮০৯-১৮৫২), আইভান তুর্গেনেভ (১৮১৮-১৮৮৩), ফিওদর দস্তয়েভস্কি (১৮২১-১৮৮১), লিও তলস্তয় (১৮২৮-১৯১০) প্রমুখের উপন্যাস-শিল্প সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। এ শতকে জার-শাসিত রাশিয়ায় অভিজাত শ্রেণির মানুষেরা ইউরোপীয় শিক্ষাতেই অভ্যস্ত ছিলেন। রুশ সাহিত্যে আধুনিকতা এনেছিলেন পুশকিন। বাস্তব জীবনচেতনা আর রোমান্টিক কল্পনা মিশেছিল তাঁর লেখায়। আধুনিক রুশ উপন্যাসে বাস্তবতার রূপায়ণে যে সম্পূর্ণতা

Dhaka University Institutional Repository

অনুভব করা যায়, তার ইউরোপীয় সাহিত্য থেকে মৌলিকভাবে পৃথক। শিল্প ও উদ্দেশ্য এতে এমনভাবে জীবনায়িত যে তা অন্য দেশের উপন্যাসে বিরল। সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদী দৃষ্টি তথা মার্কসবাদী চিন্তায় শিল্পী ও তার সৃষ্ট সাহিত্যকর্মের সামাজিক রাজনৈতিক দায় প্রাধান্য পেয়েছে। "সংঘশক্তির উত্থান ও অপরাজেয়তায় বিশ্বাসী যে নতুন মতবাদ দ্বারা রাশিয়ার নবীন শাসনতন্ত্র উজ্জীবিত ছিল– সেই মতবাদে বিচ্ছিন্ন মানুষের আর্ত অসহায় মানবাত্মার যন্ত্রণাকে প্রাধান্য দেওয়াটা গণ্য হয়েছিল প্রগতিবিরোধী রূপে। তাই বিশ শতকের রুশ ঔপন্যাসিকদের লেখায় প্রধানত সমাজবাস্তবতার চিত্রণ আর সামাজিক প্রগতি সম্পর্কিত আদর্শ ও প্রত্যয়েরই রূপায়ণ ঘটেছে।" (সুমিতা, ২০১০ : ৩৬)। এভাবে সমগ্র ঊনিশ শতক ধরেই ইংরেজি ফরাসি ও রুশ উপন্যাস-শিল্পের সৃষ্টি, বিকাশে সংরূপের নানা পরিচর্যা চলেছে।

উপন্যাস : বিশ শতক

উপন্যাসের শিল্প-সংরূপের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে উপন্যাসকে দেখবার দৃষ্টিকোণেও এসেছে অবশ্যম্ভাবী ও প্রত্যাশিত পরিবর্তন। বিশ শতকে বহু-আয়তনিক উপন্যাসের সম্ভাবনা বেড়ে যায়; এর মূলে সমাজবিজ্ঞানী, দর্শনবিদ, বৈজ্ঞানিক ও মনোবিজ্ঞানীর প্রভাবও আছে। নৃ-বিজ্ঞানী জেম্‌স জর্জ ফ্রেজার রচিত গ্রন্থ (১৮৫৪-১৯৪১) *The Golden Bough* (১৮৯০) মনস্তত্ত্ববিদ ও দার্শনিক উইলিয়াম জেম্‌স-এর (১৮৪২-১৯১০) *The Principle of Psychology* (১৮৯০), সিগমুণ্ড ফ্রয়েড (১৮৫৬-১৯৩৯), কার্ল গুস্তাভ ইয়ুং (১৮৭৫-১৯৬১), আলফ্রেড এ্যাডলার (১৮৭০-১৯৩৭), পরবর্তীকালে জ্যাক লাকাঁ (১৯০১-১৯৮১), হ্যারল্ড ব্লুম (১৯৩০-) প্রমুখ মনোবিজ্ঞানীর তত্ত্ব ও সিদ্ধান্ত; দার্শনিক নিট্‌শেসহ আধুনিক দার্শনিকগণের জীবনদর্শন, বিজ্ঞানী ও দার্শনিক বার্গসঁ-এর গতিতত্ত্ব, আইনস্টাইন-এর আপেক্ষিকতাবাদ প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকতত্ত্ব, প্রযুক্তির নব নব আবিষ্কার ইত্যাদিতে বিশ শতকের মধ্যভাগের মধ্যেই মানুষ পরিচিত হয়ে যায়।

মানবমনের রহস্য, অবচেতনা, আদিম-কামনাসমূহের অস্তিত্ব ও অভিব্যক্তি সম্পর্কে জ্ঞান অর্জিত হবার সঙ্গে সঙ্গে জীবন সম্পর্কে দৃষ্টিকোণও বিপুলভাবে পরিবর্তিত হল। মানুষের প্রতিটি আচরণ বিশ্লেষণের দৃষ্টিভঙ্গি নতুনত্ব পেল। একইসাথে শিল্পেরও নব নব প্রচ্ছায়, পর্যায় ও ব্যাখ্যা সম্পূর্ণ নতুন চেতনার দ্বার উন্মোচন করল -লেখক ও পাঠক উভয়ের কাছে। জেমস্ জয়েসের (১৮৮২-১৯৪১) *ইউলিসিস*

Dhaka University Institutional Repository

(১৯২২) উপন্যাসটি মিথ আর চেতনা-প্রবাহরীতির মিশ্রণে নির্মিত। জয়েস-প্রবর্তিত 'চেতনাপ্রবাহ টেকনিক' উপন্যাস লেখার কৌশলে এক বিরাট পরিবর্তন এনেছিল, তাতে উপন্যাসের সীমার পরিধি অনেক বেড়ে গেল। ১৯০৯-এ ফরাসি ঔপন্যাসিক মার্সেল প্রুস্ত (১৮৭১-১৯২২), ১৯১৫-তে ইংরেজ ঔপন্যাসিক ডরোথি রিচার্ডসন (১৮৭৩-১৯৫৭) এবং ১৯৩০-এর মধ্যে প্রকাশিত ভার্জিনিয়া উল্‌ফ (১৮৮২-১৯৪১)-এর উপন্যাসসমূহে 'Stream of consciousnes' টেকনিকের পাকাপাকি প্রবর্তন হল। বিশ শতকের প্রথম ভাগের সাহিত্যিক গোষ্ঠী 'ব্লুমস্‌বেরি গ্রুপ'-এ ছিলেন ভার্জিনিয়া উল্‌ফ, ই. এম. ফরস্টার (১৮৭৯-১৯৭০), জন মেনার্ড কেয়ানস (১৮৮৩-১৯৪৬) প্রমুখ ঔপন্যাসিক, যারা নারীবাদ, যুদ্ধবিরোধী শান্তিকামনায় মানবতাবাদ (pacifism) প্রভৃতি তত্ত্ব-দর্শনের চর্চা করেন। ভার্জিনিয়া উল্‌ফ তাঁর 'Modern Fiction' (১৯১৯) প্রবন্ধে লিখেছেন যে, ঔপন্যাসিক যদি সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে নিজের অনুভূতি ও উপলব্ধি প্রকাশ করতে পারতেন তাহলে "There would be no plot, no comedy, no tragedy, no love interest or catastrophe in the accepted sense." (উদ্ধৃত, দেবীপদ, ১৯৮২ : ১৫০)। এছাড়া কথাসাহিত্যের মূলধন হল মানুষের জীবন ও তন্নিহিত গভীর অভিজ্ঞতা, সে কাজ দুরূহও বটে। উল্‌ফ লিখেছেন :

> The novelist- it is his distinction and his danger is terribly exposed to life. (উদ্ধৃত, বীরেন্দ্র, ১৯৯৮ : ৭০)

উল্‌ফের উপন্যাসগুলো যথা *Mrs Dalloway* (১৯২৫) *To The Light House* (১৯২৭) মূলত নব্য উপন্যাস-রীতির সাক্ষ্য হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। এভাবে 'সেলফ' আর 'সোল' অর্থাৎ আত্মসত্তাকে প্রধান করে দেখার শৈল্পিক অভ্যাস তৈরি হল। ইউরোপীয় চিত্রকলায় রিয়ালিজম-এর যুগও তখন অতিক্রান্ত। ইম্‌প্রেশনিজম প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে উনিশ শতকের শেষ তিন দশকের দিকে। বাস্তবের বিচিত্র বিন্যাস নয়, নিজের মনের স্তরকেই রঙে-রেখায় ভাষা দিতে চেয়েছেন চিত্রশিল্পীরা। এই সব কিছুরই সম্মিলিত অভিঘাত ছিল বিশ শতকীয় উপন্যাসের গতিপথ পরিবর্তনের কারণ। 'মিস্টার বেনেট অ্যাণ্ড মিসেস ব্রাউন' প্রবন্ধে (১৯২৪) উল্‌ফ ইংল্যান্ডের রাজা সপ্তম এডওয়ার্ড-এর সময়কালীন 'এডওয়ার্ডিয়ান নভেল' (জন গল্‌সওয়ার্দি, শার্ল বেনেট, এইচ. জি. ওয়েলস) এর সঙ্গে 'মডার্ন নভেল'-এর একটি তুলনা করেছিলেন। সেখানে সমকাল সম্পর্কে তাঁর বিখ্যাত উক্তিটি ছিল : "...in or about December 1910, human character changed." (উদ্ধৃত, সুমিতা, ২০১০ : ৪১)।

Dhaka University Institutional Repository

জয়েস প্রবর্তিত চেতনা-প্রবাহধর্মী উপন্যাসের উপযোগিতা বিশ শতকেই শেষ হয়ে যায়নি। মূলত অন্তরঙ্গ আত্মকথন বা চেতনাস্রোতকে ভাষায় রূপান্তরিত করার এই প্রয়াস আধুনিক-উত্তরাধুনিক কালেও চলেছে। মনোঃসমীক্ষণের ভূমিতে তত্ত্বের নতুনত্ব ঘটেছে ভাষাভিত্তিক সাহিত্যতত্ত্বের বিকাশের মাধ্যমে। এ পর্যায়ে জ্যাক লাঁকার তত্ত্বই অগ্রগণ্য; বিশ শতকের প্রথম ভাগটি ফ্রয়েড-শাসিত, দ্বিতীয় ভাগ বিশেষত শেষ তিন দশকে লাঁকার তত্ত্বেরই প্রাধান্য। সমকালীন অধিকাংশ সাহিত্যতাত্ত্বিক ও সমালোচকেরা লাকাঁর মনোঃসমীক্ষণতত্ত্বের ওপর অনেকটা নির্ভরশীল। লাকাঁ মিলন ঘটান ফার্দিনান্দ দ্য সস্যুর (১৮৫৭-১৯১৩)-এর ভাষাবিষয়ক চিন্তা এবং ফ্রয়েডের মনোবিজ্ঞানের। লাকাঁর মতে, ভাষার মতই মানুষের অবচেতন মনও কাঠামোবদ্ধ (Stuctured)। *Écritis* (১৯৭৭) গ্রন্থে ডিসকোর্সের কাঠামোবাদী (Stucturalist) ও উত্তর-কাঠামোবাদী (Post-Stucturalist) তত্ত্বসমূহের আলোকে ফ্রয়েডকে পুনর্ব্যাখ্যা করেছেন তিনি, ফ্রয়েডীয়বাদকে পুনর্লিখন করতেও চেয়েছেন তিনি। ফ্রয়েডের ভেতর-কাঠামো থেকে লাকাঁর উত্তরণ ঘটে বাইরের ভাষা-কাঠামোতে। মানব বিষয় (Subject) এর সাথে ভাষার কী সম্পর্ক তা-ই তাঁর বিশ্লেষণের বিষয়। পরবর্তীকালে মিশেল ফুকো (১৯২৬-১৯৪৮) জ্যাক দেরিদা (১৯৩০-২০০৪) শিল্পতত্ত্বে ভাষা বিষয়ক দর্শনকে আরো বিস্তৃত করেন।

একুশ শতকের ইংরেজ ঔপন্যাসিক ও মনোবিদ Salley Vickers (১৯৪৮–) একজন ঔপন্যাসিক ও একজন মনোবিজ্ঞানীর সাদৃশ্য বিষয়ে বলেন : "Being a psychoanalyst is another way of being a novelist, both are about story." (সূত্র : Salley Vicker, Wikipedia)। Vicker-এর মতে, উপন্যাস আসলে (জীবনের) সামগ্রিক বিশ্লেষণের ওপরেই জোর দেয়, যেখানে অব্যক্ত নীরবতা শব্দে শব্দে উচ্চকিত হয়ে ওঠে আর শব্দের আকারে একটি অর্থ বারবার বিনির্মিত হয়। মূলত দর্শন, ইতিহাস, নৃতত্ত্ব, রাজনীতি-তত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব কিংবা মনস্তত্ত্ব ব্যক্তির অহংকেই উপস্থিত রাখে। আধুনিক উপন্যাস বা আখ্যানও একারণে বৃহৎ 'টেক্স্ট', যা একই সাথে অসংখ্য 'co-text' -এর সম্মিলিত বয়ান সাথে করে হয়ে ওঠে বহুবাচনিক।

উপন্যাসে বাস্তবতার ধারণার বিকাশ উনিশ শতকেই, বাস্তববাদের ধারণা যদিও একরইরকম থাকেনি। ঔপন্যাসিকেরা পরিবর্তিত বাস্তবতা উত্থিত নতুন সমস্যাবলীর স্বরূপ ও প্রকৃতি আবিষ্কারে

Dhaka University Institutional Repository

নব কৌশল ও রীতির ও উদ্ভাবন করেছেন। উপন্যাসের প্রথম যুগে ছিল কাহিনীর প্রয়োজন; তারপর দরকার হল চারিত্রিক স্বাতন্ত্র্যের। মনস্তত্ত্বমূলক রচনার পর কাহিনীর জটিলতা ঘুচে গেল, বাড়ল মনের জটিলতা, তারপর সৃষ্টি হল চেতনা-প্রবাহের। অর্থাৎ শিল্পের নিজস্ব নিয়মে এক-এক সময় এক-এক রকমের উপন্যাসরীতির উদ্ভব হয়েছে; কিন্তু এর সঙ্গে সামাজিক, আর্থনীতিক ও রাজনীতিক পরিবেশ ও অবস্থার পরিবদলের নিগূঢ় যোগ রয়েছে।

বিশ শতকের বিশ্ব-উপন্যাস ইতিহাস পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে উপন্যাস ক্রমশ বাস্তববাদী, সাম্রাজ্যবাদ, যুদ্ধ ও বুর্জোয়া সমাজবিরোধী, ফ্যাসিবাদবিরোধী এবং প্রযুক্তিসর্বস্ব পশ্চিমা ধনতন্ত্র ও আধিপত্য-লিপ্সার নিস্ফল পরিণতি সম্পর্কে বিরূপ চেতনাসম্পন্ন হয়ে ওঠে। ক্রমান্বয়ে সমাজভিত্তিক বাস্তবপন্থী দৃষ্টি, বুদ্ধিধর্মিতা, প্রতীকধর্মিতা ও চেতনা-প্রবাহতা প্রাধান্য পেয়েছে উপন্যাসে। আখ্যানে লেখকের সর্বজ্ঞ ভূমিকাও হ্রাস পেতে থাকে।

প্রথম ও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ বিশ শতকের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। যুদ্ধ-আক্রান্ত বাস্তবতায় যুদ্ধের অর্থহীন সংগ্রাম ও মূল্যবোধের পরিণতি শিল্পীমনে অন্তর্প্রবিষ্ট হতে থাকে, যুদ্ধের প্রতিরোধ-লক্ষ্যে অস্তিত্ব ও জীবন মমত্ব সর্বোপরি মানববাদ হয়ে ওঠে মৌলিক জিজ্ঞাসার বিষয়। "কীভাবে শিল্পী কালিক অভিজ্ঞতাকে অপসৃয়মাণ সময় থেকে উদ্ধার করে রূপ দেবেন, সে জিজ্ঞাসায় আন্দোলিত হতে থাকে ফর্ম, অন্তর্সূত্র হিসেবে এই আন্দোলনে যুক্ত থাকে ব্যক্তিসময়তারও সংকট, বস্তুর সঙ্গে তার চেতনার বিপ্রতীপ সম্পর্ক এবং নির্বিচার নিঃশর্ত শিল্পবিশ্বকে তাৎপর্য প্রদানের ইচ্ছা।" (আকতার, ১৪০৭ : ১৭)। বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও পুঁজি জৈব প্রয়োজনের এবং ভোগ-বিলাসের সমস্ত সুবিধা করে দিলেও প্রশ্নবিদ্ধ হয়েছে সংস্কৃতি-স্বাধীনতা, প্রেম-ব্যক্তিত্ব। সমকালীন রাষ্ট্র ও সমাজব্যবস্থা বিশেষত পাতি বুর্জোয়া শ্রেণির রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন ও ধনতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ক্রম আধিপত্য, মধ্যবিত্ত বা সাধারণ শ্রেণির মাঝে নিরাশা ও হতাশা, সময় সম্পর্কে তিক্ত অবিশ্বাস, জগৎ সম্পর্কে ছিল অসুখী মনোভাব; শিল্পীমনেও প্রায় একই প্রতিক্রিয়া ছিল।

বিশ শতকের উল্লেখযোগ্য ইংরেজ ঔপন্যাসিক হলেন– হারমান মেনভিল (১৮১৯-১৮৯১), জোসেফ কনরাড (১৮৫৭-১৯২৪), এইচ. জি. ওয়েলস (১৮৬৬-১৯৪৬), জন গল্‌সওয়ার্দি (১৮৬৭-১৯৩৩),

Dhaka University Institutional Repository

ই. এম. ফরস্টার (১৮৭৯-১৯৭০), ডি. এইচ. লরেন্স (১৮৮৫-১৯৩০), অলডাস্ হাক্সলি (১৮৯৪-১৯৬৩), জর্জ অরওয়েল (১৯০৩-১৯৫০), গ্রাহাম গ্রীন (১৯০৪-১৯৯১) প্রমুখ। সমকালে আমেরিকান ঔপন্যাসিক উইলিয়াম ফকনার (১৮৯৭-১৯৬২), আর্নেস্ট হেমিংওয়ে (১৮৯৮-১৯৬২), জন স্টেইনবেক (১৯০২-১৯৬৮), নাথানিয়েল ওয়েস্ট (১৯০৩-১৯৪০), হেনরি রথ (১৯০৬-১৯৯৫), রিচার্ড রাইট (১৯০৮-১৯৬০), টম উল্ফ (১৯৩০-২০১৮) প্রমুখ বিখ্যাত হয়ে ওঠেন। আমেরিকান ঔপন্যাসিকেরা সমকালীন কথাসাহিত্যের বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গিকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। এছাড়া উপন্যাসে সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতাকে প্রাধান্য দেয়া, পিউরিটান গোঁড়ামির বিরোধিতা, বর্ণ-বৈষম্য, যুদ্ধ ও ফ্যাসিজম বিরোধিতাও ছিল। তিরিশের যুগের আমেরিকান উপন্যাসকে 'proletarian novel'-এর যুগ বলা হয় কারণ ঔপন্যাসিকেরা প্রায় সকলেই পুঁজিবাদের অসারতা বনাম তথাকথিত সভ্যতার বিরুদ্ধে এবং সাধারণ মানুষের পক্ষে দাঁড়িয়েছিলেন। এছাড়া সামাজিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্যের বাস্তবপন্থী তথ্যনিষ্ঠ documentary বা ন্যাচারালিস্ট রূপায়ণই আমেরিকার উপন্যাসের মুখ্য বৈশিষ্ট্য।

বিশের দশকে 'নন-ফিকশনধর্মী' উপন্যাসের গঠনও নব্য আঙ্গিক এনে দিয়েছে; আমেরিকান ঔপন্যাসিক ট্রুমান গার্সিয়া কাপোটি (১৯২৪-২০১৬)-এর *In Cold Blood* (১৯৬৬), মাইকেল হার (১৯৪০-২০১৬)-এর *Dispatches* (১৯৭৭), নরম্যান মেইলার (১৯২৩-২০০৭)-এর *The Armies of the Night* (১৯৬৮), অ্যালেক্স হ্যালে (১৯২১-১৯৯২)-এর *Roots : The saga of an American Family* (১৯৭৬) প্রভৃতি উপন্যাসের গঠন-প্রকৃতি থেকে এগুলোকে 'নন-ফিকশন' উপন্যাস হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। ষাটের দশকের মধ্যভাগে আমেরিকান সাংবাদিক ও লেখক টম উল্ফের (১৯৩০-২০১৮) 'নিউ জার্নালিজম'-এর তত্ত্বীয় ধারণা ও চর্চা উপন্যাসের গঠনে তথা 'ন্যারেশনে' সাংবাদিকতার ধরন প্রয়োগে অনুপ্রাণিত করে। 'নন-ফিকশন' উপন্যাস আসলে সাহিত্যের এক প্রকার সাংবাদিকতা (Literary Journalism), যা সাধারণত বাস্তব তথ্যসমৃদ্ধ দৈনন্দিনতা থেকে সংগৃহীত।

ঊনিশ শতকের প্রথমার্ধে ফ্রান্সে ইতিহাস-কল্পিত-রঞ্জিত রোমান্টিক কাহিনীর উপন্যাস-সম্ভার রচিত হয়েছিল প্রচুর। ভিক্টর হুগো (১৮০২-১৮৮৫), আলেকজাঁদরে দ্যুমা (১৮০৩-১৮৭০) ছিলেন এ ধারার অন্যতম লেখক। তবে এ শতকের শেষ দুই দশক থেকেই ফরাসি শিল্পীদের শিল্প-ভাবনায়

Dhaka University Institutional Repository

পরিবর্তন এল। উপন্যাস কেবল বিধিবদ্ধ কাহিনীর আধার হবে এমন ধারণা বদলে গেল। ফরাসি কবি শার্ল বোদলেয়ার (১৮২১-১৮৬৭) এবং স্টিফেন মালার্মের (১৮৪২-১৮৯৮) শিল্পচর্চা ফরাসি সাহিত্যের ইতিহাসে তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে ওঠে। এর আগে স্তাঁদাল এবং বালজাক দুজনেরই লেখায় প্রাধান্য পেয়েছিল বস্তুবাদী দৃষ্টিকোণ। বিশ শতকে প্রথম উল্লেখযোগ্য ফরাসি ঔপন্যাসিক মার্সেল প্রুস্ত (১৮৭১-১৯২২)। এছাড়া আর্দ্রে জিদ (১৮৬৯-১৯৫১), আর্দ্রে ব্রেঁতো (১৮৯৬-১৯৬৬), লুই আরাগঁ (১৮৯৭-১৯৮২), রমাঁ রলাঁ (১৯০৪-১৯১২), জ্যাঁ পল সার্ত্রে (১৯০৫-১৯৮০), আলবেয়ার ক্যামু (১৯১৩-১৯৬০) প্রমুখের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ্য। বিশ শতকের ফরাসি উপন্যাসের বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করে বলা যায়– শিল্পী-মনস্তত্ত্বে তখন সক্রিয় ছিল বুর্জোয়া-মধ্যবিত্ত সমাজ-আচরিত ও পোষিত তথাকথিত 'আদর্শ' সম্পর্কে অবজ্ঞা এবং দ্রোহ; সাম্রাজ্যবাদ-ফ্যাসিজমের বিরোধিতা, সমাজের 'মেকি' বা কৃত্রিমতার প্রতি বিরূপতা, প্রটেস্ট্যান্ট-পিউরিটান ধর্মানুশাসন থেকে অহং বা আত্মমুখী নিষ্ক্রমণ প্রক্রিয়া ইত্যাদি। কল্যাণকামী সমাজবাদ, ধর্মীয় দর্শন তথা মানববাদ, ঐতিহাসিক দৃষ্টি, ইতিহাসের অর্থনৈতিক ব্যাখ্যা ও শ্রেণিসংগ্রাম সচেতনতাসমৃদ্ধ রাজনৈতিক চেতনা, স্ব-পোষিত দর্শনের চর্চা, বুদ্ধিধর্মী অহংমুখিতা, বাস্তবধর্মী সমস্যা এবং নেতিবাচক অস্তিত্ববাদ থেকে অর্থময় অস্তিত্ববাদ প্রভৃতি চেতনা ও দর্শনে সমকালীন ফরাসি উপন্যাস-শিল্প সমৃদ্ধ হয়েছে। শিল্প-পরিচর্যার দিক থেকে প্রতীকবাদ, দাদাইজম ও সুর্‌রিয়ালিজম ছিল অন্যতম।

রুশ উপন্যাসরীতি আদ্যন্ত স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে স্বতন্ত্র। দস্তয়েভস্কি এবং তলস্তয়ের মধ্য দিয়ে রাশিয়ার উপন্যাস শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছে। দস্তয়েভস্কি তাঁর রচনার মধ্য দিয়ে গিয়েছেন মানুষের আত্মার কাছে, যেখানে অবিরাম পাপ-পূণ্যের সংঘাত চলতে থাকে এবং মানুষ উত্তরণের পথ খোঁজে। তলস্তয় পাপের জগতের ভেতরে মানুষের দুর্দশার কাহিনী লিখেছেন এং সেই মানুষকে নিজের খাঁটি সত্তার কাছে, খাঁটি অস্তিত্বের মুখোমুখি দাঁড় করাতে চেয়েছেন, যাতে সে নিজের বিভ্রমগুলোকে বুঝতে ও জীবনের খাঁটি স্বরূপটিকে চিনতে পারে। যদিও পাপ-পূণ্যের ধারণা বিষয়ে চিন্তা-চেতনার যথেষ্ট পরিবর্তন হয়েছে একালে। তলস্তয়ের *ওয়ার অ্যান্ড পিস*-কে সর্বকালের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস বলেছেন তুর্গেনেভ, ফ্লবেয়র, গল্‌সওয়ার্দি, ই. এম. ফরস্টারের মতো দুনিয়াখ্যাত লেখকেরা। ঔপন্যাসিক টমাস মান *আন্না কারেনিনা*-কে বলেছেন 'বিশ্বসাহিত্যের শ্রেষ্ঠ সামাজিক উপন্যাস।' (রাহুল, ২০১৭ : ভূমিকা-অংশ)। আঙ্গিক ও বিষয় নিয়ে গভীর মৌলিকতার পরিচয় দিয়েছিলেন নিকোলাই গোগোল। জার-শাসিত

Dhaka University Institutional Repository

রাশিয়ার ভয়াবহ, দুর্দশাগ্রস্ত ছবি উঠে এল তাঁর রচনায়। এছাড়া আধুনিক মানুষের জীবনকে লোককাহিনীর ছাঁচে ঢেলে পরিবেশন করেন তিনি। রুশ সামন্ত-সমাজের অসুস্থতা, বিপ্লব ও বিপ্লবী জীবনের গোঁজামিল, রাশিয়ার নতুন সমাজের নানা অসঙ্গতি নিয়ে অকপটে লিখেছেন ম্যাক্সিম গোর্কি (১৮৬৮-১৯৩৬)। এছাড়াও আইভান বুনিন (১৮৭০-১৯৫৩), মিখাইল শ্লোকভ (১৯০৫-১৯৮৪), নিকোলাই অস্ত্রোভস্কি (১৯০৪-১৯৩৬), ইলিয়া ইরেনবুর্গ (১৮৯১-১৯৬৭) প্রমুখ ঔপন্যাসিকের উল্লেখযোগ্য অবদান রয়েছে।

বিশ শতকের গোড়া থেকেই রাশিয়ায় আখ্যানতত্ত্ব নিয়ে নানা ভাবনাচিন্তা শুরু হয়ে যায়। উপন্যাসের আঙ্গিক নিয়ে এই ভাবনাচিন্তা আঙ্গিকের ধ্রুপদী, সরলরৈখিক কালানুক্রমকে ভেঙে দেয়। মিখাইন বাখতিনের (১৮৯৫-১৯৭৫) আবির্ভাব এ ব্যাপ্যারে বিরাট ভূমিকা নেয়। ফরাসি ঔপন্যাসিক র‍্যাবলে (১৪৯৪-১৫৫৩) এবং রাশিয়ান ঔপন্যাসিক দস্তয়েভস্কিকে (১৮২১-১৮৮১) নিয়ে যুগান্তকারী কাজ করলেন বাখতিন। এর পাশাপাশি রুশ ফিউজারিজমের উত্তরাধিকার হিসেবে জন্ম নিল রুশ ফর্মালিজম। রুশ প্রকরণবাদীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন বরিস আইকেনবম (১৮৮৬-১৯৫৯), ভিক্টর শক্লভস্কি (১৮৯৩-১৯৮৪), ইউরি তিনিয়ানোভ (১৮৯৪-১৯৪৩), ভ্লাদিমির প্রপ (১৮৯৫-১৯৭০) এবং রোমান জ্যাকবসন-এর মত (১৮৯৬-১৯৮২) বিখ্যাত আখ্যানতাত্ত্বিক। তলস্তয়কে নিয়ে প্রসিদ্ধ কাজ করেন শক্লভস্কি।

বিশ শতকে জার্মানির হাইনরিখ মান (১৮৭১-১৯৫০), এরিখ মারিয়া রেমার্ক (১৮৯৮-১৯৭০), টমাস মান (১৮৭৫-১৯৫৫), গুন্টার গ্রাস (১৯২৭-২০১৫); চেক ঔপন্যাসিক ফ্রান্জ কাফকা (১৮৮৩-১৯২৪) প্রমুখের নামও অগ্রগণ্য। উপন্যাসে তাত্ত্বিকতা আমদানি করেন কাফ্কা, জার্মান ঔপন্যাসিক জ্যাকব ওয়েসেরমান (১৮৭৩-১৯৩৪), অস্ট্রিয়ান-বোহেমিয়ান কবি-নাট্যকার ও ঔপন্যাসিক ফ্রান্জ ওয়েরফেল (১৮৯০-১৯৪৫) প্রমুখ। আধুনিক জীবনে ব্যক্তি-আত্মার নিঃসঙ্গতা মানুষকে অন্তর্মুখী ক'রে ঘটনার চেয়ে তাত্ত্বিকতার দিকে নিয়ে চলেছে– তার পরিচয় আছে কাফ্কার উপন্যাসে। রাশিয়ান ঔপন্যাসিক বরিস পাস্তেরনাক (১৮৯০-১৯৬০), মিখাইল বুলগাকভ (১৮৯১-১৯৪০), ভ্লাদিমির নবোকভ (১৮৯৯-১৯৭৭), মিখাইল শ্লোকভ (১৯০৫-১৯৮৪) প্রমুখের উপন্যাসও উৎকর্ষ

Dhaka University Institutional Repository

লাভ করেছে। বিষয়বস্তু ও পরিচর্যারীতির পরিপ্রেক্ষিতে বিশ শতকের উপন্যাসের কিছু সাধারণ বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করা যায় :

- সমকালীন পরিবেশের বা ঘটনার বিবরণ নয় বরং উপন্যাস হয়ে উঠল সময়ের ব্যাখ্যাতা।
- ঘটনার ক্রিয়ার চেয়ে চরিত্রায়ণ কৌশলকে গুরুত্ব প্রদান।
- পরিচর্যার দিক থেকে উপন্যাস 'এক্সপ্রেশনিস্টিক' নয়, হয়ে ওঠে 'ইমপ্রেশনিস্টিক'। কারণ জীবনের অন্তর্গত বা গভীরতর সত্য ধরার জন্য এটি প্রয়োজন।
- উপন্যাস তার প্রথাগত রীতি হারাল (formlessness)। সরল, ক্রমিক পরিণতিসম্পন্ন প্লট ও ঘটনার আড়ম্বরের পরিবর্তে চরিত্রের অন্তর্গত চেতনা ও সংগ্রামশীল বাস্তবতার দ্বি-স্তরিক রূপায়ণ; অভিজ্ঞতা ও অভিজ্ঞান সমন্বয়িত জীবন-বিন্যাসই হল আধুনিক উপন্যাসের আলেখ্য। চিরায়ত বাস্তব বা বাস্তবতার ধারণা হয়ে উঠল অলীক। আখ্যান কখনও কখনও হয়ে গেল বিকল্প বাস্তবের বিকল্প বয়ান। ইতিহাস-চেতনা ও সময় সম্পর্কিত ধারণার পরিবদলে সময়ের সরল চলমানতা নয়, বরং উপন্যাসে ধারণ করা হল জটিল-বহুরৈখিক, বহুস্বরিক সময় ও জীবন।
- চরিত্র রূপায়ণ ও জীবনায়নে বিচিত্র ভাব, বিষয়, চিন্তা-চেতনা, দর্শন-এর ব্যাপকতর পরিচর্যা
- রচনার পরোক্ষ রীতিকে ধারণ করা। বিশেষত বিশ/একুশ শতকের উপন্যাসে পরিচর্যা হিসেবে পরাবাস্তব, অধিবাস্তব বা অন্য কোনো লোকোত্তর অভিজ্ঞতার আধারে জীবনকে উপলব্ধি করার প্রবণতা লক্ষ করা যায়। সমকালীন কথাসাহিত্যে উত্তরাধুনিক, উত্তর-কাঠামোবাদী, উত্তর-ঔপনিবেশিক এবং বিনির্মানবাদী ভাবনার বিকাশ ঘটেছে। সাহিত্যকর্মে পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদের চাপিয়ে দেয়া কর্তৃত্বব্যঞ্জক সংস্কৃতি প্রতিহত করার প্রবণতা রয়েছে। এছাড়া 'ভার্চুয়াল ইউটোপিয়া' (বাস্তবতাকে 'virtually' দেখা), 'ইন্টারটেক্সচুয়ালিটি' (আন্তর্পাঠগতি) প্রভৃতিও উত্তরাধুনিক উপন্যাস সৃষ্টি ও বিচারের সাথে সম্পৃক্ত।

উপরোক্ত বৈশিষ্ট্য ছাড়াও বিশ শতকের উপন্যাসের বিষয় ও পরিচর্যাগত বিভিন্ন লক্ষণ পরিস্ফূট হয়েছে ও হচ্ছে। উপন্যাস-বিচারের দৃষ্টিভঙ্গিতেও বিরাট পরিবর্তন এসেছে।

Dhaka University Institutional Repository

উপন্যাস-তত্ত্ব জিজ্ঞাসা

শিল্প-সাহিত্য সংক্রান্ত মতাদর্শ নিয়ে বহু বিতর্ক রয়েছে, উপন্যাসতত্ত্বও এর ব্যতিক্রম নয়। বিশেষত পাশ্চাত্যের তাত্ত্বিকরা ইংরেজি ও ইউরোপীয় সাহিত্যের নানা সৃষ্টি সম্পর্কে নানাবিধ মতামত পোষণ করেছেন। ঔপন্যাসিকের জীবনসংলগ্নতা, উপন্যাসে প্রতিফলিত জীবনের বিচার সম্পর্কে মতপার্থক্যের প্রচুর অবকাশ আছে। গদ্য-মাধ্যম হিসেবে উপন্যাসের শিল্প-তত্ত্ব বিষয়ে ঔপন্যাসিকেরা পূর্ণাঙ্গ ধারণা দেননি, যেভাবে কবিতা বিষয়ক তত্ত্ব গড়ে উঠেছে কিংবা রূপ পেয়েছে সমালোচনা-ভাবনা; সেরকমভাবে সাহিত্যের এক ঐতিহাসিক 'আর্ট-ফর্ম' হিসেবে 'ফিকশন' বা উপন্যাস-শিল্প তত্ত্বায়নের ধারাবাহিক বিকাশ অনুসন্ধান করা কঠিন হয়ে পড়ে। জন্মপর্ব থেকে সমকাল পর্যন্ত ক্রমধারা বিশ্লেষণের সূত্রে প্রাথমিকভাবে বলা যায়, রোমান্সধর্মিতা এবং পরবর্তীকালে বাস্তবধর্মিতার পথ বেয়ে উপন্যাসের শুরু, বিকাশ এবং পরিণতি। যেখানে একটা কাহিনী থাকবে বলে ধারণা করা হয়, থাকবে চরিত্র ও সময়-পরিক্রমা। আবার কাহিনী তথা গল্পহীনতাও যেখানে আধুনিকালে অনেকটা স্বাভাবিক। আমরা সাধারণভাবে জানি– উপন্যাস এক বিরাটকায় গদ্যভঙ্গিমা; যা সাহিত্যের অন্যান্য ফর্মের চেয়ে জীবনকে বিস্তৃত পরিসরে ধারণ, বিশ্লেষণ এবং ব্যাখ্যা করে। এটি ইতিহাস তথা প্রবহমান সময়ের সাথে ব্যক্তির সংযুক্তি কিংবা বিযুক্তির এক অভিজ্ঞানও বটে। যে কাঠামো, শ্রেণি কিংবা পরিপ্রেক্ষিতে ব্যক্তির বাস; সমান্তরালে সে কাঠামোও ব্যাখ্যাত হয় উপন্যাসে, কিংবা বিপরীতক্রমে তা হয়ে ওঠে ব্যক্তির, কখনও ব্যক্তির প্রতিনিধিত্বকারী সমষ্টির নিজস্ব ইতিহাস।

উপন্যাসের তত্ত্বায়ন বিষয়ে ঔপন্যাসিকের নিজস্ব ভাবনা তার শিল্পকর্ম কিংবা উপন্যাস-সমালোচকের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে আখ্যানতাত্ত্বিক দিক নির্দেশনা নেয়া যায়। সে সূত্রেই বলা চলে যে– উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকেই সামগ্রিক কার্যকারণ-শৃঙ্খলাপূর্ণ আরম্ভ ও পরিণতিমুখী বৃত্তাবদ্ধ কাহিনী-প্যাটার্নের চেয়ে আখ্যানের শরীরী উপাদান-কল্প হিসেবে চরিত্র বড় হয়ে ওঠে। সাধারণত উপন্যাসের আঙ্গিক আদর্শগত ও শিল্পজ্ঞানের মৌলনীতির সমবায়ে এবং ব্যবহারিক প্রয়োগের অভিজ্ঞতার দ্বারা গঠিত ও সমৃদ্ধ হয়। আর বিষয়বস্তু প্রসঙ্গে বলা চলে– একজন সচেতন শিল্পীর দৃষ্টিতে ব্যক্তিমানুষ, তার জীবন-সমগ্রতা, সময়ের চলমানতা নিয়ে এক প্রকার দ্বান্দ্বিক বিষয়বস্তুতে পরিণত হয়– যেখানে বিষয়টাই হয়ে ওঠে আঙ্গিক এবং যেখানে ঘটনাবস্তু একমাত্র বিষয় নয়। ঘটনাবর্ণনা, চরিত্রচিত্রণ বা মানসবিশ্লেষণ ইত্যাদি প্রসঙ্গেই উনিশ-বিশ শতকের কথাশিল্প তত্ত্বের বয়ান পেশ করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

ব্যক্তির সামাজিকতা এবং ব্যক্তিকতা– এই দুইয়ের সম্পর্ক বিন্যাসের বিভিন্ন রূপবন্ধই উপন্যাসের প্রধান উপজীব্য।

আখ্যান বা গল্পের অভাব কোনো মানব-সমাজেই কোনো দিন থাকেনি। পুরাণ, মহাকাব্য, লোককথা থেকে শুরু করে বহুবিধ আখ্যানের বিচিত্র সম্ভার বহন করে মানবসমাজ। এই আখ্যান বা গল্প থেকে উপন্যাস নিষ্কাশিত হয়েছে বিশিষ্ট প্রাকরণিক কুশলতায় এবং শিল্পীর জীবন দৃষ্টিকোণে। আঠার শতকের ইউরোপীয় সাহিত্যে উপন্যাস জন্মের সঙ্গেই উপন্যাসের শরীরী উপাদান বিষয়ে চর্চা আরম্ভ হয়, প্লট-চরিত্র-সংলাপ-ঘটনার কার্যকারণ শৃঙ্খলার প্রত্যাশা ও দাবিকে ঘিরে গড়ে ওঠে উপন্যাসের তত্ত্ববিশ্ব। সেই সাথে উনিশ শতকের গোড়া থেকে শুরু হয় উপন্যাসে জীবনায়ন সম্পর্কিত ভাবনা, অনুভূত হয়– মানুষের বাস্তব জীবনের কোনো একটি দিকে বা বিচিত্রমুখী সমগ্রতা অনুসন্ধানের লক্ষ্যে নির্মিত আখ্যানভিত্তিক ভাষা-সংরূপই হল উপন্যাস। তবে 'বাস্তব' ও 'সমগ্রতা'– এই দুটো ব্যাপারে এবং উপন্যাসের সাংগঠনিক উপস্থাপনা (ভাষা যার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ) প্রভৃতি পর্যালোচনা সূত্রেই গড়ে উঠেছে আখ্যানতত্ত্বের কিছু রূপ-রীতি; যার সাথে উপন্যাস তথা সাহিত্য সমালোচনার তত্ত্ব ও সংশ্লিষ্ট।

সমাজে নতুন শ্রেণিবিন্যাসের প্রতিক্রিয়ায় সাহিত্যের নতুন আঙ্গিক জন্ম দেয়। সাহিত্য-শিল্পকে সামাজিক বিষয় মনে করে শিল্পকলার বিভিন্ন শাখা নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষার সূত্রপাত হয় উনিশ শতকেই। সাহিত্য সমালোচনায় মার্কসবাদ এ কাজটি করেছে সমাজ-মানুষ-রাষ্ট্র সম্পর্কে তাত্ত্বিক আদর্শকে সামনে রেখে। মার্কসবাদের অভ্যুদয়ের পর সমাজ-পরিবর্তনের আন্দোলন নির্দিষ্ট গতি লাভ করায় সমাজপরিবর্তনকামী সাহিত্যের বৈশিষ্ট্যও পার্টির আদর্শের সঙ্গে সমান্তরাল হয়ে ওঠে। "সাহিত্যের এক ধরনের উদ্দেশ্যমুখিতা রয়েছে – এঙ্গেলসের এ-কথার সূত্র ধরে লেলিন সাহিত্যের শ্রেণিচরিত্র ও এর সামাজিক আদর্শিক ভূমিকার ওপর গুরুত্ব দেন। (সাঈদ-উর, ১৯৮৫ : নয়)। শিল্পকলার সাথে সমাজের ও শ্রেণিস্বার্থের সম্পর্ক নিধারণকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে মার্কসবাদী সাহিত্যতত্ত্ব ও সমালোচনা। উপন্যাস শিল্প সম্পর্কে মার্কসবাদী সাহিত্যতাত্ত্বিকদের নির্দিষ্ট মতাদর্শ আছে, তবে তা সামগ্রিকভাবে শিল্প-সাহিত্য সম্পর্কে মার্কসবাদী দৃষ্টির অনুরণন। বলা যায়, পার্টি গঠনের তত্ত্বের সঙ্গে মার্কসবাদের জ্ঞানতত্ত্ব ও শিল্পসাহিত্যের নন্দনতত্ত্ব একীকৃত হয়েছে। যদিও

Dhaka University Institutional Repository

পরবর্তীকালে শিল্প সাহিত্যের মূল্য বিচারে মার্কসীয় নন্দনতত্ত্ব সবসময় একইরকম থাকেনি। কেবল বিষয়বস্তু নয়, মার্কসীয় মতাদর্শনুযায়ী জীবনের সবদিকে প্রকাশযোগ্য আধেয়সমূহ আঙ্গিককে প্রভাবিত করে; অথবা আঙ্গিক নির্ধারণে অনুসঙ্গীয় ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে পারে। লুনাচারস্কি (১৮৭৫-১৯৩৩) ১৯২৮-এ রচিত মার্কসবাদী সাহিত্যসমালোচনা : কতিপয় প্রস্তাব' প্রবন্ধে লিখেছেন :

> প্রতিটি অত্যুৎকৃষ্ট রচনায় (Master piece) আঙ্গিক সর্বতোভাবে আধেয় দ্বারা নির্ধারিত হয় এবং প্রতিটি সাহিত্যসৃষ্টি অত্যুৎকৃষ্ট হওয়ার প্রত্যাশী–পাঠকেরা বুঝতে পারবেন যে, এই প্রত্যক্ষসূত্রজাত যে-আঙ্গিক, তার উপাদান সমূহ কোনক্রমেই সমাজবিচ্ছিন্ন নয়। সেগুলোকে পরবর্তী পর্যায়ে সমাজপটভূমি থেকে ব্যাখ্যা করতে হবে। (অনুদিত, সাঈদ-উর, ১৯৮৫ : ৬৩)

সুতরাং ব্যক্তি ও শিল্পের সাথে সমাজপট গভীরভাবে সম্পর্কিত এবং শিল্প-সাহিত্যের সামাজিক দায় থেকেই সৃষ্ট শিল্পের ন্যায়সূত্র। মার্কসবাদী সমালোচনাশাস্ত্রের প্রবর্তক গিওর্গি প্লেখানভ (১৮৫৬-১৯১৮) ফরাসি ঔপন্যাসিকদের সমালোচনা করেন। গুস্তাভ ফ্লবেয়রের (১৮২১-১৮৮০) উপন্যাসে রোমান্টিক কৃত্রিমতা ও অস্বাভাবিকতা না থাকায় তাঁর প্রশংসা করেছেন প্লেখানভ। ফরাসি বাস্তববাদীদের সাথে রুশ বাস্তববাদীদের তুলনাও করেণ তিনি।[২]

আধুনিক মার্কসবাদী সাহিত্যতাত্ত্বিক সমালোচক হিসেবে যাঁরা অগ্রগণ্য, তারা হলেন- গিওর্গি লুকাচ (১৮৮৫-১৯৭১, মিখাইল বাখতিন (১৮৯৫-১৯৭৫), রাল্‌ফ ফক্স (১৯০০-১৯৩৬), ক্রিস্টোফার কডওয়েল (১৯০৭-১৯৩৭), লুসিয়েন গোল্ডম্যান (১৯১৩-১৯৭০), আয়ান ওয়াট (১৯১৭-১৯৯৯), টেরি ঈগলটন (১৯৪৩-) প্রমুখ। আয়ান ওয়াট মূলত সাহিত্যে বাস্তববাদ বিষয়ে তাঁর মতাদর্শ প্রকাশ করেছেন। লুকাচ নভেলকে একসময় বলেছিলেন 'বুর্জোয়া এপিক'; তাঁর গুরুত্বপূর্ণ বইগুলো হল– *The Theory of the Novel* (১৯২০), *History and Consciousness* (১৯২৩), *Theory of Aesthetics* (১৯৬৩), *Studies is European Realism* (১৯৫০), *The Historical Novel* (১৯৩৭)। লুকাচ মনে করেছিলেন- মহৎ শিল্পী তাঁরাই যাঁরা মানবজীবনের সামঞ্জস্যপূর্ণ সমগ্রতাকে ধরতে পারেন ও পুর্ননির্মাণ করতে পারেন। তিনি বলেন, "মার্কসীয় ইতিহাসদর্শন মানুষকে সমগ্রভাবে বিশ্লেষণ করে এবং মানববিকাশের ইতিহাসকে অখণ্ডভাবে অনুধ্যান করে।" (অনুদিত, সাঈদ-উর, ১৯৮৫: ১৩৪)। জার্মান ও ফরাসি এবং রুশ ধ্রুপদী ঔপন্যাসিক গ্যেটে (১৭৪৯-১৮৩২), বালজাক,

Dhaka University Institutional Repository

ফ্লবেয়র ও টলস্টয়ের এবং ঊনিশ শতকের কাজের বিশ্লেষণ তাঁর চিন্তা ও আত্মপ্রকাশের একটা বড় অংশ। তিনি প্রুস্ত, আন্দ্রে জিদ এবং জয়েস, কাফ্‌কাকে প্রত্যাখ্যান করেছেন, তবে এদের শৈলীকে অশ্রদ্ধা করে নয়। "লুকাচ 'সমসাময়িক বাস্তবতাবাদের তাৎপর্য'-তে এলিয়েনেশন বা বিচ্ছিন্নতাবাদী অবক্ষয়ী সূত্রগুলোকে তীক্ষ্ণ যুক্তি দ্বারা ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছেন।" (রণেশ, ২০১৩ : ৩০৭)। 'উপন্যাসের তত্ত্ব' গ্রন্থ টলস্টয়ের নিরীক্ষা দিয়ে শেষ করেছেন। যেসব উপকরণ ও গুণের জন্য উপন্যাস মহাকাব্য ও ধ্রুপদী নাটক থেকে পৃথক, সেগুলোর অন্যতম শ্রেষ্ঠ রূপকল্প টলস্টয়। লুকাচ টলস্টয়কে 'ঐতিহাসিক উপন্যাস' (The Historical Novel) গ্রন্থের মূলাধারে স্থাপন করেছেন, মানবতাবাদী শিল্পী রমাঁ রলাঁ (১৮৬৮-১৯৪৪) এবং ম্যাক্সিম গোর্কিকে (১৮৬৮-১৯৩৬) তাঁর পাশাপাশি রেখে। আলোচনায় এনেছেন জার্মান ঔপন্যাসিক টমাস মান (১৮৭৫-১৯৫৫)-কেও।

মনুষ্যত্বের সারসত্তাকে মানবসমাজের দীর্ঘ যাত্রাপথে শিল্পরূপের আধারে স্থাপন করে যুগের পর যুগোত্তীর্ণ করে এসেছেন যে মহান কথাশিল্পীরা, লুকাচ তাঁদের মূল কাজটিকে যেমন চিহ্নিত করেছেন, তেমনি তাঁদের শৈলী ও সাধনাকেও গুরুত্ব দিয়েছেন। 'সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতাবাদের' একজন পুরোগামীর ভূমিকা পালন করলেও লুকাচ অন্যান্য মার্কসবাদী সাহিত্যতাত্ত্বিক থেকে নিজের পৃথক করতে পেরেছিলেন। সমাজতাত্ত্বিক বাস্তবতার ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে লুকাচ বলেছিলেন, "বাস্তবতার অবিকল নকলনবিশী এবং মনোময়তা দুইই বস্তুগত ঐতিহাসিক বিকাশের বিরোধিতা করে।" (উদ্ধৃত, রণেশ, ২০১৩ : ৩১০)।

তাত্ত্বিক র‍্যালফ ফক্স *The Novel and the People* (১৯৩৭) গ্রন্থে উপন্যাসকে 'আধুনিক যুগের মহাকাব্য' আখ্যা দিয়ে বলেছিলেন যে তা প্রকৃতপক্ষে ব্যক্তিমানুষের হৃদয় বেদনা এবং তার সমস্যারই কাহিনী। র‍্যালফের মতে, আধুনিক যুগের উপন্যাসে একজন ব্যক্তির সাথে সমাজের এবং পরিবেশের সংঘর্ষ স্বাভাবিক। তাঁর অভিজ্ঞান ছিল নিম্নরূপ :

> The Novel deals with the individual, it is the epic of the strugle of the individual against society, against nature, and it could only develop in society where the balance between man and society were lost, where man was at war with his fellows or with nature. (Ralph, 1972 : 35)

Dhaka University Institutional Repository

উপন্যাসের মহাকাব্যিক গুণ তথা পরিসরের বিশালতা কিংবা উপন্যাস ও মহাকাব্যের পার্থক্য-সাদৃশ্য নিয়ে সমকালীন সমালোচক, তাত্ত্বিক মিখাইল বাখতিন (১৮৯৫-১৯৭৫), আয়ান ওয়াট (১৯১৭-১৯৯৯), ফ্রানকো মরেটি (১৯৫০-) ক্রিস্টোফার হিল (১৯১২-২০০৩) প্রমুখ মত প্রকাশ করেছেন। 'ফর্ম' হিসেবে মহাকাব্য একটা পূর্ণতা ও স্থায়িত্ব পেয়েছে– এ মত প্রকাশ করে মিখাইল বাখতিন তাঁর *Epic and Novel : Towards a methodology for the study of the novel* প্রবন্ধে দুয়ের বৈপরীত্য (যা মূলত সাদৃশ্যের মতই দেখায়) সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ মতাদর্শ প্রকাশ করেছেন। 'নভেল' তাঁর কাছে "the only developing genre and therefore it reflects more deeply, more essentially, more sensitively and rapidly, reality itself in the process for its unfolding' (Bakhtin, 1994 : 07)। বাখতিনের যুক্তি হল, 'উপন্যাস' ও 'মহাকাব্য' তাদের দুই বিপরীতধর্মী ও প্রধান বৈশিষ্ট্য যথা- 'novelness' এবং 'epicness' দ্বারা গঠিত।

বাখতিন একটি স্বতন্ত্র সাহিত্য-বর্গ (Literary Genre) হিসেবে অন্যান্য শিল্প মাধ্যমের সাথে উপন্যাসের তুলনাই করেননি; বরং এক বিস্তৃত পরিসরে উপন্যাস-তত্ত্বকে প্রতিষ্ঠা করেছেন। উপন্যাসকে তিনি দেখেছেন এমন একটি প্রক্রিয়া হিসেবে যার কালসীমানা প্রাচীন মধ্যযুগ থেকে আধুনিক যুগ পর্যন্ত বিস্তৃত। আধুনিক উপন্যাসের নান্দনিক অভিজ্ঞতাকে সূত্রবদ্ধ করে তিনি প্রাচীন ও মধ্যযুগের সাহিত্যে তার সমতুলতা সন্ধান করেছেন। উপন্যাসে নাটক, গীতিকবিতা বা অন্য যেকোনো সাহিত্যধারার শৈলী স্থান পেতে পারে। কিন্তু এই শিল্পমাধ্যমের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী তাদের অবশ্যই উপন্যাসায়িত (Novelised) হতে হবে। মহাকাব্যের বিপরীতে উপন্যাসে নিরূপিত হয় অভিজ্ঞতা, জ্ঞান ও কর্মের দ্বারা; বাখতিন উপন্যাস সম্পর্কে যা ভেবেছেন ও বলেছেন– বিশেষত তাঁর দ্বিবাচনিকতা সত্তার সঙ্গে মন ও জগতের সম্পর্ক প্রভৃতি চিন্তা ইউরোপীয় তথা বিশ্ব দর্শনভূমির ঐতিহ্যেই বর্তমান ছিল। "তাঁর কৃতিত্ব এই যে, তিনি চেতনার সার্বভৌমত্ব স্বীকার করেও তাকে সময় ও পরিসরের পটে- ইতিহাস ও ভূগোলের প্রেক্ষিতে-অচ্ছেদ্য সম্বন্ধে যুক্ত করে দিয়েছেন।" (তপোধীর, ১৪০৩ : ৩২)। বাখতিনের মতে চেতনার ভিত্তি হল অপরতা; সুতরাং দ্বিবাচনিক প্রক্রিয়া অনুযায়ী চেতনা মানে অপরসত্তার বোধ।[৪] যদিও এই অপরতার মানে সত্তা-বিচ্ছিন্নতা নয়। উপন্যাসকে বাখতিন দ্বিবাচনিক দর্শনের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রকল্প বলতে চেয়েছেন। বাখতিনের মতানুযায়ী উপন্যাসের বয়নে বহুস্বরতার স্বাধীন উপস্থিতি এবং অধিকার প্রতিষ্ঠিত; ফলে, পলিফোনিক ডিসকোর্স

Dhaka University Institutional Repository

হয়ে ওঠে উপন্যাসের অনন্য উপাদান। জীবনের নানা জটিলতা থেকে উঠে আসা সুর-বৈচিত্র্য বা বিভিন্ন মতাদর্শের এক সমন্বয় (অর্কেস্ট্রেশন) হল 'পলিফনিক ডিসকোর্স'। বহুস্বরসমৃদ্ধ উপন্যাসের মধ্যে তাই বিচিত্র ভঙ্গিতে মূর্ত হয় জীবনের বহুমাত্রিক দ্বন্দ্ব ও কৌণিক মাত্রা। এককথায় বিচিত্রতাই এই genre-এর প্রাণবস্তু। এছাড়া বাখতিনের চিন্তায় গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানে রয়েছে আখ্যান ও কার্নিভাল-সংক্রান্ত ভাবনা। বাখতিনের মতে জীবনের সুতীব্র প্রকাশই হল কার্নিভালের জীবন। উপন্যাস-চিন্তার একটা বড় উপাদান কার্নিভাল; অর্থাৎ অনেক উপন্যাসের ধারণা কিংবা কাঠামোতেই রয়েছে কার্নিভালের রূপ। কার্নিভালের মতো উপন্যাসও মানুষকে বাস্তবের দিকে, মাটির দিকে দৃষ্টি ফেরাতে বাধ্য করে। এ প্রসঙ্গে স্মর্তব্য যে, সংলাপকে বাখতিন কথোপকথন বা উক্তি-প্রত্যুক্তি– এই আক্ষরিক অর্থে ব্যবহার করেননি। সংলাপ বলতে তিনি নির্দেশ করেছেন বিভিন্ন চিন্তা, ভাব, আদর্শ, আচরণ আবেগ প্রভৃতির বিনিময়, 'বাদ-প্রতিবাদ, দ্বন্দ্ববিরোধের সৃষ্টি ও বিকাশের বিপুল সম্ভাবনায় গতিশীল ও জটিল আন্তঃসম্পর্ক, যা তাঁর রচনাশৈলিতে সংলাপের ধাঁচে অনুস্যুত হয়ে থাকে।" (নরেন্দ্রনাথ, ১৪০৩ : ৫৭)। বাখতিন বাচনকে দেখেছেন মানবিক প্রক্রিয়া, ব্যক্তি ও সমাজ উভয়স্তরেই ভাষাদর্শগত দ্বন্দ্বের সামাজিক কার্যকলাপ হিসেবে। উপন্যাসের ভাষা প্রসঙ্গে বাখতিন লেখেন :

> The author participates in the novel (he is omnipresent in it) with almost no direct language of his own. The language of the novel is a system of languages that mutually and ideologically interanimate each othor. It is impossible to describe and analyze it as a single unitary language. (Bakthin, 1994 : 47)

নভেলাইজেশনকে একটি প্রাচীন প্রক্রিয়া এবং উপন্যাসের ফর্ম, উপস্থাপনার বৈচিত্র্য বা নতুনত্বকে একটি নিরন্তর প্রচেষ্টা আখ্যা দিয়েছেন বাখতিন। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন :

> The process of the novel's developement has not yet came to an end. It is currently entering a new phase. For our era is characterized by an extra-ordinary complexity and a deepening in our perception of the world, there is an unusual growth in demands on human discernment, on mature objectivity and the critical faculty. These are feautures that

Dhaka University Institutional Repository

will shape the further development of the novel as well. (Bakthin, 1994 : 47)

বাখতিনের সময়-স্থান সংক্রান্ত ভাবনা হল 'ক্রোনোটপ' তত্ত্ব। 'Forms of Time and the Chronotope in the Novel' (১৯৩৭-৩৮) নামক রচনায় বাখতিন আইনস্টাইনের গাণিতিক সূত্র-পদ্ধতি 'ক্রোনোটপ'-কে উপন্যাসের তত্ত্বের সাথে সম্পর্কিত করেন এবং শব্দটি কেন ব্যবহার করেছিলেন তা ব্যাখ্যা করেন বলেন :

> We will give the name Chronotope [literally 'time space'] to the intrinsic connectedness of temporal and spatial relationships that are artistically expressed in literature." (Bakhtin, 1994 : 84)।

সময় (time's scale, rythm and pattern) এবং স্থান উপন্যাসের বর্ণনায় বিচিত্র রূপ পায়। বাখতিন গ্রীক রোমান্স থেকে আধুনিক যুগ পর্যন্ত উপন্যাসের প্রকরণ-কৌশলে সময় এবং স্থানের ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশকে ভিত্তি করে উপন্যাসে একটা Genre বা সাহিত্যিক শ্রেণি-বিভাজন করেছেন। ক্রোনোটপ ও উপন্যাস সম্পর্কিত বাখতিনীয় বিশ্লেষণকে নিম্নোক্ত সারণির মাধ্যমে চিত্রায়িত করা যায় :

Literary genre	**Space**	**Time**	**Chronotope**
Greek Romance	An abstract alien golden age world	Adventure time of the future	The encoumter
Adenture of everyday life	The real and concrete events of everyday life	Time of the present	The road
Biography	The public square	Real life combing past and present	The real time
Chivalric romance	A miraculous dream world in nature	Miraculous past time	The beauty of the nature

Dhaka University Institutional Repository

Rabelaisian novel (roque, clown and fool)	Plays and dramas includinng body, clothing, food, drink, sex, death, defection	Productive growth of future and possible time	The threshold
Idyllic novel	Family territory, unity of space	Idyllic and folkloric past time	the family idyll

মূলত সময় ও স্থানের অবিচ্ছিন্নতা ও গভীর সম্পর্ককে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন বাখতিন। সাহিত্যের একটা যথাযথ আঙ্গিক-রূপ বা উপাদান হল ক্রোনোটোপ, যা সময় এবং স্থানের সমগ্রতা (concrete whole) নির্ণায়ক গুণ। বাখতিনের মতে সাহিত্যে এই সময় ও স্থানের একটি শ্রেণিগত গুরুত্ব আছে; উপন্যাসে যা বিশেষভাবে স্বকীয় ও অন্তর্নিহিত থেকে অন্যান্য সকল সাহিত্য-শ্রেণি থেকে একে পৃথক করেছে। বাখতিনের 'ক্রোনোটোপ' ভাবনা সম্পর্কে সমালোচকের মূল্যায়ন :

> Bakhtin studies chronotopes that occur in the novel, like 'the road', 'the path of life', 'mystery' etc., which are produced in time and are reinforced by tradition (Source: Shodhganga.inflibnet.ac.in)

বিশ শতক জুড়ে সাহিত্য ও সমাজবিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় তত্ত্বের বিকাশ ও প্রাচুর্য লক্ষ করা যায়; যেমন– মার্কসবাদ, নব্য সমালোচনা, অবয়ববাদ, বিনির্মাণের তত্ত্ব, নব্য ইতিহাসবাদ ইত্যাদি। আধুনিক ও আধুনিকোত্তর এসব তত্ত্বের কিছু কিছু ক্ষেত্রে বাখতিনের উপস্থিতি অনুধাবন করা যায়।

বিশ শতকের শেষ দশকগুলোতে আখ্যানতত্ত্ব নতুন নতুন রূপ পরিগ্রহ করেছে। এরই সঙ্গে জ্ঞান-বিজ্ঞান-প্রযুক্তিবিদ্যার বিভিন্ন শাখা-প্রশাখার সঙ্গে তার মেলবন্ধনও ঘটে চলেছে। দর্শন-মনস্তত্ত্ব-ভাষাতত্ত্ব-তথ্য-মিডিয়াসহ জ্ঞানের বিভিন্ন শাখার চর্চা ও বিশ্লেষণ মিশে যাচ্ছে আখ্যানতত্ত্বে। বলা যায়, আমাদের জীবন অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানতত্ত্বের খুব সামান্যই যেন এখন আখ্যানতত্ত্বের বাইরে রয়েছে। উনিশ শতকের কিংবা বিশ শতকের বেশ কিছুটা সময় পর্যন্ত তাত্ত্বিকদের আখ্যান-ভাবনাকে চিহ্নিত করা যায় 'প্রেক্ষিতগত আখ্যানতত্ত্ব' (contextual narratology) হিসেবে। যেমন- হেনরি জেম্‌স (*The Art of the novel*, ১৯০৭-১৭) পারসি লাবোক (১৮৭৯-১৯৬৫) (*The Craft of Fiction*, ১৯২১) ইত্যাদি। পরবর্তী পর্যায়ে এল ভাষাতত্ত্বের ক্ষেত্রে প্রয়োগগত বিপ্লব (যেমন– বিনির্মাণবাদী, মনঃসমীক্ষণবাদী ভাষাতত্ত্ব, জ্ঞানমূলক ভাষাতত্ত্ব তথা আখ্যানতত্ত্বের উদ্ভব) যা নির্মিতিবাদী

Dhaka University Institutional Repository

আখ্যানতত্ত্বকে বিকশিত করেছে। এ পর্যায়ে রবার্ট পেন ওয়ারেন (১৯০৫-১৯৮৯) ও ক্লিন্থ ব্রুকস (১৯০৬-১৯৯৪) এর *আন্ডারস্ট্যান্ডিং ফিকশন*, ক্লদ লেভি স্ট্রস (১৯০৮-২০০৯)-এর *স্ট্রাকচারাল অ্যানথ্রোপলজি*, নর্থপ ফ্রাই (১৯১২-১৯৯১)-এর *অ্যানাটমি অব ক্রিটিসিজম*, রলাঁ বার্থ (১৯১৫-১৯৮০)-এর *দ্য প্লেজার অব দ্য টেক্সট*, আয়ান ওয়াট (১৯১৭-১৯৯৯)-এর *দ্য রাইজ অব দ্য নভেল*, নোয়াম চমস্কি (১৯২৮–)-এর *সিনট্যাকটিক স্ট্রাকচারস*, জেরারড জেনে (১৯৩০-২০১৮)-এর *ন্যারেটিভ ডিসকোর্স রিভিজিটেড* ইত্যাদি গ্রন্থের নাম উল্লেখযোগ্য। উত্তর-নির্মিতিবাদ, উত্তর-উপনিবেশবাদ কিংবা উত্তরাধুনিকতাবাদী আখ্যান-ভাবনায় উল্লেখযোগ্য তাত্ত্বিকেরা হলেন– রোমান জ্যাকবসন (১৮৯৬-১৯৮২), ডেভিড লজ (১৯০৫–), পল রিকো (১৯১৩-২০০৫), সেমুর চ্যাটম্যান (১৯২৮-২০১৫), ফ্রেডরিক জেমসন (১৯৩৪–), এডওয়ার্ড সাঈদ (১৯৩৫-২০০৩), পিটার ব্রুকস (১৯৩৮–), মিক বল (১৯৪৬–), হোমি কে. ভাবা (১৯৪৯–) প্রমুখ। উপন্যাসের মার্কসবাদী, নারীবাদী, উত্তর-উপনিবেশবাদী, নির্মাণ-বিনির্মাণবাদী পাঠতত্ত্ব পেয়েছি আমরা। উপন্যাস-তত্ত্বে ভিন্ন ভিন্ন মতাদর্শের বিকাশের ফলে একদিকে তত্ত্ব-প্রচারের সম্ভাবনা যেমন অনেকটা বেড়ে গেছে; অন্যদিকে তত্ত্বের উপস্থিতিতে উপন্যাস পেয়ে গেছে এক ধরনের তাত্ত্বিক ভূমিকা।

সমকালে উপন্যাসের তত্ত্ব বা এর বিচার-মূল্যায়নের ক্ষেত্রে দুটো প্রধান প্রবণতা চিহ্নিত করেছেন ফ্রেডরিক জেমসন। এগুলো হল– 'semantic' এবং 'syntactic' । বিশ শতকের মধ্যভাগ বা তার আগে থেকেই গল্প উপন্যাসের কাঠামোর আকরণকে বুঝতে গিয়ে তাত্ত্বিকেরা ভাষাতত্ত্বের দৃষ্টি (semantic design of novel) নিয়ে অগ্রসর হয়েছেন। ভাষিক দক্ষতার নিরিখে সাধারণ পাঠকের বোধগম্যতা ও বর্ণনা-ক্ষমতার নিরিখে যৌক্তিকতা-নির্ভর সংগঠন হিসেবে দেখা যায় বলে উপন্যাসের প্লট বা ছক-কাঠামো যে গভীর অধ্যয়নের বিষয় তা রলাঁ বার্থ (১৯১৫-১৯৮০) স্পষ্ট করে তুললেন। সাহিত্য-সংরূপ হিসেবে উপন্যাসের বিকাশ, বিবর্তন, রূপান্তর-বৈচিত্র্যেকে ভিত্তি করেই এ বিষয়ক তত্ত্ব বা সমালোচনা-ভঙ্গিও নির্মিত হয়েছে। উপন্যাস উপস্থাপনার রীতি সম্পর্কেই আধুনিককালে আলোচনা সবচেয়ে বেশি। পাশ্চাত্য সমালোচকদের মাঝে হেনরি ফিল্ডিং, মিডলটন মারি (১৮৮৯-১৯৫৭), বাফন, আব্রামস, লিরিয়াম এলোট থেকে শুরু করে ডেভিড লজ পর্যন্ত এ বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেছেন। ঔপন্যাসিক ও তাত্ত্বিক ডেভিড লজ (১৯০৫–) 'নভেল'-এর পরিবর্তে 'ফিকশন' শব্দটি গ্রহণেই প্রাধান্য দিয়েছেন। উপন্যাস-সমালোচনায় তিনি ভাষাকে সর্বাধিক গুরুত্ব

Dhaka University Institutional Repository

দিয়েছেন। তাঁর 'Language of Fiction' (১৯৬৬) বইটি নব্য সমালোচনায় অগ্রগণ্য ভূমিকা রেখেছিল। ঔপন্যাসিককে তিনি কবির মতই 'Verbal Artist' বলে আখ্যা দিয়েছেন। "সমালোচক হিসেবে তিনি তাঁর সমস্ত বৌদ্ধিক সম্পদ নিয়োজিত করেন রূপক ও লক্ষণার (metonymy) তুলনামূলক আলোচনায়। কিন্তু তারপর চলে আসেন উপন্যাস রচনায়।" (রণবীর, ২০১১ : ১০৩)। অর্থাৎ সমালোচনা বা সাহিত্যের কঠোর বিজ্ঞানসম্মত বিশ্লেষণের চেয়ে উপন্যাস রচনাকে শ্রেয় মনে করা। আবার, উপন্যাস তার সমালোচনামূলক ও তাত্ত্বিক ভূমিকা পালন করবে কী না সে প্রসঙ্গেও মূল্যায়ন করেছেন লজ। অর্থাৎ উপন্যাসে নির্মিত জীবন-বাস্তবতা মূলত বর্হিজগৎ, ভাষা ও আখ্যানের মধ্যস্থতায় পরিবেশিত হয়; আর এই দিকটি তাত্ত্বিক উপন্যাস ব্যাখ্যা করে উপন্যাসের ভেতর থেকে। সুতরাং তা একইসাথে হয়ে ওঠে উপন্যাস ও তাত্ত্বিক সমালোচনার আধার। লজের মতে, প্রাতিষ্ঠানিক তত্ত্ব থেকে উত্তরোত্তর বিচ্ছিন্নতার বোধই উপন্যাস লেখার প্রকৃত অভিজ্ঞতা, সেই সাথে যেকোনো "অধি-ঔপন্যাসিক (metafictional) কৌশল তাঁর মতে, কোনো অর্থেই বাস্তবতাবিরোধী কৌশল নয়, বরং তার উল্টোটাই।" (রণবীর, ২০১১ : ১০৭)।

সমকালীন বেশ কিছু ঔপন্যাসিকের তাত্ত্বিক রচনাকর্ম থেকে 'ফিকশন' তথা উপন্যাসের বিচিত্র আঙ্গিক আলোচিত হচ্ছে আখ্যানতত্ত্বে। ঔপন্যাসিকেরা হলেন- নভোকভ, স্যামুয়েল বেকেট (১৯০৬-১৯৮৯), ফ্রান্জ কাফ্কা, ইটালো ক্যালভিনো (১৯২৩-১৯৮৫), উমবার্তো ইকো (১৯৩২-২০১৬), গাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেজ (১৯২৭-২০১৪) প্রমুখ। বিশ শতকে চর্চিত বিভিন্ন 'ফিকশন টার্ম'-গুলো হল: 'New fiction', 'Anti fiction', 'Metafiction ', 'Surfiction', কিংবা 'Post-Modern fiction'। আমেরিকান সাহিত্যতাত্ত্বিক Brian Mchale তাঁর রচিত গ্রন্থ *Post-Modernist Fiction*-এ 'আধুনিক ও উত্তরাধুনিক ফিকশন' তথা উপন্যাসের চারিত্র্য বিষয়ে তুলনামূলক আলোচনা করেছেন। তিনি বলেন :

> The dominant of modernist fiction is epistemological. That is, modernist fiction deploys strategies which engage and foreground questions such as... how can I interprete this world of which I am a part? And what am I in it? ... What is there to be known; who knows it? How do they know it, and with what degree of certainty? (Brian, 1987: 09)

Dhaka University Institutional Repository

আবার বিপরীতে পোস্টমডার্ন 'ফিকশন' হল :

> ... The dominant of postmodernist fiction is *Ontological* ... that is, postmodernist fiction deploys strategies which engage and foreground questions like ... which world is this? What is to be done in it? Which of myselves is to do it ... what is a world? What kinds of world are there, how are they constituted, and how far they diffier? (Brian; 1987: 10)

প্রথাগত উপন্যাস-আঙ্গিক বিনির্মাণের প্রক্রিয়াতেই নব্য আঙ্গিক বা এ্যান্টি-আঙ্গিকের জন্ম হয় উত্তরাধুনিক পর্বে। ফরাসি লেখক অ্যাঁলা রবগ্রীয়ের (১৯২২-২০০৮) উচ্চারণে শোনা গেল 'নব্য উপন্যাসের' (nouveau roman) কথা। উপন্যাসে 'প্লট', 'ক্রিয়া' 'ন্যারেটিভ' 'চরিত্র' 'লেখকের হস্তক্ষেপ' বা 'অন্তর্যামী কথকের' অস্তিত্বকে পুরোপুরি অস্কীকার করেছেন রবগ্রীয়ে। পঞ্চাশের দশকের মাঝামাঝি ও ষাটের দশকের আরম্ভে 'নব উপন্যাসের' আন্দোলন গড়ে ওঠে। এ জাতীয় উপন্যাসের অন্যান্য স্রষ্টারা হলেন ফরাসি ঔপন্যাসিক নাতালি সারোৎ (১৯০০-১৯৯৯), ক্লদ সিমো (১৯১৩-২০০৫), মার্গারিৎ দুরাস (১৯১৪-১৯৯৬) ও মিশেল বুঁতর (১৯২৬-২০১৬) প্রমুখ। 'নব উপন্যাস' অভিধা সম্পর্কে রবগ্রীয়ের বক্তব্য ছিল যে একটি প্রকৃতপক্ষে কোনো স্কুল বা ঘরানার নির্দেশ করে না, এমনকি তা লেখকদের কোনো সংঘবদ্ধ গোষ্ঠী বা অভিন্ন উদ্দেশ্যে নিয়োজিত নয়। বরং তা উপন্যাসসমূহের মধ্যে মানুষ ও বিশ্বের নবসম্পর্কের প্রকাশক্ষম আঙ্গিক সন্ধান করেছে, যা উপন্যাসকে আবিষ্কারে অর্থাৎ মানবকে আবিষ্কারে শপথবদ্ধ– তাদের বোঝাতে চলনসই একটা আখ্যান মাত্র।" (রবগ্রীয়ে, ২০১১ : ১২)।

রবগ্রীয়ে সাহিত্যিক ভাষার বদলের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিলেন। কারণ সময় ও বাস্তবতাতাড়িত মানুষের কাছে সময়ের পর্বান্তরে অপেক্ষাকৃত পুরনো ও দরকারি ধারণগুলো যখন ধ্বংস হয়, বস্তুর বর্হিবেশে সত্তা আড়াল হয়ে যায়, তখন মানসিক আবেগ প্রকাশে এক ধরনের পরাবাস্তব রূপান্তর

Dhaka University Institutional Repository

ঘটে। ফলে শিল্পের উপাদান ও প্রকাশে ঘটে বিরাট পরিবর্তন; রবগ্রীয়ে অনুভব করেন– "দিনে দিনে আমরা দেখছি বিমুখতা বাড়ছে, অনুভূতিশীল মানুষ দৃশ্যগত, সাদৃশ্যজাত বা জাদুমন্ত্রময় শব্দের অভাব অনুভব করছে ... অন্যদিকে দৃশ্যগত বা বর্ণনাত্মক বিশেষণ– যাতে রয়েছে পরিমাণ, স্থান নির্দেশ, সীমা নির্দেশ, সংজ্ঞা নির্দেশ– থেকে আসছে জটিলতা যা দিক নির্দেশ করছে নব উপন্যাসের পক্ষে।" (রবগ্রীয়ে, ২০১১ : ২০)। রবগ্রীয়ে এ প্রসঙ্গে জর্জ লুই বোর্হেসের (১৮৯৯-১৯৮৬) একটি উক্তির উদ্ধৃতি দেন। বোর্হেস তাঁর *Ficciones* (১৯৪৪) গ্রন্থে বলেছিলেন যে, 'যথার্থই বিংশ শতাব্দীতে কেউ অক্ষরে অক্ষরে *দোন কি হেতো* লিখলেও তার রচনা সের্ভান্তেস থেকে আলাদা হবে।" (উদ্ধৃত, রবগ্রীয়ে, ২০১১ : ১২)।

বাস্তবতার ধারণা সম্পর্কে বিক্ষোভ ও বিদ্রোহ থেকেই ঔপন্যাসিকেরা বা আখ্যানতাত্ত্বিকেরা মানুষ, জীবন-বাস্তবতার প্রতিবিম্বায়ন ও তৎসম্পর্কিত ভাষার অন্তর্বয়নে নব অনুসন্ধান চালিয়েছেন। সুতরাং উত্তরাধুনিক পর্বে 'অ্যান্টি-নভেল' বা 'অ্যান্টি আঙ্গিক' অর্থাৎ 'প্রতি-উপন্যাস' বলে যে রূপ-চারিত্র্য নির্ণয়ের চেষ্টা চলেছে; তা মূলত সে যুগ-জীবনের এক বিশ্বস্ত ও অর্থপূর্ণ প্রতিচ্ছবিই হয়ে উঠতে চেয়েছে। এ কারণে অনেক সমালোচক আধুনিক ও উত্তরাধুনিক সময় পর্বের পারস্পরিক তত্ত্বগত বিরোধিতাকে প্রাধান্য দিতে চাননি বরং উত্তর-আধুনিকতাকে ভিন্ন ধরণের এক যুগলক্ষণ বলে শনাক্ত করার চেষ্টাই লক্ষ্যণীয়। উপন্যাসের ক্ষেত্রেও তাত্ত্বিকরূপে আধুনিক-উত্তরাধুনিক 'ক্যাটাগরি' নির্ণয় করাকে অনেকটা অর্থহীন বলে মনে করা হয়। লুসিয়েন গোল্ডম্যান 'এ্যান্টি-নভেল' প্রবক্তা অ্যাঁলা রবগ্রীয়ে (১৯১৩-১৯৭০) ও নাথালিয়ে সুরেকে 'most radically realistic writers' হিসেবে আখ্যা দিয়েছেন এই বোধ থেকেই; 'because they seek to represent a different human reality of our times in self-admittedly different, rigorous and radical ways.' (Goldman, 1975: 140)। তাত্ত্বিক ডেভিড লজও তাঁর *The Novelist at the Crossroads* (1971) নামক রচনায় 'রিয়ালিজম' এবং 'নভেল'-এর সম্পর্ককে জোর দিয়েছিলেন, তিনি মনে করেন– 'উপন্যাসের মৃত্যু' হয়নি এবং বাস্তবতাও এক চলমান বিষয়; কেবল সময়-বিশেষে বাস্তবতার সম্ভাব্য নতুন সব অর্থায়ন ঘটে। তাই 'উপন্যাস' নামক শিল্পরূপেরও নির্দিষ্ট তাত্ত্বিক বয়ান ও রূপাঙ্গিক স্থায়ী হতে পারে নি। ফরাসী-চেক ঔপন্যাসিক ও তাত্ত্বিক মিলান কুণ্ডেরা (১৯২৯-) উপন্যাসের সংজ্ঞার্থে বলেছেন যে এটি হল "মহান গদ্যের আঙ্গিক যেখানে– একজন লেখক সঠিকভাবে অস্তিত্বের কোনো মহান বিষয়

Dhaka University Institutional Repository

অন্বেষণ করেন, পরীক্ষামূলক অস্মিতার (চরিত্রের) মাধ্যমে।" (মিলান, ২০১২ : ৯৭)। এছাড়া উপন্যাস-শিল্পের চলমানতা[৫] বিষয়ে তাঁর মত–

> উপন্যাসের আত্মা চলিষ্ণুতারই আত্মা। ....উপন্যাস কেবল একটি কার্যমাত্র (এক দীর্ঘস্থায়ী কার্য, অতীতের সাথে ভবিষ্যতের সংযোগ রক্ষাকারী) হয়েই থাকে না, সাম্প্রতিক অনেক ঘটনার মধ্যে একটি হয়ে ওঠে; হয়ে ওঠে এমন এক ভঙ্গি যার কোনো আগামী দিন নেই। (মিলান, ২০১২ : ২২)

উপন্যাস জীবনের রহস্যাকীর্ণ জটিলতাকে ধারণ ও উদ্‌ঘাটন করে, মিলান কুণ্ডেরা বোধহয় এ কারণেই বলেন : "Every novel says to the reader : 'Things are not as simple as you think.' " (উদ্ধৃত, সত্যেন্দ্রনাথ, ২০০০ : ১৪)।

উপন্যাস-সমালোচনার তত্ত্ব নির্দিষ্ট সূত্রে আবদ্ধ থাকতে পারে নি। এর বড় কারণ বোধহয় এই যে, আখ্যানের ইতিহাস কেবল সাহিত্য-নির্ভর নয়, সাহিত্য-বহির্ভূতও এবং এই দুয়ের অবিচ্ছিন্নতা আখ্যান-চর্চার বিরাট পরিসর, বিস্তৃত ক্ষেত্রকে উন্মুক্ত করে দেয়।[৬] উপন্যাস-বিচার বা সমালোচনার দৃষ্টি কখনও বিষয়বস্তুকেন্দ্রিক আবার কখনও রূপকেন্দ্রিক হয়েছে। উপন্যাসের সাথে কখনও ইতিহাস-রাষ্ট্র-মানব বিষয়ক সমাজবাদী বিভিন্ন তত্ত্ব (মার্কসিস্ট, হিস্ট্রিসিস্ট, পোস্ট-কলোনিয়ালিস্ট, ফেমিনিস্ট, নিও-হিস্ট্রিসিস্ট দৃষ্টি), কখনও মনঃসমীক্ষণিক (Psycho-analyltic) তত্ত্ব, কখনও ভাষাভিত্তিক নির্মিতবাদী তত্ত্বের (Formalist, Structuralist, Post-structuralist) সম্পর্ক গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। সামাজিক ইতিহাসের গভীরে ব্যাপ্ত অহরহ রূপান্তর, ব্যক্তি-অস্তিত্ব ও সামূহিক অভিজ্ঞানের অভিঘাতে বিষয়-বিষয়ী, চিহ্নায়ক-চিহ্নায়িত; ব্যক্ত ও অব্যক্তের আন্তঃসম্পর্কের পরিবদল হয়। ফলে উপন্যাস বা আখ্যান প্রকল্পে মানবের পরিবর্তিত চেতনাবিশ্বে সময় ও পরিসরের বহুমাত্রিক সত্য ব্যক্ত ও বিনির্মিত হচ্ছে। কথাসাহিত্যের অনুবিশ্বে এ কারণে কোনো স্থিরবিন্দু থাকছে না, তাৎপর্য ও প্রকাশের নব্য গ্রন্থনায় বারবারই বহু আয়তনিক পরিসর থেকে উপন্যাস তথা আখ্যানের পুনঃসূচনা ঘটে চলেছে।

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায় : দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

দেবেশ রায়ের শিল্পদৃষ্টি ও উপন্যাসতত্ত্ব

বাংলা উপন্যাসের রূপরেখা

ব্রিটিশ উপনিবেশিত বাংলায় উনিশ শতকে সাহিত্যিক মাধ্যম হিসেবে গদ্যরীতির উন্মেষের প্রায় অব্যবহিত পরেই উপন্যাসের জন্ম এবং জন্মের একশো বছরে পরিমাণ ও উৎকর্ষগত বৈচিত্র্যে তা পরিণতও হয়েছে। "বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র এবং কল্লোল-কালিকলম যুগের প্রতিভাবান অথচ অসম মানসিকতা-সম্পন্ন ঔপন্যাসিকদের সৃষ্টিসম্ভারে উপন্যাসের যে বিবিধ বিবর্তন লক্ষ করা গিয়েছে, সাম্প্রতিক কাল পর্যন্ত তা আশ্চর্য সজীব।" (হীরেন, ২০১১ : ১৪)

ঊনিশ শতকের গদ্যকাহিনি প্লট নির্মাণের গুণে সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছিল; প্যারীচাঁদ মিত্র, ভূদেব মুখোপাধ্যায় বা শিবনাথ শাস্ত্রী ততটা সফল না হলেও ঘনবদ্ধ প্লট চরিত্র নির্মাণে বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস সার্থক শিল্পরূপ পেয়েছে। উনিশ শতকের বাংলা উপন্যাসে বিষয়-ভাবনার বৈচিত্র্যও ছিল। বাঙালি স্বাদেশিকতাবোধের জাগরণ, একই সাথে রাজনৈতিক সংকট, ইংরেজ শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণির জীবন-ভাবনা, দেশাত্মবোধ এবং ইতিহাস-চেতনার জাগরণ ছিল ঊনিশ শতকের উপন্যাসের পরিপ্রেক্ষিত। ইতিহাসের অন্দরমহল থেকে স্বদেশ সম্পর্কিত বীরত্ব কাহিনিগুলোর সন্ধান চলেছে; ইতিহাসের কাহিনির সূত্রেই বাংলায় রোমান্স জাতীয় উপন্যাস লেখা হয়েছে প্রচুর। এই জাতীয় উপন্যাসের শিল্পোত্তীর্ণ দৃষ্টান্ত বঙ্কিমচন্দ্রের *দুর্গেশনন্দিনী*, *কপালকুণ্ডলা*, *মৃণালিনী*, রমেশচন্দ্র দত্তের *মাধবীকঙ্কন*, রবীন্দ্রনাথের *বউ ঠাকুরাণীর হাট* ইত্যাদি। অলৌকিকতা, অতিপ্রাকৃতিকতা ছাড়াও সামাজিক-ব্যঙ্গ উপন্যাসের একটা ধারাও দেখা দিয়েছিল সমকালীন বাংলা সাহিত্যে। এ শতকেই বাংলা উপন্যাস গঠনের দিক থেকে যথেষ্ট পূর্ণতা পেয়ে যায়, প্লট গঠনেও বৈচিত্র্যের সম্ভাবনা দেখা দেয়। উনিশ শতকীয় বাংলা উপনাসের দিকে তাকালে সমকালীন বাঙালি সমাজের চিন্তা-মননের পরিবর্তন ও এর বিস্তারের চালচিত্র স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। কখনও উপন্যাসের গল্পরসের সাথে মিশেছে বৃহত্তর সামাজিক উদ্দেশ্য, স্বাদেশিকতার আদর্শ; ফলে নানাদিক থেকে উপন্যাসগুলো গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

Dhaka University Institutional Repository

বাংলা কথাসাহিত্য উনিশ শতক থেকে বিশ শতকে প্রবেশ করেছে রবীন্দ্রনাথের লেখনীর অনুসরণে। উপন্যাসের লক্ষ্য ও আঙ্গিক দু'দিক থেকেই বঙ্কিমচন্দ্র থেকে পৃথক হলেন তিনি, উপন্যাসের নির্মাণে আবহ রচনা ও মনোবিশ্লেষণ গুরুত্ব পেয়েছে তাঁর কাছে। সমালোচকের মতে, "রবীন্দ্রনাথের লেখায় গল্প উপন্যাসের প্লট আছে, কিন্তু প্লটের ঐকান্তিক প্রাধান্য নেই।" (সুমিতা, ২০১০ : ৬৬)। এছাড়া "রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসশিল্পভাবনায়– অর্ন্তপ্রেরণার বহির্দেশের বস্তু অর্থাৎ জগতের সামগ্রিকতা ও মানবজগতের বিস্ময় অন্তর্প্রদেশ শৈল্পিক ঐকান্তিকতায় সমন্বিত।" (আকরম, ২০১০ : ৪২)। তাছাড়া রবীন্দ্রনাথ উপন্যাসের আঙ্গিকটিকে দেখেছেন সাহিত্যের মৌল সারসত্য সন্ধানের সাথে সমীকৃত করে, একটা নিজস্ব ও স্বকৃত তাৎপর্যের নিরিখে।রবীন্দ্রনাথের পর শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে বিশ শতকের প্রথম দুই দশকের বাংলার সামাজিক-অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপট বিশ্বস্ত সত্যতায় রূপায়িত হয়েছিল।

বিশ শতকের সাহিত্য সৃষ্টির পরিপ্রেক্ষিত হিসেবে খুবই গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে ধরা হয় পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসার ও 'বাঙালির নবজাগরণ'কে; সেই সাথে স্বদেশি চেতনা, বঙ্গভঙ্গ, স্বাধীনতাকামী ও সাম্রাজ্যবাদবিরোধী নানা আন্দোলন, দুটো মহাযুদ্ধ, অঞ্চলগুলোর পুনর্বিন্যাস ও উদ্বাস্তু সমস্যা– এ উপমহাদেশের ইতিহাসকে করে আন্দোলিত। স্বভাবতই বাংলা উপন্যাসে এসেছে একের পর এক ঘাত-প্রতিঘাতের তরঙ্গ। আধুনিক বাংলা উপন্যাসের জন্মের ইতিহাস-বিশ্লেষণে সমকালের স্বদেশ-সমাজ পরিবেশের কারণকার্য স্বীকারের পাশাপাশি যুগপরিবেশে পাশ্চাত্য চিন্তাস্রোত ও সাহিত্যের নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা প্রভাবের কথাও চর্চিত হয়। সে সময় 'কল্লোল' ও 'কালি-কলমে' প্রকাশিত বিদেশি সাহিত্যের অনুবাদ ও বিদেশি সাহিত্য সম্পর্কিত প্রচুর আলোচনা প্রকাশিত হয়েছে। (দ্রষ্টব্য, ড. রামেশ্বর শ', ২০০৬ : ১০৫)। ফরাসি 'ন্যাচারালিস্ট' শিল্পী, ইংরেজ ও রুশ ঔপন্যাসিকদের নিয়ে আলোচনা ও অনুবাদ হয়েছে পত্রিকা দুটোতে।

বিচ্ছিন্নতা, নাগরিক মানসিকতার পাশাপাশি পল্লিজীবনচিত্রণ, পাশ্চাত্য-অভিমুখিতা, ব্যক্তি-কেন্দ্রিকতা প্রভৃতি লক্ষণগুলি বাংলা কথা-সাহিত্যে ফুটে উঠতে আরম্ভ করে; বিশেষ করে দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তীকালে– বিশ শতকের তৃতীয় ও চতুর্থ দশকে। "আরো নির্দিষ্ট করে বললে, *কল্লোল-কালিকলম-প্রগতি*র অতি-আধুনিক কালে চিহ্নিত তরুণ লেখকদের গল্প-উপন্যাসে।" (সত্যেন্দ্রনাথ, ২০০০ : ১৪৮)। যদিও *কল্লোল*-কালের সব ঔপন্যাসিকই সমানভাবে 'পশ্চিমাস্য ও বিচ্ছিন্নতাবাদী'

Dhaka University Institutional Repository

নন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি ও সমরোত্তর সাহিত্যের সঙ্গে বাঙালি চিন্তাজগতের সংযোগ ঘটে গেল বিশের কালপর্বেই। বিশ শতকীয় আধুনিকতার পর্বে বিশেষত *কল্লোল*-পর্বে উপন্যাসে জীবনবাস্তবতা রূপায়ণের ক্ষেত্রে ঔপন্যাসিকের বাস্তবতার বোধ, মনস্তাত্ত্বিক চেতনা সংক্রান্ত ইউরোপীয় ধারণা নিয়ে সমকালে সাহিত্য-বিতর্ক ও হয়। এ পর্যায়ে বাস্তবতার ধারণা, সাহিত্যে বাস্তবতার উপস্থাপনা বিষয়ে প্রচুর তর্ক-বিতর্ক ও মতাদর্শের প্রকাশ ঘটে। রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্র-নরেশচন্দ্র-প্রমথ চৌধুরী-বুদ্ধদেব বসু-সহ *কল্লোল*-পর্বের তরুণ লেখকগোষ্ঠীর অনেকেই এ বিতর্কে জড়িয়ে পড়েন। ত্রিশের দশকে 'সাহিত্যে বাস্তবতা' বিষয়ক বিতর্ক বা সাহিত্য সমালোচনা-মতাদর্শ ভিন্নমাত্রা পেয়েছিল মার্কসীয় দর্শন-তত্ত্বের আলোকে। অনেক কথা-সাহিত্যিক-প্রাবন্ধিক ও সমালোচকেরা মার্কসীয় নন্দনতত্ত্বের ব্যাখ্যা-ভাষ্য রচনা করেন এবং এর মধ্য দিয়ে সমাজতান্ত্রিক বাস্তবাতাবাদী সাহিত্যের পরিমণ্ডল প্রস্তুত করেন। তবে বিতর্কের বিষয়বস্তু মতাদর্শ বা সাহিত্যতত্ত্বকেন্দ্রিক (বিশুদ্ধ সাহিত্য বনাম ফলিত সাহিত্য) হলেও একথা স্বীকার্য কথাসাহিত্যে ব্যাপকভাবে জীবন উপস্থাপনের তাগিদ সৃষ্টি হয়েছিল সমকালীন বাস্তবতা থেকেই, কিছু সীমাবদ্ধতা ছাড়া বিশ শতকের এই পর্বে ঔপন্যাসিকেরা সেটা করতে সক্ষম হয়েছেন।

সরল জীবন ও মনের বিপরীতে পরিবর্তিত বাস্তবতার অভিঘাতে সৃষ্ট জটিলতায় জীবনচেতনার উপস্থাপনে ও আঙ্গিকের স্বাতন্ত্র্যও দেখা গেছে এ সময়ের কথাসাহিত্যে। ঘটনা বা কাহিনিনির্ভরতা পরিত্যাগ করে বাংলা উপন্যাস চরিত্র-প্রধান হয়ে যে অগ্রগতি লাভ করেছিল রবীন্দ্রনাথের হতে ধরে; বিশ শতকের সূচনা-মুহূর্তে তা সেখানেই থেমে থাকেনি, ক্রমশ বিবর্তিত ও পরিপূর্ণ এবং সময়-সংলগ্ন হয়েছে। উপন্যাসের চরিত্র আত্মসমীক্ষাপ্রধান হয়ে উঠেছে; এরই সাথে সংলগ্ন হয়ে আছে কথাসাহিত্যের ভাষার পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং গদ্যের ভেতর সচেতনভাবে রূপান্তর আনার প্রয়াস।

বিশ ও তিরিশের দশকে প্রকাশিত বহু পত্রিকাকে ('কল্লোল', 'কালি-কলম', 'প্রগতি' 'পরিচয়', পূর্বাশা, 'দেশ') ঘিরে তরুণ লেখকগণ কর্তৃক বাস্তবতাধর্মী উপন্যাস রচনার প্রচেষ্টা দেখা যায়। উপন্যাসে আধুনিকতাবাদী নানা চিন্তা– 'সমাজ-বাস্তবতাবাদ' তথা মার্কসবাদী দৃষ্টিভঙ্গিও দেখা গেল। এ পর্যায়ে একদিকে সমাজের শ্রেণি-দ্বন্দ্বময় বাস্তবতার উদ্‌ঘাটন যেমন ঘটেছে, তেমনি ঘটনানির্ভর আখ্যান সর্বস্ব উপন্যাসপ্লট পরিহার করে মানুষের মনের সূক্ষতা এবং অন্তরালের বিচিত্র রহস্য

Dhaka University Institutional Repository

উদ্‌ঘাটনে অথবা মননসমৃদ্ধ তাত্ত্বিকতায় সমৃদ্ধ হয়েছে উপন্যাস। উল্লেখযোগ্য ঔপন্যাসিক হলেন– জগদীশ গুপ্ত (১৮৮৬-১৯৫৭), বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৪-১৯৫০), ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় (১৮৯৪-১৯৬১), তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৮-১৯৭১), শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় (১৯০১-১৯৭৬), গোপাল হালদার (১৯০২-১৯৩৯), অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত (১৯০৩-১৯৭৬), প্রেমেন্দ্র মিত্র (১৯০৪-১৯৮৮), সতীনাথ ভাদুড়ী (১৯০৬-১৯৬৫), মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯০৮-১৯৫৬), বুদ্ধদেব বসু (১৯০৮-১৯৭৪), অদ্বৈত মল্লবর্মণ (১৯১৪-১৯৫১) নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় (১৯১৮–১৯৭০) প্রমুখ। জীবনের মর্মমূলে প্রবেশ করে জীবনযাপনের সামাজিক ও মানসিক সংকটগুলোর সূক্ষ্ম বিশ্লেষণে অতি পারঙ্গম ঔপন্যাসিক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বিষয় ও প্রকাশভঙ্গিতে বাংলা উপন্যাসকে ভিন্ন মাত্রা দিয়েছেন। "তাঁর কথাসাহিত্যে আখ্যানের বাস্তবতা, নর-নারী সম্পর্ক, ব্যক্তি ও সমাজের দ্বন্দ্বময় লগ্নতা, গাঢ় অনুভবতল থেকে উঠে আসা জীবন-ভাবনার প্রায় দার্শনিকতার স্তর একীভূত হয়েছে।" (সুমিতা, ২০১০ : ৭৪)। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর উপন্যাস ও ছোটগল্প দিয়ে প্রমাণ করলেন আখ্যানের গড়ন ও আকার তার মৌলিক বদলে ফেলেছে, "স্থান বা পরিসর বদলে ফেলছে মানুষজনকে আর মানুষজন বদলে দিচ্ছে স্থান বা পরিসরকে। পরিসর আর মানুষজনের এমন অর্থান্তরন্যাসই *পদ্মানদীর মাঝি* ও *পুতুল নাচের ইতিকথা*'র মৌলিকতার প্রধান উপাদান।" (দেবেশ, ২০১০ : ৬৬)।

বাংলা সাহিত্যে চল্লিশের দশককে চিহ্নিত করা যায় 'রাজনীতি-সচেতন' অধ্যায় হিসেবে। পূর্ববর্তী দশকে ঘটে যাওয়া অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ঘটনা, *কল্লোল*-আবর্তে মথিত দেশের সামগ্রিক আবহ– ইত্যাদি কারণে এ সত্য অনুভূত হয়। সমালোচক লিখেছেন :

> চারের দশকটিকে আমরা রাজনীতি-সচেতন উপন্যাসের দশক বলতে পারি। চল্লিশের ঘটনাবলিও রাজনৈতিক সংকটের সঙ্গে কত নিবিড়ভাবে যুক্ত ছিল তা সকলেই জানেন। (সুমিতা, ২০১০ : ১০৩)

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, মন্বন্তর, দাঙ্গা বা সাম্প্রদায়িক সম্পর্কের পরিণতি, জাতীয়তাবাদী রাজনীতির অভিমুখ পরিবর্তন, কমিউনিস্ট পার্টির নানা আন্দোলন, 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনের সর্বভারতীয় অভিঘাত, আগস্ট বিপ্লব, ফ্যাসিস্ট-বিরোধী লেখক ও শিল্পী-সংঘের প্রতিষ্ঠা (১৯৪২), ভারতের স্বাধীনতা ও দেশবিভাগ– সব মিলে এক ক্ষুব্ধ রাজনৈতিক তরঙ্গময় রূপ চল্লিশের দশকের। সাহিত্যে এর

Dhaka University Institutional Repository

অভিব্যক্তি বা প্রভাবও স্বাভাবিক; পূর্ববর্তী দশকগুলোতে মানুষের রাজনৈতিক চেতনাও ক্রমবিকশিত হয়েছে। বিশ্বযুদ্ধ, মন্বন্তর, দেশভাগ, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা প্রভৃতি পরিপ্রেক্ষিত এ সময়ের বাংলা উপন্যসের প্লটে ছড়িয়ে ছিল নানাভাবে। শিকড়হীনতা, ছিন্নমূল চেতনার স্রোত ব্যক্তিহৃদয়কে ভয়ানক বিপর্যস্ত করেছিল– অন্তত নাগরিক মধ্যবিত্ত শ্রেণিকে। দেশভাগের মধ্য দিয়ে রাষ্ট্রীয় বিভাজন, দেশ-কাল-পাত্রের গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনগুলি ছিল একসূত্রে গ্রথিত।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সময়কালের ঔপন্যাসিকের অনেকে দেশভাগ ও পরবর্তী পর্যায়েও সাহিত্য রচনা করে গেছেন; যেমন– নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, সতীনাথ ভাদুড়ী, সঞ্জয় ভট্টাচার্য, সুবোধ ঘোষ, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, ননী ভৌমিক, বনফুল, সরোজকুমার রায় চৌধুরী, গোপাল হালদার প্রমুখ। বিশ্বযুদ্ধোত্তর পর্বের প্রতিষ্ঠিত লেখকদের মধ্যে রয়েছেন জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, সন্তোষ কুমার ঘোষ, বিমল কর, রমাপদ চৌধুরী, সমরেশ বসু প্রমুখ। সমাজ ও ব্যক্তির মনস্তাত্ত্বিক সংঘর্ষে ব্যক্তি-আত্মার উন্মোচন এবং জটিলতম স্থিতি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর পর্বের অন্যতম প্রবণতা। তারাশংকর, বিভূতিভূষণ, মানিক বন্দোপ্যাধ্যায়, সুবোধ ঘোষ, অচিন্ত্যকুমার, প্রেমেন্দ্র, বুদ্ধদেব, সঞ্জয় ভট্টাচার্য, ননী ভৌমিক প্রমুখ কথাকার নানাভাবে সমকালকে কথাসাহিত্যে গ্রহণ করেছেন, যুদ্ধোত্তর পর্বে তা তাঁদের পরিণত চেতনায়, সত্য-জিজ্ঞাসায় এক-একটি নতুন প্রবণতা বা লক্ষণ হয়ে উঠেছে। বিশ্বযুদ্ধকালীন বাংলা সাহিত্যের ধারার গতি বৈশিষ্ট্য প্রসঙ্গে সমালোচক-কথাকার গোপাল হালদারের উক্তি :

> বাঙলা উপন্যাস শুধুমাত্র ব্যক্তি-প্রধান জীবনচিত্র না হইয়া ঘটনা প্রধান সমাজ-চিত্র হইতে চাহিতেছে। ... উহা একটা পরিবর্তমান পৃথিবীর এবং সমাজের ও রাষ্ট্রের রূপান্তর প্রত্যক্ষ করিতে যত্নপর।" (উদ্ধৃত, বীরেন্দ্র, ১৯৯৮ : ৩২)

যুদ্ধ-পরবর্তী ভারতবর্ষে দেশভাগ ছিল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। স্বাধীনতা প্রাপ্তির আগে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কারণে সমাজ জীবনে যে জটিলতার সৃষ্টি হয় এবং তাতে বাংলা কথাসাহিত্যে যে বিষয়ের বৈচিত্র্য আসে, তারই সূত্র দেখা দেয় স্বাধীনতা-উত্তর বাংলা কথাসাহিত্যে। রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভের পরবর্তী অধ্যায়ে দেশজ সামাজিক-অর্থনৈতিক-সাংস্কৃতিক আন্দোলন চারিত্র্যে আসে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন। প্রাক্-স্বাধীনতা মুহূর্তে হিন্দু-মুসলমান বিরোধ, সাম্প্রদায়িক বিভেদ, পারস্পরিক অবিশ্বাস প্রকট হয়ে ইতিহাসকে করে রক্তক্ষয়ী। হত্যা-ধ্বংস-মানবিকতার বিপর্যয়ে স্বাধীনতা-উত্তর ভারতবর্ষে এক অরাজকীয় পরিবেশের সৃষ্টি হয়। মানুষের অর্থনীতি, সামাজিক

Dhaka University Institutional Repository

কাঠামো, মূল্যবোধ, জীবনের নিশ্চিত নিরাপত্তা বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। স্বভাবতই ৪৭' পর্বে উপন্যাস বিষয় হিসেবে প্রাধান্য লাভ করেছিল দেশ, দেশ-চেতনা সংক্রান্ত নানা সমস্যা। এ পর্যায়ে কোনো কোনো ঔপন্যাসিক ইতিহাস বা রাজনীতিকে অনেকটা নিভৃতে রেখে "আপাত ইতিহাসনিরপেক্ষ জীবনের ভিতর থেকে দেশবিভাজন-স্বাধীনতাকে দেখছিলেন (যেমন-নরেন্দ্রনাথ মিত্র); আবার কেউ জীবনের দৈনন্দিনকে আপাতত সরিয়ে রেখে ইতিহাস বা রাজনীতিতে দেশ-বিভাজন-স্বাধীনতাকে দেখছিলেন।" (দেবেশ, ১৯৯১ : ৮৮)। দেশভাগের সমকালে এবং অব্যবহিত পর্বে যেসব উপন্যাস লেখা হয়েছিল, তার মাঝে উল্লেখযোগ্য হল– নবেন্দু ঘোষের *ফিয়ার্সলেন* (১৯৪৬), বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের *কলকাতা নেয়োখালি বিহার* (১৯৪৭), প্রবোধকুমার স্যান্যালের *হাঁসবানু* (১৯৪৮), জীবনানন্দ দাশের *জলপাইহাটি*, *বাসুমতীর উপাখ্যান* (রচনাকাল ১৯৪৮) ; অমরেন্দ্র ঘোষের *ভাঙছে শুধু ভাঙছে* (১৯৫০) এবং *মন্থন* ; মানিক বান্দোপাধ্যায়ের *সার্বজনীন* (১৯৫২) এবং অচ্যুত গোস্বামীর *কানাগলির কাহিনি* (১৯৫৫), অমিয়ভূষণ মজুমদারের *নির্বাস* (১৯৫৯), নারায়ণ স্যান্যালের *বকুলতলা পি. এল ক্যাম্প* (১৯৫৫)। "দেশবিভাগজনিত অভিজ্ঞতা পরবর্তী প্রজন্মে পশ্চিমবঙ্গ ও পূর্ববঙ্গ দুই প্রান্তেই জীবনকে এমনভাবে বিপর্যস্ত করে দিয়েছিল যে পরবর্তী অর্ধ শতাব্দী ব্যাপ্ত ক'রে বিভিন্নভাবে এই অভিজ্ঞতা-ভিত্তিক আখ্যান যেন হয়ে উঠেছে বাংলা কথাসাহিত্যের একটি মুলস্রোত।" (অপর্ণা, ২০১৩ : কথামুখ)। প্রফুল্ল রায়ের *কেয়াপাতার নৌকা* (১ম ও ২য় পর্ব ১৯৭০), অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের *নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে*, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের অর্জুন (১৯৭১) এবং আরো আগে বনফুলের *ত্রিবর্ণ* (১৯৬৩) ও আবু রুশদের *নোঙর* (১৯৬৭) প্রভৃতি এ সময়ের গুরুত্বপূর্ণ উপন্যাস।

এসব উপন্যাসগুলোতে মানুষের সংকট দুটো স্তরে অনুভূত। একটি হল রাষ্ট্র ও সমাজ-পরিস্থতিজনিত অসঙ্গতি, অস্থিরতা, অন্যটি আত্মিক ও মনস্তাত্ত্বিক অনিশ্চয়তা। সেই সাথে আর্থ-সামাজিক পরিমণ্ডল এবং রাজনৈতিক পটভূমিও সমান স্বীকৃত হয়েছে কথাসাহিত্যের বাস্তবতায়। ভারসাম্যহীন জীবনব্যবস্থায় স্বাধীনতার অব্যবহিত পরবর্তী সময়পর্বে মানবিক সম্পর্কের জটিলতাগুলো সামগ্রিকভাবে একটা বিচ্ছিন্নতাবোধেরও প্রচ্ছায়া সৃষ্টি করে। নব রাষ্ট্র ব্যবস্থা, নতুন অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক প্রকল্প, সামাজিক পরিবর্তনের সাথে সাথে তখন মধ্যবিত্ত সমাজের চারিত্র্য বদলে গেছে। অবক্ষয়, বিচ্যুতি, পতন, উৎকেন্দ্রিকতা ইত্যাদি ব্যাপারগুলো সামাজিক অবস্থা থেকেই এসেছিল, সেই সাথে জন্ম নিয়েছে সুস্থিত জীবনের আকাঙ্ক্ষা।

Dhaka University Institutional Repository

বাংলা সাহিত্যে পঞ্চাশ ও ষাটের কালপর্ব হয়ে উঠেছিল নতুন ধারার কথাসাহিত্যের জনন-ভূমি। উপন্যাসে ভাষা আর বাস্তবতাকে ইতিহাস-সময়ের আলোকে পর্যবেক্ষণ করবার অভিনব দৃষ্টিকোণ নিয়ে কথাসাহিত্যের নতুন রূপ গড়ে তুললেন কয়েকজন লেখক। বর্হিবাস্তব এবং অন্তর্বাস্তবকে সমন্বিত করে গড়ে তোলা হল শিল্পের নব রূপাবয়ব। এ ধারাতে উল্লেখযোগ্য লেখক হলেন– কমলকুমার মজুমদার (১৯১৪-১৯৭৯), অমিয়ভূষণ মজুমদার (১৯১৮-২০০১), মহাশ্বেতা দেবী (১৯২৬-২০১৬), দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯৩৬-১৯৭৯), দেবেশ রায় (১৯৩৬–) প্রমুখ। এছাড়াও ছিলেন মনোজ বসু (১৯০১-১৯৮৭), জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী (১৯১২-১৯৮২), সন্তোষ কুমার ঘোষ (১৯২০-১৯৮৫), বিমল কর (১৯২১-২০০৩), সমরেশ বসু (১৯২৪-১৯৮৮)– যারা ব্যক্তির সমস্যাকে ধরতে চেয়েছেন সামাজিক-রাষ্ট্রিক পটে। গল্প-উপন্যাসের বিষয় ও চরিত্রকে দেখার দৃষ্টিভঙ্গিতে বদল ঘটতে থাকে স্বাধীনতা-উত্তরকালের পরিবেশে। ১৯৬২ সালে ভারত-চীন সংঘর্ষ, দেশীয় সাম্যবাদী গোষ্ঠীর মধ্যে বিভাজন, নকশাল আন্দোলন, ১৯৬৫ সালে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ, ক্ষমতাসীন শাসকগোষ্ঠীর কর্তৃত্ব পরিবর্তন; যুক্তফ্রন্ট সরকার– এ সবের মধ্যেই কথাসাহিত্যের অধ্যায় সৃষ্টি হতে থাকে। বিশ শতক এক বহুমুখী আবর্ত-সংকুল শতাব্দী; বাংলা কথাসাহিত্য এই শতবর্ষকে তার সম্পূর্ণতায় চিহ্নিত করতে চেষ্টা করেছে, অগ্রসরমান সময় বদলে দিচ্ছে কথাসাহিত্যের বিয়ষ-ভাবনা ও গঠন-ভঙ্গিমা। উপন্যাসের সমালোচনা কিংবা বিশ্লেষণে বিষয়-আলোচনাই হয়ে ওঠে মুখ্য; কেননা উপন্যাসই সবচেয়ে বড় গদ্য-মাধ্যম হিসেবে জীবনকে-সমগ্রতাকে গভীরভাবে ধারণ করতে সক্ষম হয়েছে, যেখানে ব্যক্তি ও সমষ্টির সম্পর্ক সমান গুরুত্বপূর্ণ; সেই সাথে দেশ-কাল-ইতিহাসের প্রবহমানতাও জরুরি। মানব-ইতিহাসের আন্তর্জাতিক পটও যেন সমান্তরালে বিন্যস্ত হয় সকল দেশের সকল কালের উপন্যাসে। ভারতবর্ষে ইংরেজ উপনিবেশায়নের কালেই উপন্যাসের 'জন্ম' হলেও সাহিত্যের বাস্তব অবলম্বন যে মানবজীবন, তা-ই বিকশিত হয়ে উঠতে শুরু করে ঊনিশ শতকের গদ্যসাহিত্যের নতুনত্বে। জন্মপর্ব থেকে বাংলা উপন্যাসের ফর্ম বা 'মডেলিং' কতটা পাশ্চাত্য আঙ্গিকজাত বা বাঁধাছক হয়ে উঠল; দেশজ সংস্কৃতির অবলুপ্তি কিংবা দু'শ বছর ধরে বিদেশি শক্তির কাছে পাওয়া সাংস্কৃতিক উপাদান ভারতীয় উপাদান হয়ে ওঠার আত্তীকরণ প্রক্রিয়া কতটা গভীর, স্বাভাবিক ও আধুনিক ছিল সে বিতর্ক ভিন্ন। কেননা সাম্রাজ্যবাদী ইতিহাসের অভিঘাতটি সময়ের এক সত্য-অধ্যায়। তাছাড়া কলোনির ইতিহাস কেবল গ্রহণের নয়, বর্জনেরও। সাতচল্লিশ পরবর্তী নয়া উপনিবেশকবলিত পূর্ব বাংলার উপন্যাসিকেরা তাদের দেশকাল পটে উপন্যাস রচনা করেছেন,

Dhaka University Institutional Repository

উপন্যাস-রীতিতে নতুনত্ব আনতে চেষ্টা করেছেন। সমকালীন জীবন কিংবা সামগ্রিক জীবনকে কার্যকারণে বুঝতে চাওয়া ও একে প্রকাশ করার তাগিদটা সম্পূর্ণরূপে ইংরেজি উপন্যাস-ফর্মের সীমাবদ্ধতায় আটকে পড়ে নি। বরং তা ধীরে ধীরে হয়ে উঠেছে একটি স্বতন্ত্র দেশের স্বতন্ত্র কথাসাহিত্যের বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত ইতিহাস। মূলত বিষয়ের চাপেই স্থিরীকৃত 'মডেল' বা আঙ্গিক থেকে বেরিয়ে এসেছে বাংলা উপন্যাস।

দেবেশ রায়ের শিল্পদৃষ্টি ও উপন্যাসতত্ত্ব

প্রাচীন বা আধুনিক শিল্পতত্ত্বের মধ্যে যেসব কারণে উপন্যাস-তত্ত্বের বৈচিত্র্য বা ভাঙা-গড়া কিংবা এক ধরণের অনির্দিষ্টতা ঘটেছে; তার প্রধান একটি কারণ হল এই শিল্পমাধ্যমের বৃহৎ পরিসর ও আকার-প্রকার। কেবল উপন্যাস রচনার তাগিদেই দেবেশ রায় উপন্যাসের শিল্পতত্ত্ব অনুসন্ধান করেছেন তা নয়। আঠার-ঊনিশ শতকের বুর্জোয়া সমাজে 'ব্যক্তি' হয়ে ওঠা মানবের এক নতুন শিল্প প্রয়াস হল উপন্যাস– উপন্যাসের জন্ম-ইতিহাস (প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য) সম্পর্কিত এই সিদ্ধান্তটির পুনর্বিশ্লেষণ সূত্রে এবং উপন্যাস কী, কোন প্রক্রিয়ায় উপন্যাস 'উপন্যাস' হয়ে ওঠে; উপন্যাসের কোনো শিল্পতত্ত্ব আছে

Dhaka University Institutional Repository

কী না ইত্যাদি অনুসন্ধান সূত্রেই দেবেশ রায়ের (১৯৩৬–) উপন্যাস বিষয়ক জিজ্ঞাসার ভুবন গড়ে উঠেছে। তাঁর জিজ্ঞাসাগুলোর সমন্বিত রূপকে উপন্যাসের 'তত্ত্ববিশ্ব' বলা যাবেনা, কারণ তিনি নিজে 'তত্ত্ব' শব্দটিকে প্রচলিত অর্থে উপন্যাসের সাথে সম্পৃক্ত করতে স্বচ্ছন্দ নন। উপন্যাস যে অভিনব কোনো শিল্পরীতি নয় এবং এর জন্ম একটা নির্দিষ্ট শতকেও নয়– দেবেশ রায় তাঁর উপন্যাস-শিল্প ভাবনায় একথা একাধিকবার বলতে চেয়েছেন। বুর্জোয়া বিপ্লব থেকে জাতিরাষ্ট্র, জাতিরাষ্ট্র থেকে মুক্ত বাণিজ্য, মুক্ত বাণিজ্য থেকে ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্য, ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্য থেকে উপন্যাস– এমন একটা ইতিহাস নন্দনতত্ত্বে গ্রাহ্য হয়ে গেছে বলে দেবেশ আক্ষেপ করেছেন। পুরনো এই সংজ্ঞা দিয়ে নভেল বা উপন্যাসকে চেনা যায় না বলেই তাঁর অভিমত। শিল্প বা উপন্যাস সম্পর্কে দেবেশ রায়ের নন্দনতাত্ত্বিক কিছু মূল্যায়নও আছে, যেগুলোকে 'বিশুদ্ধ' শিল্পরূপের সংজ্ঞার্থ খোঁজার চেষ্টা হিসেবে চিহ্নিত করা যায়।

শিল্পের শ্রেণিগত নির্দিষ্ট রূপ সম্পর্কে দেবেশ রায় মত প্রকাশ করেছেন ; তিনি মনে করেছেন সাহিত্যের এক-একটি রূপকে কতটা নির্দিষ্ট করে তুলতে পারে বা নতুন কোনো রূপকে নির্দিষ্ট আকার দিতে পারে– তার ওপর একটা ভাষার শিল্পক্ষমতা নির্ভর করে। "সাহিত্য রূপের নির্দিষ্টতা স্থির না হলে সাহিত্যচর্চা ব্যাহত হয়।" (দেবেশ, ১৯৯১ : ১৭০) – একথা বললেও শিল্প-সাহিত্য বিশেষত কাহিনীগদ্য হিসেবে উপন্যাসকে পাঠ করার ক্ষেত্রে আঙ্গিকের অতিনির্দিষ্টতা ও তার অনুসরণে সৃষ্ট উপন্যাস-পাঠের বাধ্যতা নিয়ে কিছুটা সংশয় প্রকাশ করেছেন তিনি। শিল্পচর্চায় লেখককে রূপের সমস্ত নির্দিষ্টতাকে মেনে নিতে হয় বলে শিল্পসাহিত্য পাঠের একটা সংস্কৃতি সৃষ্টি হয়েছে। দেবেশ অবশ্য কামনা করেছেন কাহিনী-গদ্যকার হিসেবে একজন লেখকের বোধের স্পষ্টতা। অর্থাৎ ছোটগল্প, উপন্যাস, স্মৃতিকথা, ভ্রমণকাহিনীসহ আরো নানা ধরণের শিল্পচর্চাকে কাহিনী-গদ্য হিসেবেই ধরে নিয়ে এক বৃহত্তর এবং অবয়বে শিল্পরূপের নির্দিষ্টতামুক্ত গভীর নান্দনিকতাবোধ ধারণ করবেন একজন লেখক। একই সাথে "লেখক কাহিনীগদ্যের যে রূপটি নিয়ে সেই মুহূর্তে কাজ করছেন, সেই রূপটি সম্পর্কে তাঁর বোধের দ্বিধাহীন স্পষ্টতাও কাম্য।" (দেবেশ, ১৯৯১ : ১৭০)। সে সূত্রে উপন্যাসও কাহিনীগদ্যের একটা ধরণমাত্র, উপন্যাস হিসেবে একটা রচনাকর্মের যা কিছু বৈশিষ্ট্য, যা কিছু এই উপন্যাসটিকে কাহিনীগদ্যের অন্য সব ধরণ থেকে পৃথক করেছে, তার সবই কাহিনীগদ্যের বৃহত্তর পরিধির অন্তর্গত হয়ে পরিধিকে বাড়ায়; ঔপন্যাসিকের এই বৃহৎ ও গভীর শিল্পবোধকেই

Dhaka University Institutional Repository

প্রাধান্য দিতে চেয়েছেন দেবেশ রায়। তাছাড়া উপন্যাস তাঁর কাছে আদি-মধ্য-অন্ত্য বিশিষ্ট শিল্পরূপ নয়, বরং এ নিয়ে তাঁর ভাবনা হল:

> একটা উপন্যাস আরম্ভই-বা হবে কেন, শেষ-ই বা হবে কেন ? আরম্ভ হওয়ারও কিছু নেই, শেষও হবার কিছু নেই। দরকার শুধু আখ্যানের একটা গতিপথ নির্মাণ করা। (দেবেশ, ১৯৯১ : ১৯৮)

অর্থাৎ উপন্যাসের উপক্রম আছে কিন্তু উপসংহার নেই; উপন্যাসের ফর্মের ভেতরেই এই স্বতোবিরোধিতা আছে; দেবেশের মতে, উপন্যাস যা করে–

বৃত্ত বানানো

বৃত্ত ভাঙা

ঘটনা ও চরিত্রকে স্বাধীন করে দেওয়া

আবার তাদের গণ্ডির ভেতর টেনে আনা (সূত্র : *উপন্যাসের নতুন ধরণের খোঁজে*, পৃ. ৯৬)

উপন্যাসের বয়নের মধ্যে 'আখ্যানের যে ধারাবাহিক ভাষ্য চলে (বিশেষত দেবেশের উপন্যাসে) সেটা কোনো সাহিত্যতত্ত্ব থেকে আসা নয়;' তিনি এটাকে তত্ত্বও বলতে চান না। (দেবেশ, ১৯৯১ : ২০২)। আখ্যানের স্তরবিন্যাস জটিল অথচ সাধারণ এই অর্থে যে, এর নির্দিষ্ট সীমা নেই, সময়ের মতই প্রবহমান, যা অন্তহীনভাবে সময়কে, মানুষকে, জীবনকে ধারণ করতে পারে। উপন্যাসকে বহুস্বরসমৃদ্ধ ও অনেকান্ত করে তোলার তাগিদ ও এই তাগিদ থেকে একটি উপন্যাসের 'নিটোল, নিশ্ছিদ্র, নির্দিষ্ট' আঙ্গিক-প্রকল্পকে সচেতনভাবে এড়াতে চেয়েছেন দেবেশ। তাছাড়া উপন্যাস সম্পর্কে তাঁর ধারণা :

> উপন্যাসই একমাত্র শিল্পরূপ যার কোনো রূপ নেই। ... এই সংজ্ঞাতিরিক্ততাই উপন্যাসকে এক মুক্তি দিয়েছে, কোনো নির্ধারিত আকার থেকে মুক্তি, কোনো নির্ধারিত প্রকৃতি থেকে মুক্তি। আর এই মুক্তিই উপন্যাসকে শিল্পের বাঁধন দিয়েছে, সে-বাঁধন উপন্যাস নিজেই তৈরি করে... উপন্যাস সম্পূর্ণ অশাসিত, অথচ, সে উচ্ছৃঙ্খল নয়। (দেবেশ, ২০০৩ : ১৪-১৫)

গল্প-উপন্যাসের কেন্দ্রের অতিনির্দিষ্টতা ইউরোপীয় উপন্যাস-তত্ত্ব থেকে পাওয়া– একথার পাশাপাশি দেবেশ মনে করেন দেশীয় আখ্যানে কেন্দ্র এরকম অতিনির্দিষ্ট নয়। তবে "শিল্পের নিজস্ব প্রয়োজনে

Dhaka University Institutional Repository

শিল্পে কেন্দ্র প্রয়োজন... সেই কেন্দ্র কোনো কোনো সময়ে প্রয়োজনে বিকেন্দ্রণের মোহও জাগাতে পারে। কোনো কোনো সময়ে আরো কেন্দ্রের আভাস দিতে পারে।" (দেবেশ, ১৯৯১ : ২০০)। আর শিল্পের এই বিকেন্দ্রণ অথবা কেন্দ্রও বাস্তবকে ঘিরে; কারণ বাস্তবকে ধারণ করতে গেলেই এক সময়ে তৈরি কাঠামো থেকে বেরিয়ে যাওয়ার তাগিদ তৈরি হয়, ভাষা আর কৃৎকৌশলের মধ্য দিয়ে সেটাই নিমার্ণ হয়ে ওঠে। 'কিন্তু অতি বৈজ্ঞানিক, অতি পূর্বনির্দিষ্ট ও অত্যন্ত উপরতলার বাস্তববোধ নিয়ে শিল্পকাজ ব্যাহত হয়।' (দেবেশ, ১৯৯১ : ২০০)। এ প্রসঙ্গেই স্মর্তব্য 'উপন্যাসের জ্ঞানতত্ত্ব' বিষয়ে দেবেশের ভাবনা, তাঁর মতে :

> উপন্যাসের জ্ঞানতত্ত্ব নিশ্চয়ই দর্শনশাস্ত্রের জ্ঞানতত্ত্ব নয়। কাহিনীতে আমরা ব্যক্তিমানুষের দেশকালের ভিতর দিয়ে, অনেক ব্যক্তির অন্তর্গত সম্পর্কগুলির ইতিহাসের মধ্য দিয়ে, আর ব্যক্তির নেহাৎ ব্যক্তিগত অভ্যাস ও মুদ্রাগুলি প্রত্যক্ষ করে কাহিনীকারের জ্ঞানের কাছে পৌঁছই। বা, কাহিনীকারই তাঁর নিজের জ্ঞানকে আমাদের কাছে পর্যন্ত পৌঁছে দিতে পারেন। তিনি কী জ্ঞান অর্জন করেছেন তারই ওপর নির্ভর করে তিনি কোন্ প্রকরণে সেই জ্ঞানকে পাঠকের কাছে আকার দিতে পারবেন। কাহিনীকারের নিজের জ্ঞানার্জনের প্রক্রিয়া, পদ্ধতি ও পরিণতিরূপের ওপর নির্ভর করে তিনি কোন্ আকারের আধেয় নির্মাণ করছেন। (দেবেশ, ২০০৬ : ১৪৯)

শিল্পরূপ ও সময়ের সম্পর্ক বিষয়ে সময়ের প্রভাবে শিল্পরূপ রূপান্তরের তাগিদ এবং ফর্মের জন্ম কিংবা অবলুপ্তি সম্পর্কে আলোকপাত করেন দেবেশ। তাঁর মতে, "কোনো-কোনো সময় এমন আসে শিল্প-সাহিত্যের এক-একটি ফর্মে, যখন সেই ফর্ম শতবাহু বিস্তার করে তার সময়কে গ্রহণ করে। আবার কোনো-কোনো সময় এমনও আসে শিল্প-সাহিত্যের এক-একটি ফর্মে, যখন সেই ফর্ম তার দুটিমাত্র হাতকেও গুটিয়ে ফেলে তার সময়কে প্রত্যাখ্যান করতে। মহত্তর নৈতিকতার গর্ভ ছাড়া শিল্পসাহিত্যের কোনো ফর্মেরই কোনো জন্ম-স্থান নেই।" (দেবেশ, ১৯৯১ : ৮৬)। উপন্যাসের বাক্-নির্মিতি বলতে কেবল তার উপস্থাপনার বৈশিষ্ট্য বা ভাষাশৈলী বোঝায় না; আখ্যানের বিস্তার ও তার সরল কিংবা জটিল প্রকাশের জন্য নির্বাচিত সঠিক শব্দ, ভাষাভঙ্গি সব মিলে পরিবেশন-রীতির ব্যাপারটাই জোরালো হয়ে ওঠে; যদিও তা একমাত্র গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার নয়। অন্যদিকে উপন্যাসের শিল্পগুণ ঠিক কোথায় নিহিত এ প্রশ্নের উত্তরও অনুসন্ধান করেন দেবেশ, তিনি মনে করেন যে সাহিত্যের নন্দনতত্ত্বে এর কোনো সরাসরি ও একমত উত্তর মেলে না বলেই উপন্যাসের শিল্প-আলোচনা সাধারণত শুরু হয় বিষয় দিয়ে। "যেহেতু উপন্যাসের ভিতরে কিছু ঘটনাস্থল, ঘটনা,

Dhaka University Institutional Repository

মানুষজন থাকাটাই রীতি বা অভ্যাস, তাই বিষয়ের আলোচনা শুরু হয় সমাজ দিয়ে (সমাজবিজ্ঞান ও সামাজিক ইতিহাসের নানা সমান্তরাল ধারায় সমাজ এক বহু আলোচিত বিষয়)।" (দেবেশ, ২০০৩ : ১৯)। কখনও উপন্যাসের ভাষা বা চরিত্রভিত্তিক মূল্যায়নও হয়, কখনও যোগ হয় পরাবিদ্যা। নান্দনিক বিচারপদ্ধতির একটা দর্শন থাকে; আর সে দর্শন এক এক জনসমষ্টির জীবনযাপন থেকেই উঠে আসে বলে মনে করেন দেবেশ। এখান থেকে কিছু মান্য সিদ্ধান্ত পর্ব-পর্বান্তরে তৈরি হয়। দেবেশের মতে, আরিস্টটল থেকে ভিট গেনস্টিন বা বাখতিন-দেরিদা পর্যন্ত তা-ই ঘটেছে। অবশ্য একজন লেখক বা কবি সম্পর্কে একটা ধারণা স্থিরীকৃত হয়ে সাহিত্যকর্ম-বিচার বিবেচনা নিয়ত আবর্তিত ও মজ্জিত না হলে আমাদের আধুনিকতার চর্চা ব্যাহত হবে– এ কথাও মনে করেন দেবেশ। উপন্যাসনের প্রক্রিয়ায় ভাষার ভেতরে অনবচ্ছিন্ন এক উপাদান থাকে; 'ভাষার বর্হিদেশ' (outsideness of language) বলতে বাখতিন তাঁর সাংলাপিক নির্মাণ বা 'ডায়ালজিক ফর্ম'-এর ধারণার সংলগ্ন একটা বাচ্য সম্পর্কে আলোকপাত করেন; দেবেশ রায় তাঁর উপন্যাসের নন্দনতাত্ত্বিক ধারণার ক্ষেত্রে এই বাচ্যটি গ্রহণ করেছেন। তাঁর মতে, উপন্যাসের ভাষা হল অন্তরের বর্হিদেশ। "প্রত্যেকটি রচনাই একটি অভিযান বা যাত্রা; ভেতরের যে পথ ও পথান্তর অতিক্রম করতে করতে রচনাটি তৈরি হয়ে ওঠে, সেই রচনার নিসর্গ বা ঐকতান গড়ে ওঠে, সেই ভেতরের পথ ও পথান্তরের ধর্ম দিয়েই, সেই বর্হিদেশও রচিত হয়, যা এক নিরন্তর যাত্রা[৭]"– ফরাসি দার্শনিক দ্যলুজ-এর এই বক্তব্যটির উল্লেখ করে দেবেশ রায় উপন্যাসন প্রক্রিয়ায় ভাষার সেই অন্তর্দেশের আবেগকে প্রাধান্য দেন যা নিরন্তর বর্হিদেশ (অপরতার বোধ ও চিত্র) নির্মাণ করতে থাকে। ঔপন্যাসিকের সংজ্ঞার্থে দার্শনিক দ্যলুজ-এর আর একটি উক্তিকে প্রাধান্য দিয়েছেন তিনি :

> একজন মহৎ ঔপন্যাসিক সর্বোপরি এমন এক শিল্পী যিনি অজ্ঞাতপূর্ব ও অপরিচিতিপূর্ব সব অনুভবপুঞ্জ গড়ে তুলতে থাকেন ও তাঁর চরিত্রগুলিকে বিকশিত করতে গিয়ে সেই অনুভবপুঞ্জকে প্রকাশ্যতায় নিয়ে আসেন।" (দ্যলুজ ও গুয়াত্তারি, 'হোয়াট ইজ ফিলসফি', উদ্ধৃত, দেবেশ, ২০০৩ : ২৫)

রূপবাদী সাহিত্যতাত্ত্বিকদের মত দেবেশও মনে করেন যে ভাষাকে উপন্যাসের বিষয় থেকে আলাদা করা যায় না; উপন্যাসের মূল ধারক হল ভাষা, আখ্যান (ন্যারেশন অর্থে) আর চরিত্র-নির্মাণ হয়ে ওঠে একই প্রক্রিয়া এবং সাধারণত কাহিনীর সরল বিবরণ চরিত্রের জটিল উপস্থাপনের আনুষঙ্গিকতায়

Dhaka University Institutional Repository

নতুনতর তাৎপর্য পায়। (সূত্র : *উপন্যাসের নতুন ধরণের খোঁজে*)। উপন্যাসের ভাষা, আঙ্গিক কিংবা উপন্যাসনের প্রক্রিয়াকে দেবেশ কখনও কখনও বাখতিন-তত্ত্বের আলোকে বিচার করতে চেয়েছেন– যেমন তারাশঙ্করের কিছু উপন্যাস (*তারাশঙ্কর : নিরন্তর দেশ* গ্রন্থ দ্রষ্টব্য)। উপন্যাসের নন্দনসূত্র চিন্তায় তিনি বাখতিনীয় কিছু বৈশিষ্ট্যকে স্বীকারও করে নিয়েছেন; বাখতিনের ভাবনা-বিশ্ব থেকে দেবেশ রায়ের অনুপ্রেরণার প্রধান প্রধান জায়গাগুলো চিহ্নিত করা যায় :

(১) উপন্যাস এমন একটি শিল্পরূপ নয়, যা ইতিহাসের একটা বিশেষ সময়ে তৈরি হয়েছিল। বাখতিনের কাছে উপন্যাস এমনই এক শিল্পরূপ যা সচেতন সাহিত্য সৃষ্টির আদিকাল থেকেই চর্চিত হয়ে আসছে– সেদিক থেকে 'নভেলাইজেশন' একটি প্রাচীন প্রক্রিয়া। 'নভেলাইজেশন'-এর প্রয়োজন তখনই ঘটে যখন কতগুলো উচ্চারিত ও অনুচ্চারিত বিধিনিষেধ (শিল্পরূপের ও সমাজ-রাষ্ট্রের) বিষয়ের পক্ষে বাধা হয়ে দাঁড়ায়।

(২) বাখতিনের কাছে 'নভেল' কেবলমাত্র একটি সাহিত্যরূপ নয়, উপন্যাস হয়ে ওঠে আমাদের সময়ের, সাহিত্যের বিকাশের প্রধান বিষয় ও আধার।

(৩) সর্বোপরি বাখতিন মনে করেন অতিনির্দিষ্ট ফর্মের কাঠামো অস্বীকারের প্রয়োজন থেকেই উপন্যাসের শিল্পরূপের প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল। লিরিক, এপিক বা নাটকের জন্য বহুকালের অভিজ্ঞতায় তৈরি তত্ত্বের কাঠামোতে ফেলে উপন্যাসের স্বরূপকে চেনা যায় না, সুতরাং বাখতিন পৌছুতে চান উপন্যাসের সেই স্বরূপে, সেই সংজ্ঞায়– যেখানে উপন্যাস, স্বতন্ত্র, বিশিষ্ট, স্বাবলম্বী, সাহিত্যের অন্যান্য ফর্ম-নিরপেক্ষ ও স্বক্ষেত্রে স্বাধীন। (সূত্র : 'উপন্যাস নন্দন', *উপন্যাস নিয়ে*)

দেবেশের মতে উপন্যাস 'উপন্যাসীয়' হওয়াই সংগত ও উচিত। উপন্যাসের আত্মা ও শরীর অন্যান্য শিল্প সাহিত্যের উপজীব্য ও উপস্থাপনার থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। এটি ক্রম-পরিবর্তনীয় গদ্য আখ্যান যা ঔপন্যাসিকের অভিজ্ঞতা বা জ্ঞানকে উপন্যাসে পরিণত করে। উপন্যাসের প্রতিফলিত বাস্তবতা প্রসঙ্গে, সময়চিহ্ন ও উপন্যাসের বিষয়-ভাবনা নিয়ে দেবেশ বিশ্লেষণপ্রয়াসী মত প্রকাশ করেন। উপন্যাসে বাস্তবতা প্রসঙ্গে তাঁর ধারণা :

> উপন্যাস বাস্তবতার যে প্রত্যক্ষ প্রতিফলন ঘটে এমন আর-কোনো শিল্পকর্মেই ঘটে না। এমনকি আধুনিক পাশ্চাত্য উপন্যাসে বাস্তবতাকে ভেঙে ফেলার যে-চর্চা, তাতেও ভেঙে ফেলার জন্য একটি

Dhaka University Institutional Repository

> বাস্তবের আশ্রয় উপন্যাসের দরকার হয়। এই বাস্তব, উপন্যাসে আসে একমাত্র ঔপন্যাসিকেরই মধ্য দিয়ে। যেখানে ঔপন্যাসিক একই সঙ্গে উপন্যাসের বাস্তবতার কনডুইট, আবার সেই বাস্তবতার বিন্যাসের শিল্পী। (দেবেশ, ২০০৬ : ১৩৯)

কিন্তু বাস্তবতা, লেখকের অভিজ্ঞতা ও উপন্যাসে তার রূপায়ণ নিয়ে অনেক সময় কঠিন মাপকাঠি দাঁড় করানো হয়। উপন্যাস সমালোচনার ক্ষেত্রে এই অভ্যস্ত ধ্যানধারণায় দেবেশ দ্বিমত প্রকাশ করেছেন :

> নভেল নিয়ে অভ্যস্ত ধ্যানধারণার মধ্যে খুব গোলমাল আছে। নভেল কতটাই বাস্তব আর কতটাই লেখকের গায়ে গতরে জানা– নভেল পড়া, নভেল লেখা, নভেল নিয়ে ভাবনাচিন্তায় এই একটা বিষয় এতটাই জাযগা জুড়ে থাকে যে নভেলটা নভেল হয়ে উঠছে কী করে ও কেন সে-কথাটা ওঠারই কোনো ফাঁক হয় না। কবিতা নিয়ে কথাবার্তায় কিন্তু তেমন ঘটে না। ... নভেল নিয়ে ভাবনাচিন্তা, কথাবার্তায় বেশির ভাগ সময়ই মনে হয়– একটা ডকুমেন্টারি নিয়ে কথা হচ্ছে। এটাও আবার পরিষ্কার নয়– ডকুমেন্টারিটা লেখককে নিয়ে নাকী তাঁর গল্পটা নিয়ে। ... উপন্যাস এক কল্পনার সৃষ্টি। উপন্যাস নিয়ে কথাবার্তার প্রধান বিষয় তো হওয়া উচিত– সেই কল্পনা কতটা সম্পূর্ণ। কল্পনার সম্পূর্ণতা বোঝার ব্যাকরণ আলাদা। (দেবেশ, ২০১৬ : ১৪৯-৫০)

দেবেশ এও মনে করেন, 'যে দুঃসময়ে সময়ের গ্রন্থি ভেঙে যায়, তখনই ঔপন্যাসিকের উপন্যাস লেখার সুসময়।' (দেবেশ, ২০০৬ : ১৩)। অর্থাৎ চিরাগত বাস্তব, প্রতিপন্ন ও অলীক হয়ে গেলে আখ্যান ক্রমশ বিকল্প বাস্তবের বিকল্প বয়ান হয়ে ওঠে। সময়-ক্রমের রৈখিকতা ভেঙে দিয়ে জীবনের নির্মাণ ও বিনির্মাণ ঘটে আখ্যানে; ঔপন্যাসিকের অর্জিত অভিজ্ঞতার ওপর আধারিত চিন্তা-জিজ্ঞাসা-অনুভূতির নির্যাস দিয়ে পুনর্নির্মিত হয়ে থাকে। এছাড়া দেবেশের ধারণা, সময়নির্দিষ্ট, সময়বাধ্য ও সময়নিয়ন্ত্রিত উপন্যাসেও সময়ের চিহ্নগুলো কালান্তরে তাদের প্রামাণিকতা না ক্ষইয়ে সময়ের অনিবার্য বদলের সাথে মিশে যেতে পারে; অর্থাৎ "সময়ের স্পষ্ট চিহ্নগুলি উপন্যাসের গল্পকে কখনো-বা এক পৌরাণিকতা মাখিয়ে দিতে পারে যাতে সে-লেখা আষ্টেপৃষ্ঠে সময়ের সব ক্ষত আর অলঙ্কার নিয়েই সমকালীন হতে থাকে।" (দেবেশ ২০০৬ : ১০৯)। সময়-উত্তীর্ণ উপন্যাসের গুণ প্রসঙ্গে দেবেশ লিও তলস্তয়, স্তাঁদাল, ডিকেন্সের নানা উপন্যাস এবং বঙ্কিমচন্দ্রের (বিশেষত *কপালকুণ্ডলা*) উদাহরণ দিয়েছেন।

দেবেশের মতে, 'আধুনিক জীবনযাত্রায় ঘটনা আর ব্যক্তির এক অন্যোন্য-নিরপেক্ষতাই উপন্যাসের জন্ম দিয়েছে।' (দেবেশ ২০০৬ : ৯৫)। উপন্যাসের প্রত্যক্ষ বিবরণে চরিত্র-ঘটনা-স্থান, চরিত্রের

Dhaka University Institutional Repository

ভেতরের ইচ্ছা-অনিচ্ছা-আবেগ-মনন, চরিত্রগুলোর ভিতরকার নানা সম্পর্ক; ঘটনা ও তার প্রতিক্রিয়ার শৃঙ্খল, ঘটনা আর ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ায় ভিতরকার নানা সম্পর্ক– 'এ সবই লেখক দেখাতে চান, দেখাতে চান সম্পূর্ণতায়, অন্য কোন উদ্দেশ্যনিরপেক্ষভাবে।' (দেবেশ ২০০৬ : ৯৫)। উপন্যাসের দায় কিংবা অন্বিষ্ট প্রশ্নে শিল্প-কৈবল্য তত্ত্ব ও শিল্পের সামাজিক দায়ের তর্কে যেতে আগ্রহী নন দেবেশ; কারণ "তাতে সিদ্ধান্তে পৌঁছনো যাবে না।" (দেবেশ ২০০৬ : ৮৬)। উপন্যাসের অন্বিষ্ট নিয়ে তিনি লিখেছেন :

> উপন্যাসের অন্বিষ্ট সমাজ নয়, সময় নয়, ইতিহাসও নয়। উপন্যাসের অন্বিষ্ট ব্যক্তিমানুষ। এই সমাজ, সময় আর ইতিহাস ব্যক্তিমানুষের চরিত্র ও মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক জটিল করে দেয়। ফলে মানুষের সংজ্ঞা বারবারই নতুন করে খুঁজতে হয়। সমাজ, সময় আর ইতিহাসধৃত ব্যক্তিমানুষ হচ্ছে উপন্যাসের অন্বিষ্ট। (দেবেশ ২০০৬ : ৮৭)

সুতরাং ব্যক্তিমানুষের সম্পর্কিত সত্যই হয়ে দাঁড়ায় উপন্যাসের প্রধান বিষয়। আবার একদিকে ব্যক্তিমানুষ আর একদিকে সময়– এই দু'য়ের ভিতর সঙ্গতি আবিষ্কার করাই ঔপন্যাসিকের শিল্পগত সবচেয়ে জরুরি প্রশ্ন বলে মনে করেন দেবেশ; কারণ সময়-নিরপেক্ষ প্রেম-ঘৃণা-হতাশা-আশা যেমন ঔপন্যাসিকের অন্বিষ্ট নয়, ব্যক্তি-নিরপেক্ষ সময়ের দ্বিধাদ্বন্দ্ব-সত্যাসত্যও তেমনি ঔপন্যাসিকের লক্ষ্য নয়। এই সময়ান্বিত ব্যক্তিকে উপন্যাসে প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়াসের "কোনো বাঁধাধরা গৎ কোন কালেই নেই।" (দেবেশ ২০০৬ : ৮৭)। এ প্রসঙ্গে উপন্যাস সমালোচনার কাঙ্ক্ষিত আদর্শকেও ব্যাখ্যা করেন দেবেশ রায় :

> বলে দেয়া ভাল, উপন্যাস সমালোচনায় ঔপন্যাসিক সময় আর মানুষকে কোন মানদণ্ডে অন্বিত করেছেন তার খোঁজাখুঁজি নেহাতই নিরর্থক। খুঁজতে হবে লেখক কর্তৃক রচিত সময়ান্বিত ব্যক্তির জটিলতা, সেই জটিলতার বিষয়ে পাঠকের সমালোচনার পূর্বনির্দিষ্ট কোন ধারণা নয়। ... ঔপন্যাসিকের পক্ষে সময়ান্বিত মানুষের অন্বেষণ কোন সময়ই সরল ব্যাপার নয়। (দেবেশ ২০০৬ : ৮৮)

আন্তর্জাতিক ও দেশি বিভিন্ন উপন্যাস বিশ্লেষণ করে দেবেশ দেখান– ব্যাক্তির কাছে পৌঁছাতে ঔপন্যাসিকেরা কখনও সমকাল থেকে সরে যান, কখনও পুরাণের আশ্রয়ে কিংবা বিচিত্র পথে তার অনুসন্ধান করেন। অর্থাৎ সময়-অন্বিত ব্যক্তিকে খুঁজতে ও সময়ের দায়কে অবশ্যম্ভাবীরূপে গ্রহণ করতে 'একজন ঔপন্যাসিককে হাজারো পথ খুঁজতে হয়।' (দেবেশ, ২০০৬ : ৯০)।

Dhaka University Institutional Repository

উপন্যাসকে দেবেশ রায় মূলত গ্রহণ করেছেন এক বিরাট শিল্পকাজ বা সক্রিয়তা হিসেবে; তাঁর ধারণা– ইতিহাস, সমাজবিজ্ঞান বা তত্ত্ব-সংবলিত অনেক রচনাকে উপন্যাস তার শৈল্পিক প্রতিমানে পরিণত করে ফেলতে পারে। সুতরাং তাঁর কাছে এ এক বিরাট শিল্পক্রিয়া । সেইসাথে এক প্রামাণিক পৌরাণিকতাও– যে 'পুরাণ' বা গল্প অথবা গল্প লেখার তত্ত্বদেশ আগেই ঘটে আছে, ঔপন্যাসিক সেই পুরাণ বা গল্পে প্রবেশ করেন কপাটহীন দরজা বা অনিমেষ উন্মুক্ততা দিয়ে; তারপর তিনি তাঁর গল্পটা গড়ে তোলেন। দেবেশের মতে, 'আমাদের বেঁচে থাকার ভিতরেই সঞ্চারিত হয় নিয়ত পুরাণ।' (দেবেশ, ১৯৯১ : ৯২)। আর সে পুরাণ হতে পারে ইতিহাস কিংবা বাস্তবতা-আবৃত এক সামগ্রিকতা, যা থেকে গড়ে ওঠে মানবজীবন চারিত্র্য। আর মানবজীবনার্থে সমৃদ্ধ হওয়াই উপন্যাসের প্রধান গুণ, সেখানে সময়-ইতিহাসের সত্য ও মানব-হৃদয়ের সত্যের দ্বিবাচনিকতা সক্রিয় থাকে। দেবেশ রায় একজন গল্পকার-ঔপন্যাসিকের 'বাচন তৈরি হয়ে উঠার উৎসের কাছাকাছি কিছু বোঝাতে' ব্যবহার করেন 'তত্ত্ব' শব্দটি যা কোন 'ইডিয়োলজি' নয়। 'গল্প লেখার জন্য ইডিয়োলজি অনিবার্য নয়, বরং কখনো দুর্বহ ভার।' (দেবেশ ১৯৯১ : ১০৩)। গল্পকার-ঔপন্যাসিকের নিজেরই এক তত্ত্ব থাকে এবং সে তত্ত্বে পৌঁছানোর কোন পদ্ধতি নেই বলে মনে করেন দেবেশ। তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন, সমাজ, ইতিহাস, বিজ্ঞান ও শিল্পের নানা তত্ত্বের আলোকে গল্প উপন্যাসের তত্ত্ব খোঁজা হয়, কিন্তু সৃষ্টির পর গড়ে ওঠা তত্ত্বদেশ আর যে তত্ত্বদেশ থেকে উপন্যাসন ঘটে সেটা এক ব্যাপার নয়, পঠন-অভিজ্ঞতা থেকে সে তত্ত্বদেশের আভাস তৈরি করা যায় না– এমনটাই ভাবতে সাচ্ছন্দ্য বোধ করেন দেবেশ।

উপনিবেশায়ন ও বাংলা উপন্যাস : দেবেশ রায়ের আখ্যান-ভাবনা

উপন্যাস নামক শিল্প মাধ্যমের নিজস্ব ভাষা ও চিহ্নায়ন প্রকরণকে দেবেশ রায় তাঁর নান্দনিক ভাবনায় গুরুত্ব দিতে চেয়েছেন। বাচনিক শিল্প হিসেবে এর বিশ্বজনীনতার গুরুত্বকেও অস্বীকার করেননি তিনি। তবে এই বিশ্বজনীনতা তাত্ত্বিক অর্থে নয়, উপন্যাসের পরিসরের অর্থে। আধুনিক পাশ্চাত্য উপন্যাস তাত্ত্বিকদের (গিওর্গি লুকাচ, আয়ান ওয়াট, লুসিয়েন গোল্ডম্যান, ফ্রান্জ ফ্যানন, মিখাইল বাখতিন, এডওয়ার্ড সয়িদ প্রমুখ) মূল্যায়ন করেছেন তাঁর নিজস্ব উপন্যাসচিন্তাকে যাচাই করে নেবার

Dhaka University Institutional Repository

জন্যই। তাছাড়া উপন্যাস সংক্রান্ত প্রায় সকল তাত্ত্বিক ধারণাই তৈরি হয়েছে ইউরোপীয় অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বলে মনে করেন তিনি, এ প্রসঙ্গে বলেন :

> পৃথিবীর উপন্যাস-সাহিত্য বিচারের একমাত্র নিরিখ ইউরোপীয় নভেলতত্ত্ব। সে নভেলতত্ত্বে আবার বুর্জোয়া বিকাশের তত্ত্ববিদ আর মার্কসবাদী তত্ত্ববিদরা একমত। ইউরোপের বিভিন্ন ভাষায় কলোনিবিস্তারী ধনতন্ত্রের সঙ্গে জড়িত বিভিন্ন স্তরের মানুষের জীবন যেমন উপন্যাসের বিষয় হয়ে ওঠে, তেমনি উপনিবেশের বৃহত্তর পৃথিবীর নানা ভাষার নানা স্তরের উপনিবেশিত সমাজ ও নানা বিচিত্র পদ্ধতিতে শোষিত মানুষজনও উপন্যাসের বিষয় হতে পারে। ইউরোপীয় নভেলতত্ত্ব অনুযায়ী, তারা দু-জনই প্রোট্যাগনিস্ট বা হিরো বা নায়ক। এই দু-জনের একজন যে প্রভু ও আরেকজন যে তার প্রভুত্বের শিকার– এই বৈপরীত্যের কোনো স্বীকৃতি ইউরোপীয় নভেলতত্ত্বে নেই। (দেবেশ, ২০১৮ : ২১)

'ইউরোপীয় নভেলতত্ত্ব' নিয়ে দেবেশের এই ভাবনা কিছুটা একপাক্ষিক বলে মনে হয়, তবে এ মতের সত্যতাও রয়েছে। আখ্যানের পুরনো প্রকল্পকে (বিশেষত ঔপনিবেশিক) অনেকটা অস্বীকারের প্রয়োজনেও দেবেশ রায় উপন্যাসের শিল্পতত্ত্ব অন্বেষণ করেন। ভাষা বা চেতনার চলমান সংহিতা পুনর্বিবেচনা, প্রত্যাঘাত ও পুনর্বিশ্লেষণের তাগিদে তিনি উপন্যাসের 'নতুন ধরনের খোঁজ' করেছেন। উপন্যাস নামক জঁর-এর নান্দনিক অভিধা হিসেবে দেবেশ রায় সংস্কৃত 'আখ্যান' শব্দটিকেও ব্যবহৃত করেছেন[৮] এর কেন্দ্র ও পরিধির বিশালত্বকে অনুভব ও প্রতিষ্ঠিত করতে। আখ্যানের বৃহৎ সংজ্ঞায়নকল্পে দেবেশ রায় লিখেছেন :

> 'আখ্যান' শব্দটির অর্থ বিপরীতময়, সংঘর্ষসঙ্কুল, রহস্যাকীর্ণ– নামপরিচয়, সংজ্ঞাপরিচয়, ইতিহাস, গল্পকথা, পুরাণ (এবং বর্তমান)। (দেবেশ ১৯৯১ : ৯৪)

সাহিত্যের সামাজিক প্রত্যুত্তরযোগ্যতা সন্ধানের প্রশ্নেই কেবল নয়, ঔপনিবেশিক চিন্তাপ্রণালী থেকে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা ও সেই সাথে 'প্রাক্-কলোনি অতীতের সঙ্গে সংযোগ পুনরাবিষ্কার এবং পুনর্বিরহের (কারন পুনর্বিরহ ছাড়া অস্তিত্বের আধুনিক সংগতি পাওয়া যাবে না) প্রয়োজনে' উপন্যাসের তত্ত্ব সন্ধানের চেষ্টা করেছেন দেবেশ রায় । "তার এই সন্ধান তত্ত্বে ও প্রয়োগে প্রণালীবদ্ধ সন্ধান।" (তপোধীর ২০১৩ : ১০৮)। এ সূত্রেই দেবেশ রায় বাংলা উপন্যাসের ইতিহাস বিশ্লেষণ করেছেন সেই সাথে উপনিবেশায়িত আরো দেশ-মহাদেশের (বিশেষত আফ্রিকা) উপন্যাস-কর্মের আলোচনা

Dhaka University Institutional Repository

করেছেন। আমাদের নিজস্ব উপন্যাস তত্ত্ব না থাকাকে উপন্যাসের বর্তমান সংকট হিসেবে তিনি চিহ্নিত করেছেন তিনি।

'ইয়োরোপ তত্ত্ব করে ও সেই আলোকে আমরা লিখি'– এই আত্মসন্তুষ্টির বোধ থাকলে উপন্যাসের ওপর কোনো কর্তৃত্ব থাকবেনা বলে মনে করেন তিনি; তাই "যে দেশগুলি আগে ইউরোপের বিভিন্ন দেশের উপনিবেশ বা কলোনি ছিল, সেই দেশগুলিকে তাঁদের উপন্যাসের জন্য নতুন তত্ত্ব রচনা করতে হবে। সেই নতুন তত্ত্ব ভাবা ও তৈরি করে তোলাও একটা নিরবধি লড়াই।" (দেবেশ ২০১৮ : ২৭)। এই গল্পের তত্ত্ব উদ্‌ঘাটন করার দায় আমাদের প্রাক্তন উপনিবেশের গল্পকার ঔপন্যাসিকদের। দেবেশের মতে, "সে দায়িত্ব কোন ঐতিহাসিক বা সমাজবিজ্ঞানীও নিতে পারেন, কিন্তু গল্পকার ঔপন্যাসিকদের পক্ষে সেই দায়িত্ব অনিবার্য। সেই স্বাদেশিক ও স্বাভাবিক তত্ত্বভূমি ছাড়া স্বাদেশিক ও স্বাভাবিক উপন্যাসের ভূমিকা তৈরি হবে না।" (দেবেশ, ২০১৮ : ২৯)।

উপন্যাস নিয়ে (১৯৯১) *উপন্যাসের নতুন ধরনের খোঁজে* (১৯৯৪), *উপন্যাসের বিবিধ সংকট* (২০১৮) প্রভৃতি গ্রন্থে এবং অনেক রচনাতেই দেবেশ রায় আধুনিক বাংলা উপন্যাসের জন্ম ও উপনিবেশের ইতিহাসকে সমান্তরালে পাঠ করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন, আমাদের উপন্যাস পাঠ আর উপন্যাস নির্মাণে কী করে হস্তক্ষেপ করেছে উপনিবেশবাদের ইতিহাস। পাশ্চাত্য উপন্যাসের স্থিরীকৃত ফর্মে উনিশ শতকের অধিকাংশ ঔপন্যাসিক উপন্যাস রচনা করেছেন বলে দেবেশ রায় মত দিয়েছেন। বাংলা উপন্যাসের আধুনিকতার চারিত্র্য বিশ্লেষণ করতে গিয়ে আমাদের 'আধুনিকতা' (যা মূলত 'এনলাইটেনমেন্ট-দীপিত আধুনিকতা') বৈশিষ্ট্যটি কখন থেকে শুরু হল তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন দেবেশ, তবে এক্ষেত্রে কোনো ঔপন্যাসিকের ব্যক্তিগত সিদ্ধিকে তিনি এর সাথে মেলান নি। উপন্যাসের ফর্ম বাংলা উপন্যাস তার জন্মকালে ইউরোপীয় নন্দনতত্ত্ব থেকেই পেয়েছে বলে মনে করেন দেবেশ। সংজ্ঞা সম্পর্কে পূর্বজ্ঞান বা স্থির ধারণা না থাকলে উপন্যাস বা গল্প– যাকে আমরা গদ্যকাহিনী বা কথাসাহিত্য বলি, তার বিকাশের প্রক্রিয়াটি হয়ে ওঠে অভাবিত ও অনিশ্চিত অথচ তার চরিত্র বা সংজ্ঞা তারই মধ্যে এক ধরণের স্পষ্টতা পেতে থাকে। এ প্রসঙ্গে দেবেশ লিখেছেন :

> বঙ্কিমচন্দ্র উপন্যাসের বা কাহিনীগদ্যের যে-ধরণটি, যে ফর্মটি প্রতিষ্ঠিত করলেন তার ভিতর কোনো অনিশ্চয়তা ছিল না, কোনো দ্বিধা বা সংকোচ ছিল না। কারণ তাঁর কাছে ইয়োরোপীয় উপন্যাসের মডেলটিই ছিল একমাত্র মডেল। ... বঙ্কিমচন্দ্র যাকে উপন্যাস মনে করতেন সেই

Dhaka University Institutional Repository

> ধরণটিই বাংলা উপন্যাসের একমাত্র ধরণ হিসেবে গত প্রায় সোয়া শ বছর চর্চিত হয়ে আসছে; মাঝখানে হয়তো কিছু ব্যতিক্রমসহই। বাংলায় উপন্যাস-সাহিত্যের প্রধান সঞ্চয় তারই ফল। (দেবেশ, ২০০৩ : ২২)

বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর *দুর্গেশনন্দিনী* লিখে পেলেন 'বাংলার স্কট' অভিধা; বাংলায় ব্রিটিশ-সাহিত্যরুচির ছাঁচ এবং 'নভেলে'র প্রচ্ছায়া এভাবেই শুরু হয়েছিল, দেবেশের মতে : "ইংরেজি উপন্যাসের একটি বাঁধাছক আমাদের উপন্যাসের বাঁধাছক হয়ে উঠল এবং আজও পর্যন্ত তাই-ই একমাত্র ছক।" (দেবেশ, ১৯৯১ : ৩১)। ঊনিশ শতকের উপন্যাস রচনার প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়েই *আলালের ঘরের দুলাল* বা *হুতোম প্যাঁচার নকশা*-র দৈনন্দিন জীবন ও ভাষা এবং "যে জীবন আমরা যাপন করছি সেই জীবন সম্পর্কে কৌতুক মেশানো মানবিকবোধ ও উপন্যাসের এক নতুন দেশীয় বিবরণই উপন্যাসের পক্ষে অপ্রাসঙ্গিক হয়ে গেল তাই নয়– আমাদের মঙ্গলকাব্যগুলিতে, চৈতন্যজীবনীতে ও চৈতন্যের পরবর্তী পালাগানে কাহিনী বলার যে একটি বা নানা ধরণ তৈরি ছিল, তার সঙ্গে বাংলা উপন্যাসের ফর্মের বিচ্ছিন্নতা ঘটে গেল।" (দেবেশ, ১৯৯১ : ২৫)। দেবেশ এই সূত্রে আমাদের প্রাক্-উপন্যাস পর্বের কাহিনীগদ্যের আধার যেমন– ব্রতকথা, পাঁচালি, কথকতা, কীর্তন, পালাগান, মঙ্গলকাব্য প্রভৃতির গঠন-বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করেছেন। এই সাহিত্য-রূপগুলোরও একটা বাঁধাছক ছিল; কিন্তু বাঁধাধরা চেহারা সত্ত্বেও কাহিনী ও চরিত্রের ভেতর ঘটে যেতে পারত নতুন অভিঘাত, ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া এবং কাহিনীর 'স্টেরিওটাইপকে' ফর্ম হিসেবে ব্যবহার করেও কবি কী করে কাহিনীটি সম্পর্কে তাঁর নিজস্ব বিবরণ দিতে সক্ষম হতেন– দেবেশ তা পর্যালোচনা করে দেখিয়েছেন; তিনি লিখেছেন :

> ব্রতকথা, পাঁচালি, কথকতা, কীর্তনে আমাদের একটা কাহিনীর ধরণ তো ছিল। এগুলোর ছক ছিল বাঁধাছক, কিন্তু প্রত্যেকবার প্রত্যেক ব্রতকথা বা পাঁচালিকার কথকঠাকুর বা কীর্তিনিয়ায় বলার সঙ্গে সঙ্গে এই কাহিনীগুলি অদ্ভুতভাবে বদলে যেত। এই কাহিনী ভিন্ন কথকের গলায়-ভাষায় ভিন্ন ভিন্ন কাহিনী হয়ে যেত। ... এরই ভিতর, সেই অপরিবর্তনীয় ছাঁচের ভিতর কথক তাঁর নিজের কাহিনীটা ঢুকিয়ে দিতে থাকেন, দেবদেবীদের নিয়ে রঙ্গরসিকতা করতে থাকেন, প্রায় কেচ্ছা শোনানোর ভঙ্গিতে শিব বা কৃষ্ণের নানা কাহিনী শোনাতে থাকেন, আর সেই প্রক্রিয়াতে ঐ কাহিনীর অপরিবর্তনীয় ছাঁচের ভিতর সমকালীনতা সঞ্চারিত হয়ে যায়। ঐ একই অপরিবর্তনীয় কাহিনীর অর্থের একটা স্তর তৈরি হয়। (দেবেশ, ২০০৬ : ১৬)

Dhaka University Institutional Repository

তিনি আরও মনে করেন যে, এই মৌখিক কাহিনীর ধারা ইংরেজ আক্রমণের প্রভাব এড়িয়ে যেতে পেরেছিল বা এড়িয়ে থাকতে পেরেছিল। কিন্তু, 'গত শতকের মাঝামাঝি যখন ডিরোজিয়ানরা বাঙালি ভারতীয় সংস্কৃতির দায়িত্ব নিতে এগিয়ে আসেন, তখনই এই সমস্ত দেশি আঙ্গিক অব্যবহারে নষ্ট হয়ে যেতে শুরু করে।' (দেবেশ, ২০০৬ : ১৭)। দেবেশ রায়ের মতে, কেবল কাহিনীগদ্যের বর্ণনার ধরন নয়, আমাদের ভাষাও ঔপনিবেশিক কালে দৈনন্দিন-ঊর্ধ্ব এক কল্পনার উপজীব্য আধার হয়ে উঠেছিল। "বাংলা ভাষার অপরিণত সেই স্তরে ঔপন্যাসিকদের কাছে উপন্যাসের ফর্ম হিসেবে দায় ছিল দৈনিক প্রয়োজনের বাইরে, বা ওপরে, আবেগ বা মননের চাপকে ধারণ করায়। উপন্যাস শব্দাশ্রয়ী শিল্প। ভাষাকে তাই এমন দায়ের কাছে নিয়ে আসাই ছিল সে যুগের ঔপন্যাসিকের স্বনির্ধারিত কর্তব্য।" (দেবেশ, ১৯৯৪ : ১০২)। আর পরাধীন দেশে তৈরি গদ্যভাষা তখনও ভাষা হিসেবে স্বীকৃত হতে পারেনি; ফলে ভাষার ব্যবহার-যোগ্যতার পরীক্ষা ছিল অনিবার্য। "বাংলা সাহিত্যের প্রথম যুগের ঔপন্যাসিকদের সেই পরীক্ষাই করতে হচ্ছিল। আর তারই ফলে উপন্যাসের ভাষা তৈরি হয়ে উঠেছিল।" (দেবেশ, ২০০৬ : ১০২)।

মিখাইল বাখতিন প্রাচীন ইয়োরোপীয় সাহিত্য থেকে উদাহরণ নিয়ে প্রমাণ করেছেন কীভাবে মহাকাব্য আর ট্রাজেডির পাশাপাশি বা পরম্পরায় লোকায়ত বা লোকজীবনের আখ্যান, প্যারোডি বা ব্যঙ্গ বিবরণের এক এমন আধার হয়ে ছড়িয়ে থাকে, যাকে তিনি বলতে চেয়েছেন 'নভেলের বিবরণের প্রাগিতিহাস।' দেবেশ রায়ও বাখতিনকে অনুসরণ করে প্রাচীন আখ্যান-সাহিত্যের অন্তর্নিহিত ঔপন্যাসিক বিবরণকে চিহ্নিত করতে চান, কৃত্তিবাসের রামায়ণ থেকে উদাহরণ টেনে তিনি দেখাতে চেয়েছেন পুরাণের শাস্ত্রীয় গঠন সেখানে কীভাবে বারবার ভেঙে যেতে চায় লোকায়তের প্রবল কৌতুকে। মঙ্গলকাব্যগুলোতেও প্যারোডি-প্রহসনগুলো আখ্যানের ভেতর এক প্রবহমানতা রক্ষা করে যেত। কিন্তু আখ্যানকাব্যের মূল কাহিনীর নেপথ্যে এক বিচিত্র ও ভিন্ন অভিজ্ঞতা তার সাহিত্যরূপ তখনও পায়নি; এমনকি নান্দনিক সাহিত্যরূপ তখনও রচয়িতাদের জানাও ছিল না তখন। "একই সমাজের বহুস্তরের বাস্তবতাকে কখনও আভাসে, কখনো স্পষ্টতায়, কখনো ইঙ্গিতে, কখনো সংলাপে, কখনো বিবরণে স্পষ্ট করে তুলতেই উপন্যাসের বিশেষ ফর্মের প্রয়োজন হয়েছিল। উপন্যাস কখনো এক স্তরের গঠন নিয়ে সম্পূর্ণ হয়না, উপন্যাসে মূল ঘটনা শুধু মূল ঘটনায় আটকে থাকতে পারেনা। (দেবেশ, ২০০৬ : ৫২)। দেবেশ রায় বিশ্লেষণ করে দেখান যে আধুনিক-পূর্ব আখ্যানে আপাত

Dhaka University Institutional Repository

অবান্তর ও অপ্রাসঙ্গিক প্যারোডি-প্রহসনের মধ্যে বহু ফর্ম; বহু রচনারীতি; বহু মানুষের প্রাণবান কণ্ঠস্বরের অংশগ্রহণ ও সম্মিলন ছিল অনায়াস ও নির্দ্বিধ। তিনি বলেন : "বস্তুত, আধুনিকপূর্ব আখ্যানসাহিত্যের এই প্যারডি প্রহসনেই (যেহেতু তা লোকায়ত) উপন্যাসের জমি তৈরি হয়েছিল– উপন্যাস বহু রীতি, বহু স্বর, বহু আখ্যানের সাহিত্যরূপ। কিন্তু এগুলো মিলে তখনো উপন্যাস হয়ে ওঠা সম্ভব ছিল না।" (দেবেশ, ২০০৬ : ৫২)। আধুনিকতার সন্ধিক্ষণে ভারতচন্দ্রের *অন্নদামঙ্গল*-এ এই চিহ্ন দেখা গিয়েছিল বলে মনে করেন দেবেশ রায়, "আখ্যানসাহিত্যের এই বাচন, এই প্যারডি প্রহসনের উপকরণ অন্য এক শিল্পকর্মের ভিতর সমাবিষ্ট হচ্ছে।" (দেবেশ, ২০০৬ : ৫২)। আবার ভারতচন্দ্রের *অন্নদামঙ্গল* রচনার প্রায় সমকালে ইংরেজ ভারতবর্ষ দখল করেছে আর "একশ বছর পরে বঙ্কিমচন্দ্র ইংরেজদের উপন্যাসের একটি ধরণে বাংলা উপন্যাস রচনার মডেল পেয়ে গেলেন।" (দেবেশ, ২০০৬ : ৫৩)। এবং সেই সাথে কাহিনী বিষয়ের কতগুলো ইংরেজি পরিভাষাও সৃষ্টি হল– রোমান্স, রোমান্টিক, ঐতিহাসিক, বাস্তবতাবাদ ইত্যাদি। গদ্যসাহিত্য বা কাহিনীগদ্যের পরম্পরা নির্ণয়ে দেবেশ রায়ের এই ইতিহাস-দৃষ্টিতে একদেশদর্শিতা আছে; কিন্তু এ কথা স্পষ্ট যে, বাংলা উপন্যাসের 'আধুনিক' পর্বের ইতিহাস-বিবরণে তাঁর প্রধান অনুযোগ মূলত উপমহাদেশে ইংরেজ উপনিবেশায়ন ও তার প্রভাবে বাংলা উপন্যাসের স্থিরীকৃত ফর্ম বা 'মডেলিং' সংক্রান্ত, কখনই উপন্যাসের বিষয়বস্তু কিংবা ঔপন্যাসিকের সক্ষমতা ও সিদ্ধি নিয়ে নয়। কারণ উপনিবেশায়িত সেই ইতিহাস পর্বে শিল্প-সাহিত্য রচনার ক্ষেত্রে ইংরেজ শেখানো 'মডেল-এ' সৃষ্টির পথ আকীর্ণ হলেও দেবেশ একথাও অনুভব করেন যে, "প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সাম্রাজ্যের লক্ষ্য হওয়া সত্ত্বেও, আমাদের হাজার-হাজার বছরের ইতিহাসের ভিতর সাম্রাজ্যবাদের কার্যকারণ ঢুকে যাওয়া সত্ত্বেও আমাদের ভাষাগুলি আমাদের ভাষাই থাকতে পেরেছে ও সেই ভাষায় যে-সাহিত্য লেখা হয়েছে, তা আমাদের ভাষায় সাহিত্য হয়েছে। সেখান থেকে এক নতুন আরম্ভ আমরা চিনে নিতে পারি।" (দেবেশ, ২০০৬ : ১৭)। এছাড়া দেবেশ আরও মনে করেন যে আমাদের দেশেও আমাদের ভাষায় ও ঔপনিবেশিক প্রভুদের ভাষায় জাতীয় সংস্কৃতির ঐতিহ্য পুনঃপ্রতিষ্ঠায় সাহিত্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ভূমিকা নিয়েছে। সাহিত্য, স্থানীয় ইতিহাস, ভূগোল ও জনজীবন কল্পনা করতে ও তাকে আকার দিতে সাহায্য করেছে। আবার এ প্রসঙ্গে কলোনি ও পোস্ট-কলোনি ধারণা আক্রান্ত উপন্যাসতাত্ত্বিকদের কথাও দেবেশ স্মরণ করেন।

Dhaka University Institutional Repository

কাহিনী বলার ধরন নিয়ে ঔপন্যাসিকের শিল্প-সংকটের অনুভব থেকেই দেবেশের বাংলা উপন্যাস-জিজ্ঞাসার আরম্ভ। প্রাক্-উপন্যাস পর্বের তথা মধ্যযুগের কাহিনীগদ্যের উদাহরণ আনলেও দেবেশ জানেন যে চাইলেই এখন মঙ্গলকাব্য বা কথকতা লেখা যায় না। কারণ "মঙ্গলকাব্য আর কথকতার সঙ্গে আধুনিক সব সংযোগ ছিন্ন হয়ে গেছে।" (দেবেশ, ২০০৬ : ২১)। তাই বাংলা উপন্যাসে ধারাবাহিকতা বিচারে (মূলত ফর্মের বা মডেলের বিচারে) একজন কথক বা লেখক হিসেবে ঔপন্যাসিকের অভিজ্ঞতা ও তার প্রকাশে বাংলা ঔপন্যাসিকের শিল্প-সফলতাও চিহ্নিত করতে চেষ্টা করেছেন দেবেশ। ঔপনিবেশিক সমাজের অজস্র, অনিবার্য স্ববিরোধিতা ও অসম্পূর্ণতা সত্ত্বেও বাংলা উপন্যাসের নিজস্ব আদল ক্রমেই রূপান্তরিত হয়েছে। সাম্রাজ্যবিস্তার আর সাম্রাজ্য প্রতিরোধের জন্য সচেতন সমাবেশের মাঝখানে একটা সময় জুড়ে বিচ্ছিন্নভাবে ব্যক্তিই হয়ে ওঠে সাম্রাজ্যের বিপরীত কোটি। বঙ্কিমচন্দ্রের রচনাসমগ্রের নিবিড় পাঠে দেবেশ জানান যে, নিজস্ব আখ্যানভঙ্গি কিংবা "ঔপন্যাসিকের দায় সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্র জাগরূক ছিলেন ও তাঁর উপন্যাসগুলির মধ্যে নিজের ফর্ম সন্ধানের এক নিরন্তর আত্মপ্রতিবাদী যাত্রার চিহ্ন আছে।" (দেবেশ, ১৯৯১ : ৭৭)। বঙ্কিমের *কৃষ্ণচরিত্র* ও 'দেবতত্ত্ব ও হিন্দুধর্ম' রচনা থেকে বঙ্কিমের আখ্যান-ভাবনার আভাস পর্যালোচনা করেন দেবেশ। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস কিংবা রবীন্দ্রনাথের *গল্পগুচ্ছ*-র পরিধিকে শনাক্ত করেন সাম্রাজ্য-আখ্যানের কেন্দ্র-বিপরীত এক বিস্তার হিসেবে; এ প্রসঙ্গে লেখেন :

> পরিধিকে বেশিরভাগ সময়ই অনতিস্পষ্ট কেন্দ্রে বিপরীতে বিন্যস্ত করে কাহিনীকে উপন্যাসের অতিরিক্ত এবং গোপন আখ্যানে সম্পাদিত করে তোলা বাংলা গল্প-উপন্যাসের একটি স্থায়ী প্রকৃতিগুণ হয়ে উঠেছে। রবীন্দ্রনাথের *গল্পগুচ্ছ*-র গল্পগুলিতে সাম্রাজ্যের কেন্দ্রের নেপথ্য পরিধিতে যে-জীবন, কখনো কেন্দ্রস্পৃষ্ট, কখনো কেন্দ্রনিরপেক্ষ, তার আখ্যান তৈরি করেন। (দেবেশ, ১৯৯১ : ৭৯)

রবীন্দ্রনাথ তাঁর নান্দনিক সংগঠনে, কাহিনীগদ্যের ভিন্নতর রূপান্তর ঘটিয়েছেন, *গল্পগুচ্ছ* এর বড় প্রমাণ। বঙ্কিমের *রাজসিংহ* ও সমকালীন কিছু উপন্যাস ও কাহিনীর আলোচনায় রবীন্দ্রনাথ তাঁর উপন্যাস-চিন্তার প্রকাশ ঘটিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের (১৮৬০-১৯০৮) *ফুলজানি* সমালোচনারও (*আধুনিক সাহিত্য* গ্রন্থভুক্ত) আগে তাঁর প্রথম উপন্যাস *শক্তিকানন* (১৮৭৭) সম্পর্কে লিখিত রবীন্দ্রনাথের একটি চিঠি উদ্ধৃত করেন দেবেশ রায়, যাতে "তিনি কাহিনীগদ্যের এক বিকল্প

Dhaka University Institutional Repository

ধরনের প্রত্যাশা জানিয়েছেন।" (দেবেশ, ১৯৯১ : ১৭৩)। ১৮৮৭ সালে এ চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন :

> ওর মধ্যে কোনো মডেলি মিথ্যা ছায়া নেই ... আপনি কোন রকম ঐতিহাসিক ঔপদেশিক বিড়ম্বনায় যাবেন না– সরল মানবহৃদয়ের মধ্যে যে গভীরতা আছে– এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সুখদুঃখপূর্ণ মানবের দৈনন্দিন জীবনের নিরানন্দময় ইতিহাস তাই আপনি দেখাবেন। (উদ্ধৃত, দেবেশ, ১৯৯১ : ১৭৪)

কেবল ফর্মের অনুকরণই নয়, দেবেশ নিজ সমাজ-সময়-ইতিহাসের দ্বান্দ্বিকতা ও সংকটকে ভিন্ন দেশীয় সংকট, দ্বান্দ্বিকতা কিংবা শিল্পতত্ত্বের সাথে সমতুলনারও বিপক্ষে, কেননা তাতে নিজ সমাজের সংকট ও দ্বন্দ্ব হারিয়ে যায়। *গল্পগুচ্ছ*-র দেশ-কাল-মানুষ, *গোরা*-র স্বাদেশিকতার বোধ, *ঘরে বাইরে*-র জাতীয় মুক্তির প্রক্রিয়া তাই দেবেশের কাছে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। এভাবে, 'সাম্রাজ্য-আখ্যানের অগোচর এক আখ্যানে (যা গল্প-উপন্যাস-নাটকে কিংবা লেখকের অন্তর্লীন সচেতনতায়) পৌঁছাতে' (দেবেশ, ১৯৯১ : ৮১) দেবেশ রায় বিভিন্ন পর্বের বাংলা উপন্যাসের ধরণ নিরূপণ করেন। মানিক, বিভূতিভূষণ ও তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের– যথাক্রমে *পুতুলনাচের ইতিকথা*, *পদ্মানদীর মাঝি*, *পথের পাঁচালী*, *গণদেবতা-পঞ্চগ্রাম* এবং বিভূতিভূষণের কয়েকটি ছোটগল্পের আখ্যানভাগ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন তিনি। শৈলজানন্দের আখ্যানরীতি ও ভাষা, সতীনাথ, অদ্বৈত মল্লবর্মণ , জগদীশ গুপ্তের নির্মাণশৈলীর প্রশংসা করেন তিনি। বিভূতিভূষণ সম্পর্কে তাঁর মত :

> যে-সাম্রাজ্য-আখ্যান-বহির্ভূত, অন্তরালের এক গহন আখ্যানের ইঙ্গিত আমরা গল্প-উপন্যাসে খুঁজছিলাম, *পথের পাঁচালী*-তে ও বিভূতিভূষণেরই কিছু ছোটগল্পে সেই আখ্যান এখন সবচেয়ে স্পষ্ট অক্ষরে পড়ে নেয়া যায়। যেন তাঁর ছাপা লাইনগুলির ভিতর থেকে জলছবির মত নির্মলতায়, রাতের আকাশের মত আভায়, এই আখ্যান নিজেকে মেলে ধরছে– অবশ্যই যদি আমাদের সেই আখ্যান পড়ে নেয়ার মত বর্ণপরিচয় থাকে। (দেবেশ, ১৯৯১ : ৮১)

তিন বন্দোপ্যাধ্যায়ের শিল্পকর্ম আলোচনা প্রসঙ্গেই দেবেশ রায় দেশ-ভাগ মুহূর্তের বা পরবর্তী গল্প-উপন্যাসের প্রসঙ্গটি উত্থাপন করেন। সতীনাথ ভাদুড়ী সৃষ্টিমান লেখক হিসেবে তখন প্রতিষ্ঠিত। দেবেশের মতে, বিশ বা তিরিশের দশকের আধুনিকতার ধারণা নিয়ে বা ৪৭' সালের কিছু আগে যারা নিজেদের মত গল্প-উপন্যাস লিখেছেন তারা কেউই "দেশভাগ-স্বাধীনতাকে একটা পরিণতিবিন্দু বা

Dhaka University Institutional Repository

আরম্ভবিন্দু হিসেবে আবিষ্কার করেননি; দেশভাগের মত ঘটনার যে অচিন্ত্যপূর্বতা, লক্ষ লক্ষ মানুষের যে-উদ্বাসন, পশ্চিমবঙ্গের জনবিন্যাসে সে যে অভাবিত আলোড়ন সেই আঁকাড়া বাস্তবকে গল্প-ঔপন্যাসিকের দাপটে আঁকড়ে ধরলেননা।" (দেবেশ, ১৯৯১ : ৮৫)। দেশভাগ-সংক্রান্ত কিছু গল্প-উপন্যাসে কথা (নরেন্দ্রনাথ মিত্র, অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়, অসীম রায়ের রচনা) দেবেশ অস্বীকার করেন নি যদিও; তাঁর বিবেচনা হল : 'যে অভিজ্ঞতা যুদ্ধ-দুর্ভিক্ষ-দাঙ্গা-রাজনৈতিক আন্দোলন প্রভৃতি বৃহৎ ঘটনাগুলোকে জিজ্ঞাসালব্ধ কাতরতায় গল্প উপন্যাসের আধেয়-কল্পনার মৌলিক বদল ঘটিয়েছিল, দেশভাগ-স্বাধীনতায় তা ঘটল না।' (দেবেশ, ১৯৯১ : ৮৫)।

দেশ-ভাগ পরবর্তী সময় থেকে নব্বই দশক পর্যন্ত গল্পকার ঔপন্যাসিকের বিভিন্ন রচনা বিবেচনায় এনেছেন দেবেশ। উপন্যাসসমূহে সময়ের প্রবহমানতা নির্দেশের একটা চেষ্টাও করেছেন তিনি, তাঁর এ ইতিহাস জিজ্ঞাসার শিরোনাম– 'পুরাণ থেকে পুরাণ', যেখানে বিশেষত দেশভাগ-স্বাধীনতার আখ্যানের বহুবাচনকে ইতিহাসের সূত্রে অন্বেষণ করা হয়েছে। সে অন্বেষণের একটা রেখাচিত্রও তিনি নির্দেশ করেন :

> ৪৬' থেকে ৪৮'-এ দেশ-ভাগ-স্বাধীনতাকে এক মহত্তর পুরাণে সংলগ্ন করার চেষ্টা ছিল। ৪৭' থেকে ৫০-৫২' পর্যন্ত দেশ ভাগ-স্বাধীনতার অর্থ বুঝে নেয়ার পর্ব গেছে। ৫০-৫২' থেকে বা তার একটু আগেই উদ্বাসনযাত্রা, জীবিকা খোঁজাখুঁজি, পশ্চিমবঙ্গে রিফিউজি কলোনি তৈরি। তারপরও দাঙ্গা সত্ত্বেও বাংলাদেশ। তারপর আবার এক পুরাণ খোঁজার পালা। (দেবেশ, ১৯৯১ : ৯৪)

দেবেশের মতে, দেশভাগ-স্বাধীনতা থেকে আমাদের এই যাত্রা এমনই মহাকাব্যিক যে তা নিয়ে যা লেখা হয় তাতেই মহাকাব্যের ছোঁয়া লেগে যায়। আখ্যান শব্দটির যে অর্থ তিনি গ্রহণ করেছেন, প্রবন্ধের শেষে সেই শব্দটির অনুভবময় পুনরাবৃত্তি ঘটান– "আখ্যান শব্দটির অর্থ বিপরীতময়, সংঘর্ষসঙ্কুল, রহস্যাকীর্ণ– নামপরিচয়, সংজ্ঞাপরিচয়, ইতিহাস, গল্পকথা, পুরাণ। ... আমাদের যে-জীবনের কথা এই গল্পগুলিতে ছড়িয়ে আছে, তার ভিতর দিয়ে এই আখ্যানই তো রচিত হয়েছে। এ-আখ্যান বাঙালি-ভারতীয়ের সেই নিজেকে খোঁজার আখ্যান– একই সঙ্গে সংজ্ঞা ও কল্পনা, ইতিহাস ও উপন্যাস, পুরাণ ও বর্তমান' (দেবেশ, ১৯৯১ : ৯৪)। বাংলা উপন্যাসের জন্মকাল তথা অতীত অনুসন্ধানের এই যাত্রায় দেবেশ রায় উপন্যাসের ইতিহাসের একটা সংক্ষিপ্ত রেখাচিত্র তৈরি করেছেন; এক্ষেত্রে ইংরেজ উপনিবেশায়ন ও সংস্কৃতির অভিঘাতকে প্রধান পরিপ্রেক্ষিত হিসেবে বিবেচনা

Dhaka University Institutional Repository

করেছেন। আর এ সূত্রেই বিশ্বের উপনিবেশকবলিত বহু দেশ-মহাদেশের, তাদের লুপ্ত গল্প-উপন্যাস ও উপনিবেশিত মানুষের দ্বারা সৃষ্ট শিল্প-সাহিত্যের প্রসঙ্গটিও এনেছেন, যা মূলত সাম্রাজ্যবাদীর ভাষায় নির্মিত বলে মনে করেন দেবেশ। তাঁর মতে আখ্যান (ইতিহাস অর্থে) আসলে একটাই– সভ্যতা, সাম্রাজ্য-বিস্তার, উপনিবেশায়ন ও শোষকদের নির্মিত সভ্যতার মহত্তরতায় বিশ্বাস স্থাপন। সেইসাথে সাম্রাজ্যবিস্তারের নতুনত্বের (মনোজাগতিক, অর্থনৈতিক) দায়িত্ব ও সেই দায়িত্ব সম্পর্কে উপনিবেশিতের আস্থা নির্মাণ করা– আর এই সবটাই ক্রমে হয়ে উঠেছে আখ্যানের সৃষ্টি ও ইতিহাসের অন্তর্গত। উপন্যাস পাঠ কিংবা নির্মাণ দুইয়ের ভেতরেই তত্ত্বের নানা অভিঘাত সাধারণত জটিলতার সৃষ্টি করে; যদিও মানুষের জীবনযাপন সংক্রান্ত তত্ত্বের ছায়া গল্প-উপন্যাসের প্রয়োজনীয় বৈষয়িক সংগঠনকে প্রভাবিত করেই ফেলে। উপন্যাস নামক শিল্পকর্মকে দেবেশ 'নিঃসঙ্কোচ আত্মতৃপ্তি ও নিঃসংকট যুক্তিকাঠামোয় বেঁধে ফেলার বিরুদ্ধে একটা জায়গা খুঁজতে চান।' (দেবেশ, ২০১৮ : ৩৭)।

উপনিবেশের সংকীর্ণতর সমাজ-পরিবারের, জীবনের উপন্যাসনে দেড়শ বছর ধরে– *হুতোম পেঁচার নকশা* থেকে– আমাদের অনেক লেখকের ঔপন্যাসিক কল্পনার জোর ও ঔপন্যাসিক পরিকল্পনার সূক্ষ্মতাকে দেবেশ 'প্রবল ও বিচিত্ররূপে সক্রিয়' (দেবেশ, ১৯৯১ : ৪১) বলে চিহ্নিত করেছেন। বাংলা উপন্যাস বা এর ইতিহাসচর্চায় উপন্যাসের গঠন-ঐতিহ্যকেই গুরুত্ব দিতে চান দেবেশ, সেই সাথে এর আকার-সংকটকেও, এই সংকট শব্দের অর্থ ও ব্যবহার তিনি করেছেন ভিন্ন অর্থে। তাঁর কাছে সংকট হল– 'একটি বিশেষ ধরণের স্থানিক পরিস্থিতি যা উৎরোতেও বিশেষ বিশেষ ধরণের কুশলতা ও ক্ষমতা আয়ত্ত করতে হয়।' (দেবেশ, ২০১৮ : ৪৯)। অর্থাৎ এটা এক পথ পরিক্রমার মত। বাংলা উপন্যাস ইতিহাস-ভাবনা ও এ সম্পর্কিত চিন্তার সূত্রটি দেবেশ জানিয়ে দেন :

> বাংলা ভাষায় উপন্যাস লেখার ইতিহাস ১৫০ বছরের কিছু বেশি। সেই সময়ের মধ্যে বাংলা উপন্যাস এমন কিছু লেখা হয়েছে যা বিশ্বসাহিত্যের অন্তর্গত হতে পারে নিজের সম্পদে। উপন্যাসের কিছু কিছু বিশিষ্ট ধরণ ইয়োরোপে চর্চিত হওয়ার আগেই বাংলায় লেখা হয়ে গেছে। আবার, একই সঙ্গে, কলোনির ভাষা ও সাহিত্য হিসেবে পশ্চিমি মডেল আমাদের উপন্যাস-সাহিত্যের ভিত ধ্বসিয়ে দিয়েছে অনেকবারই, যদিও সে ধ্বসের জায়গায় নতুন ভিত তৈরি হয়ে উঠেছে। বাংলা ভাষার একজন উপন্যাস লেখক হিশেবে বাংলা উপন্যাসের ইতিহাস আমাকে গৌরব করার মত উত্তরাধিকার দিয়েছে। যেকোনো লেখককেই তার উত্তরাধিকার তৈরি করে নিতে

Dhaka University Institutional Repository

> হয়। সেই ওতপ্রোত দায় থেকেই আমি বুঝতে চাই, বাংলা উপন্যাসের আকার সংকট বিশ্ব উপন্যাসের আকার-সংকটেরই (যেহেতু উপন্যাসের কোনো সংকটহীন আকার সম্ভব নয়) অন্তর্গত। এ সংকটের অর্থ ফর্মের দুরূহতা। সেই অর্থেই আমরা খুঁজছি উপন্যাসের মত আকারের অনিবার্য সংকটগুলি বাংলা উপন্যাসে– দুই বাংলাতেই– কী কী প্রক্রিয়ায় উপন্যাসে রচনারই প্রতিক্রিয়া হয়ে উঠেছে। এটা উপন্যাসের শিল্পপ্রকরণকে আধুনিক সংকটের সঙ্গে যুক্ত করার প্রক্রিয়া। (দেবেশ, ২০১৮ : ৪৮)

উপন্যাসের আকার বা ফর্মের অতিনির্দিষ্ট সংজ্ঞার্থ নির্ধারণ করা দেবেশ রায়ের লক্ষ্য নয়– বরং বাস্তব অভিজ্ঞতা যে প্রক্রিয়ায় শিল্পিত হয়ে ওঠে, সেই প্রক্রিয়াটিই সেই উপন্যাসের আকার বা ফর্ম' (দেবেশ, ২০১৮ : ৪৫) – উপন্যাস সম্পর্কে এই রকম একটা তত্ত্বনিরপেক্ষ সংজ্ঞার্থেই যেন স্বস্তি খোঁজেন তিনি। উপন্যাসের আকার এ কারণেই স্বাধীন ও আয়ত্ত। আধুনিক সেই ঔপন্যাসিক বা উপন্যাসকে তিনি অনুসন্ধান করেন, যিনি একই সাথে 'অন্তর্দেশগঠক, আকারধ্বংসী ও আত্মপাঠক ঔপন্যাসিক' (দেবেশ, ২০১৮ : ৫১)।

যে-কোনো বিন্দু থেকে নতুনভাবে শুরু হতে পরে আখ্যানের অভিজ্ঞতা নির্ণয়ের প্রক্রিয়া– এ সূত্রেই সমকালে প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠেন দেবেশ রায়। 'ভাষাকে-প্রথাকে অপরীক্ষিত-তথ্যকে-বয়ানের ধারণাকে আক্রমণ করার মধ্য দিয়ে আখ্যানের গড়ন বা ভাষার সত্যকে নবমাত্রায় গভীরভাবে উপলব্ধি করতে চেয়েছেন তিনি।' (তপোধীর, ২০০৩ : ১২২)। আত্মবিনির্মাণ, প্রতিনিয়ত আখ্যান বা কথনবিশ্ব নির্মাণের নব প্রকল্প উপস্থাপন করে; উপন্যাসের ঐতিহ্য ও ইতিহাসের ব্যতিক্রমী পাঠ-সমীক্ষা এবং উপন্যাস শিল্পরূপ-সম্বন্ধীয় নানা বয়ানের মধ্য দিয়ে দেবেশ রায় তাঁর একক যাত্রার পথকে প্রাতিস্বিক করে তোলেন।

Dhaka University Institutional Repository

টীকা

১. হেনরি ফিল্ডিং ‘টম জোন্‌স’ উপন্যাসের অষ্টম খণ্ডের ভূমিকায় ঔপন্যাসিককে ‘ঐতিহাসিক’ আখ্যা দিয়েছেন। তাঁর মতে ঐতিহাসিক উপস্থাপিত করেন ‘Public transaction’ আর ঔপন্যাসিক করেন ‘Scenes of private life’. (উদ্ধৃত, দেবীপদ, ১৯৮২ : ৮৬)।

২. দ্রষ্টব্য : প্লেখানভ রচিত ‘শিল্পের জন্য শিল্প প্রসঙ্গে’ প্রবন্ধ (*মার্কস ও মার্কসবাদীদের সাহিত্যচিন্তা* গ্রন্থে সংকলিত) অনুবাদ ও সংকলন : সাঈদ-উর রহমান। পৃ. ১৬

৩. “For Lukács, the best novels narrate neither from above nor below, but with an aspiration towards totality.” (A post by Herrnaphta, on February 28, 2010. Marxist Marginalia, https: herrnaphta.wordpress.com).

৪. “In dialogism, the very capacity to have consciousness is based on otherness. More accurately, it is the differential relation between a centre and all that is not that centre.” (Holquist, 1990: 18).

Dhaka University Institutional Repository

৫. “The Novel’s spirit is the spirit of complexity ... the novel spirit is the spirit of continuity ... a thing made to last, to connect the past with the future.” (Milan, 1986 : 10)

৬. এ প্রসঙ্গে উত্তর-কাঠামোবাদী আমেরিকান আখ্যানতাত্ত্বিক জে. হিলিস মিলেরের (১৯২৮–) মন্তব্যটি প্রণিপ্রধানযোগ্য : “If the literary work is within itself open, heterogeneous, a dialouge of conflicting voices, it is also seen as open to other texts, permeable to them, permeated by them. A literary text is not a thing in itself, organically unified, but a relation to other texts which are relations in their turn. The study of literature is therefore the study of intertextuality. (উদ্ধৃত, তপোধীর, ২০১৩ : ৯৭)

৭. উত্তরাধুনিকতাবাদী ফরাসি দার্শনিক Gilles Deleuze (১৯২৫-১৯৯৫) রচিত ‘Critique et Clinique’ (*Gilles Deluze : Essays Critical and Clinical* গ্রন্থে সংকলিত) প্রবন্ধ থেকে বক্তব্যটি উদ্ধৃত করেছেন দেবেশ রায় তাঁর *তারাশঙ্কর : নিরন্তর দেশ* বইয়ে। উল্লেখ্য যে দ্যলুজ সাহিত্যকে ‘Enterprise of health’ এবং শিল্প-রচয়িতাকে Clinicians of Civilization’ বলে আখ্যায়িত করেছিলেন। দ্যলুজ তাঁর নানা রচনায় সাহিত্যিক হারম্যান ম্যানভিল, ডি. এইচ. লরেন্স, স্যামুয়েল বেকেট, আলফ্রেড জেরি, লুইস ক্যারল-সহ দার্শনিক প্লেটো, স্পিনোজা, কান্ট, নিট্‌শে এবং হাইডেগারের রচনার মূল্যায়ন করেছেন।

৮. রাধাকান্ত দেব-এর *শব্দকল্পদ্রুম*-এর ‘আখ্যান’-এর অর্থ দেয়া আছে– ‘নাম, সংজ্ঞা, ইতিহাস, উপন্যাস।’ (উদ্ধৃত, দেবেশ, ১৯৯১ : ৬৪)।

গ্রন্থপঞ্জি

অপর্ণা পাল (২০১৩)। *ভিন্ন স্রোতের ঢেউ : বাংলা উপন্যাস (১৯৪৭-৬৭)*। অক্ষর প্রকাশনী, কলকাতা-৬।

অ্যাঁলা রবগ্রীয়ে (২০১১)। *নব উপন্যাসের পক্ষে* (শামসুদ্দিন চৌধুরী অনুদিত)। বর্ণায়ন, ঢাকা।

Dhaka University Institutional Repository

কার্তিক লাহিড়ী (২০১৪)। *বাস্তবতা ও বাংলা উপন্যাস*। প্রতিভাস, কলকাতা-৭০০০৭২।

ড. রামেশ্বর শ' (২০০৬)। *আধুনিক বাংলা উপন্যাসের পটভূমি ও বিবিধ প্রসঙ্গে*। পুস্তক বিপণি, কোলকাতা।

তপোধীর ভট্টাচার্য (২০১৩)। *আখ্যানের সাতকাহন*। বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা : ৭০০০০৯।

দেবীপদ ভট্টাচার্য (২০০৩)। *উপন্যাসের কথা*। দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ৭০০০৭৩।

দেবেশ রায় (১৯৯১)। *উপন্যাস নিয়ে*। দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭০০০৭৩

দেবেশ রায় (২০০৩)। *তারাশঙ্কর : নিরন্তর দেশ*। দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭০০০৭৩

দেবেশ রায় (২০০৬)। *উপন্যাসের নতুন ধরণের খোঁজে*। দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭০০০৭৩

দেবেশ রায় (২০১০)। *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় : নিরন্তর মানুষ।* এবং মুশায়েরা, কলকাতা।

দেবেশ রায় (২০১৬)। *জলের মিনার জাগাও (আত্মকথা)*। প্রাচী-প্রতীচী, সঙ্গীতা এনক্লেভ, কলকাতা-৬১

দেবেশ রায় (২০১৮)। *উপন্যাসের বিবিধ সংকট*। প্রতিভাস, কলকাতা-৭০০০৭২

বীরেন্দ্র দত্ত (১৯৯৮)। *বাংলা কথাসাহিত্যের একাল*। পুস্তক বিপণি, কলকাতা-৭০০০০৯

বেগম আকতার কামাল (১৪০৭)। *বিশ্বযুদ্ধ জীবন ও কথাশিল্প*। নিউ এজ পাবলিকেশন্স, ঢাকা।

মিলান কুণ্ডেরা (২০১২)। *উপন্যাসের শিল্পরূপ* (সঞ্জীবন সরকার অনুদিত)। সন্দেশ, ঢাকা।

রণবীর লাহিড়ী (২০১১)। *আখ্যানতত্ত্বের আখ্যান*। চর্চাপদ, কলকাতা-৭০০০১২।

রবীন্দ্রনাথ গুপ্ত (১৯৭১)। *উপন্যাস প্রসঙ্গে*। তুলি-কলম, কলিকাতা-৯।

রাহুল দাশগুপ্ত (২০১৭)। *রাশিয়ার উপন্যাস ও ঔপন্যাসিক*। প্রতিভাস, কলকাতা-৭০০০৭২।

Dhaka University Institutional Repository

সত্যেন্দ্রনাথ রায় (২০০০)। *বাংলা উপন্যাস ও তার আধুনিকতা*। দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭০০০৭৩।

সাঈদ-উর-রহমান [অনু] (১৯৮৫)। *মার্কস ও মার্কসবাদীদের সাহিত্যচিন্তা*। একাডেমিক পাবলিশার্স, ঢাকা।

সুমিতা চক্রবর্তী (২০১০)। *উপন্যাস বহুরূপে*। অক্ষর প্রকাশনী, কলকাতা-৬

সৈয়দ আকরম হোসেন (২০১০)। *রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস : চেতনালোক ও শিল্পরূপ*। একুশে পাবলিকেশন্স লি:, ঢাকা।

হীরেন চট্টোপাধ্যায়, উপন্যাসের রূপরীতি, ২০১১, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা,

Brian Mchale (1987). *Postmodernist Fiction*. Routledge, London and New York.

Lucien Goldman (1975). *Towards a Sociology of the novel*. (Trans. by Alan Sheridon). Tavistock publications Ltd. , London.

M. M. Bakhtin (1994). *The Dialogic Imagination*. Michael Holquist (Edt). Caryl Emerson and Michael Holquist (translated). University of Texas press, Austin, USA.

M. M. Bakhtin (1994). 'Epic and Novel'. *The Dialogic Imagination*. Michael Holquist (Edt). Caryl Emerson and Michael Holquist (translated). University of Texas press, Austin, USA

Michael Holquist (1990). *Dilogism: Bakhtin and his world*. Routledge, London & New York.

Milan Kundera (1986). *The Art of the Novel* (translated by Linda Asher). Grove press, Inc. , US.

Dhaka University Institutional Repository

Morroe Berger (1977). *Real and Imagined worlds: The novel and Social Science*. Harvard University press, UK .

Philip Rahv (2003). 'Fiction and the criticism of fiction'. *Critical Approaches to Fiction*. (Shive K. Kumar & E. Keith Mckean Edt.) Atlantic publishers & Distributors, New Delhi, India.

Ralph Fox (1972). *Novel and the People*. International Publication, New York.

সহায়ক পত্রিকা

নরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত (১৪০৩)। 'বাখতিন : তৃতীয় বিশ্বে'। *এবং এই সময়* (সম্পা. অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়)। কলকাতা-৭০০০৬০।

তপোধীর ভট্টাচার্য (১৪০৩)। 'বাখতিনের তত্ত্ববিশ্ব ও দ্বিবাচনিকতা'। *এবং এই সময়* (সম্পা. অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়)। কলকাতা-৭০০০৬০।

দ্বিতীয় অধ্যায় : অন্তহীন বৃত্তান্তে জীবন

পরিবেশ ও পটভূমির ব্যাপ্তি এবং এই দু'য়ের মিথস্ক্রিয়ায় মানবচরিত্রের জটিল রহস্যের বিকাশ ও উন্মোচনেই উপন্যাস সার্থক হয়ে ওঠে। ব্যাপ্তির যে ধারণা উপন্যাসের গঠনের সাথে সম্পর্কিত; সেই আদি ধারণা থেকেই দেবেশ রায়ের 'বৃত্তান্ত' রচনার প্রচেষ্টা। বৃত্তান্ত কখনো থেমে যাবার নয়– এই

Dhaka University Institutional Repository

শিল্পধারণা দেবেশ তাঁর একাধিক উপন্যাসে স্পষ্টাকারে প্রকাশ করেছেন। বৃত্তান্ত– যার আদি নেই, অন্ত নেই। বৃত্তান্ত কবে শুরু হয়েছে তা যেমন বলা যায় না, কবে শেষ হবে তাও অনিশ্চিত। অনিঃশেষ এর বিস্তার, জীবনের মতো। "দেবেশের উপন্যাসেও সেই চলমানতার রূপই ক্রমশ শিল্পের মাহাত্ম্য অর্জন করেছে। যেখানে জমি বাড়তে থাকে, চেনা-অচেনা অসংখ্য চরিত্র যাওয়া-আসা করে, দেশ ও কাল নির্ভর প্রসঙ্গের অভ্যন্তরে– আসে নতুন-নতুন রহস্য, প্রতিনিয়ত বিচ্ছিন্নতা ও সংলগ্নতা ঘটতে থাকে পরস্পরের মধ্যে– এই নিয়েই তাঁর মহাকাব্য, এই নিয়েই তাঁর বৃত্তান্ত।" (অরুণ, ১৪২১ : ১৮৪)।

ইংরেজিতে Chronicle (উৎস : ল্যাটিন Cronikle)-কে বাংলায় 'সময়ানুক্রমে সংঘটিত ধারাবাহিক ঘটনার বিবরণ' বলা চলে। শব্দটির সাহিত্যিক সংজ্ঞায় বলা হয়েছে :

> A Chronicle is a historical account of events (real or imagined) that are told in chronological order, meaning from first to last as they occur in time. It typically records events as witnessed or understood by the person writing the chronicle (the chronicler); but it is fundementally objective, not interpretive. It is used as a style of writing in both fiction and nonfiction. In moden time, various fictional stories have also adopted "chronicle" as part of their title, to give an impression of epic proportion to their stories.
>
> (উৎস: http://www.google.com/amp/s/literayterms.net/chronicle/amp/)

সাহিত্যিক পরিভাষা হিসেবে Chronicle মূলত ইতিহাস রচনার সাথে সম্পর্কিত।[১] যেমন– নবম শতকে ইংল্যান্ডের (Wessex) রাজা আলফ্রেডের (৮৪৯-৮৯৯) সময় থেকে রচিত হতে থাকে 'Anglo-Saxon Chronicle' যা বিশ শতক পর্যন্ত চলেছিল। এটা ছিল ইংরেজদের সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক অর্জনের মাইলফলক; ইংরেজি গদ্যের রূপ-রূপান্তরের একটা গুরুত্ববহ সংগ্রহও ছিল এটি। আধুনিক ইতিহাস কিংবা সাহিত্য রচনার ক্ষেত্রে যেকোনো Chronicle পূর্বগামীর কাজ করে, কারণ এতে গদ্যে বা পদ্যে লিখিত প্রচুর উপাদান থাকে; বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এ ধরনের রচনাগুলো লৌকিক উপকাহিনীর মত হলেও এগুলো বাস্তব পরিপ্রেক্ষিত থেকে খুব একটা আলাদা নয়। অর্থাৎ তথ্য ও সময়-প্রতিফলিত সত্যই অন্তর্ভুক্ত হয় এতে। উদাহরণ হিসেবে ইংরেজ 'ক্রনিকলার'

Dhaka University Institutional Repository

Raphael Holinshed (১৫২৯-১৫৮০)-এর Chronicles of England, Scotland And Ireland (YEARE 1577 to the YEARE 1586) কথা বলা যায়– ১৮০৮ সালে লন্ডন থেকে প্রকাশিত ছয় খণ্ডের এই ডকুমেন্টটি পরবর্তীকালে শেক্সপিয়ারের (১৫৬৪-১৬১৬) বিভিন্ন 'Chronicle Play' এবং অন্যান্য এলিজাবেথীয় নাট্যকারদের রচনার গুরুত্বপূর্ণ উপাদান-উৎস হিসেবে কাজ করেছে। 'Chronicle Novel' বলেও একটি সাহিত্যিক পরিভাষা রয়েছে। এ সম্পর্কে 'The Oxford Dictionary of Literary Terms'- এ বলা হয়েছে :

> A long novel or connected sequences of novels in which the narrative recounts the fortunes of a family or similar group recurring Characters overs many years, usually covering at least two generations. This category of fiction overlaps with the saga novel, where the emphasis is on changes within a family; but where the story attempts to reflect typical development in social history over a sustained period, the term 'chronicle novel' may be preffered, especially if the story's events are connected with notably historic dates and events. Significant modern examples in English- John Galsworthy's *The Foresyte Saga*, 1906-1921. (Edt. by Chris Baldick, 2015 : 33)

দেবেশ রায়ের বৃত্তান্ত সমালোচনায় এগুলো প্রাসঙ্গিক হলেও তাঁর রচিত বৃত্তান্তগুলোর একটাও 'Chronicle' নয়। অর্থাৎ তাঁর উপন্যাসগুলোকে সেই সংজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত করা যায়না। তবে 'Chronicle'-এ সময়কে যেভাবে পর্বান্তরে ধারণ করা হয়, দেবেশের উপন্যাসে সেরকম প্রক্রিয়া লক্ষণীয়; যেখানে সময়ের ঐতিহাসিকতা বা 'ইভেন্ট' থাকে– ঔপন্যাসিকের 'ফিকশন'-এ সেই 'ইভেন্ট' বা সময়ের ভেতর 'উপন্যাসন' ঘটে যায়। এই অর্থেই উপন্যাস হয়ে ওঠে বিস্তৃত-বিস্তীর্ণ সময়ের আধার।

উপন্যাসের নামে 'বৃত্তান্ত' শব্দ যোগ করা কোনো বিশেষ 'ফর্ম' সৃষ্টির প্রয়াস কীনা সে অনুসন্ধানকে নাকচ করে দেবেশ রায় বলেন : "*পুতুল নাচের ইতিকথা*, *হাঁসুলিবাঁকের উপকথা*, *ঢোঁড়াইচরিতমানস* ইত্যাদি উপন্যাসেও এই ধরনের নাম বা শব্দ যোগ হয়েছে। তাই আমার 'আখ্যান-বৃত্তান্ত-পুরাণ' ইত্যাদি শব্দকে নতুন ধরার কোনো কারণ নেই।" (দেবেশ, সাক্ষাৎকার : ২০১৫)। তবে আধুনিক

Dhaka University Institutional Repository

শিল্পপ্রকরণ হিসেবে উপন্যাসের জন্য নতুন তত্ত্ব রচনার তাগিদ দেবেশ রায়ের বৃত্তান্ত রচনার সাথেও সম্পৃক্ত। "(উপন্যাসের) নতুন তত্ত্ব ভাবা ও তৈরি করা এক নিরবধি লড়াই বা চলমান প্রক্রিয়া" (দেবেশ, ২০১৫: ২২) দেবেশের এ বক্তব্যও তাঁর উপন্যাস চর্চার ভঙ্গিমাকে ব্যাখ্যা করে। 'বৃত্তান্ত' এই প্রক্রিয়ারই প্রকাশ। অবশ্য বৃত্তান্ত শব্দ যোগ করে লেখা উপন্যাসগুলোতেই কেবল দেবেশের 'বৃত্তান্ত'-ধারণা তথা উপন্যাস-শিল্প সম্পর্কিত নান্দনিক উপস্থাপনা একমাত্র পরিশীলিত নয়। সেটা তাঁর অন্যান্য উপন্যাসের প্রকরণ ও বয়ান-ভঙ্গি প্রমাণ করে। দেবেশ রায়ের কাছে উপন্যাস সীমায়িত শিল্পপ্রকরণ নয়, যেখানে রয়েছে রাষ্ট্র-রাজনীতি-সমাজ-অর্থনীতি– ইতিহাস তথা সামূহিক মানবজীবনচিত্র কিংবা সে সম্পর্কে শিল্পীর বীক্ষণ, অভিজ্ঞতা ও নিরন্তর পাঠ। বৃত্তান্ত রচনায় দেবেশের চিন্তনে কাজ করে এক অখণ্ড সময়ের অনুভব– পরিবাহিত ও অনিঃশেষ সেই সময় ও অন্তহীন চলমান জীবনকেই তাঁর সম্মুখপ্রসারী (open-ended) 'বৃত্তান্তে' ধরতে চেষ্টা করেন তিনি; একইসাথে বৃত্তান্ত রচনার অসম্পূর্ণতা প্রকারান্তরে অপারগতাকে স্বীকার করেন। এটা তাঁর উপন্যাস-শিল্প দর্শন ভাবনাও। এছাড়া তাঁর মতে :

> উপন্যাস এমন একটা শিল্পরূপ, যেখানে প্রত্যেকটা উপন্যাস উপন্যাসের নতুন ফর্ম তৈরি করে; ... ঔপন্যাসিক যেভাবে তাঁর ন্যারেটিভকে ধরেন, তার ওপরেই এ উপন্যাসের ফর্মটা আকার নেয়। আর সেই আকারটাই হল উপন্যাস। উপন্যাসের আয়তনের কারণে এই ফর্মটা ভীষণ determining ; আকার যেটা নিচ্ছে, সেই আকারটাই হল বিষয়। (দেবেশ, সাক্ষাৎকার : ২০১৫)

মধ্যযুগের বর্ণনাধর্মী আঙ্গিক বা 'ন্যারেটিভ প্যাটার্ন' বিশেষত মঙ্গলকাব্য, পাঁচালি, লোককাব্য, কিচ্ছা-কাহিনীর ভিতরে থাকা গল্প-বর্ণনার ভঙ্গিমাটা বৃত্তান্তকার দেবেশের অনুপ্রেরণার অন্যতম উৎস। তার আখ্যান বিশেষত *তিস্তাপারের বৃত্তান্ত* ও *সময় অসময়ের বৃত্তান্ত* উপন্যাসে "আগাগোড়া চলেছে একটা সন্দর্ভ– Narrative আর Discourse মিলেই তৈরি হচ্ছে টানাপোড়েন।" (মানবেন্দ্র, ১৯৯১ : ২০১)। দেবেশের বৃত্তান্ত প্রসঙ্গে সমালোচকের মত :

> বৃত্তান্তকার, বৃত্তান্ত বা ক্রনিকল যিনি লেখেন– প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সাহিত্য ও পুরাণের ঐতিহ্য থেকে জেনেছি– শুধু যা ঘটেছে তার কথা বলেন না, বলেন যা ঘটবে তার কথাও। দেবেশ তাঁর বৃত্তান্তে সেই দ্রষ্টা বা ব্যাখ্যাতার ভূমিকাকেই ক্রমশ স্পষ্ট করেছেন। দেশ ও কালকে উন্মোচিত করার লক্ষ্য, চরিত্রের ব্যক্তিগতকে নৈর্ব্যক্তিকে মেলানো এবং তারই সঙ্গে বৃত্তান্তকারের আয়োজিত

Dhaka University Institutional Repository

> সংগঠন ও স্বপ্ন– এসবের মধ্যেই উপন্যাসের সংজ্ঞাকে প্রতিষ্ঠা বা পুনরুদ্ধার করতে চেয়েছেন দেবেশ। (অরুণ, ১৪২১ : ১৮৪-১৮৫)

ছেদহীন পর্ব-পর্বান্তরের সমন্বয়ে অন্তত তিনটি বৃত্তান্ত লিখেছেন দেবেশ রায়। এগুলো হল– *তিস্তাপারের বৃত্তান্ত* (১৯৮৮), *মফস্বলি বৃত্তান্ত* (১৯৮৯) এবং *সময় অসময়ের বৃত্তান্ত* (১৯৯৩)। আত্মীয় বৃত্তান্ত (১৯৯০) 'বৃত্তান্ত' নামধারী হলেও পূর্বোক্ত তিনটি উপন্যাস থেকে এটি সম্পূর্ণ আলাদা। এ অধ্যায়ে দেবেশ রায়ের বৃত্তান্তমূলক উপন্যাসসমূহ আলোচিত হয়েছে।

ক. তিস্তাপারের বৃত্তান্ত

বাংলা উপন্যাসের প্রেক্ষাপটে *তিস্তাপারের বৃত্তান্ত* একটি স্বতন্ত্রধর্মী উপন্যাস। গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ১৯৮৮ সালে, উপন্যাসটির আদি পর্ব ও বনপর্বের প্রথম প্রকাশ ১৯৮০ ও ৮১-র শারদীয় 'বারমাসে'-এ এবং অন্ত্যপর্ব প্রকাশ পায় ১৯৮৭-র শারদীয় 'প্রতিক্ষণ'-এ। উপন্যাসটির জন্ম আশির দশকে এবং এতে রয়েছে সমকালীন জীবন, রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক-সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের আবর্তন যা একইসঙ্গে সাময়িক এবং উত্তরিত বা সর্বকালীন জীবন-বিধৃত।

উপন্যাসের শুরু উত্তরবঙ্গে আপলচাঁদ ফরেস্টের কাছাকাছি এক অতি নির্দিষ্ট স্থানে। এর প্রস্তুতি পর্বের স্মৃতিচারণে সমালোচক লিখেছেন :

> 'তিস্তাপারের বৃত্তান্ত'– সূচনাকাল সম্ভবত ১৯৬৩-৬৫ সাল। সে সময় দেবেশদা পার্টির কাজের দায়িত্ব নিয়ে প্রায় সর্বক্ষণের কর্মীর মতোই তিস্তাপারের উভয় তীরের ভৌগোলিক পরিবেশের সঙ্গে অভিযোজন করে বসবাসকারী সাধারণ কৃষিজীবী ও শ্রমজীবী মানুষদের ভেতরে প্রবেশ করে তাঁদের জীবনযুদ্ধের প্রাত্যহিক ঘটনাগুলি তাঁর মানসপটে চিত্রায়িত করতে থাকেন। তারই ফলশ্রুতি তাঁর মহাকাব্যোপম উপন্যাস 'তিস্তাপারের বৃত্তান্ত'। তিস্তাপারের সমাজ-সংস্কৃতির এমন বাস্তব চিত্র দুর্লভ। (বিমলেন্দু, ১৪২১ : ৩৭)

গল্প-উপন্যাসে তিস্তা প্রসঙ্গে দেবেশ রায়ের স্মৃতিচারণ :

> তিস্তা নিয়ে তো বেশ কিছু গল্প উপন্যাস লিখেছি। খুব সম্ভবত, 'বিপজ্জনক ঘাট...' নামে একটি গল্পই তিস্তা নিয়ে আদি লেখা। খুব টানত– তিস্তার বিস্তার, চর আর স্রোত। সেই স্রোত পেরনোর

Dhaka University Institutional Repository

> শক্তি, যৌবন ও দক্ষতা। এই টানটার ভিতর রোম্যান্স ছিল। রোম্যান্স ছাড়া তো আর কোনো গল্পই গল্প হয় না। (দেবেশ, ২০১৬ : ১২০)

তিস্তাপারের বৃত্তান্তে প্রায় সাড়ে আটশ পাতা ধরে রচিত হয়েছে বাঘারুর আখ্যান। তেমনি লেখক পাঠককে জানাতে ভোলেন নি যে, বাঘারুর গল্প বলতে চাওয়া তার পক্ষে কত অসংগত, কত অবান্তর। "লেখক হিসাবে তাঁর অবস্থান *তিস্তাপারের বৃত্তান্ত* লিখবার আগেও যেখানে ছিল, এ বৃত্তান্ত শেষ করেও যে তিনি সেই একই জায়গায় থেকে গেলেন, এমন চৈতন্যের যন্ত্রণা দেবেশ রায়কে ছেড়ে যায় না কখনও।" (রুশতী, ১৯৯৭ : ২৬)। বাঘারুর চরিত্রায়ণ ও সে ব্যাপারে লেখকের স্বীকৃত অপারগতা প্রসঙ্গেই সমালোচক এই মন্তব্য করেছেন। উপন্যাসের শুরুতে বা 'আদিপর্বের' চৌদ্দতম উপ-পরিচ্ছেদে এক উন্মুক্ত প্রাকৃতিক পটভূমিতে 'ফরেস্টারচন্দ্রের আত্মঘোষণা'য় বাঘারুর নিজস্ব স্বরে তার পরিচয় উন্মোচন করেন কথক। "গায়ে অন্ধকারের এক পুরু পলেস্তারা লাগিয়ে" অন্ধকারে দৈত্যাকার ছায়া বাঘারু, জমির হাকিমকে (সার্ভে অফিসার) কাল্পনিকভাবে দাঁড় করিয়ে আত্মগত আওয়াজে সে নিজের পরিচয় দেয় :

> হুজুর আসি গেইছি। মুই ফরেস্টারচন্দ্র। ফরেস্টারচন্দ্র বাঘারুবর্মন। দেখি নেন। মোর মুখখান, দেহখান, দেহি নেন। (দেবেশ, ১৯৮৮ : ৩৮)

> দুই হাতের পাতায় চোখ ঢেকে, ফরেস্টার অন্ধকারকে আরো অন্ধকার করছিল। নীরবতা তৈরি হচ্ছিল। সে-নীরবতায় তার কথাবার্তাগুলোও মিলিয়ে যাচ্ছিল। অবশেষে সেই নীরবতার ভেতরে থেকে ফরেস্টার শুরু করে, "শুন হে হুজুর, কাথা মোর দুইখান। কী দুইখান কাথা? একখান কাথা হইল যে তোমরা ত জমির হাকিম। মোর জমিঠে মোর নামখান তুমি কাটি দাও। মোর একখান ত জমি আছিল। আপলচাঁদ ফরেস্টের গা-লোগো। মোক ঐঠে পাঠায় গয়ানাথ জোতদার। হাল-বলদ-বিছন সগায় ওর। মুই হালুয়া আছিল কয়েক বছর। অ্যালায় আর নাই। বলদ যার, বিছন যার, হালুয়া যার, ধান যার- জমি ত তারই হবা নাগে হুজুর। ত ঐ জমিখান মুই, ফরেস্টারচন্দ্র বাঘারুবর্মন ছাড়ি দিছু। লিখি দাও, শ্রীফরেস্টারচন্দ্র বাঘারুবর্মনক এই জমিঠে উচ্ছেদ দেয়া গে-এ-এ-ই-ল্। (দেবেশ, ১৯৮৮ : ৩৯)

বাঘারুর উন্মোচনে কথক এভাবেই সংলাপ বা কথোপকথনের সাহায্য নেন। যদিও সমগ্র উপন্যাসে বাঘারু একসাথে এত কথা আর একবারও বলেনি। জমির সার্ভেয়ার বা তার ভাষায় হাকিমকে সে আরো জানিয়ে দিতে চায়, "এইঠে ফরেস্টার ত অনেক হুজুর– বর্মণও হুজুর অনেক। রায়বর্মণও

Dhaka University Institutional Repository

কনেক-আধেক আছে। কিন্তুক বাঘারুবর্মণ এই একোটাই।" (দেবেশ, ১৯৮৮ : ৪০)। চেহারায় অনড় দৃঢ় মোঙ্গলীয় স্থাপত্যের খোদাই নিয়ে ফরেস্টারচন্দ্র বাঘারুবর্মণ জানিয়ে যায় আপলচাঁদ ফরেস্টের কাছে তার একখানা জমি ছিল, কী করে তা গয়ানাথ জোতদার দখল করে তাকে 'হালুয়া' বানিয়েছে, কী করে তার নাম বাঘারু হল। অবশ্য জমির হাকিমের সাথে এই কাল্পনিক কথোপকথনের সাক্ষী থাকে কেবল অন্ধকার এক প্রকৃতি।

অপারেশন বর্গার কাজে তিস্তাপারে আসা সেটেলমেন্টের অফিসার সুহাস, যে এককালে ছিল নকশাল, এখন সরকারি আমলা, পুরোমাত্রায় সৎ এবং বর্গা জরিপের কাজ নিষ্ঠার সাথে পালন করতে বদ্ধপরিকর, গাজোলডোবা গ্রামে সে পৌঁছে যায় সার্ভের কাজে। বৃত্তান্তের শুরুতে সার্ভে অফিসার সুহাসের প্রেক্ষণবিন্দুতে দেখা যায় বাঘারুকে। সুহাস লক্ষ করে, গয়ানাথ জোতদারের সমস্ত হুকুম একটা লোক নীরবে তামিল করে চলেছে– কখনো 'হাকিম'-এর বসবার জন্য মাথায় করে চেয়ার বয়ে আনছে, কখনো সেই চেয়ারের পায়া ক্রমাগত মুছছে, কখনো বড় ও ভারী মৌজা ম্যাপটা হাওয়ায় উড়ে গেলে তরতর করে গাছে উঠে পেড়ে আনছে। লোকটার পরনে এক চিলতে কাপড় ছাড়া আর কিছু নেই। সুহাস ভাবে, লোকটা কে? "জরিপবিদের তেমন কোনো ভাষা অধিগত নেই যার সাহায্যে লোকটাকে সে দ্ব্যর্থহীনভাবে চিনতে পারে, তেমন কোনো চিহ্নবিজ্ঞান আয়ত্তে নেই, যার সহায়তায় পুরোদস্তুর পড়ে বা পেড়ে ফেলতে পারে তাকে।" (শিবাজী, ১৯৯৬ : ১০৬)। সার্ভে অফিসার সুহাস আর কথকের জবানিতে একযোগে উপমায়িত হয় বাঘারু :

> সুহাসের দুই হাতে ম্যাপ মেলা– নীল কাগজের ওপর শাদা রেখার। আর এই লোকটিই যেন আর-একটা ম্যাপ রিলিফে আঁকা, এমন নিষ্প্রাণ বস্তুর মত সামনে এসে দাঁড়ায়। তার মাথা থেকে পা শাল-সেগুনের দীর্ঘ কাণ্ডের মত অনিয়মিত, বর্ণশূন্য ও রুক্ষ। চোখদুটো কোন গভীরে– মণি দেখা যায় না। নাকটা থ্যাবড়া। পরনে একটা নেংটি– তার রংও গায়ের রংয়ের সঙ্গে মিশে আছে। (দেবেশ, ১৯৮৮ : ৫১)

> ...সুহাসের একেবারে সামনে এসে দাঁড়ায় লোকটা– পায়ের নখ থেকে মাথার চুল পর্যন্ত ভেজা, সারা গায়ে জল, পরণের কানিটা ঊরুর সঙ্গে লেপ্‌টে গেছে। লোকটা একটা ভেজা শালগাছের মত দাঁড়িয়ে থাকে– বানের জল নেমে যাওয়ার পর ডাঙা জমির একটা বিচ্ছিন্ন শালগাছের মত এই ভিড়ের সামনে দাঁড়িয়ে থাকে। তার পাশ কাটিয়ে ভিড়টাকে এগতে হয় (দেবেশ, ১৯৮৮ : ৬৯)

Dhaka University Institutional Repository

উপন্যাসের বিভিন্ন অংশে শালপ্রাংশু বিশাল দেহ আর বুকের অধিকারী বাঘারু বর্ণিত হয় একই ভঙ্গির ঐকতানে :

> যদি বাঘারু ছোটখাট হত বা অন্তত একটু রোগা, ভিড়ের ভেতর দাঁড়ালেও যদি ওকে দেখা না যেত, যদি মিশে যেত ভিড়ের সঙ্গে, তা হলেও তাকে খেয়াল না করে থাকা যেত। কিন্তু এই বাঘারুটা ত একটা পুরনো শাল-গাছের মত তার শ্যাওলা-ছাতাধরা শরীরে সবাইকে আড়াল করেই তাকে দাঁড়াতে হয়। ...অথচ এত বড় একটা বাঘারু, তার শরীরের চামড়া গাছের বাকলের মত, মুখ-চোখ কোনো ভাষা নেই, মাথার চুলের আলাদা রং নেই। সত্যি এখানে চলে না। (দেবেশ, ১৯৮৮ : ৮৯)

বাঘারুর শরীরী অবয়বের মত অমীমাংসীত তার নামটাও। সে এম-এল-এ বীরেন্দ্রমোহন রায়বর্মণকে পথহীন ফরেস্ট, ব্রিজহীন নদী পার করে দিতে পারে। "এম-এল-এ দেখে, জঙ্গলটা যেন কোনো সময়ই বাঘারুর কোমর ছোঁয় না। সে যেন মাঠের ওপর দিয়ে হাঁটছে, এমনি তার হাঁটা।" (দেবেশ, ১৯৮৮ : ৯৪)। আর ব্রিজহীন নদীতে, "বাঘারুর শরীরের ওপর তার শরীরের পুরো ভারটা দিয়ে জুতো আর ব্রিফকেসসহ এম-এল-এ বাঘারুর গলাটা জড়িয়ে ধরে। ... স্রোত এসে বাঘারুকে ঘা মারলে ফুলে ওঠে– বানভাসি ফরেস্টে এক একটা শালগাছের গোড়ায় যেমন হয়। চলন্ত শালগাছের মতন মাঝনদীতে বাঘারু দাঁড়িয়ে থাকে। তারপর আবার স্রোত সামনে এম-এল-এ কাঁধে পা বাড়ায়।' (দেবেশ, ১৯৮৮ : ৯৮-৯৯)। এম-এল-এ-র পথ-প্রদর্শক বাঘারু তার এ্যামেলিয়াবাবুকে বলেছিল, "যত টাইম যাছে, মোর নামখান সলসল করি বড় হয়্যা যাছে। ... তোমাক মোর নামটা ছোট করি দিবার নাগিবে। ...সগারই ত ছোট হয় বাবু, মোরখানই বাড়ি যাছে। ...হাজারিয়া কাম। হাজারিয়া নাম। কামও বদলি যাছে, নামখানও বাড়ি যাছে। এক কামের পরে আরেক কাম, এক নামের পরে আরেক নাম। মোর একখান মানষির নাম দেন।" (দেবেশ, ১৯৮৮ : ৯৪)। এম-এল-এ-কে নদী পার করে দিতে দিতে বাঘারু শুনিয়ে যায় তার নামকরণের সাতকাহন। কী করে কাঠ কুড়ানো মায়ের পেটে জন্মালে সে হল 'কুড়ানিয়ার ছোয়া', একাকী আদিম প্রাকৃতিকতায় কাঠ কুড়ানো মা সদ্যোজাতের নাড়ি কাটতে পেল কেবল হাতের কুড়ুলখানা, তাই বাঘারুর নাম হল 'কুড়ালিয়া কোটা' আর গয়ানাথের জঙ্গলে (আপলচাঁদ ফরেস্ট) তাকে আক্রমণ করে বাঘ। ঘাড়ে, পেছনে বাঘের থাবার আঘাত পেয়েও বাঘের সাথে লড়াইয়ে জিতে গেলে তখন থেকে তার নাম হল 'বাঘারু, "সেইঠে মোর নাম হয়া গেইল বাঘারু। বাঘ খানক মুই হারি দেছু, এ্যাল্যায় মোর নাম হইল বাঘারু।

Dhaka University Institutional Repository

...এ ধরো কেনে, পুরা একখান পালাটিয়া গান বান্ধা হয়্যা গেইল– কুড়ানির ছোয়া, কুড়ালিয়া-কোটা, বাঘারুয়া, ফরেস্টুয়া চন্দ্র বর্মন।" (দেবেশ, ১৯৮৮ : ৯৭)। এই 'পালাটিয়া গানের' মত বৃহৎ নামের সারি থেকে মুক্তি পেতে চাওয়া বাঘারুর এ্যামেলিয়া বাবুর কাছে আর্জি ছিল নামটা মানুষের নামের মত ছোট ও স্থির করে দিতে। একটা নাম তাকে গয়ানাথও দিয়েছে, যেন শ্লেষ মেশানো কণ্ঠেই বাঘারু বলে :

> গয়ানাথও ত মোক নাম দিছে বাবু। গয়ানাথ মোর মাও-এর দেউনিয়া, মোর দেউনিয়া, জমির দেউনিয়া, ফরেস্টের দেউনিয়া, তিস্তা নদীর দেউনিয়া, ভোটের দেউনিয়া। ত ধরো, এ্যানং একখান ভোটের আগত কহিল, হে বাউ, ভোটত তয় নামখান দিয়া দিছু। ত মুই পুছিলোঁ, কী মোর নামখান। ত কহিল, ফরেস্টারচন্দ্র বর্মন, মনত রাখিস ফরেস্টারচন্দ্র বর্মন। ত মুই মনত রাখি দিছু– ফরেস্টারচন্দ্র বর্মন। মনত রাখি ভোট দিছু– গয়ানাথের ভোট। (দেবেশ, ১৯৮৮ : ৯৪)

বাঘের কামড়ে ছয়মাস জলপাইগুড়ির হাসপাতালে পড়ে থাকা বাঘারুর হাল আর চাষ দুই-ই চলে গিয়েছিল, প্রাপ্তি ছিল নামটা। গয়ানাথ জোতদার এম-এল-এ কে জিজ্ঞেস করেছিল, 'বলদ বাঘারু' তাকে ঠিকমতো নদী পার করে দিয়েছিল কি না, ততক্ষণে অবশ্য এ্যামেলিয়া বাবু কুড়ানির ছোয়া, কুড়ালিয়া-কোটা, বাঘারুয়া, ফরেস্টুয়া চন্দ্রবর্মণের বিপুল 'নাম্বা' নাম-কাহিনী ভুলে গিয়েছেন। বাঘারুর প্রতি সমব্যথিতায় তিনি গয়ানাথ জোতদারকে জিজ্ঞেস করেন, "উমরাক একখান আধিয়ারি দিছেন?" (দেবেশ, ১৯৮৮ : ১০৯)। 'বাঘারুক আধিয়ারি?" বিস্মিত গয়ানাথ ভাবে একথা নিশ্চয়ই বাঘারুই বলেছে এম-এল-এ-কে। কিন্তু বাঘারু আধিয়ারি চাইতে পারে না কিংবা সেরকম কোনো চাওয়ার কথা ভাবতেও সে পারে না। কেবল একটা ছোট নাম চেয়েছিল সে; সকলের নামই ছোট হয়, তারটাই কেবল বেড়ে যায়, এই লজ্জায়। এম-এল-এও বলেন, না, বাঘারু আধিয়ারির কথা কিছুই বলেনি। বাঘারু যা বলেছিল, অন্তত যা বলতে চেয়েছিল, তা এ্যামেলিয়াবাবুর পক্ষে বোঝা সম্ভব ছিল না। গয়ানাথের ক্রোধের সামনে বাঘারু বারবার বলেছিল, এ্যামেলিয়াকে সে নিজের নাম বলেছে, জন্মকথা বলেছে, কিন্তু আধিয়ারির কথা কিছুই বলেনি কিন্তু গয়ানাথ বিশ্বাস করেনি, ক্ষমাও করেনি তার এই বিরাট অপরাধ। ফলে বাঘারু পেল গয়ানাথের মহিষের বাথানে নির্বাসন।

> কহিছিস কি কহিস নাই, বুঝিবু এ্যালায়। তুই কালি সূর্য উঠিবার আগত এই তিস্তাপার ছাড়ি চলি যাবি। হু-ই নাগরাকাটাত ডায়না নদীর চরত মহিষের বাথান আছে, ঐঠে থাকিবু। (দেবেশ, ১৯৮৮ : ১২৩)

Dhaka University Institutional Repository

সে নির্বাসনে বাহ্যত বাঘারুর অপমান আছে, কিন্তু সেই প্রকৃতি কিংবা তিস্তা যেমন তার চর-জলস্রোত-পলি নিয়ে একান্তই নৈসর্গিক, বাঘারুও তেমনি। সমালোচক মনে করেন :

> লেখক বাঘারুর জন্মবৃত্তান্ত ও নিজস্ব একটি নাম সন্ধানের জন্য তার যে এম-এল-এর কাছে অনুনয়, সেই ভাষা ও প্রেক্ষণবিন্দু চরিত্রটির জন্মলাভের অনুপুঙ্খ বর্ণনা ও তার প্রাকৃতিক স্বভাব চিহ্নিত করেন। এটি এমন এক চিত্রণ যা প্রতিপন্ন করে 'representation is reality'– এই তত্ত্বকে, বাঘারু উত্তরবঙ্গের রাজবংশী জনগোষ্ঠীর মধ্যেও অধিক প্রান্তিক– সে রয়ে গেছে আদিমানব স্তরে, অথচ সময়াবর্তে সে আধুনিক উন্নতির ফাঁদে আটকে পড়া এক মানুষ, যে জোতজমি সার্ভে পার্টি, ভোট-মিটিং-মিছিল ইত্যাদি কিছুই বোঝে না। (আকতার, ২০১০ : ৬৯)

বাঘারুর পারিপার্শ্বিকতার সকল কিছুই বাঘারুর প্রত্যাখ্যাত, তার অন্বয় কেবল আদিম উন্মুক্ত প্রাকৃতিক পটভূমির সাথে। এ কারণেই নির্বাসিত বাঘারু ডায়নার জঙ্গলে পাখির সঙ্গে ভাষাহীন সংলাপহীন বিনিময়ে স্বচ্ছন্দ কিংবা সূর্য-গ্রহণ শুরু হলে নিজের সর্বশক্তি দিয়ে বাথানের মইষানিকে প্রসব করাতে সমর্থ। তখন জন্মানো বাছুরটাকে সে এমনভাবে কোলে তুলে নেয়, "যেন বাঘারুর বুক তার দ্বিতীয় গর্ভ।" (দেবেশ, ১৯৮৮ : ১৮৬)। বাছুর কোলে বাঘারুর সঙ্গী হয় বুড়িয়াল মহিষ, ভোখা কুকুর। নির্বাসনে শুরুতে যেমন মহিষের বাথানে যেতে থাকা বাঘারুর সঙ্গী হয়েছিল একটা শাদা চাঁদ :

> বাঘারু ডাঙা থেকে লাফ দিয়ে নীচে নামে। আর চাঁদটাও তড়াক করে লাফ দিয়ে আপলচাঁদ ফরেস্টের মাথা থেকে তার মাথার ওপর এসে পড়ে। লাফ দিয়ে নেমে বাঘারুকে দাঁড়াতে হয়। চাঁদটাও আটকে যায়। বাঘারু মাঠ দিয়ে চলা শুরু করে দক্ষিণ হাঁসখালির দিকে। চাঁদটাও গড়িয়ে-গড়িয়ে চলে। চাঁদটা টাকার জলছাপের মত। (দেবেশ, ১৯৮৮ : ১২৩)

রাতের চাঁদের মত সকালের আগুনরাঙা আকাশের সূর্যোদয়-ও সমস্ত রঙ নিয়ে মানব ও প্রকৃতির সৃজনশীল সমপর্ণের ও সম্পর্কের ভাষা হয়ে ওঠে। বাঘারুর দৃষ্টিকোণে প্রকৃতি-রূপ নানা ব্যঞ্জনায় মূর্ত হয়ে ওঠে। গয়ানাথের বাড়ি থেকে মহিষের বাথানে নির্বাসনের পথে হাঁটা বাঘারুর মাথায় মাথায় চলে আসছে যে আকাশ, 'সবুজ নাগান', সেই আকাশের সবুজের নীচে কোথাও কোথাও কিছু কিছু মেঘ ছিল। সেই সব জায়গায় আকাশের রঙ, মেঘের রঙ, আলোর রঙ মিলে আরো নানারকম রঙ তৈরি হচ্ছিল :

Dhaka University Institutional Repository

> কুন অং (রং) কুখন ফুটে উঠে আর মিলি যায়, না দেখা যায়, না-বোঝা যায়। ...আগুনের নাখান অংটা দূরত-দূরত চলি যাছে, হু-ই পচিম পাখত তিস্তা নদীর পারত, তার পচিমে জলপাইগুড়ি সদরত, তার পচিমে– সবখানের আকাশ নাল [লাল] টকটকা হবা ধরিছে হে। (দেবেশ, ১৯৮৮ : ১২৭)

বাঘারুর বিরাট শরীরটা রঙিন আলোর আঘাতে এভাবেই শিহরিত হতে থাকে। "বরমতলায় সেই সূর্যোদয়ের সামনে নির্বাসনের পথে বাঘারুর শরীরে-মনে কেমন মুক্তির বোধ এসে যায়। কোনো অদৃশ্য আড়াল থেকে উৎক্ষিপ্ত রঙের এই আকাশমাটিব্যাপী বিস্ফোরণে আর নিজের এই শরীরটার এমন মুক্তিতে বাঘারু হাসে।" (দেবেশ, ১৯৮৮ : ১২৮)। বাঘারুর বিহ্বল চোখেই প্রভাতের সূর্যরঙ-স্নাত, স্বতঃস্ফূর্ত প্রকৃতি পাঠকের কাছেও জীবন্ত ও সজীব হতে থাকে; ভাষাহীন বাঘারুর দেহ-মন জুড়ে উৎকীর্ণ আদিম সৃষ্টিশীল মগ্ন প্রকৃতির দ্বিমাত্রিক সম্পৃক্তি প্রবলভাবে অনুভূত হয়। সমালোচকের প্রতীতি :

> আর কিছু না থাক তার অন্তত জঙ্গলের সঙ্গে, প্রকৃতির সঙ্গে, নিগূঢ় বন্ধন রয়েছে– সব সত্ত্বেও আত্মবোধের জন্য ফরেস্টারচন্দ্রের একটি পোক্ত নির্ভর আছে। যে-তিস্তা, যে-ফরেস্ট, যে-জন্তুজানোয়ারের সঙ্গে বাঘারুর নিত্য দেয়া-নেয়া, সে-সব কি সামাজিক পরিধির বাইরে নয়? ...জঙ্গলে গয়ানাথের বাথানে, আলাদা আলাদা করে প্রত্যেক গরু মোষের সঙ্গে ঘনিষ্ট আত্মীয়তা তার। তাহলে এমন ভাবা কি ভুল যে ওই নৈসর্গিক প্রাচুর্যের মধ্যে বাঘারুর জন্য যে জায়গা বরাদ্দ, তার মারফত তার বঞ্চিত জীবনের ঈষৎ ক্ষতিপূরণ হয়? (শিবাজী, ১৯৯৬ : ১০৮)

নির্বাসিত বাঘারু সূর্যোদয় অবলোকন ক'রে 'সূয্যি ঠাকুরের গান' সামলাতে পারে না; "তার মাথায় ছড়াগিলা গানগিলা পিপিড়ার মত চলি আসিবার ধরে এক্কারে লাইন বান্ধি, একোটা পর একোটা, কোটত আসে কোটত যায় কায় জানে।" (দেবেশ, ১৯৮৮ : ১২৯)। ডায়না নদীর চরে গয়ানাথ জোতদারের বাথান সামলাতে গিয়েও নিজের মনে গান গায় সে। মইষাল বন্ধুর জন্য আকুল প্রার্থনায় ভরা সেই গান। কথকের প্রশ্ন :

> কাজে কাজে অবিচ্ছিন্নতার সেই গানে এত বিরহ আসে কোথা থেকে? বিরহ তার, মইষাল বাঘারুর জন্যই। ... বাথান বাঘারুর জানা, মোষও বাঘারুর জানা, মইষাল তো বাঘারু নিজেই! বাঘারু তখন না বাজানো দোতরার ঝোঁকে-ঝোঁকে গাইছে–
>
> বাথানে বারোশ মইষ
>
> ও মোর মইষাল এ্যাকেলা ঘুরেন,

Dhaka University Institutional Repository

ঘরত্ মোর এই যৈবনখান্

কাপড়ে বান্ধি রাখেন।

অ-মোর মইষাল বন্ধু রে-এ-এ–

বাঘারু নিজেই নিজের বিরহিণী। (দেবেশ, ১৯৮৮ : ১৬৭)

তবে প্রকৃতির সংস্পর্শে বাঘারুর শরীরের ও সেই সূত্রে মনের যে উন্মোচন তা বারবার ব্যাহত হয় যখন সে মানুষের মুখোমুখি হয়। চা-বাগানের পাশ দিয়ে হাঁটতে-হাঁটতে সে বাগানের 'লাইন' থেকে শ্রমিকদের বেরিয়ে পড়া দেখে সে, দেখে তাদের পোশাক-আশাক, তাদের ঘরে ফেরার 'দৈনিক উৎসব'– সেই ভিড়ে বাঘারু বিমূঢ় বোধ করে। মানুষজনের মিছিলে তাকে 'আউলাভাউলা' দেখায়। "সে এই ভিড়ের কেউ নয়, সে বড়ো নগ্ন– এতটা নগ্নতা এই মিছিলেরও সয় না। ... একটা ছোট নেংটি তার কোমরের সামনে বাঁধা। ... ফলে, সেই একমুখো ভিড়ের সঙ্গে স্রোতের বেগে ছুটলেও বাঘারু স্রোত হয়ে যেতে পারেনা। সে স্রোত নয়, সে স্রোতোবাহিত– তিস্তার স্রোতের টানে যেমন ওপড়ানো শালগাছ ছোটে।" (দেবেশ, ১৯৮৮ : ১৩৩-১৩৪)। শেষপর্যন্ত মিছিলের নারীদের হাসির খোরাক হয়ে যায়। কিংবা চা-বাগানের বাবুর ভর্ৎসনা জোটে। কিন্তু জল-জঙ্গল-জমি সর্বত্রই বাঘারুর স্বচ্ছন্দ অনায়াস বিচরণ আর আত্মীয়তা। "তিস্তার খেয়ালী আপন প্রবাহের মতো বাঘারুরও প্রাকৃত উদ্ভব– প্রাকৃত বিকাশ– পরিণতিহীন প্রাকৃত অগ্রগমন।" (অনিন্দ্য, ২০১২ : ১৪১)। এম-এল-এ কে নদী পার করানো বাঘারু, মইষানিকে বাছুর প্রসব করানো; চা-বাগানে পাথর খুঁজে পাথরকে আদিম মানুষের মতই অস্ত্র করে নেয়া, কিংবা বর্ষার তিস্তায় চার-চারটে গাছের সঙ্গে ভেসে যেতে পারা বাঘারু, তিস্তার চরে গয়ানাথের অমূল্য বৃক্ষ নিয়ে বানভাসি হয়ে রংধামালি বাধের উপরে, গয়ানাথের অপেক্ষায় থাকা বাঘারু– ইত্যাদি বৃত্তান্ত আসলে বিরাট অকৃত্রিম প্রকৃতিতে মানব বাঘারুর আত্তীকরণেরই গল্প। "কিন্তু গয়ানাথ জোতদারের এই বলদমানষিটা কখনো প্রকৃতির অনুষঙ্গে বিস্তৃত বিরাট হয়ে পর্ব পর্বান্তরে যেতে পারে না।" (রুশতী, ১৯৯৭ : ৩২)। তাই বাঘারুর নির্বাসনের বনপর্ব শেষ করতে দেবেশ রায়কে লিখতে হয় :

> এমন কোনো ঘটনাও ত বাঘারুর নেই, যা একটা কোথাও আরম্ভ হয়ে একটা কোথাও শেষ হয়। ...বাঘারুর সব ঘটনাই তার আগে থাকতে ঘটে আসছে, আর তার পরেও ঘটে যেতে থাকে। ...বাঘারুর প্রতিটি দিনই এক একটা পুরো জীবন। প্রতিটি ভঙ্গিই ত বীরত্বের ভঙ্গি– সে নদী সাঁতরানোই হোক আর পাথরে শুয়ে থাকাই হোক, ভোখার সঙ্গে খেলাই হোক আর বুড়িয়ালের

Dhaka University Institutional Repository

> পিঠে দাঁড়ানোই হোক। সে মোষের বাচ্চা বের করাই হোক, আর পাখির ডাক ডাকাই হোক। ...বাঘারুর ত কোনো অর্থ নেই। ...বাঘারুর ত কোনো নাম নেই! সে ত শুধু কাজে কাজে বদলে-বদলে যায় ...কুড়ানিয়া, বাঘারু, পাথরিয়া, মইষাল....তার এই হয়ে ওঠার ত আর শেষ নেই। (দেবেশ, ১৯৮৮ : ১৮৮-১৮৯)

বৃক্ষপর্বে বাঘারুর নতুন নাম হয় 'গাছারু'। গয়ানাথের হুকুমে তিস্তার উত্তাল স্রোতে পড়ে যাওয়া ফরেস্টের গাছ নিয়ে স্রোতে ভাসে বাঘারু, গাছগুলোকে দিয়ে মাচা বানিয়ে বানের জলে নিজেকে কিছুক্ষণ স্থিতু করে সে, রায়পুর রংধামালির বাঁধের ওপর থেকে তাকে দেখতে পেয়ে উদ্ধার করতে আসা মানুষগুলোকে বিভ্রান্ত করে সে। কারণ তিস্তার বন্যায় বসবাসহীন হয়নি বাঘারু; গয়ানাথ যখন তাকে গাছগুলোর সঙ্গে ভেসে যেতে বলেছিল, তখন তার কাছে অর্থ ছিল বন্যার জল, স্রোত আর ভাসমান ঐ চারটি গাছের সঙ্গে নিজের শরীরটাকে জুড়ে দেয়া; আর গয়ানাথ ও আসিন্দিরের কাছে তার অর্থ ছিল জল নেমে গেলেও গাছগুলো নিরাপদে থাকবে। তাই উদ্ধার করতে আসা নৌকার মাঝির ইঙ্গিত বা ভাষা বোঝে না বাঘারু :

> সে অর্থটা বুঝতে চায়। এমন জলের মধ্যে যদি এমন সাক্ষাৎকার ঘটে যায় তা হলে সেখানে অর্থবিনিময়ে দেরি হওয়ার কথা নয়। কিন্তু তবু যে ঘটছে তার কারণ বাঘারুর আজীবন অর্থবোধহীনতা, এমন-কি অন্যের শরীরের ভাষা বোঝার অক্ষমতা, শরীরেরও অক্ষরজ্ঞানহীনতা। বাঘারু তার নিজের শরীর দিয়ে একটার পর একটা এমন কাজ করে যেতে পারে– যার একেবারে নিকট অর্থ হয়ত তার কাছে ধরা পড়ে, বা যারা দেখে তাদের কাছে হয়ত একটা দূরার্থও এসে যায়। (দেবেশ, ১৯৮৮ : ৩২৭)

এই একই কারণে তিস্তার জলে চারটি গাছ নিয়ে যে বিশ্বস্তভাবে ভেসে এসেছে, বাঁধের উপরে কাঠের আড়তদার চারটি গাছের অন্তত একটি বিক্রি করে টাকা নিতে বললে বাঘারু তা করতে পারে না। এ নিয়ে তার কোনো মানসিক দ্বন্দ্বও হয় না। বাঘারুর চিন্তায় স্তরপরম্পরা কিংবা পরম্পরাহীন জট হয়তো আছে আরো সব মানুষের মতই, "কিন্তু সেই আর সব মানুষ থেকে তার পার্থক্যও আছে।" (দেবেশ, ১৯৮৮ : ২৯০)। ঔপন্যাসিককেও তাই বাঘারুর প্রসঙ্গে লিখতে হয় :

> তার প্রতিদিনের বাঁচা এই শরীরের সর্বস্বতা দিয়েই বাঁচা। ... এমন-কি হাজার হাজার বছর ধরে তৈরি মানুষের এত পোশাক-পরিচ্ছদের মধ্যে মাত্র দেড় হাতি এক ত্যানা লেগে আছে যে-বাঘারুর সম্পূর্ণ মানবশরীরটিতে, সেই দেড় হাতি ত্যানাতেই মাত্র যে-বাঘারু মানব সভ্যতার সঙ্গে বাঁধা– সেই বাঘারু, প্লাবিত নদীতে, বৃষ্টিতে, ঝড়ে ও অন্ধকারে এতটা বন্যা পেরিয়ে আসা এই শরীরটা

Dhaka University Institutional Repository

থেকে একটা গাছের বাঁচা বেচে দেবে কী করে? বাঘারুর যেমন মন নেই, তেমনি হয়তো মাথাও নেই। (দেবেশ, ১৯৮৮ : ৩৪৭)

বাঘারু এভাবেই নিরন্তর তার অনন্বয় সৃষ্টি করে চলে মানবসমাজের সঙ্গে। "আপাদমস্তক ভেদচিহ্নে মোড়া বাঘারু, ফলে, মানুষ যেখানে জোট বাঁধে সমাজ গড়ে, সেখানেই সে নিরাশ্রয়।" (শিবাজী, ১৯৯৬ : ১০৭)। ব্যক্তির সত্তা, স্বাধীনতা, নিজস্ব স্বর, জগত– সাধারণত ব্যক্তি সম্পর্কিত এইসব ধারণার সম্পূর্ণ বাইরে বাঘারু কেবল তার শরীর নিয়ে বাংলা উপন্যাসে ব্যতিক্রম হয়ে উঠেছে। বাঘারুরও আছে সত্তা, তবে তা প্রকৃতিতে লীন স্থানিকতাকেই দ্রষ্টব্য করে; আছে স্বাধীনতা, কিন্তু তা শরীরের অভিব্যক্তিতেই নিঃশেষিত; মহাপ্রকৃতি তার জগত, সেখানেই তার সমস্ত বোঝাপড়া। তার শরীরের ভাষা সে-ই ঠিক করে, ফলে সে প্রত্যাখ্যান করতে পারে, স্থানান্তর ঘটাতে পারে নিজের। সমাজ-সভ্যতা নিরপেক্ষ সংবেদনশীল মানব বাঘারু তাই বিচ্ছিন্ন 'অপারেশন বর্গা' (ভূমি জরিপ) থেকে, কৃষক-মজুর-শ্রমিক আন্দোলন থেকে, উত্তরখণ্ড আন্দোলনেরও সে কেউ নয়, তার 'সিপিএম' নেই, জিন্দাবাদ, ঝাণ্ডা, মিছিল কিংবা লাল সেলামও নেই। স্বদেশ, স্ব-কালে জটিল রাজনৈতিক পরিবেশ, স্থল-জল ও বনভূমির অনুপুঙ্খ বর্ণনা সর্বোপরি সেই পটে ব্যক্তিমানুষের যে বহিঃপ্রকাশ এই উপন্যাসে রয়েছে, বাঘারু সেখানে মৌলিক-ই থেকে গেছে। 'মিছিল পর্বে' অভিজ্ঞানহীন, ভাষাহীন শুদ্ধ মানুষ বাঘারুর তৃতীয় সংলাপ লক্ষণীয় :

: 'তোমরালা একা-একা ঝাণ্ডাখানা খাড়ি করি এ্যালায় টারিঠে বাহির হবা ধরছু, আর এ্যালায় হাট শেষ করি

টারিত ফিরিবার ধইচ্ছু একা-একা। তোমরালার আর কুনো মানষি নাই?'

: 'মোর আর কুনো মানষি নাই। মোর একেলা মুই আছো।'

: 'তোমরালা কি উত্তরখণ্ডত জয়েন দিছেন?'

: 'হামারার কুনো খণ্ড নাই, কুনো জয়েন নাই।'

: 'না, না কহিছু, তোমরালার জোতদারখানত জয়েন দিবার ধইচছে।'

: 'না জানো'

: 'না জানো ত ঝাণ্ডখান কান্ধত করি একেলা-একেলা হাট-বাট ঘুরিবার ধরিছেন কেনে?'

: 'মোক গয়ানাথ কহিছে তাই ঘুরিবার ধরিছু। মোক ত আগতও ঝাণ্ডা দিছে গয়ানাথ।

Dhaka University Institutional Repository

(দেবেশ, ১৯৮৮ : ৪২৮-৪২৯)

মিছিলে গয়ানাথের হুকুমে ঝাণ্ডা হাতে বারংবার বাঘারুর দৃঢ়চেতা উত্তর :

...'না-হয়। মোর কুনো ঝাণ্ডা নাই।'

তিস্তার বন্যায় রংধামালির বাঁধে সরকারি অফিসারের জিজ্ঞাসাবাদেও 'গাঙ্গুয়ামানষি' বা 'গাছারু' সম্বোধিত বাঘারুর উত্তর :

> মোর নামঠিকানা নাই রো। গয়ানাথ জোতদার মোর দেউনিয়া। উমরার নাম লেখেন- (দেবেশ, ১৯৮৮ : ৩৪৪)

সে আরো জানায় স্থানীয় আদিবাসীদের মত সে রাজবংশী বা ভাটিয়াও নয়। যেন অন্তহীন নেতি দিয়েই তৈরি বাঘারু। যেন সে একটা "ভাসমান চিহ্নক, আধেয়বিহীন শূন্য আধার।" (শিবাজী, ১৯৯৬ : ১০৮)। একপর্যায়ে ঔপন্যাসিকের বাঘারুর-বিবরণ যুক্তি-পরম্পরা হারায় :

> দশ-বার বছরে (বাঘারুর) মাত্র তিন-তিনটি সংলাপ– তাও ক্রমেই নেতিবাচক। বাঘারু কি তার জীবনে ক্রমেই নিজের কাছে নিজে অবান্তর হয়ে পড়ছে– ধারাবাহিকভাবে? (দেবেশ, ১৯৮৮ : ৪২৯)।

অথচ তিস্তাপারের এমন কোনো ঘটনাই নেই যার সঙ্গে বাঘারু জড়িয়ে না যায়, অপারেশন বর্গার কাজে, বন্যার জলে, উত্তরখণ্ডীদের আয়োজিত সংস্কৃতির সদাচারে, কামতাপুরের দাবিতে ঝাণ্ডা হাতে মিছিলে, সবশেষে তিস্তা ব্যারেজে। কোনো কিছুর অংশী না হয়েও সে পৌঁছে যায় যাবতীয় সংঘাতের কেন্দ্রে।

তিস্তাপারের বৃত্তান্তে জাতি-বর্ণ ও অর্থনীতি-রাজনীতির সূত্রে নানা শ্রেণিচরিত্রের সম্পর্ক-সূত্রবিন্যাস বিশ্লেষিত হয়েছে। কেন্দ্র ও প্রান্তের বহুমাত্রিক সংঘাত ও দ্বন্দ্ব; আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে চিত্রিত হয়েছে চা-বাগানের জমির অধিকার প্রশ্নে কৃষক-মজুরের অমীমাংসীত সংঘাত, 'রাজবংশী' বনাম 'ভাটিয়া', 'চরুয়া' ও তীরবর্তী মানুষ, জোতদার-আধিয়ার, সিপিএম বনাম উত্তরখণ্ডী– পরস্পরবিরোধী এই শ্রেণি-সংঘাত বা সময়ান্বিত ব্যক্তির জটিলতা দেবেশ রায় ধরতে চেয়েছেন একজন নৈর্ব্যক্তিক কথকের মতই। তাঁর সমাজতাত্ত্বিক বীক্ষণেই স্পষ্ট হয়েছে সমাজ

Dhaka University Institutional Repository

ইতিহাসের ঐতিহাসিকতা, ক্রমান্বয়তা, পরম্পরা। আর সেই স্তরে ব্যক্তির ইতিহাসও নির্মিতি পেয়েছে। সমালোচকের মতে :

> দেবেশ রায়ের উপন্যাসে নিরক্ষর বাঘারুদের পাশাপাশি রয়েছে রাজবংশী-মদেশিয়া-নেপালি-বাঙালি, কৃষক-মজুর, জোতদার প্রতিনিধি গয়ানাথ, চা-বাগানের কর্তৃপক্ষ, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ, কর্মচারী। না, তিস্তাপারের বৃত্তান্ত 'বাঘারু চরিতমানস' নয়, তাতে কেন্দ্রচরিত্র বলে কিছু নেই। ... দেবেশ রায়ের উপন্যাসের বিষয় : 'ইতিহাস'। ইতিহাসের চলিষ্ণুতার প্রতি বিশ্বস্ত থাকতে বদ্ধপরিকর কথক। (শিবাজী, ১৯৯৬ : ১১৫)

অবশ্য দেবেশের এই ইতিহাস-বর্ণন সরল নয়। সামাজিক-অর্থনৈতিক কিংবা রাষ্ট্রিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে জনগোষ্ঠীর (উচ্চ-নিম্ন) সংঘাত অধুনা সময়ে যতটা না সম্মুখ, তার চেয়ে অনেক বেশি দ্বান্দ্বিক। আধুনিক উপন্যাসে জন-বিন্যাস তথা বহুকৌণিক দ্বান্দ্বিকতার বিশ্লেষণী বিবরণ চলে আসে। বিশ শতকের শেষ দুই দশকে ভারতে তফশিলভুক্ত জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক শ্রেণির রূপান্তর ঘটেছে, আর্থ-সামাজিক নিয়মের স্বাভাবিকতায় তাদের নিজেদের মধ্যেও গড়ে উঠেছে শোষক-শোষিতের সম্পর্ক। এ কথাটি উত্তরবঙ্গের রাজবংশীদের বিষয়ে সর্বতোভাবে প্রযোজ্য। রাজবংশীরাই দেবেশ রায়ের উপন্যাসের প্রধান লোকসমাজ। তিস্তা-অববাহিকায় রাজবংশীদের বহুকালের বসতি। তিস্তাপারের রাজবংশীদের মধ্যে তাই জোতদার থেকে কৃষক সব শ্রেণিকেই দেখা যায়। এমনকী দেখা যায় নিঃস্বত্ব ভূমিদাসকেও– যার শ্রমের জন্য তার মালিককে কোনো পারিশ্রমিক দিতে হয় না। রাজবংশীদের জাতি-ধর্ম-বংশ প্রতিষ্ঠার ইতিবৃত্ত বিবৃত হয়েছে *তিস্তাপারের বৃত্তান্তে*। চিহ্নিত হয়েছে 'উত্তরখণ্ড' নামে স্বতন্ত্র এক রাজ্যের দাবি যেখানে রাজবংশীরাই হবে প্রধান নাগরিক ও ভাষা-ভাষী। সমকালে নয়া স্বীকৃতি পাওয়া নয়া আঞ্চলিকতাবাদ এক্ষেত্রে মূল কারণ নিয়ে উপস্থাপিত। "বৃহত্তর অর্থে কেন্দ্রভিত্তিক একীকরণের রাজনীতি তার দাপটে ধ্বংস করে সৃষ্টিশীল উন্নয়নের মূল সুর, যৌথসত্তাকে। কিন্তু এটাও তো সমান সত্যি, এ ধরণের সুবিধাভোগী আঞ্চলিক রাজনীতির 'প্যাকেজে' 'এক জাতি এক প্রাণ'-এর মতো জাতীয় সংহতির শ্লোগান এক সরল বিকৃত রূপ পায়। আর কেন্দ্রও সমঝোতা করে আঞ্চলিক এলিট গ্রুপের সঙ্গে।" (প্রিয়কান্ত, ২০০৭ : ৮৯)।

বিভিন্ন পর্বে এই সমঝোতাই দেখি *তিস্তাপারের বৃত্তান্তে*। অর্থ-ক্ষমতার শক্তিতে জমির সার্ভেয়ারের সঙ্গে কিংবা আদালতে উকিলের মাধ্যমে জমির অধিকারের প্রশ্নে গয়ানাথ জোতদার চায় সমঝোতা করতে; তিস্তা ব্যারেজের কাজ এগিয়ে চলে, বেড়ে চলে গয়ানাথের পাওনা-গণ্ডার হিসেব-নিকেশও।

Dhaka University Institutional Repository

কেন্দ্রীয় ক্ষমতায় আসীন দল চায় রাজ্য বা আঞ্চলিক দলগুলোর সাথে বোঝাপড়া করে নিতে; 'সবুজ বিপ্লবের এনট্রেপ্রানিয়ুর কৃষিবিনিয়োগকারীর' সমঝোতা হয় নকশালিয়া মতবাদীর সাথে। *তিস্তাপারের বৃত্তান্ত* উপন্যাসের বড় অংশ জুড়েই রয়েছে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক কর্মকাণ্ডের বিবরণ। সুহাসের তত্ত্বাধানে জমি জরিপের মধ্য দিয়ে উপন্যাসের শুরু, ক্রমান্বয়ে বাঘারু ও বাঘারু কর্তৃক গয়ানাথের বাথান পরিচালনা, বন্যাক্রান্ত জনসাধারণের আত্মরক্ষার প্রয়াস, উদ্বাস্তু মানুষজন, তিস্তার বন্যা, বৃক্ষবাহনে বাঘারুর যাত্রা, ভারত-বাংলাদেশের সীমান্তবাহিনী, উত্তরখণ্ড পার্টির রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, তিস্তা ব্যারেজ নির্মাণ ও উদ্বোধন, মাদারি ও তার মায়ের স্বতন্ত্র আবাসভূমি, মিছিল-মিটিং প্রভৃতি ঘটনায় সমৃদ্ধ এক পরিশিষ্টসহ ছয় পর্বে দীর্ঘ উপন্যাস এটি। এর আদিপর্বেই দেশীয় রাজনৈতিক আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতি-পরিবেশ নানাভাবে চিত্রিত। কৃষক-শ্রমিকের পরস্পর স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়কেন্দ্রিক অন্তর্দ্বন্দ্ব, জোতদার ও ক্ষুদে রাজনীতিবিদদের কর্মকাণ্ড, সিডিউল সিটের এম-এল-এর প্রত্যক্ষ আবির্ভাব ও গতিবিধি প্রভৃতির মধ্যে দিয়ে এই উপন্যাসটিতে সর্বপ্রথম রাজনৈতিক পরিবেশের সূচনা ঘটে। আদিপর্বে 'কৃষক সমিতির প্রোগ্রাম', 'রাধাবল্লভের বক্তৃতা', 'কৃষক মজুর : আলোচনা', 'কৃষক মজুর : লেনদেন', 'কৃষক-মজুর : শ্রেণি-সংগ্রাম', 'কৃষক মজুর : সম্মুখ সংগ্রাম', 'কৃষক-মজুর : ঐক্যের সংগ্রাম', 'একি কৃষক না মজুর' প্রভৃতি অংশে ক্রমশ নিদিষ্ট অঞ্চলের আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক পরিস্থিতি, এমনকী 'বৃক্ষ পর্বে' বন্যাজলবেষ্টিত বাঘারুর উদ্ধার পরিকল্পনার মাধ্যমেও রাজনৈতিক কর্ম-প্রবাহের প্রকাশ ঘটেছে। বিশেষত 'মিছিলপর্বে' উত্তরখণ্ডের স্বতন্ত্র রাজ্য দাবির পরিপ্রেক্ষিতে একদিকে বিত্তবানদের স্বার্থ সংরক্ষণকারী রাজনীতি; অন্যদিকে সর্বহারা শ্রেণীর স্বপক্ষে কর্মরত রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গের সীমাবদ্ধতা প্রকাশিত হয়েছে। এই সূত্রেই বাঘারুর মালিক গয়ানাথ রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বে রূপান্তরিত হয়, তাছাড়া এই পর্বে পঞ্চানন বাবু, বীরেন্দ্রনাথ বসুনিয়া, শিল্পমন্ত্রী, সন্তোষবাবু, সুবিমল বাবু, হেমেনবাবু প্রভৃতি রাজনীতিবিদদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ক্ষেত্র বিশেষে চিহ্নিত হয়েছে। সর্বোপরি জলপাইগুড়ি অঞ্চলের রাজনৈতিক পরিবেশ তার সম্পূর্ণতা নিয়ে উদ্ভাসিত। "এ অঞ্চলের রাজনীতি যেমন সাধারণ মানুষজনের সচেতন বোধ, স্বার্থ-বিমুক্ত কতিপয় বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের রাজনৈতিক চাতুর্যে আবর্তিত, তেমনি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানও জনবিচ্ছিন্ন রাজনীতিবিদদের কূটচালে মন্থিত এবং এই সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড জনবিচ্ছিন্ন স্বার্থপর রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হওয়ার ফলে স্বাভাবিক নিয়মেই বিকৃত– উত্তরখণ্ড সম্মিলন

Dhaka University Institutional Repository

উপলক্ষ্যে শ্রীদেবীর নৃত্যানুষ্ঠান এই বিকৃতির চূড়ান্ত নিদর্শন।" (নাসিম, ২০০৩ : ১৩৯)। রাজনীতির প্রধান নিয়ন্তা হয়ে ওঠে পুঁজি, দেবেশ সেই রাজনীতি-চারিত্র্যের রূপান্তরও ব্যাখ্যা করেছেন :

> হয়তো উত্তরখণ্ড আন্দোলনের মত ঘটনা এ-রকম নানা পরস্পরবিরোধী স্বার্থ মিশিয়েই তৈরি হয়। কখনো এই স্বার্থ কখনো ঐ স্বার্থ প্রাধান্য পায়। কিন্তু রাজবংশী জোতদারের নতুন টাকার যোগ্য বিনিয়োগক্ষেত্র খোঁজার জন্যে এ-ধরণের আন্দোলন এখন অনেকদিন পর্যন্ত তৈরি হয়ে উঠবে। বৃহত্তর ভারতে ব্যবসা ও শিল্পের বাড়তি, হিশেববহির্ভূত, অসংখ্য টাকায় যে-সামাজিক শ্রেণী তৈরি হয়ে গেছে– রাজবংশীরাও তা থেকে আলাদা নয়। (দেবেশ, ১৯৮৮ : ৩৯৩)

'নিখিল বঙ্গ উত্তরখণ্ড সমিতি'র প্রথম সম্মিলনে রাজবংশী, মুসলমান, নমঃশূদ্র ও অন্যান্য উপজাতি মানুষের অত্যাচারের কথা বলা হয়। রাজবংশী সমাজের উপজাতিগত পরিচয় ও তাদের সমাজের রূপ-রূপান্তরের বয়ানও জেনে যায় পাঠক। কিন্তু তা কেবল ইতিহাস-বিবৃতিই হয়ে থাকে। আন্দোলনে সরকার ও বিরোধী পক্ষের এম.এল.এর-দের মধ্যে মিটিং-এ ঠাট্টা-ইয়ার্কি হয়, মূল প্রস্তাব নিয়ে আলোচনাই হয় না; দু-দিনের সম্মিলনে প্রতিদিন একই বক্তৃতা হয় কিংবা প্রতিদিন বক্তৃতা করার লোকও পাওয়া যায় না; সেখানে গয়ানাথের মত জোতদার ভাষণ দেয়। তিস্তা ব্যারেজের সঙ্গে-সঙ্গে জমির অধিগ্রহণ, কৃষকের উচ্ছেদ, তাদের বিপন্নতা, ব্যারেজ বা ড্যামের ফলে যে-উপকার হবে তার সঙ্গে গরিব মানুষের সম্পর্ক না-থাকা– এইসব অমোঘ সত্যভাষণের সঙ্গে মিশে যায় নানারকম রাজনৈতিক ফন্দিফিকির। গয়নাথের সংক্ষিপ্ত এবং 'সিধে ও সরল ভাষণ তার চমৎকার উদাহরণ। তারপর সম্মিলনের প্রধান উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়ায় নাচ-গান-ভিডিও ইত্যাদি। পূর্বাবর নিয়মেই সর্বহারা মানুষের অধিকার সংরক্ষণের আন্দোলন রূপ পায় না; তারা 'জলুশে' সামিল হয় শুধুমাত্র মালিকের হুকুমে কিংবা কিছু খেতে পাওয়ার আশায়। সেই মিছিলও হারিয়ে যায় তিস্তা ব্যারেজ উদ্বোধন উপলক্ষে সরকারি অনুষ্ঠানের আয়োজনে। সরকারি পুলিশ বাহিনী 'মাত্র কয়েক মিনিটে উত্তরখণ্ডের স্বতন্ত্র রাজ্যের দাবি আপলচাঁদের এক টুকরো জমির ওপর মেরে, ভেঙে, থেঁতলে ফেলে চলে যায়।' (দেবেশ, ১৯৮৮ : ৪৩৫)। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, 'মিছিলপর্বে'র বিপুল রাজনৈতিক কর্মযজ্ঞে বাঘারুর অবস্থান গয়ানাথ কর্তৃক নির্ধারিত হওয়া সত্ত্বেও বাঘারু আশ্চর্যজনকভাবে রাজনৈতিক চেতনাবোধহীন। "শুধু তিস্তার ভেতরে ঐ বিরাট প্রাচীর, প্রাচীরের ওপর অত গেট আর মঞ্চ, গেটে আর মঞ্চে এত ঝাণ্ডা" (দেবেশ, ১৯৮৮ : ৪৩৫) দেখে বাঘারু অবাক চোখে তাকিয়ে থাকে। উত্তরখণ্ড, কামতাপুর, গোর্খাল্যান্ড, পুরনো চরের নমঃশূদ্রদের আন্দোলনের সামনে পড়ে সরকার

Dhaka University Institutional Repository

তড়িঘড়ি অসম্পূর্ণ তিস্তা ব্যারেজের উদ্বোধন করে দিতে মনস্থ করে। মুখ্যমন্ত্রী আসেন বলে সে সরকারি অনুষ্ঠানে ট্রাক-ট্রাক মানুষ যায়– জনসভায় মানুষের মাথার সংখ্যা বৃদ্ধি করতে। যায় মাদারি, মাদারির মা– এই ব্যারেজ নির্মাণ বা উদ্বোধনের সঙ্গে যাদের কোনো সম্পর্ক নেই। মাদারির মা আসে খাদ্যের সন্ধানে এবং তার হারিয়ে যাওয়া সন্তানদের খোঁজে। সেই মাদারির মা– যাদেরকে সংজ্ঞায়িত করা হয় 'দারিদ্র্যসীমার বাইরে' বা 'পশ্চাদপদ অংশ' বলে। দেবেশ রায়ের *তিস্তাপারের বৃত্তান্ত* উপন্যাসের অধিকাংশ চরিত্রই নিম্নবর্গের পরিধির বাইরে। মাদারির মা তাদের অন্যতম। ঘরবাড়িহীন, সমাজ পরিত্যক্তা মাদারি মা– জঙ্গলের মধ্যে শ্যাওড়া গাছের নিচে যার আশ্রয়, যে বাঁচে বনের পশুর নিয়মে; যার প্রতিদিনের খাদ্য তালিকা ভদ্রস্থ সমাজ-মানুষের কল্পনার বাইরে– সেই মাদারির মায়ের মত মানুষেরা সমাজ উন্নয়ন কিংবা তিস্তা ব্যারেজ দিয়ে কি করবে! "ভারতের উত্তরখণ্ডে স্বতন্ত্র রাজ্য দাবির ইতিহাসের সঙ্গে মাদারির মাকে অন্তর্ভুক্ত না করে দেবেশ রায় বিপ্রতীপ রাষ্ট্রভাবনার উজানে চলে যান। ...ব্যারেজ উদ্বোধনের মিছিলের আবর্তে মাদারির মা আবার সন্তান হারিয়ে ফিরে আসে তার শ্যাওড়াঝোরা রাষ্ট্রের পাতায় কুটিরে।" (আকতার, ২০১০ : ৭৬-৭৭)। অন্ত্যপর্বের শেষ অধ্যায়ে শেষ পঙ্‌ক্তিসমূহে তাই ঔপন্যাসিক লেখেন :

> মাদারির মায়ের দারিদ্র্যের মধ্যে ত কোনো গৌরব নেই, বড় বেশি অপমান আছে। সেই অপমানের বিচ্ছিন্নতাকে বিদ্রোহের বিচ্ছিন্নতা বলে ভাবার মধ্যে, তার সাতকাহন বৃত্তান্ত জানার মধ্যে, মিথ্যে কিছু থেকেই যায়। ভারতবর্ষে যারা কালি-কলম ব্যবহার করতে জানে, আমাদের মতো, তারা জানে না ভারতবর্ষের দরিদ্রতম ছ-সাত কোটির কথা কোন অক্ষরে লেখা হয়ে যায়। তাই অক্ষরজ্ঞানহীন এই বৃত্তান্ত যত লেখা হবে ততই মিথ্যা হবে 'সে কহে বিস্তর মিছা, যে কহে বিস্তর।' (দেবেশ, ১৯৮৩ : ৪৯১)

বাঘারু কিংবা মাদারির মা-র এই বিযুক্তি কিংবা বিজনতাই এই বৃত্তান্তের মূল সত্য হয়ে ওঠে; অপরদিকে অক্ষরসর্বস্ব রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায়ন উন্নয়নের প্রকল্প, রাজনীতি-সমাজ সংক্রান্ত বর্ণনা হয়ে পড়ে অবান্তর। জীবনধারণের এত নিম্নতম স্তরে তাদের অবস্থিতি যে বাঘারু কিংবা মাদারির মা-র নিঃসঙ্গতা ও দারিদ্রকে ঠিকভাবে পরিমাপ করা যায় না। এ প্রসঙ্গে সমালোচক লিখেছেন:

> দারিদ্র্য তো এই পরিবেশের সর্বাঙ্গে। সবরকমের ধূর্ততা, পচন ও সুবিধাবাদের মধ্যেও প্রাধান্য দারিদ্র্যেরই। শুধু তো খেতে-পরতে না পারার দারিদ্র্য নয়, অস্তিত্বের সর্বাঙ্গীণ দারিদ্র্য। পাঠকের বা এমনকী হয়তো লেখকেরও দারিদ্র্যকে চেনার যে পরিধি তাকেও ছাড়িয়ে যায় তা। সংবাদপত্রে, রাজনৈতিক নেতাদের ভাষণে, নিত্য প্রকাশমান নথিতে বা পরিসংখ্যানে যে দারিদ্র্যের কথা পড়ি

Dhaka University Institutional Repository

> বা শুনি, তাকে তুচ্ছ করে দেয় এই দারিদ্র্য। ...বাঘারুর সঙ্গে আমাদের অপরিচয় ততটাই যতটা আমাদের রাজনীতি-সমাজনীতি বা আমাদের চিন্তা-অধ্যয়ন বা আমাদের মানবিক আবেগ ছুঁতে পারে বাস্তবের ওপর স্তরকে। আমাদের জ্ঞানের বা অনুসন্ধানের যে নিরুপায় সীমাবদ্ধতা তারই যেন প্রতীক হয়ে ওঠে বাঘারুর এই অপরিচয়। ... এই স্বাতন্ত্র্য ও আবিষ্কারের ওপর জোর দেওয়ার জন্যই বাঘারুর উপস্থাপনার ডিটেল্‌সের মধ্যে একটা আতিশয্য-নির্ভর কমিকেরও আভাস হয়তো আসে; পাছে আমরা নিছক বাস্তবের সংজ্ঞাতেই তাকে চিহ্নিত করে ফেলি শুধু– এর প্রতীকরূপকে শনাক্ত করতে ভুলে যাই। (অরুণ, ১৪২১ : ১৫৯)

তিস্তাপারের বৃত্তান্ত উপন্যাসটি নিম্নবর্গের কথকতা কী না তা এ প্রসঙ্গেই আলোচ্য। নিম্নবর্গের স্বতন্ত্র ক্রিয়াকলাপ এবং রাষ্ট্র তথা আধুনিক ক্ষমতাতন্ত্রের সর্ববিস্তারী জাল– এই দুইয়ের সমন্বিত বিবৃতি *তিস্তাপারের বৃত্তান্তে* আছে। "তিনি (দেবেশ) চেষ্টা করেছেন elite-এর বিপরীত (other) হিসেবে সাবঅলটার্নকে কীভাবে নির্মাণ করা যায়। এছাড়া *তিস্তাপারের বৃত্তান্ত*-র নায়ক speaks, সে বলতে পারে, 'এ ভারতবর্ষ হামার দেশ নয়।" (সাধন, ২০১১ : ১১৯)। কিন্তু দেবেশ রায়ের উপন্যাসে ক্ষমতা বা কেন্দ্র কর্তৃক শোষণের বিপরীতে other অর্থাৎ অপরের প্রাসঙ্গিকতা এখানে এসেছে প্রত্যাখ্যানের সূত্রে। তিস্তা ব্যারেজ তৈরি, সরকারের খাস জমির অধিগ্রহণ নিয়ে বড়লোক জোতদার, টাকার মালি, ক্ষমতার মালিক নানা শ্রেণীর ও পেশার মানুষের রাজনীতি-সংযুক্ত ও বিবৃত অর্থনীতিই এ আখ্যানের একমাত্র ব্যাপার নয়। ব্যারেজ তৈরির ফলে মিছিলহীন ও নদীহীন সর্বস্বহারা বাঘারু এবং শ্যাওড়োঝোরার মাদারির মা ও মাদারির মূলত কোনো অর্থনীতি নেই, আছে শুধু শরীর– যা দিয়ে শেষ পর্যন্ত ঐ অর্থনীতিকে তারা প্রত্যাখ্যান করে। এই মানুষগুলোকে কোনো বর্গে বা অর্থনৈতিক শ্রেণিতে চিহ্নিত করা যায় না। এ আখ্যান "শেষপর্যন্ত তাই নদী-অন্বিত মানবসভ্যতার ক্ষমতায়ন ও উন্নয়নের রাজনৈতিক ইতিহাসকে প্রাকৃতিক-শারীরিক ব্যক্তিকর্তৃক প্রত্যাখ্যানের ইতিহাস, আবার একইসঙ্গে ক্ষমতালিপ্সু ব্যক্তিবর্গ কর্তৃক ঐ প্রকৃতি-শরীরকে নিরন্তর ভাঙাগড়ার নাট্যমঞ্চও বটে।" (আকতার, ২০১০ : ৮২)। আর দেবেশের উপন্যাসে নিম্নবর্গের চরিত্রায়ণ প্রসঙ্গে বলতে হয়– বাঘারু, মাদারির মা কিংবা খেতখেতু-টুলটুলি (*মফস্বলি বৃত্তান্ত*), রাধিয়া-কেলু (*সময় অসময়ের বৃত্তান্ত*) ইত্যাদি চরিত্রগুলো "বাংলা উপন্যাসের জগতে আসেনি সাব-অলটার্ন স্টাডিজের-এর প্ররোচনায়। অভিজ্ঞতার চাপ ও মানবমুক্তির যথার্থ কল্পনাই দেবেশকে দিয়ে গড়িয়ে নিয়েছে এইসব চরিত্র। এর কোনোটাই তত্ত্ব নয়। দেবেশের উপন্যাসের গঠন বেরিয়ে এসেছে সেখান থেকেই– কোনো স্ট্রাকচারালিজমের কোনো ঘরানা থেকে নয়।... একটি চরিত্রের প্রাধান্যকে হারিয়ে

Dhaka University Institutional Repository

বহু চরিত্রের স্বর, বহু কাহিনীর স্বাধিকার, আদিমধ্যঅন্ত্যহীন অনিঃশেষ বিস্তার যদি উপন্যাসের একটি স্বতন্ত্র ও অমোঘ ভাষাকে জন্ম দিয়ে থাকে, তা তো তৈরি হয়েছে সত্যিকারের বাঙালি অভিজ্ঞতারই রোদেজলে।" (অরুণ, ১৪২১ : ১৭৩)। এ উপন্যাসে নিম্নবর্গ প্রসঙ্গে যদিও কোনো সমালোচক মনে করেন :

> দেবেশ রায় 'তিস্তাপারের বৃত্তান্ত' নামক মহাকাব্যিক আখ্যানে ও অতি সাম্প্রতিক যোগেন মণ্ডল সংক্রান্ত উপন্যাসের বয়ানে নিম্নবর্গীয় পরিসরকে নতুন প্রকরণে পুনরাবিষ্কার করতে চেয়েছেন। (তপোধীর, ১৪২০ : ২৭)

তবে এই আখ্যানে নিম্নবর্গীয় চেতনার অনুসন্ধান একমাত্রিক বা সর্বাগ্র নয়। অর্থাৎ এটি কেবল নিম্নবর্গেরই আখ্যান নয়।

তিস্তাপারের বৃত্তান্ত উপন্যাসটি আঞ্চলিকতায় বিশিষ্ট কী না সে প্রসঙ্গটিও বিবেচ্য। সাধারণত আঞ্চলিক উপন্যাসে নির্মিত জীবনদর্শন, ভাষা-সংলাপ, ঘটনা কিংবা চরিত্রায়ণ– সবকিছুই একটা নির্দিষ্ট আঞ্চলিক ভাব ও আবহকে উপস্থাপন করে; যদিও তা বৃহত্তর সমাজ ও জাতীয় জীবনের সঙ্গে সম্পর্কহীন নয়। একটি অঞ্চলের বহমান সংস্কৃতি, নৃতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য, ভাষাভঙ্গি, ভৌগোলিকতা, স্থানিক রং প্রভৃতির সমবায়ে পূর্ণ জীবনকে রূপ দেয়ার সূত্রে *তিস্তাপারের বৃত্তান্ত*কে আঞ্চলিকতা-বিশিষ্ট বললে ক্ষতি নেই। তবে এর চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল– বিবর্তিত সময় ও সমাজ-রাজনীতি-অর্থনীতির পালাবদল এবং আন্তর্জাতিক ব্যবস্থার সমান্তরালে নির্দিষ্ট ভৌগোলিক পরিসীমার যে পরিবর্তন ঘটে– একটা বিশেষ অঞ্চলের আবহামান ইতিহাস-ঐতিহ্য-সংস্কৃতি লালিত প্রাকৃত জনমানুষ সে বিবর্তনের দ্বারা প্রভাবিত কীনা তার ইতিকথা রূপায়ণের আলোকে বৃত্তান্তটি বিবেচ্য। বহমান তিস্তা নদী ও পরবর্তীকালে নির্মিত তিস্তা ব্যারেজকে কেন্দ্র করে উপন্যাসটি এগিয়েছে। সেইসাথে পারিপার্শ্বিকতায় অবস্থানরত ব্যক্তিবর্গের ক্রিয়াকর্ম, চিন্তাধারার মাধ্যমে তিস্তা, জলপাইগুড়ি ও তৎসংলগ্ন সমতল ও বনভূমির সামাজিক-সাংস্কৃতিক-রাষ্ট্রীয় অর্থনৈতিক উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। আর্থসামাজিক রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে উচ্চ, মধ্য ও নিম্ন সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষজনের উপস্থিতি এই বৃত্তান্তে দেবেশ রায়ের মার্কসীয় চেতনাসমৃদ্ধ জীবন দৃষ্টিভঙ্গির প্রকাশেরই অংশ। তিস্তাপারের স্থানিক আয়তন এর কথনকে সংহত করেছে বলেই সমালোচকের মত। (অনিন্দ্য, ২০১২ : ১৪২)। স্থান নাম যেমন – ক্রান্তিহাট, আপলচাঁদ ফরেস্ট, গাজলডোবা, নিতাইদের চর, মালবাজার, চালসা, মাদারিহাট ইত্যাদি), স্থানিক নিসর্গ-ভূপ্রকৃতি, স্থানিক রাজনৈতিক বাস্তবতা (এম-এল-এ ও পিডব্লিউডি

Dhaka University Institutional Repository

ইঞ্জিনিয়ারের ব্রিজকেন্দ্রিক রাজনীতি, গয়ানাথ জোতদার-ব্যারেজপ্রকল্প-উত্তরখণ্ড রাজনীতি, বামফ্রন্ট-উত্তরখণ্ড পার্টি রাজনীতি), স্থানিক অর্থনীতি (জমি ও ফসল, জঙ্গল ও অর্থ, চর ও কৃষি, চা-বাগান ও চা-শ্রমিক, বন ও বাথান), স্থানিক সংস্কৃতি (তিস্তাবুড়ির পূজা, বাঘারুর সঙ্গীত), বসতিকেন্দ্রিক সামাজিক বাস্তবতা (রাজবংশী-ভাটিয়া)– এইসব স্থানিক প্রসঙ্গ ও বাস্তবতাকে উপস্থাপন করতে চায় বলেই "উপন্যাসের পর্ব-বিন্যাসে কথন কিছু কিছু ঘটনা তৈরি করে নিয়েছে। অনুপুঙ্খ কথন-ক্রিয়ার সমাহারে এই বৃত্তান্তের কথক ঘটনা নির্মাণ করেন।" (অনিন্দ্য, ২০১২ : ১৪৪)। তাছাড়া কেবল তিস্তাপারের বাসিন্দাই নয়, উত্তরবঙ্গের বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে সুদূর অতীতকাল থেকে গোষ্ঠীবদ্ধভাবে বসবাস করে আসা রাজবংশী সমাজের পেশা, জনজীবনের পরিচয় বিশেষত তাদের মুখের প্রকাশে ভাষা দেবেশ রায়ের নিরীক্ষা এ বৃত্তান্তের অন্যতম সফলতা। উপজাতি আদিবাসী রাজবংশী, নমঃশূদ্র, কোচ, বোরো, যারা শত বছর ধরে মিলিয়ে যেতে চেয়েছে হিন্দুসমাজের সাথে, কিন্তু হিন্দুসমাজ তাদের গ্রহণ করেনি। যদিও এরাই ভারতের উত্তরাঞ্চলের ইতিহাস-স্রষ্টা। এরাই তিস্তা-কাহনেরও রচনাকার। "বৃত্তান্ত তো কথকিয়া লিখছেন না, কখনো হাটুরেদের কথা, শব্দ, ভাষায় লেখা হয়ে যাচ্ছে অঞ্চলের ইতিহাস। সেই সঙ্গে আঞ্চলিক ভূগোলকে চিনিয়ে দিয়ে যাচ্ছেন কথকিয়া।" (মনোরঞ্জন, ১৪২১ : ২২৩)। দেবেশের কথাসাহিত্যে রাজবংশী ভাষা ব্যবহৃত হয়েছে দুই প্রকারে, প্রথমত সংলাপের মধ্য দিয়ে, দ্বিতীয়ত বর্ণনা অংশে। সাহিত্যে উপভাষা বিশেষ করে রাজবংশী ভাষার প্রয়োগ সম্বন্ধে দেবেশ রায়ের বক্তব্য নিম্নরূপ :

> আমি রাজবংশী ভাষা রাজনীতির প্রয়োজনে শিখেছি, যখন শিখলাম একবারও ইচ্ছে হয়নি ঐ রাজবংশী ভাষায় আঞ্চলিক গল্প লিখব। আমার মনে হয়েছিল ঐ রকম আঞ্চলিক লেখালিখির দরকার নেই। কিন্তু হঠাৎ আবিষ্কার করলাম, স্বাভাবিক গদ্যে একটা গল্প এগচ্ছে হঠাৎ একটা রাজবংশী সংলাপ এসে গেলে, সেখানে গল্পটার আখ্যানভাগ একটা অন্য অর্থের মধ্যে ঢুকে পড়ছে, সেখানে থেকে আবার বর্ণনার ভাষায় চলে আসতে পারছি। আখ্যানটাকে দু-তিনটি স্তরে কাজ করানো যাচ্ছে। ...আখ্যানের ধরন যে বদলে যেতে পারে, দু- তিনটি স্তরে যে আখ্যানকে ছড়িয়ে দেখা যায় এটা আমি জেনেছি রাজবংশী ভাষা শিখবার পর, রাজবংশীদের মধ্যে পার্টির কাজ করতে করতে, রাজবংশী বাচন থেকে। (দেবেশ, ২০০৩ : ১৯৫-১৯৬)

উক্ত বক্তব্যে দেবেশ রায়ের উপভাষা প্রয়োগ-বিষয়ক প্রস্তাব ঔপন্যাসিক হিসেবে তার উদ্দেশ্যকেও ব্যাখ্যা করে। *তিস্তাপারের বৃত্তান্ত* উপন্যাসে যদিও কথক স্থানিক নিসর্গ, স্থানিক ভূ-প্রকৃতি-অর্থনীতি-রাজনীতি ও রাষ্ট্রব্যবস্থা ও স্থানিক জনমানুষকেন্দ্রিক সন্দর্ভ রচনা করেছেন তবু এটাকে 'আঞ্চলিক

Dhaka University Institutional Repository

উপন্যাস' আখ্যা দেওয়া কঠিন। প্রাসঙ্গিক ঐতিহাসিক ভৌগোলিক সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক সূক্ষ্মতায় যাপিত জীবনধারা সম্পর্কে ঔপন্যাসিকের সমৃদ্ধ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা এবং তা রূপায়ণে তার মমত্বময় উদ্যোগে উপন্যাসটি বিশিষ্ট হয়েছে। আঞ্চলিক অনুপুঙ্খের তথা অভিজ্ঞতার, অফুরন্ত বিপুল যোগানে সমৃদ্ধ বৃত্তান্তটিকে সাংস্কৃতিক ভাষান্তর বা অনুবাদও বলা চলে। কারণ এতে রয়েছে সাংস্কৃতিক প্রত্যন্তের সযত্ন পরিশ্রমী ও আন্তরিক খোঁজ। বাংলা সাহিত্যের অনেক আঞ্চলিক উপন্যাস থেকে *তিস্তাপারের বৃত্তান্ত* কেন পৃথক, সে প্রসঙ্গে সমালোচক লিখেছেন :

> এর আখ্যান-ন্যায় বাবদ অন্যান্য অনেক আঞ্চলিক উপন্যাস থেকে পাঠ্যটিকে যে পৃথগীকৃত করে নেওয়া সম্ভব, তার সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ কারণ হল নিছক আধার হিসেবে বাইরে থেকে দেশকাল পরিধিকে চিহ্নিত করেই আঞ্চলিকতার দায় সেক্ষেত্রে চুকোচ্ছে না, অনেকদূর পর্যন্ত প্রবিষ্ট হয়ে তা সমীকৃত হচ্ছে অন্তর্বস্তুর সঙ্গে; এই অর্থে অধিকরণ বা আধার কেবল নয়, তা আধেয়ও বটে। সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যসহ দেশকালপট, অর্থাৎ ইতিহাস ও ভূগোল, উপন্যাসের অন্তর্বস্তুর সঙ্গে একীভূত হচ্ছে। ...আঞ্চলিকতার যুক্তি তৈরি হচ্ছে একই সঙ্গে পাঠ্যের ভিতর ও বাইরে থেকে। (অনিরুদ্ধ, ১৪২১ : ৭২)

তাছাড়া এই কথকতা প্রায়শই একজন নাগরিক লেখকের, শিক্ষিত-মধ্যবিত্তের রাজনৈতিক-সামাজিক-নৃতাত্ত্বিক-ভৌগোলিক-সাংস্কৃতিক জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার আলোকে বিশ্লেষণে এবং ব্যাখ্যায় সমৃদ্ধ। বাঘারু এই কথকতার কেন্দ্রবিন্দু, তার কোনো ভাষা নেই, কেবল আছে শরীর– তিস্তার শরীরই যেমন তারা ভাষা, বাঘারুর শরীরই তার ভাষা– চেতন-অচেতনের, জীব-জড়ের দ্বিত্ব-সম্পর্কে বাঘারু ও তিস্তাকে ধরে রেখে কথক এই দুই প্রকৃতির (নিসর্গ আর মানব) ভাষার সঙ্গে পরিচিত করান পাঠককে। বৃত্তান্তের শেষে অনিঃশেষ বৃত্তান্তের চলমানতা আর অপরিবর্তনীয় বাঘারুর পরিচয় দেন ঔপন্যাসিক :

> এই *তিস্তাপারের বৃত্তান্ত* প্রাকৃতিক তিস্তার সঙ্গে মানুষজনের সহবাসের রীতিনীতির বৃত্তান্ত। গয়ানাথের সঙ্গে তিস্তার সহবাসের একরকম রীতিনীতি, নিতাইদের সঙ্গে আর-এক রকম আর সীমান্তবাহিনীর সঙ্গে অরো এক রকম। বাঘারুর রীতিনীতি বলে কিছু নেই। তিস্তা তার নদীস্বভাবে প্রাকৃতিক, সে জল ছাড়া আর কিছু নয়। বাঘারু তার মানবস্বভাবে প্রাকৃতিক– সে কেবল মানুষ, একজন মানুষ ছাড়া আর কিছু নয়।
>
> এই বৃত্তান্ত লেখা এখানেই শেষ হল। তিস্তা ব্যারেজ আরো কয়েক বছর পর শেষ হবে। তখন সেই নতুন, মানুষের তৈরি নদীর সঙ্গে মানুষজনের সহবাসের রীতিনীতি একেবারে আমূল বদলে

Dhaka University Institutional Repository

> যাবে। কত দ্রুত আর কতটাই আমূল যে তা বদলায়– তা বদলানোর আগে আমরা ধারণাও করতে পারি না, বদলানোর পরও মাপতে পারি না। (দেবেশ, ১৯৮৮ : ৪৯৫)

বাঘারু ও তিস্তার পরিবর্তিত রূপের মধ্য দিয়েই কিংবা মাদারির মা-র স্বতন্ত্র রাষ্ট্র-পরিচয়ে অথবা তিস্তার বন্যায় সীমান্ত মুছে যাওয়ার মুহূর্তে নাম-দেশ-পরিচয়হীন অসহায় মেয়ের ভেজা ধর্ষণে এ বৃত্তান্ত ভিন্ন বয়ানে বিন্যস্ত হয়। এতে তিস্তাপারের জনগোষ্ঠীর বহমান জীবনধারা শিল্পসম্মতভাবে প্রযুক্ত হলেও বৃত্তান্তটি অঞ্চল বা দেশকালের সীমা অতিক্রান্ত হয়ে ওঠে। আর ব্যারেজশোভিত তিস্তা কিংবা প্রশাসনরক্ষিত আপলচাঁদ ফরেস্ট ছেড়ে মাদারির হাত ধরে বাঘারুর নিরর্থক, নিরুদ্দেশ পরিক্রমায় সৃষ্টি হয় মহাকাব্যিকতার সুর। সমালোচকের ভাষায় :

> রূপকথার স্বপ্ন ছেঁড়া অরণ্য স্বদেশ ছেড়ে Diaspora বাঘারু চলে যাচ্ছে। পিছনের পথে পড়ে রইল ভাঙা ইতিহাসের টুকরোগুলো। ...
>
> বাঘারু চলে যাচ্ছে।
>
> সে কি আবার ফিরে পেতে চাইবে নতুন কোনো অরণ্য লাবণ্য?
>
> জানে না ইতিহাস...
>
> অথবা নতুন কোনো স্রোতস্বতী জননী প্রবাহিনীকে ?
>
> কে জানে...
>
> হাঁটছে বাঘারু...
>
> ভাঙতে ভাঙতে যাচ্ছে কথকের দেওয়া অপমানের অন্ধকার আবরণকে। ছিন্ন করে যাচ্ছে মাটির বঞ্চনা, ভূমি আধিপত্যকে।
>
> হাঁটছে বাঘারু...
>
> চলেছে যেন নেই দেশ, নেই সময়, নেই ঘর, নেই স্বজন, নেই সমাজ, নেই রাষ্ট্র, নেই ইতিহাস, নেই ভূগোলের দেশে।
>
> হাঁটছে বাঘারু নয়...
>
> জীবন...
>
> আবহমানকালের...। (মনোরঞ্জন, ১৪২১ : ২২৯)

তিস্তা কাহনের রচনাকার এভাবেই ইতিহাস, সমাজতত্ত্ব আর নৃ-তত্ত্বের নির্যাস নিষ্কাশন করেন। এই সন্দর্ভের সাথে জড়িয়ে আছে মহাকাব্যের মতই জনজাতি গোষ্ঠীর পরিচয়, বংশ-কুলশাস্ত্র কিংবদন্তী, প্রবাদ, প্রত্ন-পুরাণ সর্বোপরি জীবন সমগ্রের চিহ্নায়ন। সময়-সমাজ-রাষ্ট্র ইতিহাসের জালে জড়িয়ে

Dhaka University Institutional Repository

পড়া জীবনকে, এর যাত্রাপথকে সাহিত্যকথায় বর্ণাভ করে কথক এক অন্ত-অনতিক্রম্য বৃত্তান্ত রচনা করেছেন, যা উপন্যাসেরই নতুন ধরনকে তুলে ধরে।

খ. মফস্বলি বৃত্তান্ত

মফস্বলি বৃত্তান্ত গ্রন্থাকারে প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৮০ সালে। এর পূর্বে ১৯৬৮ থেকে ১৯৭৪ পর্যন্ত বিভিন্ন পর্বে উপন্যাসটি শারদীয় 'কালান্তর', 'দেশ' সাপ্তাহিক-এ বেরিয়েছে। ১৯৮৯-এ উপন্যাসের পরিবর্তিত ও বর্ধিত সংস্করণ বের হয়, যেখানে সপ্তম পরিচ্ছেদ নতুন করে যোগ হয়।

নিঃস্ব ভাগচাষি কৃষক-জীবনের এক অনন্য দলিল *মফস্বলি বৃত্তান্ত*। ভাগচাষি বা আধিয়ার খেতখেতু ও তার পরিবারের রূঢ় জীবন যুদ্ধের এই ভাষ্য দেবেশ রায়ের স্বদেশ আবিষ্কারেরই এক ভিন্ন আয়োজন। "কেবল স্বদেশ নয়, প্রকৃতি ও মানবজীবনের মৌল স্বরূপকে স্বদেশেরই আঙ্গিনায়" (অরুণ, ১৪২১ : ১৫০) ধরার এক চেষ্টা আছে এ বৃত্তান্তে। ফলে এর প্রতিপাদ্য হয়ে উঠল কৃষকের জীবন ও মানস, যার সঙ্গে প্রকৃতির সম্পর্ক সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ, বিচিত্র ও আমূল।

জলপাইগুড়ি ডিভিশনের আলিপুরদুয়ার, কোচ বিহার, দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি ও কালিম্পং এবং মালদা বিভাগের উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর ও মুর্শিদাবাদ, বিহারের কিছুটা অংশ মিলিয়ে ভারতের উত্তরবঙ্গ এলাকা। দেবেশ রায়ের *মফস্বলি বৃত্তান্তে* এই উত্তরবঙ্গ এলাকার কৃষক-জীবন চিত্রই প্রতিফলিত হয়েছে, যেখানে উৎপাদন কাঠামোর রূপ-রূপান্তরের বাস্তবতাও বিবৃত হয়েছে সূক্ষ্ম বিশ্লেষণে। উপন্যাসে এই বঙ্গের কৃষক-প্রসঙ্গ রূপায়ণের যৌক্তিকতা প্রসঙ্গে সমালোচক বলেন :

> আমাদের দেশের ও কালের অভিজ্ঞতায় উত্তরবঙ্গের নিঃস্ব কৃষকের বাস্তবেই তা সবচেয়ে তীব্রতা পেতে পারে। উত্তরবঙ্গের কৃষকজীবনের সঙ্গে নিবিড় ও প্রত্যক্ষ সংলগ্নতায় এবং কৃষি ও কৃষকজীবনের বিষয়জ্ঞানে তিনি সে-বাস্তবকে সত্য করে তোলেন, এতই নিশ্চয়তা শিল্পের পর্যবেক্ষণে। (অরুণ, ১৪২১ : ১৫০)

মফস্বলি বৃত্তান্ত লেখা হয়েছিল ১৯৭৪ সালে এবং এর আগে। ১৯৬২ থেকে ১৯৭২ পর্যন্ত উত্তরবঙ্গে কমিউনিস্ট পার্টির প্রায় সার্বক্ষণিক কর্মী হিসেবে এই অঞ্চলের গ্রামের সঙ্গে, গ্রামের মানুষের সঙ্গে,

Dhaka University Institutional Repository

তাদের জীবনযাপন ও ভাষার সঙ্গে দেবেশের নিবিড় সংযোগ ঘটে।[২] তবে এ সূত্রে *মফস্বলি বৃত্তান্ত*কে আঞ্চলিক উপন্যাস হিসেবে শনাক্ত করা যায় না। *মফস্বলি বৃত্তান্তে*র মূল ইতিহাস ক্ষুধা। আধিয়ার খেতখেতু তার বউ টুলটুলি, তার তিন সন্তান– বেঙ্গু, বৈশাখু, খেতেশ্বরী ও খেতখেতুর ভ্রাতুষ্পুত্র চ্যারকেটু– এক একটি অধ্যায়ে এক একজনের বৃত্তান্ত; ক্ষুধার ইতিহাসে এক-একটি বৃত্তান্ত আলাদা। চরিত্রেরা এ কারণেই বারবার ধানের ক্ষেতের পাশ দিয়ে হেঁটে যায়, যেখানে নিসর্গ তার পুরো সৌন্দর্য নিয়ে নির্বিকার দাঁড়িয়ে থাকে। উপন্যাসের মূল পটই যেন প্রকৃতি, পরিবেশ দ্যোতনা যেখানে প্রায় অলৌকিক হয়ে ওঠে। বৃত্তান্তের আদিতে চ্যারকেটুর সাথে গভীর-রাতের প্রকৃতিকে মিলিয়ে ঔপন্যাসিকের বর্ণনা এক অন্তলুপ্ত, অনিঃশেষ বিস্তৃতি পায় :

> ঝাঁপটা ঠেলে (ঘুমকাতুর) চ্যারকেটু বাইরে বেরয়। সারারাত হিম পড়েছে, ফলে উঠোনটা ভিজে, পায়ের তলে ভেজা। জ্যোৎস্নায় অবিশ্যি মনে হতে পারে জ্যোৎস্না মাটিতে মিলে আছে। উঠোনে দাঁড়িয়ে চ্যারকেটুকে সামনে-পিছনে ধানখেত, দুই ভিটের দুই ঘর, নীল জ্বলজ্বলে প্রায় তারাহীন আকাশ, পশ্চিমের আকাশের চাঁদ এই সবের তদারকি করে দুই হাত ওপরে তুলে একটা সশব্দ হাই তুলতে হয়। একটিমাত্র নেংটিতে চ্যারকেটুর প্রায় ন্যাংটো তরুণ শরীরের সেই হাই-তোলা ভঙ্গিমার ভেতর চাঁদ-চাঁদনি-আকাশ-ধানখেত ইত্যাদির সঙ্গে একটা পারিবারিকতা প্রকাশ পায়। যেন ঘরের ভেতরে মাচানের ওপর শোয়া, আর এই উঠোনে দাঁড়িয়ে থাকা বা উত্তরের ঘরের সিঁড়ির গাছের গুঁড়িটাতে একটু বসা বা আকাশে চাঁদ থাকা– এ সবের ভেতর এমন কোনো পার্থক্য নেই। (দেবেশ, ১৯৮০ : ২২-২৩)

প্রকৃতি-সংলগ্ন চ্যারকেটুর উপস্থাপনায় বোঝা যায় না তার শরীরে তখন তিনদিনের বাসি খিদে, জিভে জলতৃষ্ণা। বরং চ্যারকেটুকে সঙ্গ দেওয়া নির্বিকার নিসর্গের বিবরণ আরো বিস্তৃত ও বিশদ হয়ে ওঠে; চ্যারকেটুও হয়ে ওঠে জ্যোৎস্নাস্নাত :

> এখন, কার্ত্তিকের এই জ্যোৎস্নাময় ঘরটার দিকে তাকালে, চ্যারকেটুর বেশ ভালই লাগে। রাতভর হিমে চালের ভামনি ভেজা। চাঁদ পূর্ব দিকে থেকে দক্ষিণের আকাশ দিয়ে এখন পশ্চিমে। এখন, সম্পূর্ণ আকাশে টুকটুকে নীলে একটিমাত্র সম্পূর্ণ চাঁদ আর হিমে ভিজে উঠোন জ্যোৎস্নায় ভিজে, আর উত্তরের ঘরের সিঁড়ির গাছের গুঁড়ির ওপর নগ্ন চ্যারকেটুর বুক থেকে পায়ের নখ পর্যন্ত সেই জ্যোৎস্নায়, শুধু যেন মাথাটুকু জ্যোৎস্নায় ওপর ভাসিয়ে রাখা... যেন চরাচরে চাঁদ-চাঁদনি-আকাশ-প্রান্তর চ্যারকেটু ছাড়া আর কেউ নেই। (দেবেশ, ১৮০ : ২৩)

Dhaka University Institutional Repository

জ্যোৎস্নাঘেরা ধানক্ষেতের সামনে দাঁড়িয়ে চ্যারকেটু পরিবারের ভাত খাওয়ার মুখ আর ভাগা জমি থেকে বছরের ধানের বা চালের অপারগ বন্দোবস্ত নিয়ে ভাবে, প্রকৃতি হয়ে ওঠে এক থাল ভাতের গদ্য-কবিতা :

> ধর কেনে এই মোট পনের-বিশ মণ ধানত তিনখানা পুরাপ্যাট আর তিনখানা আধাপ্যাট কি তামান্ বছর চলিবার পারে ? প্যাটত্ দুইদিন ভাত না পড়িলেই ভাতটার কথা আর মনত্ আইসে না। এই জোছ্নার আলোর নাখান্ ভাতখান্ এ্যানং কিছু হবা পারে, যেইলা, এ্যানং মাঝরাতত্ পিথিমিলা আর আকাশলায় ভাসি্ বেড়ায়, জাগিবার পারে, ধানখ্যাতত্ খাড়িবার পারে। ভাত আর চাঁদ একো জিনিশ, আকাশত্ থাকে মাঝরাতত্। (দেবেশ, ১৮০ : ২৩)

আবার শীতের শেষরাতে মাচান থেকে নেমে প্রকৃতির প্রায় কাব্যিক পরিবেশে ক্ষুধার্ত চ্যারকেটুর মূত্রত্যাগের দীর্ঘস্থায়ী বর্ণনায় এক ধরনের আয়রনিও প্রকাশ প্রায়। এই ব্যঙ্গ প্রসারিত হয় চ্যারকেটুর পোস্টার সংগ্রহের দীর্ঘতর চিত্রে। কঠোর শ্রমে, ধৈর্যে ও চাতুরিতে অঞ্চল-অফিস থেকে গ্রামোন্নয়ন বা ভোটের সময় চলে আসা রং-বেরঙের পোস্টার সংগ্রহ করে এবং তার জীর্ণ কুঁড়ের বেড়ায় কীভাবে সেগুলো পাটকাঠি বা গাবের আঠায় লাগানো যায় তা নিয়ে চিন্তা করে চ্যারকেটু। কথকের বিবরণ :

> এই ঝুরঝুরে ঘরে নানা রঙের নানা রকমের পোস্টার। পরিবার পরিকল্পনা, বসন্তরোগ নির্মুলকরণ, সার, পাম্প, অধিক ফলনশীল ধান, জোড়া বলদ, কাঁচি দা ও ধানের শিষ, ইন্দিরা গান্ধি, হাতুড়ি-তারা, গাই-বাছুর। নানা রং, নানা ছবি। ... যেমন-যেমন ফাঁক তেমন-তেমন পোস্টার ত আর জোগাড় হয় না। তাই এই ঘরের ভামনি, বেড়া, বাতার মত পোস্টারগুলোতে ঝুরঝুরে হয়ে যায়। তখন বৃষ্টির ছাঁট বাছুরের গায়ে যাতে না-লাগে সেই উদ্দেশ্যে টাঙানো পোস্টারটা, বাছুরটা বিক্রি হয়ে যাওয়ার পরও খুলতে গেলে, ঝরঝর করে ঝরে যায়। (দেবেশ, ১৯৮০ : ২১)

এসব চিত্রে শ্লেষকে অতিক্রম করে গভীর হয় পরিস্থিতির কারুণ্য ও বিষাদ; দরিদ্র কৃষকের অস্তিত্বের আর্তনাদ ঘনীভূত হতে থাকে। এই বিপন্ন বাস্তবতার রূপায়ণ প্রসঙ্গে সমালোচক লেখেন :

> দেবেশ রায় যখন তাঁর *মফঃস্বলি বৃত্তান্ত* উপন্যাসের মাধ্যমে চ্যারকেটু চরিত্রের ক্ষুধার সঙ্গে গাছ পাতা ডাল শিকড় প্রকৃতি হয়ে নিজেই সত্তাগত অবলোপে মিশে যেতে থাকেন– তখন বোঝা যায়– উভয়ের এই তৃণভূমি, ধানগোছা, জ্যোৎস্না ও নিসর্গনির্ভর বহুস্বরিক ডিসকোর্স বিশ্বায়নজাত বিনোদন প্রক্রিয়ার বাইরের জীবনচরিতেই ক্রমাগত স্বস্তি খুঁজছে। ক্ষুধা থেকে দীর্ঘতর ক্ষুধার দিকে

Dhaka University Institutional Repository

> যেতে যেতে এমন এক আশ্রয়ী সামাজিকতার ইতিহাস খুঁজছে, যে ইতিহাস জেগে থাকে একটা দেশের বীক্ষাগত সংহতির ভেতরেই। (জহর, ২০০৭ : ৬৯)

পাকা ধান ও সেদ্ধ ভাতের জন্য অপেক্ষিত সময়ের বিবরণে চ্যারকেটুদের ক্রমান্বয়ে বিষাদ তীব্রতর হয়। ভাত খাওয়ার পর দুই রাত পোয়ানো একটা পরিবারের সম্পূর্ণ খিদে নিয়ে জেগে ওঠা ও উদিত সূর্যের সকালের বর্ণনা :

> দিগন্ত আকাশ, ধানখেত, টসটসে পাকা ধানখেত, আর একটু ওম-ধরানো কার্তিকের কুয়াশাভেদী সূর্য– এ-সবই পুরনো।
>
> ধানগুলো পেকে এমন টসটসে যে-কোনো মুহূর্তে কাটা শুরু হতে পারে। কখনো-সখনো এক-আধ পেট ভাত খেয়ে না-খেয়ে, ভাতের ফেন না-খেয়ে, ভাতের ফেন জমিয়ে রেখে সারাদিন ধরে খেয়ে, বা মাঠঘাট থেকে কচু তুলে এনে-এনে সিদ্ধ করে খেয়ে, গেল-বছরের ধানের পুরনো খিদেটাকে সামলে সুমলে এখন নতুন বছরের নতুন ধানকাটার সেই মুহূর্তটি গোনা হচ্ছে। ... এই নতুন বছরের নতুন ধানের আদিগন্ত বিস্তারে এরা এদের বাসি পুরনো খিদে নিয়ে বসে থাকে। (দেবেশ, ১৯৮০ : ৩১-৩২)

খেতখেতুর ছেলেমেয়ের আচরণ আর কান্নাতেও স্পষ্ট হয় এই অসহায়তা। তোবড়ানো অ্যালুমিনিয়ামের গ্লাসে বাসি ফ্যান বাচ্চাদের মুখে পর্যায়ক্রমে ধরে টুলটুলি, অবশ্যই প্রত্যেকে কয় ঢোক খাবে তার হিসেব মাপা। ছোট এক ঢোক ফ্যান খেতে থাকা খেতেশ্বরীর মুখ-শরীরের স্নায়বিক সংবেদনাময় চিত্র :

> গেলাশটা ঠোঁটে নিয়ে, কাত করে, গেলাশের কানাটা নাকের ডগায় লাগিয়ে ঘণ্টা কাটিয়ে দেয়। যতক্ষণ-না সে খাচ্ছে, খেয়েই যাচ্ছে, এই ঘটনাটা থেকেও প্রবলতর হয়ে ওঠে তার খিদে। তার চোয়ালের হাড় সামান্য নড়ে, চোখের পাশের শিরাটা দবদব করে, যত বেলা তত বেশি দবদব করে, কপালে বিনবিন ঘাম জমে, টলটল করে, ভেঙে গড়িয়ে যায়, ঐটুকু ছোট্ট কপাল জুড়ে ঘামের রেখায়-রেখায় কত রকমের নকশা তৈরি হয়, ভেঙে যায়। কান পাতলে গেলাশের সঙ্গে দাঁতের ঘষায় কুরকুর আর জিভের চুকচুক শব্দ শোনা যায়, গভীর রাতে শেয়ালের হাড় চিবুনোর শব্দের মত। (দেবেশ, ১৯৮০ : ৩৩)

আর শেষ পর্যন্ত শূন্য গেলাশটাই মাটিতে পড়ে যায়। সামান্য চাল সংগ্রহের জন্য মরিয়া খেতখেতু বেরিয়ে পড়লে তাকে দেখতে না পেয়ে, পাখির মতো স্বরে খেতেশ্বরী ডেকে ওঠে– "বাপা হে"।

Dhaka University Institutional Repository

(দেবেশ, ১৯৮০ : ৩৭)। আট বছরের বৈশাখু আর ছয় বছরের বেঙ্গু মা-র পিছু পিছু হাঁটতে থাকে এবং পথ হারিয়ে ফেলে। তালমা নদীর পাড়ে বিকল্প খাদ্য হিসেবে কচু বা শিকড় তুলতে যায় টুলটুলি। পথভোলা দুই শিশু তখন ধানের ক্ষেতের মধ্যেই ভাতের গল্প করে করে ক্ষুধাকে তাড়াতে চায়। প্রকৃতি ও মানুষের মৌলিক অন্বয় যেন এই দুই শিশুর কান্নায় চিহ্নিত হয়ে যায়; আর তখন তা পশু-পাখিদের খাদ্য-আর্তির মতই শোনায় :

> সেই গর্তের ভেতর পাকা ধানগাছে ঢাকা বেঙ্গু কাদাজলে দাঁড়িয়ে বুকের কাছে হাত দুটি জড়ো করে কেঁদে ফেলেছে– কাউকে শোনানোর কান্না নয়, যাতে কেউ শুনতে না পায় সেইজন্য চাপা কান্না, পেটের কোনো গভীরে গভীরতর ক্ষুধার মতো ভয়ের কান্না। গর্তের ওপরে ধানগাছের গোড়ায় পাকা ধান-খেতে ঢাকা বৈশাখু কাঁদে– এত ধান কবে ভাত হবে! আর তারও ওপর দিয়ে সেই কার্তিকে, সেই পাকা ধানের স্রোত বয়ে যায়। (দেবেশ, ১৯৮০ : ৪৪)

বাসি পুরনো খিদে আর নতুন পাকা ধানের এই দ্বন্দ্ব ক্রমেই তীব্র হয়ে ওঠে। একদিকে প্রকৃতির সৌন্দর্যময় সম্মোহনী পটভূমি, অপরদিকে অপেক্ষমান রূঢ় বাস্তব– এই বৈপরীত্যই যেন এ আখ্যানের রূপকল্প হয়ে ওঠে। ক্ষুধাকে স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর করার জন্যই সোনালি ধানক্ষেতের চিত্র আসে বারবার। আর তখনও নির্জন অব্যবহৃত সেই ক্ষেতের চিত্র আধিভৌতিক হয়ে ওঠে :

> পাকাধানে কার্তিকের মাঠ এত জনহীন আর সারারাতের হিমের ভারে ধানগাছের সারি এত নোয়ানো আর রোদ যেন খানিকটা মিয়নো– সকাল বয়ে গেলেও মনে হয় না সকাল হয়েছে। এরই মধ্যে বাতাস বয় বলে ধানখেতব্যাপী দিগন্ত থেকে দিগন্ত হিল্লোলিত হয়ে যেতে থাকে– নইলে এত নির্জনতাকে প্রাণহীন মনে হত। হিল্লোলিত নির্জনতা এই সকালে অবশ্য আধিভৌতিক হয়ে যায়, এত দিগ্‌দিগব্যাপী ধানখেত কিন্তু কোনো জনমনিষ্যি নেই। এমন-কি আকাশে যেন পাখিও নেই। ...এখন, এই কার্তিকে, এই পাকা ধানের খেতে পরী-বওয়া 'দেও-বাও' ছম-ছম বয়ে যায়। পাকা ধানের আদিগন্ত নির্জনতা বায়ুময় ভরে যায়। (দেবেশ, ১৯৮০ : ৩৮-৪১)

এই কার্তিকে পাকা ধানের ক্ষেতের ভিতর দিয়ে, দিগন্তবিস্তৃত আকাশ-মাটি-বাতাসের মধ্যে দিয়ে রচিত হয় বৈশাখু-বেঙ্গুর ভাত খাবার কল্পিত গল্প। বর্ষার পুরনো ও প্রায় শুকনো কাদাজলে হাত ডুবিয়ে মাছ খোঁজার ব্যর্থ চেষ্টা আর দুজনের কথোপকথনে স্পন্দিত হয়ে ওঠে জীবন :

> 'মাছের ঝোল খাবি কী দিয়া রে দাদা ?' গর্তের ভেতর থেকে বেঙ্গু চিৎকার করে।

Dhaka University Institutional Repository

'ভাত দিয়া খাবু'– বৈশাখু গর্তের পাশে ধানগাছের গোড়ায় বসে শান্তস্বরে বলে।

'ভাত কুন্ঠে পাবি?' বেঙ্গুর প্রশ্ন উঠে আসে।

'পাম, পাম, এতো ধান আর ভাত পাম না কেনে রে?'– বৈশাখু ধানের গোড়ায় তাকায়।

(দেবেশ, ১৯৮০ : ৪৪)

এভাবেই দুই শিশুর কল্পনা বেয়ে আসে নতুন গল্প, "যে গল্পের কথোপকথন, মাটির ছেলে বেঙ্গুর প্রশ্নে প্রশ্নে– বৈশাখু-বেঙ্গুর স্বরে, ধাপে ধাপে আমাদের পৌঁছে দেয় মানবিক সমাজের কাঙ্ক্ষিত দিনগুলিতে যেখানে কোন ইনডিজুয়াল আইডেন্টিটি নেই।" (দেবাশিস, ১৪২১ : ২৭৫)। যেখানে 'একোর বাছুর সগার বাছুর'– হয়ে জীবনের সৃজনশীল বিকাশের অনন্ত সম্ভাবনার শর্তগুলো পূরণ করে দেয় :

এইলা এক খুব বড়, খুব সাঁটাইল, খুব বড় মানষি আছিল্। সেলার গাইগুলা বার মাস গাভিন্। হে বাছুর হবা ধরিছে তো ধরিছে।

...পা ছড়িয়ে পেটের ওপর দুই হাত জড়ো করে বেঙ্গু বসেছিল। তার সারা গায়ের কাদা শুকিয়ে গেছে। এখন কোথাও-কোথাও ফাটছে। বেঙ্গু চিলের গলায় চিৎকার করে, 'যেই গাইয়ের বাঁট যেই বাছুরের ইচ্ছা টানিবার পারে?' দুই হাতে হাঁটু জড়িয়ে রেখে বৈশাখু প্রৌঢ় মাথা নাড়ে, 'হয়, হয়, পারে। বাঁট ছাড়া বাছুর নাই। বাছুর ছাড়া বাট নাই। একোর বাঁট সগার বাঁট। সগার বাছুর একোর বাছুর।'

'কুনো বাঁটের দুধ শুখায় না?'

'না শুখায়'

'কুনো বাছুরের প্যাটত ভোক না থাকে?

'না থাকে।'

'ভোক নাই?'

'নাই'

'একোর বাছুর সগার বাছুর?'

'বাছুর।'

... বহুবার বলা, বহুবার শোনা গল্পটা বৈশাখু আর বেঙ্গুর গলায় গলায় নতুন হয়ে যায়। এখন কার্তিকে এই পাকা ধানের খেতে উপকথার নতুন জন্ম হচ্ছে। (দেবেশ, ১৯৮০ : ৪৬-৪৭)

Dhaka University Institutional Repository

'তিন দিনের বাসি খিদে আর আগামী ক'দিনের নিশ্চিত খিদে'র তাড়নায় বৈশাখু, বেঙ্গু আর খেতেশ্বরীর মা টুলটুলি নদীর পথে ভাটি পথে বাঁকে নির্জনতর জায়গায় খুঁজতে থাকে কচু বা শেকড়। যেতে যেতে তার আশঙ্কার মধ্যে প্রতীকায়িত হয় খাদ্য-অনুসন্ধানে আদি মানবের সংকটময় দ্বান্দ্বিকতা, টিকে থাকার পারস্পরিক লড়াই :

> বছরের মধ্যে বার কয়েক ত টুলটুলিকে যেতেই হয়, কচু আর বুনো আলুর খোঁজে। কিন্তু খোঁজটা আরো সবার ত জানা। তাই টুলটুলিকে তাড়াতাড়ি হাঁটতে হয়, যাতে সে আগেভাগে পৌঁছাতে পারে। কিন্তু এমন ত হতে পারে টুলটুলির মত আর একজন গতকাল বা পরশু বা তার আগের দিন বা তার আগের দিন বা সাতদিন আগে ঐ কচু তুলে নিয়ে গেছে। আবার এ-ও হতে পারে, আজ প্রথম টুলটুলিই ঐ কচুতে হাত দিল। এই জায়গাটার কচু তুলতে ত আসবে দ্বারিকামারীর লোক, কীচকের ভিটার লোক, গোলান্দিপাড়ার লোক আর সরকার পাড়ার লোক। (দেবেশ, ১৯৮০ : ৫০)

খাবার সংগ্রহ করতে যাওয়া টুলটুলির ভাবনায় বা স্বগতোক্তিতে একটি গরীব কৃষক (ভাগচাষী) পরিবারের কথা থেকে সর্বহারা গ্রামীণ খেতমজুরের আভাস পাওয়া যায়। সে বলেছে সেইসব বাড়ির বৌ-মেয়েদের কথা যাদের স্বামীর 'পাঁচ দশ বিঘে আধি জমি' নেই, তাই খাবার খুঁজতে গিয়ে তার মতো অভিমান-মিশ্রিত লজ্জাও নেই বা সে জন্য একটু আড়ালের কাঙ্গাল নয় যারা, তাদের কথা :

> টুলটুলির স্বামী খেতখেতুর ত তাও পাঁচ-দশ বিঘে আধি জমি আছে। খেতখেতুর ত একটা গোয়ালঘর আছে। খেতখেতুর ত একটা ঘটি থাকে যেটা বেচা যায়। পাটের দাম বেশি হলে খেতখেতুর ত কলাই-করা থালা থাকে। এর কোনোটাই যাদের নেই তাদের ত সারা বছরটাই খাওয়া খুঁজতে হয়। তারা এর ভেতরেই বুনো আলু আর কচুতে হাত দিয়ে ফেলতে পারে। (দেবেশ, ১৯৮০ : ২৭৭)

টুলটুলির এই শঙ্কার মধ্যে দরিদ্র কৃষক জীবনের বিচ্ছিন্নতা ও উপবাসী ক্ষুধাই তীক্ষ্ম হয়ে ওঠে। সামান্য কচু বা গাছের শেকড় সংগ্রহের আশায়, তা-ও সহজলভ্য নয় জেনেই টুলটুলি সোনালী ধানক্ষেতের অবাস্তব অর্থহীন বিস্তারে ঢাকা পড়তে পড়তে ধানক্ষেতের বাধা পার হয়, শিরার টান আর হাঁফধরার মধ্য দিয়ে উঁচু ডাঙায় ওঠে, তারপর পৌঁছায় নির্জন ঢালে– 'একলা থেকে একলাতর' (দেবেশ, ১৯৮০ : ৫৩)। সেই দুর্গম ঢালে বিকল্প খাদ্য অন্বেষণে যেতে থাকা টুলটুলির বর্ণনা :

> গত ক-মাসের অনির্দিষ্ট ক্ষুধা আর ক্ষুন্নিবৃত্তি, গত তিন দিনের পরিপূর্ণ অনাহার আর আগামী ক-দিনের নিশ্চিত উপবাস কি টুলটুলি ভেতরে কোনো অন্তর্জ্যোতির জন্ম দেয় যার ফলে সে শুধু

Dhaka University Institutional Repository

> বাইরের চেহারা দেখে বুঝে যায়, এই ডালপালার ভেতরে, এই শিকড়বাকড়ের ভেতরে, মাটির নীচে কোথায় কোনো এমন খাদ্য আছে কি না যা মাটি উপড়ে তুলে আনলে তার বা তার বাচ্চাদের ক্ষুধার কিছু-কিছু অংশ মেটাতে পারে। যত কম সময়ের জন্যই হোক, মিটতে পারে। (দেবেশ, ১৯৮০ : ৫৯)

কচু তুলতে গিয়ে এক-একটা ভঙ্গি থেকে টুলটুলির শরীরের আরেকটা ভঙ্গিতে পরিবর্তন "যেন ধীরগতি মর্মান্তিক ও রক্তাক্ত নৃত্যনাট্য– জীবনের অসহায়তা ও মরিয়া লড়াইয়ের রেখাচিত্র। সেখানে সম্ভাবনা ও অপচয়। প্রত্যাশা ও ধ্বংস যেন একসঙ্গেই আসে। (অরুণ, ১৪২১ : ১৫৩)। শারীরবৃত্তে ও চকিতে ভগ্ন বাক্‌প্রতিমায় তারই আভাস :

> দলিত স্তন, বাহুসন্ধির অবকাশে পিষ্ট স্তনতা, উরুর বিস্ফারে নিতম্বের সংক্ষিপ্ততা, বাহুর উৎক্ষেপে কাঁধের লুপ্ত বর্তুলতা, আর মাটির দেয়ালে প্রকীর্ণ সমকোণে দক্ষিণাস্য সেই মূর্তি, সারা শরীরের আক্ষেপে রেখায় রেখায় চলৎমূর্তি রচে-রচে, অবশেষে উৎপাটিত বোন্দা শিকড় নিয়ে, ধ্বংসস্তূপের ধারাবাহিক বেগে, দেড়-মানুষ দু-মানুষ নীচে তালমা নদীর পাড়ে খান খান ভেঙে পড়তে থাকে। (দেবেশ, ১৯৮০ : ৬৭)

পঞ্চম অধ্যায়ে দেখি ভগ্ন শরীরে খেতখেতুর হাঁটা– তিনদিনের উপোস ও পেটের ভেতর আলসার নিয়ে সে চাল ধার পাওয়ার অলীক কল্পনায় অতি কষ্টে আলের উপর দিয়ে হেঁটে চলে। তার শারীরিক মুদ্রাতেও অস্তিত্বের সব যন্ত্রণা জমা হয় :

> হাঁটার সময় খেতখেতুর কোমরের নীচের বাঁ দিকের হাড়টা তাঁতের মাকুর মতো যতটা নেমে ফের ওঠে, ডান দিকের হাড়টা ততটা নীচে নামার আগেই যেন উঠে পড়ে। ফলে ডান পা-টা পুরো না ফেলেই খেতখেতু একটুখানি হেঁচড়ে যায়। আলসারের ব্যাথাটা তলপেটের ডান দিকে এত বেশি দানা পাকিয়ে যায় যে হাঁটার তাল অনুযায়ী ডান পা-টা ওঠানামা করানো সম্ভবই হয় না। (দেবেশ, ১৯৮০ : ৭৪)

খেতখেতু রায় বর্মণ, যার নিজের এক ডেসিমেল জমি নেই, কিন্তু তিন পুরুষের আধিয়ারি আছে এবং প্রতি বছর তার জমির পরিমাণ কমে আসছে– সেই খেতখেতু দীর্ঘ ক্লান্তিকর হাঁটার পথে গ্রামের পঞ্চায়েতের বাড়ি যায় 'ধান কর্জের' আশায়। কিন্তু তা সহজ হয় না কারণ পঞ্চায়েত তার 'গিরি' নয় বা পঞ্চায়েতের কোনো জমিতে খেতখেতু বা চ্যারকেটু আধিয়ারি করে না। তাছাড়া তখন ধীরে ধীরে

Dhaka University Institutional Repository

উঠে যাচ্ছে আধিয়ারি আর রমণী পঞ্চায়েতের ত সবই নিজ চাষ। চাষের সময় গ্রামের লোককে দিয়েই কাটাতে হবে তারও কোনো মানে নেই। "বাইরে থেকে ঠিকা বন্দবস্তে একদল বিহারী মজুর এনে দিন তিন-চারের ভেতর খেতের ধান গোলায় তুলে তারপর নিজের লোকজন দিয়ে মাড়াই করতেও পারে।" (দেবেশ, ১৯৮০ : ৮৪)। খেতখেতুর সাথে পঞ্চায়েতের কথোপকথনে গ্রামীণ আর্থ-উৎপাদন কাঠামোর রূপ-রূপান্তর, সমকালীন রাজনৈতিক পরিবেশ ও কাঠামোতে এর প্রভাব স্পষ্ট হয়ে ওঠে। চারপুরুষ ধরে আধিয়ারি করা জমি ক্রমশ ছোট হয়ে আসে, গিরির (মালিক) জমিতে হলেও তার বাড়ির চার পুরুষ ধরে ঐ একই জায়গায় আছে, তবে সময়ের তালে জমি ভাগ হয়ে গিরি বদল হয়েছে :

> খেতখেতুদের গিরি ছিল জলাপাইগুড়ি শহরের এক উকিল বাবু। তাকে কখনো দেখেই নি প্রায় খেতখেতু, কি খেতখেতুর বড় বাপা-ও। তার ঠিকা ছিল পদ্মনাথের সঙ্গে। পদ্মনাথের সঙ্গে খেতখেতুর বড় বাপার ছিল আধি-বন্দবস্ত। 'বলদ-বিছন-খোয়া' সবই পদ্মনাথ দিত। জমি আইনের পর পদ্মনাথ ঠিকা ছেড়ে দিল, সেই উকিল বাবু গিরির কোনো এক মুহুরি বাবু এসে জমি দেখাশোনা করত। ... উকিলবাবু মরে গেলে তার দুই ছেলের ভেতর জমি ভাগ হল। ছোট ছেলে জমি বেচে দিল। খেতখেতুও সঙ্গে-সঙ্গে বেচা হয়ে গেল এক সাইকেল ওলা গিরির কাছে। বড় বাপার হালে যা-জমি ছিল, সেটা বারবার হাত বদলে কমে-কমে তখন এক হালেরও কমে এসে দাঁড়িয়েছে। (দেবেশ, ১৯৮০ : ৭৯)

বর্গা বা আধিয়ারি ব্যবস্থার একটা রূপান্তরের চিত্র পাওয়া যায় এখানে। ভূমি আইনের[৩] ফলে পরিবর্তিত উৎপাদন ব্যবস্থায় বদলে যাওয়া শ্রেণি-চরিত্রের সংক্ষিপ্ত ঐতিহাসিক পট ইঙ্গিতায়িত হয়েছে বৃত্তান্তে। সেই সাথে চলমান রাজনীতি শ্রেণি-বিভাজন ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে প্রভাবিত করেছে; খেতখেতুর স্বগতোক্তিতে সেই আক্ষেপই ব্যক্ত হয়েছে :

> পদ্মনাথ আছিল্ গিরি, হইছে অ্যালায় নিজচাষি। অমণীকান্ত (রমণীকান্ত) আছিল্ পঞ্চায়েত, হইছে অ্যালায় মেম্বার। নরেন সরকার আছিল্ জোতদার, হইছে অ্যালায় এফ-সি-আই-এর এজেন্ট। (দেবেশ, ১৯৮০ : ৮০)

অথচ এই সকল পরিবর্তনের মাঝে বিচ্ছিন্ন ও বঞ্চিত খেতখেতুরা তথা বর্গা-সম্প্রদায়ের জীবন থাকে অপরিবর্তনীয়, বরং সময়ে ক্রমশ নিঃশোষিত হতে থাকে তারা, শ্লেষের ব্যঞ্জনায় তাই খেতখেতুর উচ্চারণ : "এক মুই খেতখেতু খেতখেতুই আছো।" (দেবেশ, ১৯৮০ : ৮০)। নিজের জমি পেরিয়ে এসে চারপাশ ঘেরা ধানক্ষেতের ভেতর "বন্যার জলে সাঁতরানো পুকুরের মত এদিক ওদিক তাকিয়ে

Dhaka University Institutional Repository

খেতখেতুকে নিজের একটা ধান-চাওয়ার জায়গা খোঁজার চেষ্টা করতে হয়।" (দেবেশ, ১৯৮০ : ৮০)। ধান কর্জ চাইতে গিয়ে খেতখেতুর অন্তর্দ্বন্দ্ব প্রবল হয়ে ওঠে। কারণ সে জানে যার কাছেই সে ধার চাইবে সে-ই বলবে গিরির কাছে যাও। "গিরি আর আছে কোথায় ! দশ বিঘে জমি কিনলেই ত আর গিরি হয় না। আর তার গিরিনিকেই এখন শহরে সাড়ে তিন-চার টাকা কেজি চাল কিনতে হচ্ছে।" (দেবেশ, ১৯৮০ : ৮০)।

পঞ্চায়েতের বাড়িতে ধারের বা ফ্রি রেশনের স্লিপের আশায় পৌঁছালেও রমণী পঞ্চায়েতের সাথে সে কথা বলা হয়ে ওঠে না তার। 'যুক্তফ্রন্টের মানষি পঞ্চায়েত তখন রাতদিন গ্রামসভা, অঞ্চল অফিস আর ব্লক অফিস করতেই ব্যস্ত।' (দেবেশ, ১৯৮০ : ৮৬)। তাছাড়া রমণী পঞ্চায়েত এখন আর গিরিও নয়, আধিয়ার বা হালুয়া রাখতে চায় না; সে হতে চায় ব্যবসায়ী। *মফস্বলি বৃত্তান্তে* দেখা যাচ্ছে দিগন্তবিস্তৃত ধানক্ষেতের অদূরেই কোর্ট আছে, পঞ্চায়েত আছে, মিছিল আছে, পলিটিক্যাল সিস্টেমের সব বন্দোবস্তই আছে– অথচ নিরন্ন কৃষক তাকে ছুঁতে পারছে না, অথবা বলা যায় কৃষকই ছুঁতে পারছে না এই বন্দোবস্ত। বাবুদের বৃত্তান্ত, তাদের ভঙ্গুর ও প্রতারক দলীয় রাজনীতির কূটকচালি এই সূত্রেই উঠে এসেছে আখ্যানে। ষষ্ঠ অংশে ক্ষুধার তাড়নায় চ্যারকেটু গৌরীহাটে গরু বেচতে যায় ঠিকই কিন্তু সাত খামারের রাস্তায় এগিয়ে বটতলির কাছাকাছি যেতেই তার চোখের সামনে প্রকাশ পায় মিছিল সাজানোর দলীয় রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড। চিত্রায়িত হয় সমকালীন সামাজিক-রাজনৈতিক পরিপ্রেক্ষণী, তার স্থানিক বা আঞ্চলিক দলাদলির হীনতা ও তুচ্ছতাও স্পষ্ট হয়। বাহেবাবুর সাগ্‌রেদ নেংশু সরকারি কংগ্রেসের পৃথক চিহ্ন হিসেবে লাঙল-কাঁধে চ্যারকেটুকে তার গরুসুদ্ধ ট্রাকের ওপর তুলে নেয়। ট্রাকের ওপর চ্যারকেটুর কটাক্ষ-তির্যক বর্ণনায় মর্মস্পর্শী এক আয়রনি প্রকট হয়ে ওঠে :

> খালি গা, কোমরের নীচে গামছা জড়ানো, কাঁধে লাঙল, কোমরে গোঁজা কাঁচি-দাও, সামনে গরু, সব মিলিয়ে চ্যারকেটুকে একটা প্রদর্শনীর 'বাংলা দেশের কৃষক'-এর মাটির মডেলের মত লাগে, হঠাৎ চোখে পড়লে সেই মডেলের স্বাস্থ্য, তৃপ্তি, পূর্ণতা, জীবন্ত মনে হয়ে যায়। চ্যারকেটুর পেটে তিনদিনের বাসি খিদে। (দেবেশ, ১৯৮০ : ১৬৫)

শেষ বাক্যটি পাঠকের চেতনায় তীব্র হয়ে ওঠে। "স্বাস্থ্য, তৃপ্তি, পূর্ণতার প্রতারক প্রদর্শনীর বৈপরীত্যে তিনদিনের বাসি খিদের নিষ্ঠুর বাস্তবতা একেবারে নগ্ন হয়ে ওঠে।" (অরুণকুমার, ২০১১ : ১৬০)।

Dhaka University Institutional Repository

গ্রাম বা মফস্বল ও শহরের সম্পর্কের স্বতন্ত্র উপস্থাপনায় ঔপন্যাসিকের এক তিক্ত প্রত্যাখ্যান হয়ে ওঠে চ্যারকেটু। সমালোচকের প্রতীতি :

> খেতখেতু–চ্যারকেটু বৃত্তান্তে, আদিঅন্তহীন প্রাকৃতিক অনুভবের মধ্যেও আছড়ে পড়ে ভদ্রলোকদের ইংরেজি বুলি, রাজনীতির ভাগবাঁটোয়ারা ও স্লোগান। গোরুর গাড়ি এসে পড়ে হাইওয়ের বাস-ট্রাকের ভিড়ে। সমসাময়িকতার ও নাগরিকতার সবকটি অভিজ্ঞান। গৌরীহাটে গোরু বেচে চাল কিনবে বলে গোরু নিয়েই এসে পড়ে এই আধ-শহুরে কোলাহলের মধ্যে লিডারহীন ঝান্ডাহীন চ্যারকেটু, আর তখনই গ্রাম ও শহরের সম্পর্কটাও তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে। শেষপর্যন্ত অবশ্য সে ওই মিছিলের ভিড় থেকে অতিকষ্টে সরিয়ে আনে নিজেকে, নিজের অস্থিচর্মসার গোরুকে, নিজের পথে, যে পথ চলেছে 'দীর্ঘতর ক্ষুধার দিকে।' (অরুণ, ১৪২১ : ১৫৭)

খেতখেতু-চ্যারকেটুদের এই বয়ে চলা নিঃশেষিত জীবনকেই নির্মোহ, অনিবার্য সত্যে তুলে ধরেন দেবেশ রায়। জমির মালিকানার সঙ্গে সঙ্গে বর্গাদারের জীবনের মালিকানা পরিবর্তনের অরেজিস্ট্রিকৃত পদ্ধতি ও নানাবিধ বন্দোবস্তের ফলে প্রান্তিক চাষি এবং ভাগচাষিরা ক্রমশ পরিণত হচ্ছিল ক্ষেতমজুর শ্রেণিতে। একদিকে ঘন ঘন জমির মালিক বা গিরি বদল হওয়ায় বর্গাদার কাকে ফসলের ভাগ দেবে তা নিয়ে অনিশ্চয়তা; অন্যদিকে যেকোনো সময় জমি থেকে উৎখাত হওয়ার সম্ভাবনা গ্রামীণ জীবনে বিপর্যয়ের মুখোমুখি করে খেতখেতুদের। পঞ্চম অধ্যায়ে এই বিচ্ছিন্নতার অভিজ্ঞতা আবার নির্মম বাস্তবতা নিয়ে সামনে এসে দাঁড়ায়– হয়তো সেটাই এই উপন্যাসের চরম মুহূর্ত– যখন খেতখেতু তার চার পুরুষের জমিতে দাঁড়িয়ে অনুভব করে, এই জমির ফসলের সে কেউ না। অশরীরী ভুলা মাসানের প্রশ্নের মুখোমুখি হয়ে সে হারিয়ে ফেলে আত্মপরিচয়। 'সে যে খেতখেতু এটা বুঝে নেওয়ার জন্যই একবার তাকিয়ে তাকে জন্মান্তরের পরিচিত এই ধানখেত দেখে নিতে হয়।' (দেবেশ, ১৯৮০ : ১১২)। কিন্তু সে বুঝতে পারে, সব ওলোটপালোট হয়ে গেছে, জমির মালিকানার বদল হয়েছে অনেকবার। শুধু খেতখেতু খেতখেতুই রয়ে গেছে– তার কোনো বদল হয়নি। 'মুই খেতখেতু ছিল থেতখেতুই আছো।' এই শূন্যতার অনুভবে নিজেকে করে আকুল প্রশ্ন–

> দুই হাতে পেটটা চেপে ধরা ছিল, হাতটা না সরিয়েই খেতখেতু আবার চোখ তুলে সেই ধানখেতগুলোর ওপর দিয়েই তাকায়– কুনঠে যাম ! কুনঠে যাম ? অ্যানং ভোখ নিয়া মুই কুনঠে যাম। (দেবেশ, ১৯৮০ : ১১৩)

Dhaka University Institutional Repository

তাই যে 'ভুলা মাসান' তার সামনে এসে দাঁড়ায়, পথ ভোলাতে চায়, সে হয়ে ওঠে তার এই বাস্তবের সর্বনাশা বিচ্ছিন্নতারই মূর্তি। চিৎকার করে বৃথাই খেতখেতু তাকে বোঝাতে চায়, 'মুই একঠেকার জমি চিনি, আলি চিনি। মুই পথ ভুল করো নাই' ; বলতে চায়, 'মুই বেদেশিয়া না-হই।' (দেবেশ, ১৯৮০ : ১২৫)। ঔপন্যাসিকের বর্ণনা :

> আকাশময় শব্দস্পন্দন শরীর ভরে গ্রহণ করতে-করতে, সেই ধান্যময় প্রান্তরে, খেতখেতু, আসন্ন সন্ধ্যায় পুরুষানুক্রমিক আকাশ মাথায় নিয়ে, পথভোলা এক বিদেশীর মতো দাঁড়িয়ে– অন্ধকারে কখন মাসান তার শরীরে ভর করবে সেই অপেক্ষায়। (দেবেশ, ১৯৮০ : ১২৮)

অতীত সম্পর্কে, গ্রাম ও হালের গ্রামীণ জীবন সম্পর্কে খেতখেতুদের এই না জানা, চিনতে না পারা আর নিজের কাছে নিজের কৈফিয়ত অতীতের (ভুলা মাসান ট্যাবু) শাসানি আর আত্মশ্লাঘা; বেদনা, ভয় এবং নিজেকে ছিন্নভিন্ন করে খোঁজা– "এ এক অসাধারণ মাত্রা পেয়েছে, একেবারে গ্রামের মত করেই গ্রামীণ মাসানের উপস্থিতিতে, স্বরে, সংলাপে, নিঃশ্বাসে– একেবারে জান্তব, শারীরিক।" (দেবাশিস, ১৪২১ : ২৭৯)। ঠিক এইরকম, দীর্ঘ সংগ্রহের সাফল্যের পর টুলটুলির খাবারে ভাগ বসাতে চায় সেই দুঃস্বপ্নের অশরীরী বুড়ি, যে তালমা নদীর জলে ছপছপ করে আসে। টুলটুলি তখন কিছুতেই যেন হারাতে দেবে না তার লড়াইয়ের ফসল। তাই হুংকার দেয় :

> হেই ভাতারখাগি ভাবিবার ধইচছে মোর মরণ হইছে। বুড়ি, তুই যদি মোর এই ঝুড়ির দুইটা শিকড়ত্ হাত দিস, বুড়ি, তক মুই খুন করি ফেলাম। (দেবেশ, ১৯৮০ : ৭২)

ভুলা মাসান বা বুড়ির মতই বৈশাখু আর বেঙ্গুর অস্তিত্বেও হানা দেয় যখ। বিনাশ সম্পূর্ণ করতে চায় শিশুর অনাগত ভবিষ্যৎ-জীবনেও। বেঙ্গু চিৎকার করে কেঁদে ওঠে, 'দাদা, হামার বড় ভোক। হামাক মারি ফেলা। মুই আর বেঙ্গু থাকিম না। মুই যখ হম! ' (দেবেশ, ১৯৮০ : ৪৯)। আর তার দাদা দু-বছরের বেশি প্রাজ্ঞতায় গল্পে-গল্পে তাকে জাগিয়ে রাখতে চায়।

উপন্যাসের এই অভিজ্ঞতা থেকেই উঠে আসে এর ভাষা, এর বাগ্ভঙ্গি, বাক্যগঠন কিংবা এর বাক্প্রতিমা। লেখক নিজেই বর্ণনা করেছেন বেঙ্গুর কাছে বৈশাখুর গল্প-বলা; এ যেন তাঁর নিজেরও ধরন। শরীর ও মনের এই পুঙ্খানুপুঙ্খ, শ্লথ গতি ও স্থিতির নকশা নিয়ে আসে তার অনিবার্য

Dhaka University Institutional Repository

বাক্‌প্রতিমা ও বাক্যগঠন। কৃষক, তার চাষবাস-জমি-ফসল নিয়ে গড়ে-ওঠা পরিবেশ এবং তার অতীতের উপবাস, বর্তমানের ক্ষুধা ও ভবিষ্যতের জন্য জেদি অপেক্ষা নিয়ে জড়িত মন, এমনকী সব কিছুর মধ্যে মর্মান্তিক বদ্ধতা– "এই গাথা রচিত হতে থাকে আপাতভাবে পুনরাবৃত্তিময় ও গতিহীন কাহিনীবিন্যাসে এবং ভাষারও বিলম্বিত প্রতিমাবহুল বর্ণনাপ্রধান চালে।" (অরুণ, ১৪২১ : ১৫৬)। বর্ণনার ভাষার পুঙ্খানুপুঙ্খতা বিষয়ের সমগ্রতাকে টুকরো-টুকরো করে দিতে চায়, জীবনের গতিকে মন্থর করে দিতে চায়, দুস্থ জীবনের বিচ্ছিন্নতায় তা স্বদেশ-আত্মার স্বরূপকেই চিহ্নিত করে। আর সকল বিরুদ্ধতার পরেও জীবন নিয়ে বেঁচে থাকার অনুপ্রেরণা হয়ে ওঠে এই বৃত্তান্ত।

গ. আত্মীয় বৃত্তান্ত

দেবেশ রায়ের 'বৃত্তান্ত'-নামধারী উপন্যাসগুলোর একটি হল *আত্মীয় বৃত্তান্ত* (১৯৯০)। এটি প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৮৮ সালে 'বসুমতী' শারদীয় সংখ্যায়। উপন্যাসটির বিষয়বস্তু দেবেশের সমকালীন অনেক লেখাই বিশেষত *তিস্তাপারের বৃত্তান্ত* (১৯৮৮), *মফস্বলি বৃত্তান্ত* (১৯৮৯), *হনন আত্মহনন* (১৯৯০), *সময় অসময়ের বৃত্তান্ত* (১৯৯৩) ইত্যাদি থেকে আলাদা। "*আত্মীয় বৃত্তান্ত*-কে সমালোচক বলেছেন 'ঘরের উপন্যাস' এবং যে-কোনো সংজ্ঞাকে নাকচ করে দেবার জন্যই বোধহয় দেবেশ যাকে বলেন নারীমুক্তির উপন্যাসও।" (অরুন, ১৪২১ : ১৭৩)। *আত্মীয় বৃত্তান্তে* নারীমুক্তি প্রসঙ্গের চাইতেও বড় সামাজিক সম্পর্কের জায়গাটা এবং একে ঘিরে চার প্রধান চরিত্রের মনোজটিলতাময় অন্তর্ভুবন, জীবন সংকট ও তা থেকে নিজেদের চেষ্টাকৃত মুক্তি অন্বেষা এবং প্রাপ্তি। উপন্যাসটি সমকালীনতায়ও সংলগ্ন। কোনো আখ্যানের সমকালীনতা হল ঘটনার তাৎপর্যে, উপস্থাপনার রীতিতে, যা এখনও প্রাসঙ্গিক। এ প্রসঙ্গে ঔপন্যাসিক লিখেছেন :

> সমকালকে ধরতে না পারলে উপন্যাস বাঁচে না, আবার সমকালকে ধরেও উপন্যাস বাঁচে না। সময়ের কাছে দায়বদ্ধ বলেই ঔপন্যাসিক লেখেন। (দেবেশ, ১৯৯৪ : ৮৬)

স্বাধীনতা-উত্তর পশ্চিম বাংলার কথাসাহিত্যে সুশীল জানা (১৯১৬-২০০৮), সমরেশ বসু (১৯২৪-১৯৮৮), মতি নন্দী (১৯৩১-২০১০), শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় (১৯৩৩-২০০১), সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় (১৯৩৪-২০১২), শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় (১৯৩৫–), দীপেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯৩৬-১৯৭৯), দিব্যেন্দু পালিত (১৯৩৯–) প্রমুখের মত দেবেশ রায়ের উপন্যাসেও এসেছে মধ্যবিত্তের জীবন-অবস্থান। সামাজিক-রাষ্ট্রনৈতিক-অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক পটভূমির প্রতিফল অন্বিত মধ্যবিত্ত জীবনের ভাঙনের

Dhaka University Institutional Repository

চিত্রের পাশাপাশি কথাসাহিত্যে রয়েছে নতুন জীবন গড়ার উপযোগী প্রত্যয়নিষ্ঠ ও উজ্জ্বল প্রতিশ্রুতি-সম্পন্ন চিত্রও।

দেবেশ রায়ের *আত্মীয় বৃত্তান্ত* সামাজিকতার পটে এক ভিন্নমাত্রার উপন্যাস, যেখানে রয়েছে একটি পরিবারের সম্পূর্ণতার তথা অপরিচয় থেকে পূর্ণ আত্মীয় হয়ে ওঠার গল্প। পয়ঁতাল্লিশ বছর বয়স্ক শশাঙ্ক একজন কলকাতাবাসী ব্যাংকার, যার একুশ-বাইশ বছর বয়সী একটি ছেলে (শেখর) রয়েছে। শেখর আইটি ইঞ্জিনিয়ারিং পড়া শেষ করেছে। সুমিতা সেন এক মেটাল স্ক্র্যাপ কর্পোরেশন অফিসে চাকরি করে, যার আর্কিটেকচারাল ইঞ্জিনিয়ারিং পড়া একটি মেয়ে রয়েছে– নাম অবন্তী সেন। শশাঙ্ক এবং সুমিতা দুজনেই বিবাহবিচ্ছিন্ন এবং পঞ্চাশের কাছাকাছি বয়সে তারা একে অপরকে হঠাৎই বিয়ে করে ফেলে। বিয়ের পর শশাঙ্ক তাদের গ্রে-স্ট্রিটের নিজেদের বাড়ি ছেড়ে উঠে আসে সুমিতা সেনের একডালিয়ার ফ্ল্যাটে; যেখানে দীর্ঘ চার বছরের ইঞ্জিনিয়ারিং পড়া শেষ করে নতুন মায়ের বাড়িতে শেখরকে ফিরতে হয়। চাকরি নেয়া বা আরো উচ্চতর পড়াশোনার আগ পর্যন্ত তাকে থাকতে হবে নতুন মায়ের ফ্ল্যাটে, রুম ভাগ করে নিতে হবে অবন্তী সেন অর্থাৎ নতুন বোনের সঙ্গে। আশির দশকের এ উপন্যাসে দুজন মধ্যবয়স্ক মানুষ যাদের আবার প্রায় একই বয়সী দুজন ছেলেমেয়ে রয়েছে– বিয়ে করে তাদেরকে চলমান সময়ে চাকরি ক্ষেত্রে, সমাজে কিংবা আত্মীয়-স্বজনের কাছে মানিয়ে সর্বোপরি নিজেদের মধ্যে নিজেদেরকে পরিবার করে নেবার মনোবিশ্লেষণিক বিবরণ হল *আত্মীয় বৃত্তান্ত*।

পঁয়তাল্লিশ বছর বয়সে নিজের ছেলের কাছে বিয়ের অনুমতি নিতে অসুবিধা হয় নি শশাঙ্কর। শশাঙ্কর সঙ্গে তার স্ত্রী ও শেখরের মা দীপিকার ছাড়াছাড়ি হয় প্রায় বার-তের বছর আগে, শেখর তখন ক্লাস সিক্সের ছাত্র। শেখর বাবার কাছেই থেকে যায় এবং তার পড়াশোনায়ও গোলমাল সৃষ্টি হয় না। পঞ্চাশের কাছাকাছি বয়সে বিয়ের পর সামাজিক প্রথা-বিশ্বাস ও নিন্দাচর্চার মুখোমুখি হয় নাগরিক শশাঙ্ক ও সুমিতা। বিয়ের ব্যাপারটা আয়োজন করে অফিসকে জানাতে পারে না শশাঙ্ক। কিন্তু "শশাঙ্ক যে বিবাহবিচ্ছিন্ন এটাও যাদের জানার তাদের জানা, সে যে এই পঞ্চাশের কাছাকাছি বয়সে বিয়ে করে ফেলেছে আর তার নিজের বাড়ি ছেড়ে স্ত্রীর বাড়িতে উঠে এসেছে– এটাও যাদের জানার তাদের জানা হয়ে যায়।" (দেবেশ, ১৯৯০ : ২১)। ছোট ছোট সংলাপ বা ইঙ্গিত-বাক্যে সহকর্মীদের

Dhaka University Institutional Repository

সূক্ষ্ম বিদ্রূপ প্রকাশ পায়, তবে সামনা-সামনি তা নাগরিক-সংযমে সীমায়িত হলেও কোনো এক সময় লিফ্‌টে উঠতে উঠতে 'লোলিতাকেস'[৪] কথাটা শুনতে হয় শশাঙ্ককে। যে লোকটি সকন্যা মহিলাকে বিয়ে করেছিল কন্যাটিকে পাওয়ার লোভে– শশাঙ্কর বিয়েটা তাদের কাছে তেমনই হয়ে ওঠে। কিংবা তাকে শুনতে হয় একটু সভ্য রসিকতা– 'দাদা, বৌভাত না খাওয়ালে কিন্তু বৌয়ের হাতের ভাত শুদ্ধ হয় না।' (দেবেশ, ১৯৯০ : ২২) । প্রতীকী ও মিতভাষায় সূক্ষ্ম ইঙ্গিতে শশাঙ্কের ব্যক্তিগত জীবনকে এভাবেই উন্মোচন করতে চায় তার কাজের পরিবেশের মানুষেরা; তবে এই গল্প ও আগ্রহও চাপা পড়ে যায় একসময়।

শশাঙ্কের পুত্র শেখরকে নিয়ে বাজার করতে গেলে সুমিতাকে পোহাতে হয় প্রতিবেশীর ব্যঙ্গ ও শ্লেষপূর্ণ সম্বোধন এবং জিজ্ঞাসা। পরিত্যক্ত স্বামীর পদবীর সঙ্গে যুক্ত 'মিসেস সেন' সম্বোধনটা যেন ইচ্ছে করে স্পষ্ট ও তীব্রতর করে তোলে প্রতিবেশী মিসেস গুহ। শেখরকে নিয়ে বাজার করতে বেরুনো সুমিতার এই অপমানটুকু গায়ে লেগে যায় যেন শেখরেরও। মিসেস গুহ-র অশ্লীল ইঙ্গিত শশাঙ্ককে জানাতে গিয়ে ক্ষোভ ঝরে পড়ে সুমিতার :

> মিসেস গুহ ত' শেখরের সামনে এমন কথা বললেন যে আমি সাউথ ক্যালকাটায় নতুন স্বামী না পেয়ে নর্থ থেকে স্বামী আর এত বড় ছেলে এক সঙ্গে জোগাড় করেছি ! যেন ওদের এইসব কথার শোধ নিতে শেখর এমন স্বাভাবিক গলায় মা বলে ডেকে ফেলল যে আমিও ভুলে গেলাম ও সেই আমাকে প্রথম 'মা' ডাকল। (দেবেশ, ১৯৯০ : ১২১)

নতুন মায়ের সাথে পথ চলতে এক সন্ধ্যায়ই যেন সুমিতা শেখরের মা হয়ে যায়। "শশাঙ্ক যে এমন একটি ছেলে তাকে দিতে পেরেছে, তাতেই এত কৃতজ্ঞতাবোধ করে ফেলে সুমিতা যে শেখর, কেবল শেখরই শশাঙ্কর সঙ্গে তার এই প্রৌঢ়ত্বের নতুন দাম্পত্যকে দূর যৌবনের স্মৃতিতে প্রাচীন করে তোলে। ... শশাঙ্ক ও সুমিতা স্বামী-স্ত্রী হিসেবে তত পৌরাণিক হয়ে ওঠে।" (দেবেশ, ১৯৯০ : ১২৩)। প্রাপ্তির অনুভবে শেখরের ভেতরেও এক বুক কান্না জমে ওঠে। যেন সুমিতা তারই প্রাচীনা জননী।

Dhaka University Institutional Repository

অবন্তীকে নিজেদের গ্রে-স্ট্রিটের পুরনো বাড়িতে নিয়ে গেলে আত্মীয়জনের কুশ্রী দৃষ্টি ও কথার কাছে বিব্রত হয় শেখর। আবার একটা ল্যাঙ্গুয়েজ কোর্সের ভর্তি ফর্মে অবন্তী পিতার পরিচয়ের ঘরে বর্তমান পিতার নাম-পদবী লিখলে ভর্তিতে সৃষ্টি হয় জটিলতা, তাকে শুনতে হয় তার ফর্ম জমা নেবার অসুবিধে আছে, কারণ অবন্তীর নাম ও তার বাবার নামের পদবীর মধ্যে 'ইনকমপ্যাটিবল ডিসক্রিপেন্সি' আছে (দেবেশ, ১৯৯০ : ১৩১)। অবন্তী শেখরকে জানাচ্ছিল ঘটনাটা। বিভিন্ন কাজে আসল বাবার নাম লিখতে আগেও আপত্তি ছিল তার :

> আমি বরাবর ত' ফাদার্স নেম-এর জায়গায় আমার বাবার নাম, মানে, আমার আসল বাবার নাম লিখতাম। একবার বড় হয়ে আপত্তি করেছিলাম, মার নাম লিখতে চেয়েছিলাম, তখন মা-ই বোঝালেন বাবার নাম ছাড়া আর মেয়েদের বেলায় বাবা বা স্বামীর নাম ছাড়া নাকি পরিচয় আইনসঙ্গত হয় না। (দেবেশ, ১৯৯০ : ১২৯)

নারী হিসেবে স্বাতন্ত্র্যকামী হতে চাইলেও সামাজিক মানুষ ও রাষ্ট্রীয় নাগরিক হওয়ার সংকটে সে হয়ে ওঠে নিঃসঙ্গ। আসলে বিক্ষুব্ধ অবন্তীর খারাপ লেগেছিল শশাঙ্ককে 'স্টেপফাদার' বলতে, এমনকী 'মায়ের দ্বিতীয় স্বামী' বলতেও। শেষপর্যন্ত নিজেকেই 'স্টেপডটার' বলে পরিচয় দেয় সে। মায়ের দ্বিতীয় বিয়ের জন্য সবচেয়ে কাছের বন্ধু জয়া অবন্তীর সাথে মেলামেশা বন্ধ করে দেয়। মায়ের 'মিসেস সেন' পরিচয়ের ওপরে ক্ষিপ্ত ছিল অবন্তী। মায়ের বিয়ে দেবার জন্য সে-ই ক্ষেপে উঠেছিল আর তার বড় কারণ তার বাবা। শেখরকে সে তার অনুভূতি জানায় :

> আমি ত' আমার বাবাকে ঘেন্না করি। ঐ লোকটির কোনো চিহ্ন আমাদের গায়ে বা জীবনে লেগে থাকবে কেন? (দেবেশ, ১৯৯০ : ১৩৮)

মূলত পরিচয়ের সংকট থেকেই অবন্তীর এই ক্ষোভ, কারণ তাদেরকে ছেড়ে চলে যাওয়া বাবা– যিনি আর একদিনের জন্যও অবন্তীকে দেখার জন্যও আসে নি– তার পরিচয় বয়ে বেড়ানো প্রতিবন্ধক হয়ে ওঠে প্রায়ই; অবনী সেন চলে গেলে তার বাড়ি ভাড়ার রসিদ মিস্টার সেন নয়, কাটা হয় মিসেস সুমিতা সেনের নামে; সামাজিকভাবে অনিবার্য ও কিছুটা অপ্রতিরোধ্য এই জটিলতায় বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে অবন্তী :

Dhaka University Institutional Repository

এই বাড়িতে, এই পাড়ায়, মা ত' মিসেস সেন বলেই পরিচিত। সবাই সেই নামেই ডাকে, চেনে। অফিসেও বোধহয় তাই। এটাই আমাদের, মার ও আমার জীবনের আর্কিওলজি। আমি অবন্তীই থেকে গেলাম, মা মিসেস সেন থেকে গেলেন। এখনো আছেন। (দেবেশ, ১৯৯০ : ১৩৬)

নতুন বাবার ছেলে শেখরের কাছে উন্মোচিত অবন্তীর মন তার মায়ের প্রতি শেখরের অনুভূতিকেও জেনে নেয়, তাদের মুহূর্তের অনুভব, জীবনস্মৃতির সত্য একটি মৌলিক আবেগে এসে মিলে যায়। দুজনের কথোপকথনে আত্মীয়তার সম্পর্ক এগিয়ে যেতে থাকে :

অবন্তী : 'আচ্ছা তুমি বুঝতে পারো, মা যে তোমাকে এই ক'দিনের মধ্যে কী অসম্ভব নিজের ছেলে করে নিয়েছে'

শেখর : 'পারি'

: 'কী করে পার? তোমার সামনে ত' কিছুই বলে না, কিছুই করে না।'

: 'ও-সব বোঝা যায়!'

: 'তুমিও মাকে কি মার মত ভালবেসে ফেলেছ?'

: '...মা আমাকে যেমন ভালবাসেন, আমি কি মাকে ঠিক তেমনটিই ভাবব নাকি? ভাবতে পারি নাকি?'

: 'ঠিক বলেছ। আমি ত' একটা বাবা পাওয়ার জন্যে পাগল হয়ে উঠেছিলাম। তখন ত' ভাবি নি, এখনো ভাবি না, বাবা আমাকে পুরোপুরি মেয়ে করে নিতে পারলেন কি না।' (দেবেশ, ১৯৯০ : ১৪১)

সামাজিক সম্পর্কের টানাপোড়েনে নতুন সম্পর্কের স্থাপত্য নির্দিষ্ট ও প্রত্যক্ষ হতে থাকে; কেটে যায় দ্বিধা-দ্বন্দ্ব। অবন্তী ও শেখর, শশাঙ্ক ও সুমিতা এবং এই চারজনই নিজেরা নিজেদের সবচেয়ে আপনজন কিংবা ঔপন্যাসিকের ভাষায় আত্মীয় হয়ে ওঠে। এই আপনতার অনুভব সবচেয়ে বেশি ছড়িয়ে পড়ে অবন্তী ও শেখরের মাঝে। সুমিতা-শশাঙ্কও বোঝে অবন্তী আর শেখরের ভেতরের ভাইবোনের সম্পর্কটা তো বানানো সম্পর্ক। সুমিতা ভাবে :

যদি তার সঙ্গে শশাঙ্কর বিয়ে না হত– তা হলে, অবন্তী আর শেখর ত' পরস্পরকে স্বাধীনভাবেই চিনতে পারত, সে চেনার ওপর ত' আর সুমিতা আর শশাঙ্কর কোন নিয়ন্ত্রণ থাকত না ? এমন কি, সুমিতা আর শশাঙ্কর বিয়েটা হয়ে ওঠার আগেও ত' তাদের সম্পর্কের একটা ইতিহাস আছে, নইলে বিয়ে পর্যন্ত তারা পৌঁছুল কী করে ? যদি সেই সম্পর্কের মধ্যেই তারা আটকে যেত, তা হলে অবন্তী আর শেখরের ভেতর ভাই-বোনের সম্পর্কটাই ত' হত আরোপিত– আরো কত অজস্র

Dhaka University Institutional Repository

> সম্পর্কের ভেতর দিয়ে তারা যেতে পারত, সে সম্পর্কের ভেতর নরনারীর সম্পর্কও একটা সম্পর্ক হতে পারত। (দেবেশ, ১৯৯০ : ১২৩)

শেখর-অবন্তী সম্পর্কের এই বদলে যাওয়াটা দ্বান্দ্বিক হলেও সুমিতার দৃষ্টিকোণে মানবমনের বৈচিত্র্য ও তার গড়া সম্পর্কের যৌক্তিকতা কিংবা অনিবার্যতা বিশ্লেষিত হয়। তাই তেইশ বছরের জীবনে একে অপরকে একটুও না জানলেও শেখর এবং অবন্তী– দু'জনের কাছে দু'জন হয়ে ওঠে 'সবচেয়ে জানা ঘটনা।' (দেবেশ, ১৯৯০ : ১৪৩)। যে সম্পর্কটা নিজেদের তৈরি করা, সেটা জটিল হতে পারে, ভেঙে যেতে বা বদলে যেতে পারে, কিন্তু অবন্তীর স্বস্তি হয় যে সেটা তাদের নিজেদের ইচ্ছেতে গড়া সম্পর্ক। *আত্মীয়-বৃত্তান্তের* চূড়ান্ত আত্মীয়তা অমোঘ হয়ে ওঠে অবন্তী-শেখরের মনের একাত্মতায় :

> জীবনের পৈতৃক সম্পর্কের অনড় অচল মনেও তারা অন্য বাঁধন ও অন্য নিষেধের এক অনতিক্রম্যতাও নিজেদের ভেতর টের পাচ্ছিল। তারা জানে না, তাদের দু'জনের সেই সম্পর্ক কোন আকার নেবে। কিন্তু না জেনেও তারা সেই সম্পর্কটাকে দু'টি মানুষের মধ্যে সম্পূর্ণ নতুন এক সম্পর্ককে আকার দেয়ার কঠিনতম এক সময়ের ভেতর হাঁটছিল; কলকাতার প্রতিদিনের চেনা নয় এমন প্রথম ভোরে প্রতিদিনের চেনা এই পথেই। ওদের সেই নির্মাণক্ষম হাঁটার সঙ্গতিতেই গোল পার্কের চত্বরের ঘাস ও সাদার্ন এ্যাভেন্যুর গাছগুলি দৃশ্যমান আকাশের নীচে তখন পরিপ্রেক্ষিতে জেগে আছে। (দেবেশ, ১৯৯০ : ১৪৪)

কলকাতার নাগরিক মধ্যবিত্তের একেবারেই ঘরের গল্প *আত্মীয় বৃত্তান্ত*। ঔপন্যাসিক আশির দশকের কলকাতা নগরীর পরিবর্তিত রূপ, নতুন কনস্ট্রাকশন বিশেষত নর্থ-সাউথ কলকাতার রূপ-ভিন্নতার বিবরণও দেন। নর্থ কলকাতায় গলি, আলো ঢোকে না, ঘিঞ্জি, বস্তি আর কলকাতার যা কিছু ভালো সবই আছে 'এলিট' বলে পরিচিত সাউথে। অথচ এই উন্নয়ন ও অগ্রগতি সংস্কারাচ্ছন্ন মানসিকতায় খুব একটা ছাপ ফেলে নি। এলিট কলকাতায় থাকা সুমিতা অবন্তীর পরিচয়ের সংকট তাই কাটে না পুরোপুরি। একটা বাচ্চা মেয়ে নিয়ে স্বামীর কাছ থেকে আলাদা হয়ে আলাদা সংসার করার উদ্বেগ আর আশঙ্কার এক জগৎ সবসময় সুমিতার "নিজের মনের মধ্যে প্রায় বাইরের পৃথিবীর মতই সত্য হয়ে থেকেছে।" (দেবেশ, ১৯৯০ : ১২২)।

নারী অধিকার তথা নারীবাদ বিষয়ে দু'একটা সেমিনার সিম্পোজিয়ামের কথা আছে উপন্যাসে, মানসিকতায় সময়ের চেয়ে অগ্রগামী বলে অবন্তী সেগুলোতে অংশও নেয়। কিন্তু নারী হিসেবে সুমিতা

Dhaka University Institutional Repository

ও অবন্তীর বিরূপ সময় ও সময়ের সাথে তাদের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও মানসিক সংগ্রামটা এখানে ঠিকই স্পষ্ট হয়ে ওঠে। যদিও ধীরে ধীরে তারা বিজিত সময়েরই স্বাদ পায় এবং নতুন সম্পর্কে গিয়ে, আর সকলের সাথে বিচ্ছিন্ন হতে হতে তারা পরস্পর পরস্পরের পক্ষে অপরিহার্য হয়ে ওঠে; সামাজিক সংস্কারবদ্ধ প্রতিবন্ধকতাগুলো তাই তাদের কাছে অবান্তর হয়ে যায়। আশির দশকে লেখা এই উপন্যাসটিকে দেবেশ 'নারীমুক্তির উপন্যাস' বললেও আপত্তির কিছু থাকে না। "ভাল লাগার আবিষ্কার নিয়ে মানুষজন পরস্পরের সংলগ্ন থেকে শুধু প্রাচীন হয়ে উঠতে পারে।" (দেবেশ, ১৯৯০ : ১১৬)– ঔপন্যাসিকের এই বোধেও বৃত্তান্তটিতে মনের আত্মীয়তার হার্দ্য উপস্থাপনা হয়ে ওঠে।

ঘ. সময় অসময়ের বৃত্তান্ত

১৯৮৩ সাল থেকে বিভিন্ন সময়ে *সময় অসময়ের বৃত্তান্ত* উপন্যাসের কোনো কোনো অংশ শারদীয় 'প্রতিক্ষণ' শারদীয় 'আজকাল', শারদীয় 'কালান্তর', শারদীয় 'প্রমা' ও শারদীয় 'বারোমাস'-এ প্রকাশিত হয়েছে। পূর্ণাঙ্গ ও প্রথম প্রকাশ ১৯৯৩ সালে। *তিস্তাপারের বৃত্তান্ত* ও পরে *সময় অসময়ের বৃত্তান্ত*-এ দেবেশ রায় এক নতুন ইতিহাস রচনা করেন, যেখানে যাত্রাহীন বাঘারুর মতই রচিত হয় কেলুর অন্তহীন হাঁটার বৃত্ত। সময় অসময়ের এই বৃত্তে কেবল কেলু নয়, বাঁধা পড়েছে পাড়ায়িরা গ্রামের ২৫ জন ধর্ষিতাও, ঔপন্যাসিকের এই বৃত্তান্ত তাদের কয়েকজনকে উৎসর্গ করা হয়েছে। বিহারের দেওঘর জেলার পুনাসি বাঁধ এলাকার পাড়ারিয়া নামে একটি গ্রামে জশিডি থানার পুলিশবাহিনী ১৯৮৮ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারি সারারাত ২৫ জন মেয়েকে ধর্ষণ করে। নকশাল আন্দোলনের অবশেষ একজন বিশ্বনাথ চক্রবর্তী আহত, প্রায় পঙ্গু অবস্থায় পলাতক সময়ে পাড়ারিয়া অঞ্চলের মানুষদের জমায়েত বেঁধে পুলিশের বিরুদ্ধে মামলা করার পরামর্শ দেয়। পাড়ারিয়া গ্রামের ধর্ষিত পঁচিশ জন মহিলার মধ্যে পাঁচজন পুলিশের বিরুদ্ধে মামলা করে। ১৯৮৭-এর ৪ নভেম্বর থেকে ১৯৮৮-এর ১৮ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত বিশ্বনাথ চক্রবর্তী চব্বিশ পরগণার এক গ্রামে, সাঁওতাল পরগণার পাড়ারিয়ার কাছেই একটি টোলায় আত্মগোপন করে ছিল। বিশ্বনাথই তাদের প্রথম বলে– পুলিশবাহিনীর বিরুদ্ধে যেহেতু সম্মুখযুদ্ধ করা যায়নি, তখন আইনের যুদ্ধ করতে হবে; এবং সে জানে পুরো প্রক্রিয়াটা মিছিল, জমায়েত কিংবা সমাবেশ ছাড়া হবে না। কারণ জমায়েত ছাড়া জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মামলা নেবে না। হাসপাতালের ডাক্তার ধর্ষিতাদের পরীক্ষা করবে না; কোর্টের হাকিম

Dhaka University Institutional Repository

তাদের নালিশ শুনতে রাজি হবে না। তাই জমায়েতের চাপেই মামলা ওঠে আদালতে। অথচ 'অক্ষরসর্বস্ব আদালত' এই প্রান্তিক অন্ত্যজ ধর্ষিতাদেরই পাল্টা অভিযুক্ত করে পুলিশকে বেকসুর খালাস দেয়। ১৯৮৯ সালে দীর্ঘ একবছর পরে এই রায়ে অভিযুক্তরা নির্দোষ প্রমাণিত হল। সেই সাথে ঐ নারীরা ক্ষতিপূরণের টাকার আশায় রাজনৈতিক নেতাদের চাপে এরকম অভিযোগ করেছেন বলে বলা হয় এবং এও বলা হয় যে ঐ নারীরা যথেচ্ছ যৌন স্বাধীনতা ভোগ করেন।

বিশ্বনাথ, যে আসলে 'সত্তরের কানু বা বারিদ সরকারের মাথায় ঢোকা গুলি নিজের মাথায় ঢুকিয়ে' এই প্রবল রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে লড়তে যেয়ে শুধু ব্যর্থই হয় না, পঙ্গু বিপন্ন অবস্থায় টিকে থাকে, মৃত্যুরও অধিকার থেকে যেন সে বঞ্চিত। বিশ্বনাথ পর্বটি দেবেশ রায় *বিপ্লবের অসময়ে এরকম ঘটে থাকে* নামে লেখেন ১৯৮৯ সালে, প্রকাশ করেন শারদীয় 'প্রতিক্ষণ' পত্রিকায়। পরে এটি *সময় অসময়ের বৃত্তান্তের* শেষ পর্ব হয়ে ওঠে।

সময় অসময়ের বৃত্তান্তের শুরুতে 'গ্রন্থবন্ধন' নামে লেখকের একটি প্রস্তাবনা অংশ আছে। সেখানে এই বৃত্তান্ত রচনার কারণ, পরিপ্রেক্ষিত এবং রচনার কৌশল বর্ণনা করা হয়েছে। আশির দশকের শেষে পাড়ারিয়া মামলার রায় প্রকাশের আগেই পাড়ায়িরা-ধর্ষণ নিয়ে দেবেশ রায়ের রচিত আখ্যান– 'কনস্ট্রাকশনের সময় এরকম ঘটে থাকে।' এই আখ্যান পর্বান্তরে কেন আর সমাপ্তি পেল না তার কারণ সম্পর্কে ঔপন্যাসিক বলেন :

> ... (রায়ের পর) পাড়ারিয়ার ধর্ষিত মেয়েরা নিজেরাই অভিযুক্ত ও পরাজিত হয়ে লজ্জায় ও ধিক্কারে যখন আদালত থেকে ফিরে গেল পুনাসি বাঁধের অন্ধকার ঢালে পাড়ারিয়া গাঁওয়ে, যেন তাদের শুরু হল এক নতুন গোপন জীবন আর বিশ্বনাথ চক্রবর্তী যখন তার বিরাট স্বদেশ ও মহৎ বিপ্লবের প্রতিশ্রুতিতে ব্যর্থ হয়ে ফিরে এল কলকাতায়, রাজ্য সরকারের সদর দপ্তরে, আত্মগোপনের পালা শেষ করে নিজের কাছে স্বীকারোক্তির এক পালা শুরু করতে, যেন জেলখানার ভিতরেই তার জিজ্ঞেসার জবাব মিলবে, তখন আবার পাড়ারিয়া-ধর্ষণের কাহিনীতেই ফিরে যাওয়া ছাড়া আমার গত্যন্তর ছিল না। (দেবেশ, ১৯৯৩ : ২১)

ঔপন্যাসিককে এ সূত্রেই পরপর লিখে যেতে হয়েছে 'বিচারের সময় আদালতে এ-রকম ঘটে থাকে' (১৯৯৩), 'ধর্ষণের পরের সকালে এ-রকম ঘটে থাকে/অলৌকিক খণ্ড', (১৯৯০), 'ধর্ষণের পরের

Dhaka University Institutional Repository

সকালে এ-রকম ঘটে থাকে/লৌকিক খণ্ড' (১৯৯১) ইত্যাদি। একটি কাহিনীর ক্রম-বৈচিত্র্যিক রূপান্তর ঔপন্যাসিককে কেন খুঁজে যেতে হয়, সে বিষয়ক ব্যাখ্যায় দেবেশ বলেন :

> এই বৃত্তান্তের একটি কাহিনী যখন লিখে চলেছি তখনই এই বৃত্তান্তের বাইরে সেই কাহিনীরই নতুন আখ্যান তৈরি হয়ে উঠতে শুরু করেছে। একই কাহিনীর একটি আখ্যান শেষ করতে না করতেই আমাকে সেই কাহিনীর আর-এক আখ্যানের জন্ম দেখতে হয়েছে। আবার, বিভিন্ন আখ্যানে একটি কাহিনীর বিবরণ লিখে উঠতে না উঠতেই এই বৃত্তান্তের বাইরে নতুন কাহিনী জেগে উঠছে, দেখছি। (দেবেশ, ১৯৯৩ : ২১)

যে অর্থে উপন্যাসের কাহিনী বানানো হয়ে থাকে, *সময় অসময়ের বৃত্তান্তের* আখ্যানগুলো সেরকম নয়। ঔপন্যাসিকের দাবি, "এ-বৃত্তান্তের সব কাহিনীই খবরের কাগজে বেরিয়েছে। কোনো-কোনো কাহিনীর অন্তর্গত কেনো-কোনো ঘটনা নিয়ে লোকসভা-বিধানসভায় প্রশ্ন উঠেছে, মন্ত্রীরা বিবৃতি দিয়েছেন। কোনো-কোনো ঘটনা সরকারি কাগজপত্রে নথিভুক্ত আছে, সেসব নথিতে বিভাগীয় সচিব ও মন্ত্রীর সই-ও আছে।" (দেবেশ, ১৯৯৩ : ২৬)। অর্থাৎ এই বৃত্তান্তের প্রামাণিক বিবরণ নিশ্চিত করে লেখক জানিয়ে দেন যে এ-বৃত্তান্তের সব কাহিনীই এই বৃত্তান্তে লিখিত হওয়ার আগে নথিভুক্ত। 'এই বৃত্তান্তে লেখা না হলেও এই কাহিনীগুলি কাহিনী হিসেবে আছে; তিনি শুধু নথির ভিতর উপন্যাসের সংক্রমণ ঘটিয়েছেন।' (দেবেশ, ১৯৯৩ : ২৬)। সুতরাং পরিপ্রেক্ষিত, কার্যকারণ ও ইতিহাস-ভূগোল সর্বোপরি সাধারণ জীবনযাপন, প্রশাসন ও আইনশৃঙ্খলার সাথে সম্পর্কযুক্ত এক নথিবদ্ধ অকৃত্রিম ভাষ্যই উপন্যাস হয়ে উঠতে থাকে। যেখানে মূলত ইতিহাসবিধৃত মানবের বা মানবসৃষ্ট ইতিহাস-গাথা সম্পূরক হয়ে উঠেছে। তাছাড়া লেখকের মতে, পুলিশ, সরকারের, আদালতের নথি-কাহিনীর অর্থের রয়েছে 'এক বিকল্পহীন নির্দিষ্টতা।' ঔপন্যাসিকের লক্ষ্য সেই নির্দিষ্টতার বিরুদ্ধে তাঁর কাহিনীর অনির্দিষ্টতাকে খাড়া করানো।' (দেবেশ, ১৯৯৩ : ২৮)। প্রশাসন বা আদালতের শব্দের অর্থও নির্দিষ্ট। অন্যদিকে উপন্যাসের শব্দের কোনো একটি মাত্র অর্থ থাকতে পারে না। ঔপন্যাসিকের সংকল্পও এ পর্যায়ে স্পষ্ট :

> আমি পুলিশের, সরকারের, আদালতের আইনি অর্থসর্বস্ব শব্দের বিপরীতে উপন্যাসের কল্পনাসর্বস্ব শব্দকে স্থাপন করতে চাই। (দেবেশ, ১৯৯৩ : ২৮)

উপন্যাসে পাড়ারিয়ার ধর্ষণ সম্পৃক্ত সকল 'নথিভুক্ত' আখ্যান তাই তাঁর 'বহুবাচনিক শব্দের আক্রমণে' (দেবেশ, ১৯৯৩ : ২৮) বাঙ্ময় হয়ে ওঠে, হয়ে ওঠে সাংঘর্ষিক। ঔপন্যাসিক লেখেন :

Dhaka University Institutional Repository

> এ-বৃত্তান্ত রচিত হয়েছে নথিপত্রের স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতা মেনে নিয়ে। এ-বৃত্তান্ত রচিত হয়েছে উপন্যাসের স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতা মেনে নিয়ে। একই কাহিনী নথিভুক্ত হয়েছে। ... কেউ কারো স্বাতন্ত্র্যের সীমানা পেরয় নি। না-পেরিয়ে উপন্যাসের কাহিনী নথিপত্রের কাহিনীর ভিতর অন্তর্ঘাত ঘটিয়েছে। ... অন্তর্ঘাতই এই বৃত্তান্ত-রচনার পদ্ধতি। উদ্দেশ্য নয়, পদ্ধতি। (দেবেশ, ১৯৯৩ : ২৮)

প্রতিবেদন কিংবা সার্বভৌম সরকারি নথির মানুষগুলো, প্রবহমান সময়ে যাদের পরিণতি স্থির ও অনড় হয়ে গিয়েছিল, দেবেশ এবার তাদেরকেই উন্মুক্ত করলেন, এখানে সময়কে প্রত্যাখ্যানের নতুনতর ভাষার অন্বেষণই লেখককে এই আখ্যান পরিক্রমায় উদ্বুদ্ধ করেছে। কেননা বিশ্বনাথ কিংবা পাড়ারিয়ার ধর্ষিত নারীরা অথবা কেলু "কোনোদিন তার দৈনন্দিন খুঁজে পাবে, সমাজ-রাজনীতি পরম্পরা কিংবা পালাবদল অনর্থকে পেরিয়ে কোনো অর্থে চিহ্নিত হবে– এমন আশার যোগ্য নয় ঔপন্যাসিকের দেশকাল।" (রুশতী, ১৯৯৭ : ২৫)। একজন বৃত্তান্তকার হিসেবে এই বিরূপ সময়ে নথি থেকে উদ্ধার করা ও সংবাদপত্রে মুদ্রিত এক অসম্পূর্ণ বা হারিয়ে যাওয়া কাহিনী থেকে বিচিত্র আরম্ভের আখ্যানে, অভ্যন্তর থেকে অভ্যন্তরে, ধারাবাহিকতা থেকে ধারাবাহিকতাহীন কাহিনীতে নব সম্বোধন, সম্ভাষণ ও রচিত নব কথোপকথনের সাথে পরিচয় করান ঔপন্যাসিক। যেখানে ধর্ষণের পর প্রথম সকালে রাধিয়ার মধ্যে কিংবা ধর্ষিতা সব নারীর মধ্যে, পাড়ারিয়ার সামগ্রিকতার মধ্যে এক জাগরণ সঞ্চারিত হয়, লুপ্ত সময়ের বিনির্মাণে নির্বাক ধর্ষিতারা তাদের আপ্ত অনুভব নিয়ে হাজির হয় উপন্যাসের পাতায়। পঁচিশ জন ধর্ষিত নারীর মধ্যে পাঁচজনকে লেখক সামনে এনেছেন– ভগবতী, সুমা, দরিয়া, রাধিয়া ও নিমিয়া। ধর্ষণের রাত, তার আগের ও পরের কিছু ঘটনা ধর্ষিতাদের আবেগ ও মননের ক্রিয়া ইত্যাদির অনুপঙ্খ বিবরণের মধ্য দিয়ে তা ব্যক্তিনিরপেক্ষ একটা বস্তুবিবরণ হয়ে ওঠে। ধর্ষিতা পাঁচ নারীর ধর্ষণ স্বতন্ত্রভাবে এবং পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বর্ণিত হয়েছে বলেই এর ব্যক্তিগত প্রকাশটা পরোক্ষ চলে যায়। যৌন অঙ্গগুলো তাদের ইন্দ্রিয়নির্ভর শারীরিকতা হারিয়ে পুলিশের হাতের লাঠিবন্দুকের মত কিংবা লাঠিবন্দুকের লক্ষ্যস্থানের মতো কেবলই এক-একটা বস্তু হয়ে দাঁড়ায়। প্রতিকারহীন গণধর্ষের ব্যাপারটাই তখন রাষ্ট্রীয় অত্যাচার ও শোষণের প্রতীক।

'ধর্ষণের পরের সকালে এ-রকম ঘটে থাকে' (লৌকিক খণ্ড), নামক পঞ্চম আখ্যানের 'অলৌকিক' ও 'লৌকিক খণ্ড' জুড়ে রাধিয়া ও কেলুর কাহিনী। নিঃসঙ্গতা, নিঃস্বতা এবং ধর্ষণযোগ্যতার দিক থেকে রাধিয়ার অবস্থান পাড়ারিয়া নারীদের মধ্যে শীর্ষে। তার সম্পর্কেই আর পাঁচজনের চেয়ে বেশি করে

Dhaka University Institutional Repository

অভিযোগ আনা যায়, তাই আদালতে ধর্ষণ প্রমাণিত হওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। জন্মের সময় থেকেই রাধিয়া ক্রম-নিঃস্বতার অংশীদার, যার 'আধপাগলা বাপ শুখা মাঠে জাল ফেলে শেষরাত্রির চাঁদনিতে মাছেদের খেলা দেখতে-দেখতে বেঘোরে মারা যায়' (দেবেশ, ১৯৯৩ : ২৫২); তার বর জোটা মুশকিল, যতই গায়েগতরে খাটার ক্ষমতা থাকুক তার– কিংবা থাকুক 'তিন বাচ্চা খাওয়ানোর মতো বুক, বছর-বছর বাচ্চা ধরার মতো চওড়া শক্ত পেট, দশ ভঁইষকে দানাপানি দেয়ার মতো হাত আর এক-দেড়মণ বোঝা বইবার মত পিঠ'। (দেবেশ, ১৯৯৩ : ২৫২-২৫৩)। বাবার মৃত্যুর পর বিয়ের জন্য রাধিয়া খেপে উঠলে কেলুই হল তখন তার যোগ্য পাত্র– যে কেলু 'বাপের তৈরি ঘর ছেড়ে ... মাইল-মাইল দূরের বাবলা গাছের তলায় বা পুনাসি বাজারের চায়ের দোকানের বেঞ্চে বসে থাকে'– 'কোন-কোন দূর মাঠে, বা, বাজারে, বা আলের ধারে, বা, শহরের পথে নিজের ঘর ছেড়ে ঘুরে বেড়ায় ... জানতে পারে মেঘেদের চলাচল, পাখিদের ওড়াউড়ি, গাছগাছড়ার বাড়বাড়ন্ত, প্রবাসীর ঘরে ফেরা বা গাঁয়ের মেয়ের প্রবাস যাওয়ার রহস্য?' (দেবেশ, ১৯৯৩ : ২৫৬-২৫৭)। এই রাধিয়ার সঙ্গে এই কেলুর বিবাহ– 'এ যেন দুজনের জন্যে দুজনার সারা জীবন তৈরি থাকা।' (দেবেশ, ১৯৯৩ : ২৫৬) :

> যে-রকম বিয়ে হয় হিমালয়ের সঙ্গে মেনকার, শিবের সঙ্গে পার্বতীর, বিষ্ণুর সঙ্গে লক্ষ্মীর, সে-রকম বিয়ের পাত্রী বা পাত্র পরস্পরের সম্পর্কে এক অজাগর নিদ্রায় আচ্ছন্ন থাকে। সেই নিদ্রায় তারা পরস্পরের সঙ্গে এমনই আশ্লিষ্ট থাকে যে তাদের পরস্পরকে নিয়ে কোনো পার্থক্যজ্ঞান থাকে না। (দেবেশ, ১৯৯৩ : ২৫৭)

কবিত্বের এই আরোপে, পৌরাণিক উপমার এই বিস্তারে রাধিয়া ও কেলু তাদের নিজের-নিজের বাস্তবতাকে বজায় রেখেও ইশারাময় হয়ে ওঠে। সারা তল্লাটে বিয়ের রং লাগে– হাসি, মশকরা, গান। বিয়ের পর তাদের দাম্পত্য জীবন নীরব, চুপচাপ– 'কেলু পাশে বসে রাধিকা কেলুর নৈঃশব্দ্যকেই গ্রহণ করে'। হাঁটতে-হাঁটতে কেলু কখনও নিরুদ্দেশ হয়ে যায়। রাধিকা তাকে খুঁজে-খুঁজে ধরে-বেঁধে নিয়ে আসে। "এভাবেই চলতে থাকে তাদের লোকায়ত বিবাহ, লোকায়ত দাম্পত্য, লোকপুরাণের স্ফূর্তি।" (অরুণ, ১৪২৪ : ১৭৭)। তারপর কেলু ও রাধিয়ার বিরহ ঘটে যেতে পারে। দাম্পত্যের ওই পুরাণ থেকে বিচ্যুত হয়ে কেলু যেতে পারে নরকের অভিযানে– কলকাতার বেহালার হাসপাতালে তেলকেসের রোগী হয়ে, কলকাতার ফুটপাতে, দেশহারানো ছন্নছাড়া জীবনযাপনে। তারপর একসময়

Dhaka University Institutional Repository

নরকবাসের অভিজ্ঞতা পার করে সে দয়িতার কাছে ফেরে– তার বিবাহকে, তার বিরহকে রক্ষা করতে ছুটে আসে পাড়ারিয়ায়। কিন্তু কেলু যখন পৌঁছায় ততক্ষণে সর্বনাশ শুরু হয়ে গেছে– শুরু হয়ে গেছে ধ্বংস আর ধর্ষণ। পাহারাদার পুলিশের বেয়নেট তাকে থামায়। সে পৌঁছুতে পারে না রাধিয়ার কাছে। এক নরক পার হয়ে হয়ে সে আরেক নরকের দরজা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। "কাউকে না-কাউকে ত এই নরকের দ্বার হয়ে দাঁড়াতে হবে। সেই প্রবেশপথ না থাকলে কী করে দেখা যাবে– এপিককে ছাড়া যারা দৈনন্দিনেও বাঁচতে পারে না রাষ্ট্র সেই এপিকগ্রস্তদের ধর্ষণ করছে?" (দেবেশ, ১৯৯৩ : ২৭৮)। কল্পকল্পান্তরের জগৎ সেখানেই শেষ হয়ে যায় না। কেলু তুচ্ছ ভঙ্গিতে নরকের দরজা ভেঙে ফেলে, রাধিয়ার কাছে এসে, সব কজন ধর্ষিতা মেয়ে, রাষ্ট্র যাদের ধর্ষণ করেছে, তাদের সামনে এসে বলে : 'জাগো। রাধিয়া, আমি সমুদ্রের স্বাদ জানি। তোমার যোনিতে সমুদ্রের অনন্ত স্বাদ। সমুদ্রকে কি ধর্ষণ করা যায় ? পাড়ারিয়ার মেয়েরা ঘুমের মধ্যে এই গান শোনে। ধর্ষণের মূর্ছা থেকে তাদের জাগিয়ে তোলে এই গান। কেলু এসে এই গান শুনিয়ে চলে গেছে।' (দেবেশ, ১৯৯৩ : ২৫৭)।

এটা ছিল অলৌকিক খণ্ড, তবে লৌকিক খণ্ডে, এই জাগরণেরই আছে বাস্তব রূপ। সারা শরীরে বেদনা ও গ্লানি নিয়ে রাধিয়া জেগে ওঠে ধর্ষণের পরের সকালে। ধর্ষিত শরীরের স্মৃতি নিয়ে সে পাড়ারিয়া গ্রাম থেকে, অন্য নারীদের থেকে আলাদা, একা হয়ে যায়; যেন একাই ধর্ষিত হয়েছে সে। আস্তে-আস্তে সেই একক ধর্ষণের স্মৃতি থেকে উঠে এসে সকলের কথা ভাবে, সকলের পাশে এসে দাঁড়ায় :

> সে একা নয়, সে একা আউরত উজারা হয়নি, তেগিয়া আর পার্বতীয়াও হয়েছে। পার্বতীয়াও হয়েছে ? তাহলে গাঁওয়ের কোনো মেয়েই বাদ যায়নি? রাধিয়া চঞ্চল হয়ে ওঠে। সে যখন আগে উঠে দাঁড়িয়েছে, সে-ই যখন তেগিয়া আর পার্বতীয়াকে দেখতে পেয়েছে, তাকেই তাড়াতাড়ি তাদের কাছে পৌঁছে কাপড়চোপড় ঠিক করে দিতে হবে। (দেবেশ, ১৯৯৩ : ২৯১)

অতিকষ্টে শারীরিক কসরত করে সে ঘরে ফেরে, পার্বতীয়া-তেগিয়ার কাছে যায়। সারা গ্রাম জুড়ে ধর্ষণের পরের সকালের কান্না ওঠে– পার্বতীয়ার কান্না, তেগিয়ার কান্না, রাধিয়ার কান্না। ধর্ষণের পরের সকালে কিশোরী পার্বতীয়ার বিস্রস্ত শরীরের বিষাদ চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে :

> সূর্যের সেই রহস্যময় প্রথম আলোতে তারা দেখে, পার্বতীয়ার দুই সরু কৃশ তরুণ কাঁধে মানুষের আঙ্গুলের ছাপে-ছাপে রক্ত জমাট বেঁধে আছে– ভেজা নদীতীর যেমন অসংখ্য পায়ের ছাপে ছাপে চিহ্নিত হয়ে পড়ে থাকে। পার্বতীয়ার যারা যোনিভঙ্গ ঘটাচ্ছিল তারা পার্বতীয়ার শরীরে প্রবেশের

Dhaka University Institutional Repository

> জন্যে পার্বতীয়ার কাঁধ দুটোকেই অবলম্বন করছিল। সেদিনের সেই প্রথম আলোতে তারা দেখে, পার্বতীয়ার তরুণ চিবুকের নীচে গলাটা যেখানে নরম হয়ে বুকে গিয়ে উঠেছে সেখানে কেউ ভোঁতা ছুরি দিয়ে আলগা মাংস কেটে গেছে, অসংখ্য। (দেবেশ, ১৯৯৩ : ৩৩৩)

পাড়ারিয়ার মেয়েরা নিজেদের ধর্ষিত শরীর নিয়ে এবং লালডিকোলার মেয়েরা নিজেদের 'ধর্ষণযোগ্য শরীর' নিয়ে পার্বতীয়াকে দেখছিল। এভাবেই একে একে উঠে আসে গণধর্ষণে ব্যক্তিপরিচয় হারানো নারীরা– দরিয়া, ভগবতীয়া, সুমা, জিনিয়া, রাধিয়া, আনোপী, নিমিয়া, বড়কী, পার্বতীয়া, লছমি, শিউপুজন কি মাই...। ধর্ষণের কারণে হাঁটাচলাবসার ভঙ্গিবদল ও হাহাকার প্রত্যেকের যেন আলাদা-আলাদা– একই ভঙ্গি বা সমবেত কান্না নয়। 'বরং যে যার ব্যথা নিয়ে একক থেকেও একক হয়ে যাচ্ছিল।' (দেবেশ, ১৯৯৩ : ৩০৩)। কিন্তু কিশোরী পার্বতীয়াকে ঘিরে রাধিয়ার শুশ্রূষার মধ্য দিয়ে সেই 'ছায়ানারীরা' মিলে যায়; মূর্ছা থেকে মেয়েদের জাগরণের কথা রাধিয়াকে অবলম্বন করেই রচিত হয়ে যায়। 'রাধিয়ার কান্নায় অন্য সকলের কান্না সমবেত থেকে যায়।' (দেবেশ, ১৯৯৩ : ৩০৩)। ধর্ষণের একটা গোটা ইতিহাস তৈরি হয়; আদালতের যুক্তিমালায় যেটা ধর্ষণই নয়!

ধীরে-ধীরে গোটা পাড়ারিয়া জেগে ওঠে। মুখে-মুখে খবর পৌঁছে যায়– ছেলেরা দৌড়ে চৌরাশিয়া ও পাশোয়ানকে জানিয়ে আসে। পুরুষদের মুখে-মুখে নতুন শব্দ উচ্চারিত হয় : রেপ। 'পাড়ারিয়া উজারা হো গয়া। রেপ, রেপ'। সারা গাঁয়ের মেয়েতে-মেয়েতে সহমর্মিতা তৈরি হয়– লালডিকোলার মেয়েরা পাড়ারিয়ার মেয়েদের সঙ্গে মিশে যায়, শুশ্রূষা করে। ছোটকি-বহু সংক্ষিপ্ততম বাক্যে জানিয়ে দেয় পুরুষদের : সব আওরতকে পুলিশ রেপ করেছে। গ্রাম জুড়ে কান্নার রোল ওঠে। অর্জুন মাহাতো, মোতি মাহাতো, ছোটা বৈজনাথ, নান্দু তুরি, ভুলকি পাশোয়ান, কানু যাদব হতভম্বের মত নিজেদের বাড়ির দিকে তাকিয়ে ও দাঁড়িয়ে থাকে। পাশোয়ান চিৎকার করে ঘোষণা করে :

> পুলিশ আমাদের সর্বনাশ করে দিয়েছে। আমাদের ঘর ভেঙেছে, আমাদের মরদদের মিথ্যা মামলায় ধরে নিয়ে গেছে, আমাদের আউরতদের ইজ্জত নষ্ট করেছে। আমরা পুলিশদের বিরুদ্ধে মামলা করব, আজই করব, ঘর জ্বালানি মামলা, দাঙ্গার মামলা, রেপের মামলা। পাড়ারিয়া গাঁওয়ের সমস্ত জেনানা এখান থেকে মিছিল করে গিয়ে দেওঘরের ডেপুটি কমিশনারের কাছে বলবে কাল রাতে কী করেছে পুলিশ, সেইসব পুলিশকে বরখাস্ত করতে হবে, এখনই, তাদের শাস্তি দিতে হবে। পুলিশকে ছাড়া হবে না। (দেবেশ, ১৯৯৩ : ৩০৩)

Dhaka University Institutional Repository

কর্মসূচি নিয়ে, প্রতিনিধিত্ব নিয়ে অনেক কথাবার্তা, অনেক চিন্তা, অনেক প্রশ্ন ওঠে; প্রতিভাত হয় ধর্ষিতা নারীর জবানবন্দির অনেক সামাজিক বা পারিবারিক সমস্যাও। শেষপর্যন্ত রাধিয়াকে নির্বাচন করা হয়– কারণ তার সামাজিকতাও নেই, পারিবারিকতাও নেই। 'রাধিয়া কেলুর বিয়ে করা বৌ, কিন্তু কেলু তো রাধিয়ার স্বামী নয়, রাধিয়ার বর। রাধিয়ার শূন্য ঘরের শূন্যতা জুড়ে তাই চিরবাসর।' (দেবেশ, ১৯৯৩ : ৩৫১)। পুলিশ রাধিয়াকে গত রাতে দখল নিয়েছিল, আজ সকালে পাড়ারিয়া গাঁ তার ওপর দখল জারি করল। রাধিয়ার 'নেতৃত্বে' ধর্ষিতা নারীর মিছিল যাবে দেওঘরের আদালতের দিকে। রাধিয়ার বিয়েতে যে-মেয়েরা শিবপার্বতী আর রামসীতার বিয়ের গান গেয়েছিল, তাদের গলায় আজ মীরা বাঈয়ের গান। অলৌকিক খণ্ডে কেলু যে জাগরণের মন্ত্র দিয়ে গিয়েছিল, লৌকিক খণ্ডে রাধিয়ার সেই জাগরণ।

রাধিয়ার মধ্যে, ধর্ষিতা সব নারীর মধ্যে, পাড়ারিয়ার সামগ্রিকতার মধ্যে জাগরণ সঞ্চারিত করে যায় যে কেলু, তারও আছে নিজস্ব প্রতীকরূপ– ষষ্ঠ এবং সপ্তম আখ্যান জুড়ে তারই নির্মাণ। *সময় অসময়ের বৃত্তান্ত* উপন্যাসের কেলু তিস্তাপারের বাঘারুর স্মৃতিকেই ফিরিয়ে দেয়, কেননা তারও রয়েছে এক প্রাত্যহিকতাবিহীন, রিক্ত জীবন ও ক্রমাগত বিচ্ছিন্নতা। 'গাঁওকা আদমি' কেলুর 'কলকাত্তাইয়া' হওয়া, কলকাতায় বিষতেল বা তেলকেসের রোগীদের সঙ্গে কেলুর মিথ্যে রোগী সাজা, ডাক্তারবাবুদের সঙ্গে কথাবার্তা, রোগীদের আন্দোলন, সাংবাদিক সম্মেলন, প্রতিবাদ হিসেবে আত্মহত্যার প্রস্তাব, সেই প্রস্তাবে কেলুর সম্মতি এবং পরদিন ভোরে হাসপাতাল ছেড়ে কেলুর চলে যাওয়া– এই সব পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণে কেলুর জীবনের তথা নরক বাসের অভিজ্ঞতা মিশে আছে, আছে এক নীরব কৌতুকও। হাসপাতাল থেকে বিচ্ছিন্ন কেলুকে দেখা যায় 'ফুটপাতের স্থাপত্যে', কলকাতার ফুটপাতের বিচিত্র জগতে। কুকুর আর ভিখিরির দলে ভিড়ে যায় সে। তারপর একসময় একাত্ম হয়ে যায় স্টোনম্যানের সঙ্গে, পাথর দিয়ে যে খুন করে চলেছে একের পর এক ভিখিরি। স্বভাবতই পুলিশ এসে তাকে হাজতবাস করায়। পুলিশের কাছে কেলুর জবানবন্দির কৌতুকরহস্যেও ধরা পড়ে কেলু কীভাবে জড়িত ও বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকছে কলকাতার বাস্তবে; কলকাতাও কীভাবে তাকে প্রত্যাখান করছে। কেলুর সম্পূর্ণতাসন্ধানের তত্ত্ব জ্ঞাপন করে ঔপন্যাসিক লিখেছেন :

> কেলুর ত গ্রাম ছিল, ঘর ছিল, বৌ ছিল। কেলুর ত এমন দৃশ্য ছিল যে দিকে তাকিয়ে সে বলতে পারত, আমার। কেলু নিজেও ত ছিল, যেদিকে তাকিয়ে সে বলতে পারত, আমি। কেলু কি তার

Dhaka University Institutional Repository

> সেই গ্রাম, তার সেই ঘর, তার সেই বৌ, তার সেই দৃশ্য ত্যাগ করে এই শহরে এসে এ-রকম হাসপাতালের দরজায়-দরজায়, জেলখানার দরজায়-দরজায়, কখনো কোনো মিছিলের সারিতে-সারিতে ঢুকতে চাইছে? কেলুর কি নিজের জন্যে এ-রকম একটা নতুন পরিচয় অনিবার্য হয়ে পড়েছিল? (দেবেশ ১৯৯৩ : ৩৫৭)

কেলু আসলে কী চেয়েছিল অথবা কী তার সাথে ঘটেছিল সেটা বোঝা যায় না, তবে কেলু আসলে বিচ্ছিন্ন তার নিজেরই জীবন থেকে। 'কেলু জীবন থেকে নিজেকে নিটোল লুপ্ত করে নিয়েছে।' (দেবেশ ১৯৯৩ : ৩৮২)। জীবন থেকে কেলুর এই বিচ্ছিন্নতায় বা বিরহে কোনো বিষাদও নেই, শুধু জীবনাচরণ আছে। তার জীবনাচরণে অন্নচিন্তাসর্বস্বতা আছে; কারণ জীবনাচরণ একটা ব্যবস্থা, কেলু সেই ব্যবস্থার সম্পূর্ণ অন্তর্গত। সেই ব্যবস্থার অংশ হিসেবেই পক্ষাঘাতগ্রস্ত 'তেলকেস' রোগীদের হাসপাতালে সে ভর্তি হয়ে যেতে পারে, যেখানে দুবেলা খাবার ও নিশ্চিন্ত আবাস আছে। এক পর্যায়ে এক তেলকেস রোগীকে হাসপাতাল থেকে রিলিজ দেয়ার সিদ্ধান্ত হলে পক্ষাঘাতগ্রস্তদের অনশন আন্দোলন শুরু হয়। কারণ পক্ষাঘাতগ্রস্ত শরীর নিয়ে হাসপাতাল থেকে এত দ্রুত ছাড়া পেয়ে তাদেরকে চিরকালের জন্য সংসারে প্রতিবাদহীন অসার জীবন মেনে নিতে হবে। তাছাড়া তারা পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়েছেই সরকারি রেশনের তেল খেয়ে। পক্ষাঘাত আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে আসার আগে এই শরীর নিয়েই তারা ঘর-সংসার, হাট-বাজার-অফিস-ব্যবসা করেছে। কিন্তু শরীরের অর্ধাঙ্গ অচল হয়ে যাবার পর আর তা সম্ভব নয় কোনোদিন– একথা জেনে গেছে তারা :

> এই রোগীরা তাদের পরিশ্রমের জীবন থেকে, তাদের জীবিকার জীবন থেকে মুহূর্তে অপ্রস্তুতভাবে শ্রমহীনতা, জীবিকাহীনতার মধ্যে পড়ে গেছে। এদের সহায় বলতে নিজেদের খাটবার জোর। এদের বিনিয়োগ বলতে নিজেদের খাটবার জোর। এদের আকাঙ্ক্ষা মানে নিজেদের খাটবার জোর। এদের আত্মবিশ্বাস মানে নিজেদের খাটবার জোর। এদের এক-একজনের খাটুনির ওপর এক-একটা সংসারের সবগুলো মুখের ভাত। ... ফলে রোগী হিশেবেও এরা পুরোপুরি রোগী হতে পারছে না অথচ নিজেরই চোখের সামনে নিজের শরীরের পক্ষাঘাতগ্রস্ত অংশকে দিনের পর দিন মৃত দেখে যাচ্ছে। সমস্ত শরীরের মৃত্যু দেখা এক অভিজ্ঞতা। (দেবেশ, ১৯৯৩ : ৪১৪)

তারা একথাও জানে সরকারি হাসপাতালে নিশ্চিন্ত আবাস ও দুবেলা খাবার ও কিছু চিকিৎসা সেবাই এখন এই নিম্ন আয়ের মানুষগুলোর বেঁচে থাকার উৎস। কেলু অবশ্য বিশ্বস্ততার সাথে তেলরোগী হয়ে

Dhaka University Institutional Repository

যেতে পেরেছিল; বরাদ্দকৃত সরকারি লুঙ্গি ও গেঞ্জি গায়ে দিয়ে, ভর করার মত একটা লাঠি নিয়ে কেলু অবলীলায় তেলকেসের রোগী হতে পেরেছিল। রোগীদের অনশন আন্দোলন রূপান্তরিত হয় ইচ্ছামৃত্যুর আন্দোলনে। এই আন্দোলনকে সরব করতে আত্মাহুতিটা প্রথম কে দেবে তা নিয়ে জটিলতা হলে নীবর কেলুই হয়ে ওঠে তাদের একমাত্র অবলম্বন। কারণ কেলু এই তেলকেসের রোগীদের মধ্যে একটা লাঠিমাত্র বেছে নিয়েছে, তাতে তার দুই পায়ের ন্যূনতম অবশতাটুকু প্রমাণিত হয় মাত্র। তেলরোগী হওয়ার জন্য তার পায়ের যেটুকু পক্ষাঘাত প্রয়োজনীয় ছিল, কেলু তার চাইতে সামান্য বেশি কিছুও নেয়নি। "অথচ আত্মহত্যার জন্যে যখন প্রতিনিধি বাছাই করা হয় তখন সনাতনবাবু প্রতিনিধি হতে পারে না– তাঁর ছেলেকে জিজ্ঞাসা করা হয়নি। লক্ষ্মীদি প্রতিনিধি হতে পারেন না– তিনি বেঁচে থাকতে চান। শিবুদা প্রতিনিধি হতে পারে না– দেশে তার বালবাচ্চা আছে, কলকাতা শহরেও তার এক খুড়ো আছে।" (দেবেশ, ১৯৯৩ : ৪৩৪)। শেষে পর্যন্ত বাকি থাকে এক কেলু। কেলুর কোথাও হয়ত দেশ আছে– এখন এই হাসপাতালটাই দেশ ও তার ঘর। কেলু পুরোপুরি তেলরোগী আবার পুরোপুরি, তেলরোগী নয়। "তা হলে কেলু ছাড়া আর কে সনাতনবাবুর ধুতির ফাঁসে গলা দিয়ে ঝুলে পড়বে? কেলু ছাড়া আর কে?" (দেবেশ, ১৯৯৩ : ৪৩৪)। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের উদ্দেশ্যে অন্য রোগীর লিখে দেওয়া আত্মহত্যার চিঠি নিরক্ষর ও প্রায় নির্বাক কেলু তার টিপসই সমেত বালিশের তলায় রেখে রাত পেরিয়ে যাবার আগেই হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে পড়ে কলকাতা শহরের প্রাত্যহিকতায়। পাড়ারিয়া থেকে দেওঘরের পথে যেমন সেদিন রাধিয়া কেলুকেই খুঁজতে বেরিয়েছিল; "বেহালা হাসপাতাল থেকে কলকাতা শহরের পথে তেমনি আজ কেলু রাধিয়াকে খুঁজতেই বেরয়, মধ্য বা শেষ রাতে। (দেবেশ, ১৯৯৩ : ৪৩৪)। বিহারের অজপাড়াগাঁ পাড়ারিয়ার পাগলাটে, ঘরছুট হতদরিদ্র কেলু কলকাতা নগরীতে এসে এভাবেই রাষ্ট্রীয় নানা অসময়ের বৃত্তান্তের অংশীদার হয়ে ওঠে, হয়ে ওঠে স্বতন্ত্র ও বিচ্ছিন্ন। ঔপন্যাসিকের বয়ানে কেলুর দৈনন্দিন বিচ্ছিন্নতার নির্লিপ্ত প্রকাশ :

> কেলু যখন কলকাতার রাস্তায়-রাস্তায় খাবার খুঁজে বেড়ায় তখন ত তার হাঁটা এক বধিরের হাঁটা। কেলু বোমাফাটার আওয়াজের ভিতর দিয়ে ধোঁয়া কেটে চলে যায়, সে পুলিশের সারিবদ্ধ রাইফেলের সমবেত নিদারুণধ্বনি ভেদ করে চলে যায়, সে ট্র্যাফিকে মাটি থেকে ম্যাকাডামের চড়চড় উঠে আসার ধারাবাহিক বজ্রধ্বনির ভিতর ঢুকে নিজের নীরবতা অটুট রেখে বেরিয়ে আসে, সে শব্দক্ষরণময় মিছিলের ভিতর ঢুকে পড়ে, যেন সে মিছিল গাছতলার মতই অনড়। এ-শহরে

Dhaka University Institutional Repository

> কেলুর হাঁটা যেন জলের ওপর দিয়ে হাঁটা বা মাটির এক ইঞ্চিমত ওপর দিয়ে হাঁটা। শহরের পথে পদক্ষেপ তার শরীরে কোনো কম্পন তোলে না। (দেবেশ, ১৯৯৩ : ৪৫৪)

একসময় সে একাত্ম হয়ে যায় 'স্টোনম্যানের' সঙ্গে, পাথর দিয়ে যে খুন করে চলেছে একের পর এক ভিখিরি। কেলুর অবশ্য না জেনে বুঝেই স্টোনম্যান হতে চেয়েছিল। কারণ "সে আঁচ পাচ্ছে একটা কোনো সুযোগ হয়ত তার সামনে এসে যাচ্ছে যখন জেলে বা হাসপাতালে বা এ-রকম কোথাও তার আরো মাস দুই-তিন দুবেলা বা চারবেলা পেটপুরে খাবার মিলবে। আর মাস-দুই-তিন দুবেলা-চারবেলা পেটপোরা খাবার খেলে তার সারা জীবনের খাওয়া হয়ে যাবে।" (দেবেশ, ১৯৯৩ : ৪৫২)। ফুটপাতে শুয়ে থাকা কেলুকে স্টোনম্যান হিসেবে পুলিশ স্বভাবতই ধরে নিয়ে হাজতবাস করায়। পুলিশ আসলে 'স্টোনম্যান' বলে অজানা অচেনা খুনী লোকটাকে বর্ণনা করছিল তার শ্রেণি নির্ণয়ের জন্য। 'স্টোনম্যান' শব্দটিই তখনও পর্যন্ত পুলিশের বা খবরের কাগজের বানানো একমাত্র শব্দ । খবরের কাগজ, রেডিও ও টিভি থেকে প্রতিনিয়ত বিভিন্ন শব্দ আমাদের শব্দতত্ত্বে এসে যোগ হয়। 'স্টোনম্যান' তেমনই একটা শব্দ। কলকাতা শহরের শব্দতত্ত্ব প্রক্রিয়া ও কেলুর বেঁচে থাকার পদ্ধতি ব্যাখ্যা করেন ঔপন্যাসিক :

> কেলু ত আর জানে না 'স্টোনম্যান' শব্দটি তার জন্যে এমনই তৈরি হয়ে আছে, 'বিষতেল' শব্দটি যেমন ছিল। ... কেলু যদি প্রমাণ করতে পারে কেলুই 'স্টোনম্যান' তাহলে পুলিশ তাকে হয় ফাঁসিতে ঝোলাবে নয়ত সারা জীবন জেলে রেখে খাওয়াবে-পরাবে। আর যদি শেষ পর্যন্ত ফাঁসিতে ঝোলানোই সাব্যস্ত হয়, তা হলেও কেলু 'স্টোনম্যান' হিসেবে একটা সুযোগ পেয়ে যাবে– জেলখানার আমরণ খাবারের নিশ্চয়তা না-হয় সে ছেড়ে দেবে, যেমন সে ছেড়ে দিয়েছিল বেহালা হাসপাতালের খাবারের নিরাপত্তা। তেল খাওয়া রোগীরা সবাই মিলে আত্মহত্যার সিদ্ধান্ত নিলে কেলু বলতে পারে নি– সে মরতে হাসপাতালে ভর্তি হয় নি, বাঁচার দরকারে যে খাবার দরকার সে খাবারের জন্যে হাসপাতালটা তার দরকার হয়েছিল। (দেবেশ, ১৯৯৩ : ৪৫৫)

সুতরাং স্টোনম্যান হিসেবে কেলুকে পুলিশের শনাক্তিকরণের জটিল ও সূক্ষ্ম পদ্ধতি অবান্তর হয়ে পড়ে। পুলিশের সাথে কেলুর কথোপকথন :

> 'তুমি থাকো কোথায়?'
>
> 'ফুটপাথমে।'
>
> 'তুমি রাতে ঘুমোও কোথায়?'

Dhaka University Institutional Repository

'ফুটপাথমে।'

'তুমি কি পাড়া বদলাও ? নাকি একই জায়গায় ঘোরো ?' কেলু প্রশ্নটি বুঝতে পারে না। ছোটদারোগাবাবু প্রশ্নটার ভাষা বদলান, 'তুমি রাত্রিতে কোথায় শোও ?'

'ফুটপাথমে।'

'কোথাকার ফুটপাথ ? ড্যালহৌসির ? বিবাদী বাগের ?'

'না জানহোঁ। ফুটপাথমে।' দারোগাবাবু আবার তাঁর ভাষা বদলান, 'তুমি যেখানে শোও সেখানে কোনো বোরা পাত? কাপড়া ?'

'নাহি সাব।'

...

'শোয়ার সময় মাথায় কী দাও ? পাথর ?'

'কুছ নেহি সাব।' (দেবেশ, ১৯৯৩ : ৪৭৬)

"এই শব্দ ও শব্দভঙ্গময় কলকাতার সঙ্গে কেলুর শব্দ বা নৈঃশব্দ্য এমন এক সম্পর্ক তৈরি করে যে পুলিশের কাছে কেলুর জবানবন্দির কৌতুকরহস্যেও ধরা পড়ে কীভাবে কেলু জড়িত ও বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকছে কলকাতার বাস্তবে। কলকাতাও কীভাবে তাকে প্রত্যাখ্যান করছে।" (অরুণ, ১৪২১ : ১৪৭)। সপ্তম আখ্যানের পর *সময় অসময়ের বৃত্তান্তের* 'সাগর খণ্ড'। যেখানে রয়েছে কেলুর সংলগ্নতা ও বিচ্ছিন্নতার ভিন্ন এক পরিক্রমা। কলকাতার রাস্তায় পরিভ্রমণ শেষে সে এসে পড়ে গঙ্গার ধারে তীর্থযাত্রীদের মেলায়। এখানে একদিকে বাসের সারি, তিনদিকে সারি সারি তাঁবু; রান্নার বড় বড় উনুনের লাইন, পুরি, রুটি, গজা আর লাড্ডুর পাহাড় ও অসংখ্য চলন্ত মানুষের ভীড়ে এসে পড়ে কেলু। প্রথমে সে বুঝতে পারে না ব্যাপারটা কী। এত সব 'ঘরওয়ালা গাঁও-ওয়ালা লোকে'র মাঝে কেলুর মত কেউ নেই। কেলু কলকাতা শহরের কোনো ভিড়েই ত মিশে যেতে পারে না, এমন-কি ভিড়ের শেষেও দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না।" (দেবেশ, ১৯৯৩ : ৪৯৪)। কিন্তু আজন্ম বিচ্ছিন্নতা নিয়েও কেলু ভিড়ের মধ্যে মিশে যেতে চায়। "কেলু যে কেলু, কেলু যে একা, তার যে ঘর নেই, গাঁও নেই, দল নেই– তাকে দেখে তেমন লাগছে না। কেলু এই ভিড়ের সঙ্গে সম্পূর্ণ অন্বয়ের একটা স্বাদ পায়, গভীর স্বাদ।" (দেবেশ, ১৯৯৩ : ৪৯৪)। তীর্থযাত্রী মানুষ, বাসের ভিড়ে, বিচিত্র কথোপকথনের শব্দময়তায় সে অকস্মাৎ গঙ্গাসাগর যাত্রার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলে। গঙ্গাসাগর মেলার তিনচার দিন আগে থেকেই কলকাতায় বাবুঘাট-আউট্রামঘাটের সামনে, ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গের কাছে, মোহনবাগান মাঠের পেছনে ছোট সাগরমেলা বসে যায়। বিভিন্ন রাজ্য থেকে লক্ষ লক্ষ তীর্থযাত্রী কলকাতার হয়ে

Dhaka University Institutional Repository

গঙ্গাসাগর যায়। এটা হচ্ছে তার সংবর্ধনা কেন্দ্র বা 'রিসেপশন পয়েন্ট'। গঙ্গার তীরের এই মেলা যেন স্বতন্ত্র এক রাষ্ট্র হয়ে ওঠে। "সাধু সন্ন্যাসীদের নিয়ে ভারতীয় ধর্মসমাজও যেমন এক স্বতন্ত্র রাষ্ট্র। এদের বাদ দিয়ে ভারতবর্ষকে বোঝা যায় না, কলকাতাকেও চেনা যায় না।" (দেবেশ, ১৯৯৩ : ৫০২)।

কেলু ভিড়ের মধ্যে থাকতে ভিড়েরই একজন এবং আর সব তীর্থযাত্রীদের মতই সে গঙ্গাসাগরযাত্রী হয়ে পড়ে। ঘটনাচক্রে সে এক নাগা সন্ন্যাসীর শিষ্য হয়ে যায়, যে সন্ন্যাসী তার কোমরে প্রসারমান লিঙ্গ জড়িয়ে রাখে। নিশিজাগরণে ব্যস্ত কলকাতা শহরের পাশেই এসব ঘটে, কলকাতার সঙ্গেও এর যোগ নেই তা নয়। ল্যাঙটের ওপর প্যান্টজামা পরে সাধুবাবা কলকাতা দর্শনে বের হয়। গ্র্যান্ড হোটেল, জাদুঘর, পাতাল রেল দেখা হয়। 'কলকাত্তাওয়ালা' কেলু তার গাইড, যদিও নিজে সে এসব কোনো কালে দেখেনি। তারপর এই গুরুর সাথে কেলুর গঙ্গাসাগর যাত্রা। গঙ্গাসাগর অভিমুখে "সমুদ্রসীমায় যাওয়ার আগে সে (কেলু) অর্ঘস্তূপের পাশ দিয়ে, সারনাথের স্তম্ভশীর্ষের সিংহের পাশ দিয়ে, বোধিসত্ত্বদের আত্মদানের কাহিনীর তলা দিয়ে, মায়াদেবীর গর্ভস্বপ্নের তলা দিয়ে, যক্ষ-যক্ষিণীদের মূর্তির সামনে বিধ্বস্ত স্থাপত্যের মকরমুখো নালী দেখেছিল। গঙ্গাসাগর যাত্রার আগে কেলুর গায়ে পুরাণের ছোঁয়া লেগে গেল।" (দেবেশ, ১৯৯৩ : ৫৪৮)। কেলুর অসার জীবনযাত্রার ভগ্নরূপের প্রতীক হয়ে ওঠে পৌরাণিক স্থাপত্য নিদর্শন। কেলু জানে সে মেলার ভেতরে থেকেও ক্রমেই মেলার বাইরে চলে যাবে, "যেমন মাসের পর মাস কলকাতার অভ্যন্তরে থেকেও কলকাতার বাইরে পড়ে যেতে হয়, যেমন সে হাসপাতালের রোগী হয়েও রোগী থাকতে পারে না, যেমন তার হাতে পাথর আর রক্তের ছোপ থাকলেও সে স্টোনম্যান হতে পারে না।" (দেবেশ, ১৯৯৩ : ৫৩২)। তাই কোনো এক সাধুর চেলা বনে গিয়ে গঙ্গাসাগর যাত্রার মধ্য দিয়ে কেলুর জীবন-বিচ্ছিন্নতার নতুন আখ্যান শুরু হয়। সাধু বাবু যখন তাকে জিজ্ঞেস করে "ঘর হ্যায় তোঁহার, কলকাত্তামে?" কেলু এর জবাব দিতে পারে না। ঘর ত সেখানেই হয়, যেখানে মানুষ থাকে। কেলু মাটির দিকে তাকিয়ে জবাব দেয়, 'হাম ত রহতা হ্যায় কলকাত্তামে।" (দেবেশ, ১৯৯৩ : ৫৪৩)। কেলুর সাধুবাবা হয়ত বুঝে নেয় কিছু একটা। কেলুর জীবন-কাহিনী অব্যক্তই থেকে যায়। এভাবে "সেই পাড়ারিয়া-ধর্ষণের মুখ্য ফরিয়াদি রাধিয়া মুসম্মতের স্বামী এই কেলু পাড়ারিয়া থেকে কত সরে আসতে-আসতে শেষ পর্যন্ত এসে পড়ে সংগঠিত হিন্দুধর্মের এক নাগা সন্ন্যাসীর কাছে।" (দেবেশ, ১৯৯৩ : ৫৫৫)। যদিও সে নিজে নাঙ্গা সাধু বনে যেতে পারে না পুরোপুরি। তবে সে সাধুর নির্দেশমত শ্রাদ্ধ করে। পিণ্ডি দেয়

Dhaka University Institutional Repository

সমুদ্রপারে, তারপর সমুদ্রের দিকে যায়, জীর্ণ বসন ত্যাগ করে নতুন সন্ন্যাসে জন্মাতে। কোনো লৌকিকতাই আর কেলুর জন্য অবশিষ্ট নেই তখন, 'স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের' পথে সকল লৌকিকতার সাথে অবিচ্ছেদ্য ও বিচ্ছিন্ন থেকে কেলু এগিয়ে যায় সমুদ্রের পানে এক অলৌকিক অনুভবে। সমুদ্রের পারে এসে কেলু বুঝতে পারে না কোথায় সমুদ্রের শুরু, কারণ গঙ্গাসাগরেই কেলুর প্রথম সমুদ্র দর্শন ঘটে। ক্রমেই সে সমুদ্রের গভীরতার দিকে এগিয়ে যায় পাঁচটি মাটির পিণ্ড নিয়ে। "এইখানে এসে সে বোঝে এইখানে আসার জন্যই সে সেই কবে থেকে, কোথা থেকে রওনা দিয়েছে।" (দেবেশ, ১৯৯৩ : ৫৬১)। মানবজীবনযাত্রার দিগন্তহীনতা, নিরন্তর পথ-পরিক্রমার দর্শনকে ঔপন্যাসিক সমুদ্রের অভ্যন্তরে ও ব্যাপ্তিতে মিলিয়ে দেন। সেই অতলস্পর্শ গভীরতায় মাটি খুঁজতে খুঁজতে কেলুর বোধোদয় হয় যে সে মানুষে মানুষে আঁকা তটরেখার কিংবা স্থলভাগের ভারতবর্ষ চেনে না, সে কেবল জানে পাড়ারিয়া গ্রাম। "আর ঠিক তখনই যে-কেলুর কাছে ভবিতব্য ও সুদূর এখনো বর্তমান ও নিকট, সেই অলৌকিক কেলু দেখতে পায়" :

> সমুদ্রের ব্যাপ্তিতে (সে) দেখে পাড়ারিয়া জ্বলছে, সেই সমুদ্রে জ্বলন্ত পাড়ারিয়ার আঙিনায় তার বহু রাধিয়াকে কারা চিত করে ফেলে ধর্ষণ করছে, রাধিয়া সেই আচ্ছন্নতার ভিতর চোখ বুজে ফেলে এই গঙ্গাসাগরের ওপরের আকাশটা দেখে ফেলেছে। ... কেলু রাধিয়াকে দেখতে পায়। দেখে, রাধিয়া সেই আগুনের মধ্য দিয়ে তাকে খুঁজতে খুঁজতে এগিয়ে আসছে। (দেবেশ, ১৯৯৩ : ৫৬২)

কেলু ঘুরে দাঁড়ায়। তারপর ঢেউয়ে পা দিয়ে পৌরাণিক অবতার হয়ে ওঠে। ঔপন্যাসিকও কেলুর অস্তিত্ব ও 'স্বয়ংসম্পূর্ণতা' অর্জনের আখ্যান সমাপ্ত করেন :

> তাকে এখনই পাড়ারিয়ার রাধিয়ার কাছে যেতে হবে। 'রাধিয়া জাগো।' কেলু আরো আরো ঢেউয়ের মাথায় পা দিয়ে, ঢেউ গুঁড়িয়ে ফেলে তার সমুদ্রখণ্ড থেকে, ধর্ষণের পরের সকালের এক অলৌকিক খণ্ডের দিকে ছুটে যায়। এই সমুদ্র, এই মেলায় তার সাধুবাবার লিঙ্গ, দেওঘরের পাহাড় কোনো কিছুই তাকে বাধা দিতে পারবে না। আটকাতে পারবে না। 'রাধিয়া, হাম আঁতহো।' (দেবেশ, ১৯৯৩ : ৫৬২)

অন্তহীন বৃত্তের অনুভবে এক বৃত্তান্ত এভাবেই মিলে যায় আরেক বৃত্তান্তে। কেলুর অনুভব ও চিন্তায় শেষ হয় সপ্তম আখ্যান : ভারবর্ষের সামনে দাঁড়িয়ে আছে কেলুর মত বহু গ্রামবাসী। তারা কেবল গ্রামকেই চেনে, চেনে না ভারতবর্ষকে।

Dhaka University Institutional Repository

অষ্টম বা শেষ আখ্যানে ঔপন্যাসিক স্বাধীন ভারতবর্ষকে অন্বেষণ করে বেড়ানো নকশাল-কর্মী বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর কাহিনীতে ফিরিয়ে আনেন পাঠককে। প্রথম আখ্যানে বা অধ্যায়ে বিশ্বনাথকে পাওয়া গিয়েছিল দাদা কামাক্ষী ও ভাইঝি মিতুর স্মৃতিতে। পাড়ারিয়ার ধর্ষণের দিনটিতে সে কাছাকাছি এক টোলায় আত্মগোপন করেছিল সহকর্মী পাশোয়ানের ঘরে। এখানেও সে স্বভাব অনুযায়ী পাশোয়ানের মাঝে বিপ্লব সঞ্চারিত করতে চায়। গ্রামবাসীদের কাছে পাশোয়ানের জ্বলন্ত ভাষণে 'হামরোঁকো লিডার বিশ্বনাথ' হয়ে জেগে থাকে। বিশ্বনাথ নকশাল রাজনীতির কর্মী। ১৯৮০-তে সে যখন এই রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত হয়, তখন নকশাল আন্দোলন প্রায় ইতিহাসের অন্তর্গত হয়ে গেছে। নকশালবাড়ী আন্দোলন (১৯৬৭-১৯৭২) সাধারণ মানুষ কৃষক-শ্রমিক-মজুরদের স্বাধীনভাবে বেঁচে থাকার অনুপ্রেরণা যুগিয়ে এক সার্বজনীন রূপ লাভ করেছিল। তেলেঙ্গানা বা তেভাগা আন্দোলন থেকেও (১৯৪৬-১৯৫১) নকশালবাদীরা অনুপ্রেরণা পেয়েছে। ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যকার রাজনৈতিক মতাদর্শের দ্বন্দ্ব বা বিরোধ থেকেই মূলত এই আন্দোলনের সূত্রপাত। ইংরেজ শাসনামলে ১৯২৫ সালে গঠিত হয়েছিল কমিউনিস্ট পার্টি অফ ইন্ডিয়া (সি.পি.আই) বা ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলন। অজস্র আন্দোলন, গণ-সংগ্রাম, বীরত্ব ও আত্মত্যাগের মধ্য দিয়ে সি.পি.আই-এর বিপ্লববাদী রাজনীতি এগোলেও বিপ্লবকে সত্যিকার অর্থে সাফল্যমণ্ডিত করা সম্ভব হয়নি। "মূলত এক ধরণের ব্যর্থতা-বোধ, তার কারণ অনুসন্ধান, পার্টির রণনীতি ও রণ-কৌশল সম্বন্ধে প্রশ্ন, নেতৃত্বের প্রতি ক্ষোভ– এসব কিছুর মধ্য দিয়ে কমিউনিস্ট কর্মী-বাহিনীর মধ্যে ধীরে ধীরে গড়ে উঠতে থাকে বিকল্প বিপ্লবী কমিউনিস্ট রাজনীতি খোঁজার প্রয়াস।" (প্রদীপ, ১৯৯৮ : ১০)। যদিও এই প্রয়াস তখন অনেকটাই ছিল বিক্ষিপ্ত, অসংগঠিত, স্থানীয় চরিত্রের, কখনও আংশিক দাবি-কেন্দ্রিক, কখনও পার্টির কোনো বিশেষ নীতিকে ঘিরে আবর্তিত, "এমনকি কখনও কখনও তা হয়ে ওঠে ব্যক্তি-নির্ভর।" (প্রদীপ, ১৯৯৮ : ১০)। ধীরে ধীরে কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে দুটি পরস্পরবিরোধী প্রবণতা গড়ে ওঠে। এর একদিকে রয়েছে পার্টি-নেতৃত্বের সংসদ-সর্বস্ব রাজনীতি, প্রতিষ্ঠিত সমাজ ব্যবস্থাকে অটুট রেখে সরকার গঠনের লক্ষ্য; নির্বাচন-মুখী আন্দোলন ও সংগঠন। বিপরীতে প্রচলিত সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রবল বিপ্লবের আকাঙ্ক্ষাসমৃদ্ধ অংশ। বিভিন্ন গণ আন্দোলন ও সংগঠনগুলোকে বিপ্লবের পথে চালনা করার কথাই এক্ষেত্রে ভাবা হয়। সি.পি.আই-এর এই দু'ধারার সংগ্রাম ক্রমশ স্পষ্ট হতে থাকে। ১৯৫৬ সালে সোভিয়েত ইউনিউনের কমিউনিস্ট পার্টির বিশতম পার্টি কংগ্রেসে ক্রুশ্চেভ (Nikita Khrushchev, ১৮৯৪-১৯৭১) স্তালিন বিরোধিতার নীতি গ্রহণ করেন। সি.পি.আই-

Dhaka University Institutional Repository

এর মধ্যেও স্তালিন প্রশ্ন নিয়ে মতাদর্শগত সংগ্রাম শুরু। স্তালিন-বিরোধী, ক্রুশ্চেভ সমর্থক পার্টি নেতৃত্ব বিবেচিত হল পার্টির দক্ষিণপন্থী অংশ হিসেবে। আর পার্টির যেটা বামপন্থী অংশ বলে ধীরে ধীরে পরিচিত লাভ করছিল সে অংশ স্তালিন-বর্জনকে মেনে নেয় নি। চীন-সোভিয়েত মতাদর্শগত মহাবিতর্কে সেদিন সি.পি.আই-এর দক্ষিণপন্থী নেতৃত্ব সোভিয়েত ইউনিয়নের পক্ষ নেয়। "তাদের নির্বাচনমুখী সংসদীয় রাজনীতির জন্যে সোভিয়েত মতাদর্শ গ্রহণ ছিল তাদের পক্ষে স্বাভাবিক ও সুবিধেজনক।" (প্রদীপ, ১৯৯৮ : ১০)। ১৯৬২-তে চীন-ভারত সীমান্ত সংঘর্ষ গভীর হলে সি.পি.আই-এর দক্ষিণপন্থী জাতীয় পরিষদ চীনকে আগ্রাসনকারী গণ্য করে নেহেরু সরকারের পক্ষ নেয়। পার্টির বামপন্থী অংশ অবশ্য চীনকে আক্রমকারী বলে মেনে নিতে পারে না। অনেকে বরং নেহেরু সরকারের সমালোচনা করেন। নেহেরু সরকার 'চীনাপন্থী' ব'লে কথিত বহু বামপন্থী কমিউনিস্টদের গ্রেপ্তার করে জেলে বন্দী করে রাখে। বিরূপ পরিস্থিতিতে কমিউনিস্ট কর্মী-বাহিনী সংগ্রাম-মুখী বিপ্লবকামী রাজনীতি (revolutionist politics)-এ আগ্রহ হয়ে ওঠে। এদের মধ্যে ছিল সর্বভারতীয় নেতৃত্বের কোনো কোনো নেতা, পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যস্তরের নেতৃত্বের অনেকেই এবং বড় সংখ্যক কর্মী বাহিনী। বামপন্থী অংশ বা পরবর্তীকালের সি.পি.আই(এম)-এর উল্লেখযোগ্য নেতারা হলেন– পি. সুন্দরাইয়া (১৯১৩-১৯৮৫), এ.কে. গোপালন (১৯০৪-১৯৭৭), হরকিষেণ সিং সুরজিত (১৯১৬-২০০৮), জ্যোতি বসু (১৯১৪-২০১০), ই. এম. এস. নাম্বুদিরিপাদ (১৯০৯-১৯৯৮), বাসবপুন্নিয়া (১৯১৪-১৯৯২) প্রমুখ। এঁদের নেতৃত্বাধীনেই অন্তর্ভুক্ত ছিলেন পরবর্তী সময়ের নকশালপন্থী বা মাও-পন্থী কমিউনিস্টরা যথা চারু মজুমদার (১৯১৬-১৯৭২), সুশীতল রায়চৌধুরী (১৯১৭-১৯৭১), নিরঞ্জন বসু (১৯১৭-২০০৯), মণি গুহ (১৯১৪-২০০৯), পরিমল দাশগুপ্ত, সৌরেন বসু (১৯২৪-), কানু স্যান্যাল (১৯৩২-২০১০), জঙ্গল সাঁওতাল (১৯২৫-১৯৮১) প্রমুখ। ১৯৬৫ সাল থেকেই চারু মজুমদার তাঁর আন্তঃপার্টি মতাদর্শগত দলিলগুলি লিখতে থাকেন। কারণ নব্য গঠিত সি.পি.আই (এম)-এর পার্টি নেতৃত্ব নিয়ে দলে দেখা দিয়েছিল সংশয়। 'বহু বিপ্লবকামী কমিউনিস্ট সি.পি.আই (এম) পার্টি নেতৃত্বকে 'নয়া সংশোধনবাদী' বলে সমালোচনা করেন। নেতৃত্বের সাথে দীর্ঘস্থায়ী মতাদর্শগত তাত্ত্বিক সংগ্রাম নয়, বরং বিকল্প বিপ্লবী প্রয়োগের (actionist stream) মাধ্যমে 'শোধনবাদ-বিরোধ' সংগ্রাম চালানোর ওপর জোর দেয়া হয়।' (প্রদীপ, ১৯৯৮ : ১০-১৩)। কিন্তু পার্টির উদ্দেশ্য ও আদর্শের দ্বিধা-বিভক্তি পরবর্তীকালে পার্টি গঠনের মূল লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত করেছিল। তবে কমিউনিস্ট পার্টির মতবিরোধ সত্ত্বেও এবং এদেশের সাধারণ কৃষক জনতার

Dhaka University Institutional Repository

প্রতি শাসনযন্ত্রের নিপীড়ন বন্ধ করতে ও কৃষকদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় এই আন্দোলন বহুল জনপ্রিয়তা পেয়েছিল। ১৯৬৭ সালে এই আন্দোলন শুরু হবার প্রাক্কালে সবাই সমর্থন দিয়েছিল সাম্যাদর্শে গঠিত সমাজের স্বপ্ন পূরণে। শাসনকারী ব্যক্তিবর্গ ব্যতীত কৃষক-শ্রমিক সমাজের এবং নিচুতলার অনেক মানুষই এই আন্দোলনের সাথে যুক্ত হয়েছিল। ঔপনিবেশিক শোষণের গোড়া থেকেই পুঁজি ও রাষ্ট্রীয় অনুশাসনের সাথে সম্পৃক্ত উন্নয়ন-অগ্রগতির নামে যে বৈপরীত্য সাধারণ জনজীবনে সংকট সৃষ্টি করেছিল; দেশবিভাগের পরেও সেটা ছিল ভারতবর্ষের রাজনীতির অন্যতম সমস্যা। পরাধীন দেশে বৈদেশিক অনুশাসনে যে অগ্রগতি, বৈষয়িক-মানসিক সব ক্ষেত্রে পদে পদে নিয়ত তার অপচয় হয়েছে। দেশবিভাগোত্তর রাজনীতির পঞ্চাশ বছরের ইতিহাস প্রায় ব্যর্থতার ইতিহাস। বিকাশ, প্রগতি, উন্নয়ন, অগ্রগতি এক জায়গায় কেন্দ্রীভূত হয়েছে আর এর মূল্য দিতে হয়েছে বিরাট জনপিণ্ডকে। সংগঠিত ও প্রতিষ্ঠিত হবার পর মাও-মার্কস-লেলিনবাদী নকশালপন্থীরা রাষ্ট্রযন্ত্রের পুঁজিবাদী, 'আপোসী জনতন্ত্রবিরোধী' শাসনব্যবস্থার বিরুদ্ধেই বিদ্রোহ করতে চেয়েছে। কিন্তু ক্রমেই তাদের রাজনৈতিক মতাদর্শ নয়, বরং নিন্দনীয় হয়ে ওঠে সশস্ত্র ও আপোসহীন বিদ্রোহের পন্থা। এ আন্দোলন ধীরে ধীরে স্তিমিত হবার পেছনে কেবল পার্টি-কর্মীদের আদর্শ ও নীতিগত বিভেদ দ্বন্দ্বই প্রধান ছিল না; তাদের দমনে রাষ্ট্রপক্ষের প্রচণ্ড দমন পীড়ন এবং আদর্শগতভাবে অন্যান্য দলগুলোর সর্বশক্তি নিয়োগ ছিল এর অন্যতম কারণ। ফলে এই আন্দোলন নেতৃত্বহীন হয়ে ব্যর্থ বিপ্লবের অভিধায় পর্যবসিত হয়।

কেবল *সময় অসময়ের বৃত্তান্তে* বিশ্বনাথের প্রসঙ্গেই নয়; দেবেশ রায়ের অন্যান্য গল্প-উপন্যাসেও উঠে এসেছে নকশাল আন্দোলন সম্পর্কিত নানা চিত্র।[৫] "শুধু নকশাল নয়, রাজনীতিরই ভ্রান্তির বিকারে রাষ্ট্রীয় জুলুমের পাশাপাশি আত্মহননও রাজনীতিকে গ্রাস করেছে। বিশ্বনাথের আদ্যোপান্ত ঘটনা তো তারই ধারাবাহিকতায় গড়া।" (অরুণ, ১৪২১ : ১৮২)। পরাজয় সম্পর্কে নিশ্চিত জ্ঞান নিয়েই যেন রাজনীতিতে নেমেছিল বিশ্বনাথ। ঔপন্যাসিক লিখেছেন :

> বিশ্বনাথ যখন ১৯৮০ সাল নাগাদ এই রাষ্ট্রকে যুদ্ধক্ষেত্রে ডাকলেন, তখন ১৯৭৫-৭৬ ঘটে গেছে, এ-রাষ্ট্র লজ্জাহীন সশস্ত্র, এ-রাষ্ট্র আবরণহীন হিংস্র। বিশ্বনাথ সেখানে দাঁড়িয়ে, একক। তাঁর আর যে-কয়েকজন সহকর্মী ছিলেন, তাঁদের ধরলেও একক। ... আমি কল্পনা করতে চাই– বিশ্বনাথ হারতে চেয়েছিলেন, সেই হার সুনিশ্চিত জেনেই তিনি তাঁর কর্মসূচি বেছে নিয়েছিলেন এমন

Dhaka University Institutional Repository

বিকল্পহীন। ... বিশ্বনাথ জানতেন জয়চিহ্ন আছে, কিন্তু তাঁর জন্য কোনো জয় কোথাও নেই। (দেবেশ, ১৯৯৩ : ৫৯১)

১৯৭৫ থেকে '৭৮ সাল পর্যন্ত বিশ্বনাথ তরুণ অবস্থায় বারবার অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে থেকেছে, তারই মধ্যে হাসপাতালের রোগীদের সঙ্গে মিলে মিছিল করেছে। ১৯৭৭-এর ফেব্রুয়ারিতে মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে খারাপ খাবার আর সঠিক ওষুধের দাবিতে 'ভুখহরতাল' শুরু করেছিল বিশ্বনাথ। তখন এই আন্দোলন ছড়িয়ে পড়েছিল দেশের আরো ১৬টি হাসাপাতালে। বিশ্বনাথ তাঁর নিউমোথোরাক্স অসুখের জন্য ১৯৭৫-এ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিল। ভাল খাবার আর সঠিক ওষুধের দাবিতে সে এবং অন্যান্য রোগীরা "এক অদ্ভুত মিছিলে একদিন হেঁটে গিয়েছিল হাসপাতালের প্রধান রাস্তা ধরে এগিয়ে, প্রধান ফটক দিয়ে বেরিয়ে বেলা দশটায় ট্রাফিক জ্যাম আর উর্ধ্বগতি ট্রাফিকের বিপরীত ছন্দের ভিতর দিয়ে।" (দেবেশ, ১৯৯৩ : ৫৮৩)। তাদের অনেকের গায়েই ছিল ছেঁড়া, নোংরা ও গোটা গেঞ্জি, শীর্ণ মুখ, ধূসর চামড়া, চোয়ালের স্পষ্ট হাড় আর কোটরে পড়া অদ্ভুত জ্বলন্ত চোখের এই মিছিলকারীদের দেখে "কলকাতার উতরোল ট্র্যাফিকও থমকে যায়।" (দেবেশ, ১৯৯৩ : ৫৮৩)। পাতলা পোড়া রুটি ও মলিন বিশৃঙ্খল একহাতা ভাত-তরকারির থালা নিয়ে ব্যস্ত কলকাতার রাস্তাকে কিছুক্ষণের জন্য অচল করে দিতে বেরিয়ে পড়েছিল তারা। বিশ্বনাথের নেতৃত্বে 'জনমত' তৈরি করতে রোগীদের সেই স্বতঃস্ফূর্ত মিছিল সফল হয়তো হয়নি। কারণ, "তখন সবে ভোট শেষ হয়েছে। কেন্দ্রে প্রথম কংগ্রেসবিরোধী মন্ত্রীসভা বসেছে, রাজ্যে বামফ্রন্ট। গণতন্ত্রের নতুন প্রত্যাশায় হাসাপাতালের রোগীদের দাবির অগ্রাধিকার ছিল না।" (দেবেশ, ১৯৯৩ : ৫৮৩)। আন্দোলনের দায়ে তাই বিশ্বনাথকে বদলি করা হল আরেক হাসপাতালে, সেখানে গড়ে তিনজন রোগীর একজন তখন মারা যায়, নিয়মিত।

১৯৭৮-এর বন্যায় বিশ্বনাথ মুর্শিদাবাদ-মালদার বিভিন্ন এলাকায় 'বুকের পুঁজরক্ত' নিয়ে ত্রাণে অংশ নিয়েছে। কারণ ৭৮-এর ৭ জুন তাঁর অপারেশন হয়, বুকের আটটা পাঁজর বাদ চলে যায় আর তার মাস দুয়েকের মধ্যেই বন্যা শুরু হলে বিশ্বনাথ সেখান থেকে আর ফেরে নি। যেখানে জীবিকার অবলম্বন ধ্বংস হয়ে গিয়ে মানুষ মরছিল– বিশ্বনাথ উদ্যোগী হয়েছিল এ-রকম অবস্থায় কীভাবে মানুষকে একটু বাঁচিয়ে রাখা যায়। এসব কাজের অনিবার্যতায়ই যেন সে প্রবেশ করেছে তার এই রাজনীতিতে। কারণ "সে যেখানেই কাজ করতে গেছে, সেখানেই প্রতিদিনের বাঁচাটাকে রাতারাতি

Dhaka University Institutional Repository

বদলে দিতে গিয়েছে।" (দেবেশ, ১৯৯৩ : ৬২৯)। এসব তাগিদ থেকেই সে পার্টিতে যোগ দেয়ার পর সাঁওতাল পরগণার দেওঘর জশিডিতে পাড়ারিয়া, ছোটকীখারখার, পুনাসি বাজারে গেছে। পাড়ারিয়া ধর্ষণ মামলায় পুলিশী অভিযানের বিরুদ্ধে এক মানব-সমাবেশের উদ্যোগ এবং ধর্ষিতাদের আদালত পর্যন্ত তুলে দেবার সাহসও সে যুগিয়েছে। এভাবে "দিগ্‌দেশহীন বেগে ছুটে বিশ্বনাথ তার যে-স্বদেশকে খুঁজছিল, জেল ভাঙছিল, বিপ্লবী পরিস্থিতি তৈরি করে তুলতে চাইছিল, যে-কোনো পরিস্থিতির ঘাড় ধরে তাকে বিদ্রোহে বদলে দিতে জোর করছিল– সাঁওতাল পরগণা, দেওঘর জিলা, পুনাসি বাঁধ, পাড়ারিয়া গাঁও সেই তার নিজস্ব স্বদেশ ও বিপ্লবেরও অংশ। (দেবেশ, ১৯৯৩ : ২০)। বিশ্বনাথ, রাজনৈতিক অর্থে 'বিপ্লব' বলতে শব্দটির 'এক ও অনড়' অর্থ বোঝে– "এই সামন্তবাদী মুৎসুদ্দি, বুর্জোয়ার নব্য উপনিবেশের রাষ্ট্রকে ধ্বংস করতে হবে, গণতন্ত্রকে ধ্বংস করতে হবে ও প্রতিষ্ঠা করতে হবে শ্রমিক-কৃষকের রাষ্ট্র।" (দেবেশ, ১৯৯৩ : ৫৯৩)। তার রয়েছে শ্রেণিশত্রুর প্রতি ঘৃণা। নকশালবাড়ির ইতিহাস বিশ্বনাথের পক্ষে এ সূত্রেই প্রাসঙ্গিক ; ঔপন্যাসিক লিখেছেন :

> নকশালবাড়ি আন্দোলন ভারতীয় গণতন্ত্রের সীমান্ত চিহ্নিত করেছে, যে সীমান্তে দাঁড়িয়ে বিশ্বনাথের যুদ্ধ ঘোষণা। বিশ্বনাথ সেই ইতিহাসের বাইরে থেকে সেই ইতিহাসের ভিতরে। বিশ্বনাথের শুধু অস্বীকার আছে– শক্তি দিয়ে অস্বীকার। (দেবেশ, ১৯৯৩ : ৫৯৩)

বৃত্তান্তে বিশ্বনাথের বিপ্লবী-জীবন ব্যাখ্যাত হয় ইতিহাসের ধারাকে সংলগ্ন রেখেই। একজন নকশালকর্মী হিসেবে বিশ্বনাথ তার বিপ্লবকে ভিন্ন মহিমায় ভালবেসেছিল। নকশালবাড়ির ইতিহাস ১৯৭৮-এর মধ্যেই অনেকটা শেষ হয়েছে ; ঔপন্যাসিক জানিয়েছেন :

> বিশ্বনাথের মাথার পিছনে কোনো ইতিহাসের বলয় নেই। ... বিশ্বনাথ ১৯৬৯-এর ২২ এপ্রিল ময়দানের সেই সমাবেশে ছিলেন না যেখান থেকে সি.পি.আই. (এম.এল)-এর প্রতিষ্ঠা ঘোষিত হল। ... এপ্রিল '৭০ থেকে শহরে-শহরে মূর্তি ভাঙা ও স্কুল-কলেজ পোড়ানো শুরু হয়– বিশ্বনাথ সেই নাগরিক-গেরিলা (আরবান গেরিলা) এ্যাকশনে ছিলেন না। ডেবরায়, গোপী-বল্লভপুরে, বীরভূমে– কোথাও বিশ্বনাথ ছিলেন না। সি.পি.আই (এম.এল)- এর মতপার্থক্যে তাঁর কোনো দলিল ছিল না। তেমন করে বলতে গেলে– তাঁর কোনো মাও-ও ছিলেন না, তাঁর কোনো চারু মজুমদারও ছিলেন না। ... (নকশালবাড়ির) ইতিহাস শেষ হয়ে গেলে বিশ্বনাথের ইতিহাসের উত্থান। সেই ইতিহাস বিশ্বনাথের পক্ষে সবসময় তত প্রাসঙ্গিক নয়। কারণ বিশ্বনাথ ত সেই ইতিহাসের ভিতর দিয়ে আসেনই নি। বড় জোর সেই ইতিহাসে প্রবেশ করেছেন। (দেবেশ, ১৯৯৩ : ৫৯২)

Dhaka University Institutional Repository

আর অসময়ের ইতিবৃত্তে বিশ্বনাথের এই প্রবেশ স্বইচ্ছায়, কোনো আন্দোলনের জোরে নয়। কারণ সমকালীন কলকাতার ছাত্র, যুবা বা বুদ্ধিজীবী আন্দোলনের সাথে বিশ্বনাথের যোগ ছিলনা বলেই ঔপন্যাসিক জানাচ্ছেন। এই যুব আন্দোলনই ১৯৬৯-এর পর নকশালবাড়ির কৃষক আন্দোলনের রাজনৈতিক দর্শন ও মতবাদ তৈরি করেছে। জ্ঞানচর্চার সাথে ক্ষমতা-বিস্তারের আধুনিক প্রক্রিয়ার ফলে কী করে একটা আন্দোলন সময়ের আবর্তে রূপান্তরিত হয়েছে, কী করে ক্ষমতা-সম্পৃক্ত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান একে গ্রাস করেছে ঔপন্যাসিক তার নিখুঁত বিশ্লেষণ করেন। কৃষক আন্দোলনের বেলায় নকশাল আন্দোলনের ব্যর্থতা সত্ত্বেও পশ্চিমবঙ্গে ছাত্র ও যুবকদের ভিতরে রাজনৈতিক বিশ্বাস হিসেবে বহমান ছিল। ঔপন্যাসিকের নির্মোহ ইতিহাস-পাঠ এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য :

> ভারতীয় রাজনীতির নকশালি বিকল্প নিয়ে যুবজনোচিত চর্চায় এই 'ব্যবস্থা'য় কোনো আপত্তি নেই। এই ব্যবস্থা বরং এমন নকশালি তত্ত্ব এখন প্রয়োগে উৎসাহই দেয় অর্থনীতিতে, ইতিহাসে, সাহিত্যে। বিশ্ববিদ্যালয়ে বা সরকারি পৃষ্ঠপোষকতার গবেষণাকেন্দ্রে এই নকশালি র‍্যাডিকালিজম দিব্যি মিলে যেতে পারে ইয়োরো আমেরিকার নব্য বামপন্থার সঙ্গে। তাতে ভারতের সমাজবিজ্ঞানবিষয়ক বিজ্ঞানের আধুনিকতাও প্রমাণিত হয়ে যায়। সারা পৃথিবীর অজস্র সেমিনারে, সিম্‌পোসিয়ামে ভারতীয় পণ্ডিতরা এই নকশালি ভাবনা প্ররোচিত চিন্তা উত্থাপনও করছেন প্রতিদিন। ভারতীয় গণতন্ত্রের বুদ্ধিজীবীরা নকশালি তত্ত্বচিন্তাকে আত্মসাৎ করে নিয়েছে। (দেবেশ, ১৯৯৩ : ৫৮০)

বিশ্বনাথ এমনই একজন বিপ্লবী "যাকে কোনো সমাবেশ উদ্দীপ্ত করে নি, অস্ত্রের অনাস্বাদিত স্বাদ তাঁকে প্রলোভন দেখায় নি, গোপনতা তাঁকে টানে নি।" (দেবেশ, ১৯৯৩ : ৫৯৩)। বরং তাঁর বেলায় সবই বিপরীত। বিশ্বনাথ তাঁর শত্রুকে চিনতে চাইছিলেন। সেকেন্ড সেন্ট্রাল কমিটি সেই শত্রুকে চিনিয়ে দেয়ার পরই তাঁর এই যুদ্ধ ঘোষণা– রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে। "রাষ্ট্রের হিংস্রতাকে বিশ্বনাথ বিপ্লবী হিংসা দিয়ে লড়ছিলেন।" (দেবেশ, ১৯৯৩ : ৫৯৩)। কিন্তু গণতন্ত্রের প্রতিটা প্রতিষ্ঠানের দ্বারা আশ্বস্ত পুলিশ, সামরিক ও আধা-সামরিক বাহিনী তার সমস্ত অস্ত্রশক্তি নিয়ে বিপ্লবীদের রুখে দিতে চেয়েছে। তখন তাই বিপ্লবেরও বড় অসময়। সমালোচক বলেন :

> অসম ডেভেলাপমেন্টে সুবিধাভোগী শহুরে কিছু মানুষের জীবনযাপনের কৃৎকৌশল নন্দিত হয়, অথচ দেশজোড়া দুস্থ মানুষের প্রতিনিয়ত ধর্ষণ ঘটে এবং রাজনীতি শুধু গোপন ও কঠোর দলীয়তা আর আনুগত্যসর্বস্ব কার্যক্রমে নিঃশেষ হয়ে যায়– তখন তো সেটা অসময়ই বটে। সময় অনেক কিছুরই– ডেভেলাপমেন্টের সময় আর কনস্ট্রাকশনের, ধর্ষণের সময়; হয়তো বাস্তব ও কল্পনার

Dhaka University Institutional Repository

> যুগ্মতায়, পুরাণের ইচ্ছাপূরণে, স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনেরও সময়– কিন্তু অসময় বিপ্লবের। (অরুণ, ১৪২১ : ১৮২)

বিপ্লবের অসময় ও এর অন্যতম বাস্তবিক কারণ ঔপন্যাসিকও ব্যাখা করেন : "সশস্ত্র বাহিনীর ভিতর ধর্ষণকামিতার অসুখ তৈরি করে দেয়া হয়েছে ও সেই অসুখকে দেয়া হয়েছে রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা।" (দেবেশ, ১৯৯৩ : ৫৯৩)। ১৯৭০-এ পশ্চিমবঙ্গে রাষ্ট্রপতি শাসনামলে পশ্চিমবঙ্গ সরকার ঘোষণা করেছিল যে ১৯৩৬ সালের 'বেঙ্গল সাপ্রেশন অব টেররিস্ট আউটরেজেস এ্যাক্ট' তৎক্ষণাৎ বলবৎ করা হল। ১৯৭৩-এর নভেম্বর পাশ করা হয় 'ওয়েস্ট বেঙ্গল প্রিভেনশন অব ভায়োলেন্ট এ্যাকটিভিটিজ এ্যাক্ট'। রাষ্ট্রীয় অনুমোদনের মাধ্যমে পুলিশ বিপ্লবীদের দমন করছিল তখন। বিশ্বনাথ ১৯৮০ সালে এরকম একটা ট্রাজেডির ভেতরই ঢুকে পড়েছিল; "রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস যখন গণতন্ত্রের স্বীকৃত অবলম্বন" (দেবেশ, ১৯৯৩ : ৫৯১)। বিশ্বনাথ অবশ্য হার সুনিশ্চিত জেনেই বিকল্পহীনভাবে তার কর্মসূচি বেছে নিয়েছিল এবং তার কর্মসূচি বা 'এ্যাকশন' সবসময় কেবল সশস্ত্র নয়। সে তার কর্মসূচির কোনো একটি কাজের জন্য অনুতপ্তও নয়। "তার রাজনীতির কোনো হত্যার জন্য নয় ; এই রাষ্ট্রকে অস্বীকার করার জন্য নয়। এই সংবিধানকে অমান্য করার জন্য নয়, এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার জন্য নয়। কিন্তু সে শুধু জেনেছে তার যুদ্ধ ঘোষণাটা অপ্রাসঙ্গিক।" (দেবেশ, ১৯৯৩ : ৫৭৭)। যুদ্ধ ঘোষণার এই অপ্রাসঙ্গিকতাও সৃষ্টি হয় ইতিহাসের সূত্র ধরে। নকশাল আন্দোলন বলতে সংসদীয় গণতন্ত্রে অবিশ্বাসী ও মাওবাদী যে কমিউনিস্ট আন্দোলন বোঝায় "তা তখন সম্পূর্ণ অবান্তর হয়ে গেছে।" (দেবেশ, ১৯৯৩ : ৫৮১)। নকশালবাড়ির মূল কৃষক আন্দোলনের কর্মসূচি ও 'এ্যাকশন' সংগঠিতভাবে সমকালীন রাজনৈতিক দলের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে গিয়েছিল। প্রতিবেদক-ঔপন্যাসিক নকশালি আন্দোলনের পরবর্তীকালের ধারা ও ব্যর্থতা বিশ্লেষণ করেছেন :

> ১৯৬৭-তে, ৬৯-এ ও ৭০-এ আপত্তি ছিল যখন এই নতুন তত্ত্বচিন্তা যুব আন্দোলন আর কৃষক আন্দোলনকে মিলিয়ে দিচ্ছিল। মিলনের সেই টানই ত নকশালবাড়ি আন্দোলনের কোটালের টান। ... এই প্রথম একটা এ্যাকশন তার রাজনৈতিক মঞ্চ বানাল– 'নকশালবাড়ি কৃষক সংগ্রাম সহায়ক সমিতি।' এর আগে রাজনৈতিক মঞ্চ বরাবর তার কর্মসূচি চাপিয়ে দিয়েছে কৃষক আন্দোলনের ওপর। আর, এই প্রথম 'আন্দোলন', 'এ্যাকশন' তার রাজনৈতিক শর্ত ঘোষণা করল। তার মূল্য দিয়েছে পুরো নকশাল আন্দোলনই। সে আন্দোলন রাজনীতি হিসেবে দাঁড়াতে পারে নি।

Dhaka University Institutional Repository

> এ্যাকশনের ব্যর্থতা বারবার রাজনীতিকে ব্যর্থ করে দিয়েছে। শেষ পর্যন্ত রাজনীতিও 'এ্যাকশন'কে যেন চিরবিচ্ছিন্ন করে দিল। (দেবেশ, ১৯৯৩ : ৫৮১)

তবে এই আন্দোলনের ঐতিহাসিক ব্যর্থতা সত্ত্বেও "সেদিনের সেই অস্বীকারের সাহস ও ঔদ্ধত্য, নির্ভীকতা ও অধিকারবোধ মিথ্যা হয়ে যায় নি।" (দেবেশ, ১৯৯৩ : ৫৮১)। বিশ্বনাথের স্বঘোষিত যুদ্ধে তার আপাত ও সাময়িক পরাজয়ের বোধ থাকলেও তার সাফল্য রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস ও হিংসাকে নগ্ন করে দেবার মধ্যেই। এই বৃত্তান্তে একজন রাজনৈতিক কর্মীর ওপর দমন, অত্যাচার এবং তার নিরাপত্তাহীনতার ছবি স্পষ্ট হয়েছে। এক দশক ধরে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে চলা যুদ্ধে ক্ষতবিক্ষত হয়েছে বিশ্বনাথ– ১৯৮২-তে গ্রেপ্তারের পর 'রিট্রিট', ১৯৮৬-তে পুলিশের লাঠির ঘায়ে নাক আর গলা দিয়ে অঝোরে রক্ত ঝরা, ১৯৮৭- তে জেল ভেঙে বেরিয়ে আসা, কিছুদিন অজ্ঞাতবাসের পর ১৯৮৯-তে আবার সেই জেলেই ফিরে যাওয়া। বিশ্বনাথ এখন পঙ্গু। ১৯৭০ সালে কলকাতার রাস্তায় রাস্তায় শহুরে গেরিলা যুদ্ধের কর্মসূচিতে কানু ধরা পড়েছিল, গঙ্গার পারে নিয়ে পুলিশ অফিসার গুলিবিদ্ধ করে তাকে। হাসপাতালে পরবর্তীকালে সে বাঁচে কী না সে প্রশ্নও অবান্তর হয়ে ওঠে। দেবেশের উপন্যাসে ১৯৭০-এর কানুর মাথায় গুলি দশ বছর পেরিয়ে এসে বিশ্বনাথের মাথায় ঢুকে যায়– "অনেক কানুর একজনের মাথায় গুলি নিজের মাথায় নিয়ে একজন বিশ্বনাথ।" (দেবেশ, ১৯৯৩ : ৫৯০)। পাঁচ-সাত বছর ধরে মাথায় গুলির প্রতিক্রিয়ার অনিশ্চিত পক্ষাঘাত আর বুকের পাঁজরাহীন ফুসফুস নিয়ে হাসপাতালের ওয়ার্ডে শুয়ে থাকে বিশ্বনাথ; সেবারত সিস্টাররাও যাকে ভয় পায়, ভয় পায় পুলিশ ও প্রশাসন। তাই ১৯৮৯ সালে পি.জি. হাসপাতালের বিশেষজ্ঞ ডাক্তার হাউস-স্টাফদের বড় দল নিয়ে তাকে দেখতে এসে বাধা পান লাঠি রাইফেলধারী পুলিশ পিকেট এবং এস বি-র অফিসারের কাছে। বিছানা থেকে মাথা ও শরীর নিজের নিয়ন্ত্রণে সরাতে না পারলেও তার ওয়ার্ডের বাইরে দিনরাত থাকে বন্দুকধারী পুলিশের প্রহরা। হাসপাতালের জমাদার-সিস্টাররা ভাবে বিশ্বনাথ "তাদের হয়ে কোনো যুদ্ধে গিয়েছিল, তেমন একটা যুদ্ধক্ষেত্র কোথাও আছে বা ছিল।" (দেবেশ, ১৯৯৩ : ৫৭৬)। বিশ্বনাথের কোনো ভিজিটর নেই, একমাত্র দাদা কামাক্ষী চক্রবর্তী ছাড়া। তার কোনো জীবনযাপন কখনও ছিল না, তাই অন্য কোনো রোগীর মত তার ভিজিটিং আওয়ার নেই। তবু সময় হলে ভিজিটিং আওয়ার্ডের আচ্ছন্নতা কাটিয়ে সোজা হয় সে– এক অন্ধকার ঘরে প্রতিধ্বনিময় পদধ্বনি শোনে। "এত মানুষের এত পায়ের আওয়াজে বিশ্বনাথ যেন তার আত্মজীবনীয় সংশোধন ঘটায়।" (দেবেশ, ১৯৯৩ : ৫৭৫)। মানুষের পায়ের আওয়াজের স্বাভাবিকতা ভুলে যাওয়া বিশ্বনাথের কাছে তা ছিল

Dhaka University Institutional Repository

বিশ্বাসঘাতকতা ও গুপ্তঘাতকতার প্রকাশ; সেখানে আশ্রয়ও থাকে– এমন বোধ তার সম্প্রতি হয়েছে হয়তো।

১৯৭০-এ কালীপুজার দিন মণ্ডপের সামনে পুলিশের গুলিতে বীরেন দেবনাথ নিহত হয়। 'পুলিশ সেই প্রকাশ্য মণ্ডপে তাদের শত্রু চিহ্নিত করতে সামান্য সংশয়ও দেখায় নি। বীরেন দেবনাথ নকশাল-ব্রতকথার অংশ।' (দেবেশ, ১৯৯৩ : ৫৭১)। তার বোন মল্লিকা বা তার বাবা-মায়ের কাছে যারাই নকশাল তারাই তাদের ভাইয়ের বা ছেলের মত। বিশ্বনাথের ওয়ার্ডে তাই নীরবে পৌঁছে যায় মল্লিকার পাঠানো একগোছা দুধসাদা রজনীগন্ধা, মাঝে মাঝে বই ও খাবার। কিন্তু "এই উপহারের ফলেই প্রবল হয়ে ওঠে সেই ইতিহাস বিশ্বনাথের শরীরের ভিতরে- তার গুলিবিদ্ধ মাথা, তার পাঁজরহীন বুক, তার স্বল্প অক্সিজেনে স্বল্প শুদ্ধ রক্তে সেই ইতিহাস এক শারীরিক প্রবাহ হয়ে উঠতে চায়; অথচ সেই প্রবাহকে তার শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন করতেই ত বিশ্বনাথ চেষ্টা করে আসছে জেল থেকে পালানোর পর, বিশেষত গত বছরখানেক।" (দেবেশ, ১৯৯৩ : ৫৭১)। বিশ্বনাথ সময়ের এক ইতিহাসকে নতুন গড়ে তুলতে চেয়েছিল, সে এখনো তাই চায়। কিন্তু সে জানে না, "সে ইতিহাসের নির্মাতা নাকি ইতিহাসের উপাদান। ... এখন বিশ্বনাথ জানে, ইতিহাসের বহু পাঠ সম্ভব। পরবর্তী সাফল্য ইতিহাসের পূর্বপাঠের বদল ঘটায়। (দেবেশ, ১৯৯৩ : ৫৭৭)। পিজি হাসপাতালের কার্জন ওয়ার্ডের ১২ নম্বর ঘরের অন্ধকারে বিশ্বনাথ "জেগে আছে, তাকিয়ে আছে, কান পেতে আছে। কোথাও মানুষের সমবায়ের দৃশ্য তৈরি হচ্ছে– কোথাও মানুষের সমবায়ের ধ্বনি তৈরি হচ্ছে– সেই দৃশ্য ও ধ্বনি দেখতে ও শুনতে চায় বিশ্বনাথ। বিশ্বনাথ তার জীবনের একটা দৈনন্দিন চায়। সেই দৈনন্দিনই হয়তো ইতিহাসের উপাদান হয়ে উঠবে।" (দেবেশ, ১৯৯৩ : ৫৭৭)।

ব্যস্ত উত্তেজনায় কর্মময়তার শেষে, কর্মহীন অজ্ঞাতবাসে বিহারের শান্ত এক গ্রামে দেহাতে মানব ও প্রকৃতিতে, মানবের কর্মের সমবায়ের স্বাভাবিক, নিস্তরঙ্গ জীবনকে আবিষ্কার করেছিল বিশ্বনাথ। ১৯৮৭-র ৪ নভেম্বর জেল খাটার পর নানা জায়গায় ঘুরে বিশ্বনাথ এখানে এসে যখন পৌঁছাল তখন ১৯৮৮ সাল, গমের চারা লাগানো গ্রাম-প্রকৃতি দৃশ্য দেখতে দেখতে বিশ্বনাথের মনের রূপান্তর আঁকেন ঔপন্যাসিক :

> বিশ্বনাথ আবার এই শীত, কুয়াশা, গম পেকে ওঠার মধ্যে ঢুকে গিয়েছিল। এখানেই কি সে প্রথম সমবেত মানুষের কাজের ছন্দ দেখতে পেল, বা দেখতে শিখল? বিঘে-বিঘে পাকা গমখেত পার

Dhaka University Institutional Repository

> হয়ে ঐ ঐদিকে একচিলতে ফরেস্ট থেকে কাঠ কুড়িয়ে খেতের আল ধরে ফেরার দৃশ্য দেখা তার রোজকার অভ্যেস ঢুকে গেল। ... মানুষ, মানুষ, মানুষ। তার কাজ, কাজ, কাজ। একই মানুষের একই কাজের কত ভঙ্গি। সকাল থেকে সন্ধ্যা এই আকাশ, মাঠ, দিগদিগন্ত, আলো ও ছায়া– সব যেন মানুষ নিজের দিকে টেনে এনেছে। (দেবেশ, ১৯৯৩ : ৬২৭-৬২৮)

জেল ভাঙাটা বিশ্বনাথের কাছে ক্রমেই অবান্তর হয়ে ওঠে, "যেন জেলের বাইরে সে আরো বেশি করে বন্দী হয়ে পড়েছে। ... জেলখানার বাইরেই বিশ্বনাথের জন্য অপেক্ষা করে ছিল এত বড় দেশজোড়া জেলখানা? জেলে যাওয়ার আগে বিশ্বনাথের কোনো দৈনন্দিন ছিল না। ... জেল ভেঙে বাইরে এসে সে দেখছে তার একটা দৈনন্দিন ধীরে-ধীরে তৈরি হয়ে উঠছে বটে কিন্তু সে-দৈনন্দিনের সঙ্গে এই গ্রামের দৈনন্দিনের কোনো সম্পর্ক নেই।" (দেবেশ, ১৯৯৩ : ৬২৯)। তাই আত্মগোপনতার পর্ব চুকিয়ে প্রকাশ্যে যখন আসে তখন এক ধরণের আনন্দ অনুভব করে বিশ্বনাথ। হাওড়া স্টেশন থেকে বেরিয়ে বাসস্ট্যান্ডের ভিড়ে ঘুরতে ভালো লাগে তার; বাসে চড়ে কলকাতা দেখতেও। শেষবারের মত উলটোডাঙায় এসে ভাইঝি মিতুর সঙ্গে দেখা করে সে। আর সব করণীয় শেষ হয়ে গেলে সে আবারও 'অ্যারেস্ট' হয়ে যায়। আবার জেলে ও সেখান থেকে হাসপাতালে যায়। সেটা জীবনের নতুন এক রণক্ষেত্র, যেখানে স্মৃতি-বিস্মৃতি আছে, বিষাদ-বিবমিষা আছে। কারণ ইতোমধ্যে, 'যে-রাজনীতিতে তার আত্মপরিচয় সেই রাজনীতিই অবান্তর হয়ে গেছে।' (দেবেশ, ১৯৯৩ : ৫৭৭)। যেন সে আত্মপরিচয় লোপের রাজনীতিই করেছে। সে এখন তার 'সেই আত্মপরিচয় উদ্ধার করতে চায়। তাই জেলে ফেরার পথ 'বিশ্বনাথের আত্মপরিচয়-চিহ্নিত সংগ্রামের নতুন রণক্ষেত্র।' বিশ্বনাথের চরিত্রায়ণ কিংবা পরিণতি সম্পর্কে সমালোচক বলেন :

> নকশাল আন্দোলনের তত্ত্বের বাস্তবতা বাদ দিয়ে বিশ্বনাথকে আঁকা হয়েছে এমন নয়। কিন্তু তার প্রথম উপস্থিতি থেকেই দেখি, দাদা কামাক্ষীর জীবনযাপনের কৃৎকৌশল নিয়ে মধ্যবিত্ত বা উচ্চবিত্ত যে-বাঁচা তারই বিপরীতে প্রতিবাদী ধ্বংসাত্মক বাঁচার প্রতিনিধি হয়ে উঠেছে সে। হয়তো রাজনীতির কমসূচি ও কার্যকলাপের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণে অতিবামপন্থী রাজনীতির বিষয়ে লেখকের, শৈল্পিক নৈর্ব্যক্তিকতা সত্ত্বেও, একটা প্রত্যাখানের মনোভাব থাকে না তা নয়। কিন্তু সঙ্গে-সঙ্গে এই লেখার পরিবেশকে পালটানোর যে-প্রতিবাদী ঐতিহ্য দল-নিরপেক্ষ বামপন্থী রাজনীতির সর্বাঙ্গীনতায় ঐতিহাসিকতায় সত্য, বিশ্বনাথের অভিজ্ঞতার বাস্তবে তারও আভা রয়ে যায়। হয়তো বামপন্থী রাজনীতির ভবিষ্যৎ সংকটেরও দ্রষ্টা লেখক। (অরুণ, ১৪২১ : ১৮২)

Dhaka University Institutional Repository

জীবনের চূড়ান্ত যাত্রার পূর্বে হাওড়া স্টেশনে পাড়ারিয়ার রাধিয়ার স্বামী কেলু এবং মাও-ৎসে তুঙ সহ আরো অনেকের সাথে বিশ্বনাথের কাল্পনিক সংলাপে সৃষ্টি হয় জন্মান্তরের পথিক মানবের আবহ; যে-কেলু তাকে বলেছিল, 'দেখো গাছের শিকর আকাশে বিঁধছে, সমুদ্রের জলে আগুন, পাড়ারিয়ার পুনাসি বাঁধের ঢালে সব আউরতরা উজারা হয়ে পড়ে আছে। এখন কোথাও যাত্রার সময় নয়।' (দেবেশ, ১৯৯৩ : ৬৫০)। মাও-ৎসে তুঙ-এর সাথে বিশ্বনাথের কবিতা রচনার স্মৃতি-আলাপনে শিল্পী ও স্রষ্টা মানবের প্রত্ন-মূর্তি আর বিপ্লবীর জীবনের মৌল সত্য মহিমান্বিত হয়ে ওঠে। মাও-ৎসে তুঙ তার কবিতা শুনতে চান, "বিশ্বনাথ সেই আচ্ছন্নতার ভিতর তার স্মৃতি; সুস্থ, সবল, ছেদহীন ধারাবাহিক মানবস্মৃতি ফিরিয়ে আনতে তার শরীরের সবটুকু ইচ্ছে আরো জোরে প্রয়োগ করে। সে তার কবিতার কাছে পৌঁছতে চায়।" (দেবেশ, ১৯৯৩ : ৬৫২)। হাওড়া ব্রিজে দাঁড়িয়ে রেলিঙে ঝুঁকে গঙ্গা, ওপারের কলকাতা, লঞ্চ, লঞ্চের লোকজন, রাস্তা, স্টেশন-চত্বরের ব্যস্ততা, ট্রেন– সর্বোপরি টুকরো জীবন-চিত্র ও মানবমুখ সমবায়ের অখণ্ডতার স্বাদ শেষবারের মত নেয় মরণ থেকে বঞ্চিত, জীবন-বিচ্যুত, প্রাত্যহিকতাবিহীন বিশ্বনাথ। কেলুর সাথে বিশ্বনাথের দেখা ও সংলাপ প্রসঙ্গে *সময়-অসময়ের বৃত্তান্তের* 'গ্রন্থমুক্তি'তে ঔপন্যাসিক লিখেছেন :

> এ-উপন্যাসে এই দুজনই ত বহুর থেকে আলাদা হয়ে আবার নিঃসঙ্গ একক যাত্রায় বহুর সঙ্গে মিলতে চেয়েছে। অথচ তাদের ভিতর সাক্ষাৎ হওয়া অসম্ভব, সংলাপ হওয়া অসম্ভব। একটা মানুষ মাথায় গুলি নিয়ে, সাত-আটটা পাঁজর ছাড়া বেঁচে আছে– এই অসম্ভবও যদি সম্ভব হয়, তা হলে কেলুর সঙ্গে বিশ্বনাথের দেখা হওয়ার মত সামান্য একটা অসম্ভবও কি সম্ভব হতে পারে না? (দেবেশ, ১৯৯৩ : ৬৫৭)

বৃত্তান্তের অখণ্ডতাকে পূর্ণতা দিতে আসলে "লেখকেরই ঐতিহাসিক চেতনা ও শিল্পের তৃতীয় নয়ন সম্ভব করে তোলে এই সংলাপ, এই মিলন। সেটাই এই উপন্যাসের উদ্ধার।" (অরুণ, ১৪২১ : ১৮৪)। *সময়-অসময়ের বৃত্তান্ত* ইতিহাসের বিরুদ্ধে প্রত্যাঘাতের প্রতিনন্দন ও প্রতিসন্দর্ভ হয়ে ওঠে, যদিও তা মূলত জীবন-সংকটেরই এক দীর্ঘ ইতিবৃত্ত। এ কারণেই সমালোচক বলেন, "অসংবরণীয় ধারাবাহিকে নয়, ইতিহাসকে তার রূপের ছিন্ন-ভিন্নতায় বুঝতে চায় কথক; সুতরাং তার কিছুই গোপন করার দায় নেই।" (শিবাজী, ১৯৯৬ : ১২৭)। দেশকালের সংলগ্নতার চেতনা দেবেশের *সময়-অসময়ের বৃত্তান্ত* উপন্যাসের বড় পাওনা। এই বৃত্তান্তের কাহিনী অনেক– প্রত্যেকটি কাহিনীর মধ্যেই অসংখ্য ছোট ছোট সামাজিক-অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা কিংবা সত্য অন্তর্ভূত আছে, যার

Dhaka University Institutional Repository

মধ্যে গড়ে উঠেছে বাস্তবের ভিত্তি। এই উপন্যাসের সবই নথি থেকে উদ্ধার করা ও সংবাদপত্রে মুদ্রিত তথ্য। পাড়ারিয়ার ধর্ষণ ও মামলার রায়, বিশ্বনাথের জেলভাঙা, জেলে প্রবেশ সবই নির্ভুল ইতিহাসের অঙ্কে পঠিত হয়েছে এতে। কিন্তু বৃত্তান্ত পাঠেই অনুভূত হয়, "বাস্তবের এই সব ঘটনাই একে অপরের সঙ্গে সংলগ্ন হয়ে যাচ্ছে, একে অপরের ওপর প্রভাব ফেলছে, ঘটনা থেকে উদ্ভূত প্রতিমাগুলো ফ্রেম ছাড়িয়ে পুরাণকল্প হয়ে উঠছে।" (অরুণ, ১৪২১ : ১৮৩)।

এ বৃত্তান্তের কোনো সারাংশে উপনীত হওয়া যায়না; অথবা এর কোনো উপসংহার নেই।[৬] বরং বৃত্তান্তের ভেতরে প্রবেশ করে জীবনের সত্যকে উপলব্ধি করতে হয়। এ আখ্যানে কথকের বয়ানে যথারীতি উঠে আসে নিরস্তিত্ব সেইসব মানবেরা, আমাদের অক্ষরজ্ঞানের আরোপিত সীমানার বাইরে যাদের ভাষার বিস্তার; পরিদৃশ্যমান উন্নয়ন কাঠামো ও শ্রেণির সংস্কার তথা "জাতীয়-আন্তর্জাতিক ডেভেলাপমেন্টের" (দেবেশ, ১৯৯৩ : ৩০) পরেও যাদের জীবন-আভ্যন্তর অপরিবর্তিত থাকে। বৃত্তান্তের 'গ্রন্থবন্ধনে' 'ডেভেলাপমেন্ট' ও 'কনস্ট্রাকশন'-এর অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক শব্দান্তর, অর্থান্তর ও বিবৃতির পরে[৭] বৃত্তান্তকারের প্রশ্নের অনুরণন ঘটে– "মানুষের মুক্তি কাকে বলে?" ঔপন্যাসিক এ অন্বেষার উত্তরও দেন : 'মানুষকেই মানুষের মুক্তি খুঁজতে হবে, কিন্তু তার আগে আর-একবার বা বহুবার জেনে নিতে হবে মুক্তির সংজ্ঞা।' (দেবেশ, ১৯৯৩ : ৩০)। তাই জীবনের মতই অনিঃশেষ এই বৃত্তান্তের বিস্তার– যেখানে রয়েছে সময়ের, মানুষের, রাষ্ট্রের বিচিত্র অবস্থান। 'ডেভেলাপমেন্ট', 'কনস্ট্রাকশন', ধর্ষণ, আদালত, স্বয়ম্ভরতা, বিপ্লব, ব্যর্থতা– "রূপান্তরিত সময়ের ও অসময়ের, বিপর্যাসের, বিসংগতির, সরলরৈখিক সময়, ঘটনা ও তার পরিণতির ওপর আঘাত-প্রত্যাঘাতের সর্বোপরি স্বদেশকে খোঁজারও বৃত্তান্ত এটি।" (শিবাজী, ১৯৯৬ : ১২৬)। আর উপন্যাসের সত্যে পৌঁছাতে ঔপন্যাসিকের চেষ্টায় ঘটে যাওয়া শব্দের রূপান্তরে, ক্রমস্থানিক মাত্রায় অর্থান্তরিত জীবনের অনুভবও স্পষ্ট হয়ে ওঠে এতে; যাকে পরিবর্তিত জীবন ও দেশকালের ক্রমস্থানিক গ্রন্থনাও বলা যেতে পারে।

Dhaka University Institutional Repository

টীকা

১ Chronicles, the predecessores of modern histories, were written accounts, in prose or verse, of national or worldwide events over a considereble period of time. If the chronicles deal with events year by year, they are often called annals. Unlike the modern historian, most chronicles tended to take their information as they found it, making little attempt to separate fact from legend. (Abrams & Geoffrey, 2015 : 51)

২ আত্মকথায় দেবেশ রায় জানাচ্ছেন, "৬২-র নাগাদ কমিউনিস্ট পার্টি করতে জলপাইগুড়ির গ্রামে-ফরেস্টে-চরে ঢুকলাম। ... কৃষক আন্দোলনের নেতাগিরি করতে ১৯৬৫-৬৬ সালে আমি যখন প্রথম জলপাইগুড়ির গ্রামের দিকে যাওয়া ও থাকা শুরু করি, তখন গ্রামের এই বিস্তার, প্রান্তর-প্রান্তর বিস্তার, প্রান্তরজোড়া বয়ে আসা হাওয়ার রকমফের, ছিটিয়ে থাকা সবুজ-সোনালি-হলুদ রং, জলের আওয়াজ, এই সব ধ্বনির সঙ্গে মানুষের স্বরের মিশে যাওয়া আমাকে নেশার মতো পেড়ে ফেলেছিল। ... কৃষক আন্দোলনের দরকারে গ্রামের সঙ্গে সেই প্রথম ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের সিস্ফনিক অভিজ্ঞতা– নৈঃশব্দ্যের নির্মাণ। ... তাতে নৈঃশব্দ্য যতটা নির্মিত হত তার চাইতে আনেক বেশি তৈরি হত শব্দের গোঙানি।

... এখন অনুমান করতে পারি ১৯৭৪-৭৫-এ 'মফস্বলি বৃত্তান্ত' নামে যে উপন্যাস লিখি ও তার আগে রাজবংশী-গ্রামে ঘটছে এমন ঘটনা নিয়ে লেখা কিছু গল্পের অক্ষরের আড়ালে এই নৈঃশব্দ্য বয়ে গিয়েছিল, আমার অজ্ঞাতেই হয়তো, কিন্তু নিশ্চয়ই আমার বোধ থেকে।" (দেবেশ, ২০১৬ : ৭৫-৯৫-৯৭)।

৩ এ উপন্যাসে ১৯৫০ সালে বলবৎ 'রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাসত্ব আইনে'র কথা বলা হয়েছে। এ আইন প্রবর্তনের মাধ্যমে লর্ড কর্নওয়ালিশের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বিধিটি চিরতরে বিলুপ্ত হয়

Dhaka University Institutional Repository

এবং কৃষিজমিতে প্রজাস্বত্বের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। সরকার কর্তৃক সকল মধ্যস্বত্ব অর্জন করে রায়তদের পুনরায় সরকারের সাথে সরাসরি সম্পর্ক স্থাপন করার উদ্দেশ্যেই চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বিলুপ্ত করে ১৯৫০ সালের জমিদারী উচ্ছেদ ও প্রজাস্বত্ব আইনের প্রবর্তন করা হয়। যদিও কৃষকদের ভাগ্য উন্নয়নে তা সুদূরপ্রসারী ফল বয়ে আনে-নি।

৪ রাশিয়ান লেখক ভ্লাদিমির নবোকভ (১৮৯৯-১৯৭৭)-এর লেখা *Lolita* (১৯৫৫) উপন্যাসের কথা বলা হয়েছে।

৫ ১৯৭১-এ 'মানুষরতন' বা 'ঢাকিয়া ঢাক বাজায় খালে বিলে' গল্পে কিংবা ১৯৭৮-এ *আপাতত শান্তিকল্যাণ হয়ে আছে* উপন্যাসে, ১৯৭৪-এ 'কয়েদখানা' গল্পে কিংবা *স্বামী-স্ত্রী* উপন্যাসে রয়েছে নকশাল প্রসঙ্গ। এছাড়া আধুনিক বাংলা অনেক উপন্যাসেই বিষয় হিসেবে আছে নকশাল আন্দোলন। যেমন– অসীম রায়ের (১৯২৭-১৯৯০) *অসংলগ্ন কাব্য* (১৯৭৩), শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের (১৯৩৫–) *শ্যাওলা* (১৯৭৭), সমরেশ বসুর (১৯২৪-১৯৮৮) *মহাকালের রথের ঘোড়া* (১৯৭৭), মহাশ্বেতা দেবীর (১৯২৬-২০১৬) *হাজার চুরাশির মা* (১৯৭৪) ইত্যাদি।

৬ এ প্রসঙ্গে ঔপন্যাসিকের বক্তব্য : "না আমার কোনো কাহিনী নেই এই রচনার শেষে যার উপসংহারে আমি পৌঁছাতে চাই। আমার কাছে এ কোনো ক্রমোন্মোচনযোগ্য কাহিনী নয়।" (দেবেশ, ১৯৯৩ : ২৮)

৭ স্বয়ংসম্পূর্ণতা, উন্নয়ন, বাজার-অর্থনীতি, সমাজ, রাজনীতি প্রভৃতি উত্তর-ঔপনিবেশিক প্রকল্পগুলো ব্যাখ্যা করেন ঔপন্যাসিক, যে শব্দগুলোর 'ভারতীয়' অনুবাদ ও চর্চা বৃত্তান্তকারের অসাধ্য বলে তিনি মনে করেন। কারণ অন্য সবার মতো রাষ্ট্র-নাগরিক হিসেবে "ডেভেলাপমেন্ট, কনস্ট্রাকশন, অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, প্ল্যানিং, সোস্যাল জাস্টিস, সেলফরিল্যায়ান্স– এই শব্দপুঞ্জের নির্দিষ্ট অর্থের ভিতরে তখন আমি ঢুকে গেছি।" (দেবেশ, ১৯৯৩ : ২০)। শব্দগুলোর ভেতরে ঢুকে এগুলোর আরোপিত অর্থ অন্বেষণ করতে করতে গ্রন্থবন্ধনের শেষে এই সূত্রেই ঔপন্যাসিকের জিজ্ঞাসা– "কনস্ট্রাকশনের অনিবার্য যুক্তিতে

Dhaka University Institutional Repository

উৎখাত পাড়ারিয়া গ্রামে পুলিশের লিঙ্গবিদ্ধ ২৫ জন নারী যখন মানবতা থেকে উচ্ছিন্ন হয়ে যায় তখন কোথায় থাকে বিশ্বনাথের বিপ্লব ও স্বদেশ ?" (দেবেশ, ১৯৯৩ : ৩০)।

গ্রন্থপঞ্জি

অনিন্দ্য ভট্টাচার্য (২০১২)। *কথা গঠন*। সুজন প্রকাশনী, কলকাতা।

জহর সেনমজুমদার (২০০৭)। *নিম্নবর্গের বিশ্বায়ন*। পুস্তক বিপণি, কলকাতা ৯

তপোধীর ভট্টাচার্য (১৪২০)। *কথার সময় : সময়ের কথা*। বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা : ৭০০০০৯

দেবেশ রায় (১৯৮৮)। *তিস্তাপারের বৃত্তান্ত*। দে'জ পাবলিশিং, কলিকাতা।

দেবেশ রায় (১৯৮৯)। *মফস্বলি বৃত্তান্ত*। দে'জ পাবলিশিং, কলিকাতা।

দেবেশ রায় (১৯৯০)। *আত্মীয় বৃত্তান্ত*। দে'জ পাবলিশিং, কলিকাতা।

দেবেশ রায় (১৯৯১)। 'কথোপকথন' (মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাথে)। *উপন্যাস নিয়ে*। দে'জ পাবলিশিং, কলিকাতা।

দেবেশ রায় (১৯৯৩)। *সময় অসময়ের বৃত্তান্ত*। দে'জ পাবলিশিং, কলিকাতা।

দেবেশ রায় (২০১৫)। 'কবি–অধ্যাপক মনিরুজ্জামান স্মারক বক্তৃতা ২০১৫'। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা-১০০০।

দেবেশ রায় (২০১৬)। *জলের মিনার জাগাও (আত্মকথা)*। প্রাচী প্রতীচী, কলকাতা-৭০০০৬১

নাসিম মহিউদ্দিন (২০০৩)। *প্রসঙ্গ : কথাসাহিত্য*। কাগজ প্রকাশন, ঢাকা।

Dhaka University Institutional Repository

প্রদীপ বসু (১৯৯৮)। *নকশালবাড়ীর পূর্বক্ষণ : কিছু পোস্ট মডার্ন ভাবনা*। প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কলকাতা-৭৩।

প্রিয়কান্ত নাথ (২০০৭)। *কাল-বিভাজিত বাংলা উপন্যাস*। বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা : ৭০০০০৯

বেগম আকতার কামাল (২০১০)। 'তিস্তাপারের বৃত্তান্ত : নদী-অন্বিত শরীর, ব্যক্তি ও ইতিহাস'। *মহাবিদ্রোহের আখ্যানতত্ত্ব ও কথাশিল্প*। ধ্রুবপদ, ঢাকা।

রুশতী সেন (১৯৯৭)। *সমকালের গল্প-উপন্যাসে প্রত্যাখানের ভাষা*। পুস্তক বিপণি, কলকাতা-৭০০ ০০৯

শিবাজী বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯৯৬)। *বাংলা উপন্যাসে 'ওরা'*। প্যাপিরাস, কলকাতা ৭০০ ০০৪।

সাধন চট্টোপধ্যায় (২০১১)। 'ক্ষমতা, বচন : নিম্নবর্গীয় চেতনার প্রেক্ষিতে সাম্প্রতিক বাংলা আখ্যান'। *বাংলা আখ্যান : বহুমাত্রিক পাঠ* (বেলা দাস ও বিশ্বতোষ চৌধুরী সম্পাদিত)। রত্নাবলী, কলকাতা-৭০০ ০০৯

অরুণকুমার ঘোষ (২০১১)। 'ঈপ্সিত প্রকরণের ঐকান্তিক সন্ধানে : দেবেশ রায়ের তিনটি উপন্যাস।' *বাংলা উপন্যাস : বীক্ষা ও অন্বীক্ষা* (সুবল সামন্ত সম্পাদিত)। এবং মুশায়েরা, কলকাতা ৭০০০৭৩

Abrams, M.H & Geoffrey Galt Harpham [Edt.] (2015). *A Glossary of Literary Terms* (11th edition). Published by Wadsworth, Cengage Learning Boston, USA.

Baldick, Chris [Edt.] (2015). *The Oxford Dictionary of Literary Terms* (Fourth edition). Oxford University Press, United Kingdom.

পত্রিকাপঞ্জি

অনিরুদ্ধ লাহিড়ী (১৪২১)। 'অপরের খোঁজে বাংলা উপন্যাস : *তিস্তাপারের বৃত্তান্ত*'। *কঙ্ক* (দেবেশ রায় সম্মাননা সংখ্যা, সম্পাদক– স্বপন পাণ্ডা ও উৎপল সাহা), ইম্প্রেশন, কলকাতা। পৃ. ৬৯-১১০

Dhaka University Institutional Repository

অরুণ সেন (১৪২১)। 'দেবেশ রায়ের বৃত্তান্ত'। *কঙ্ক* (দেবেশ রায় সম্মাননা সংখ্যা, সম্পাদক– স্বপন পাণ্ডা ও উৎপল সাহা), ইম্প্রেশন, কলকাতা। পৃ. ১৪৭-১৮৬

দেবাশিস মহান্তি (১৪২১)। 'দেবেশ রায়ের মফস্বলি বৃত্তান্ত : একটি আলোচনা'। *কঙ্ক* (দেবেশ রায় সম্মাননা সংখ্যা, সম্পাদক– স্বপন পাণ্ডা ও উৎপল সাহা), ইম্প্রেশন, কলকাতা। পৃ. ২৭২-২৮৬।

বিমলেন্দু মজুমদার (১৪২১)। 'আমার শিক্ষক, অধ্যাপক দেবেশ রায়'। *কঙ্ক* (দেবেশ রায় সম্মাননা সংখ্যা, সম্পাদক– স্বপন পাণ্ডা ও উৎপল সাহা), ইম্প্রেশন, কলকাতা। পৃ. ৩৫-৩৮।

মনোরঞ্জন বিশ্বাস (১৪২১)। 'এক অশ্বারোহী ও নিঃসঙ্গ শব্দ'। *কঙ্ক* (দেবেশ রায় সম্মাননা সংখ্যা, সম্পাদক– স্বপন পাণ্ডা ও উৎপল সাহা), ইম্প্রেশন, কলকাতা। পৃ. ২২১-২২৯।

সাক্ষাৎকার

পহেলা বৈশাখ, ১৪২২ উপলক্ষ্যে দেবেশ রায় ঢাকায় আসেন ২০১৫ সালের ১১ এপ্রিল। তিনি অতিথি হয়েছিলেন কথাসাহিত্যিক সালমা বাণীর (জেমকন সাহিত্য পুরস্কারপ্রাপ্ত) নিকুঞ্জস্থ বাসায়। গবেষকের (মুনিরা সুলতানা) সাথে দেবেশ রায়ের ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার এটি। সাক্ষাৎকারের তারিখ : ১২ এপ্রিল, ২০১৫। স্থান : নিকুঞ্জ, ঢাকা।

তৃতীয় অধ্যায়

প্রতিবেদন-শীর্ষক উপন্যাসে জীবনায়ন

দেবেশ রায়ের বেশ কয়েকটি উপন্যাস 'প্রতিবেদন' শব্দটি যুক্ত করে লেখা হয়েছে। আক্ষরিকভাবে 'প্রতিবেদন' শব্দটির অর্থ বিজ্ঞাপন, বিজ্ঞাপন পত্র, রিপোর্ট (*বঙ্গীয় শব্দকোষ*, হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ. ১৩৯৯)। তবে 'রিপোর্ট' বলতে সচরাচর যা বোঝায় দেবেশ রায়ের প্রতিবেদন নামাঙ্কিত উপন্যাসগুলোর একটিও তা নয়। "*তিস্তাপারের বৃত্তান্ত*, *সময় অসময়ের বৃত্তান্ত* যেমন টিপিক্যাল বৃত্তান্ত নয়, দেবেশের প্রতিবেদন চিহ্নিত উপন্যাসও তেমনি বিশেষ generic ধাঁচ পেয়ে যায়। কারণ এখানে তো তিনি সাংবাদিক সুলভ রিপোর্ট দাখিল করছেন না, উপন্যাসের কয়েকটি পাতা ওল্টালেই তা বোঝা যায়।" (রবিন, ২০১১ : ৯৬)।

Dhaka University Institutional Repository

বিশ শতকের শেষের দিকে আমেরিকাতে সাংবাদিকতার ধরনে নন-ফিকশনধর্মী উপন্যাস রচিত হচ্ছিল। ষাটের দশকের মধ্যভাগে আমেরিকান সাংবাদিক ও লেখক টম উল্‌ফের (১৯৩০-২০১৮) 'নিউ জার্নালিজম'-এর তত্ত্বীয় ধারণা ও চর্চা উপন্যাসের গঠনে তথা 'ন্যারেশনে' সাংবাদিকতার আদল প্রয়োগে অনুপ্রাণিত করে। 'নন-ফিকশন' উপন্যাস আসলে সাহিত্যের এক প্রকার সাংবাদিকতা (Literary Journalism), যা সাধারণত বাস্তব তথ্যসমৃদ্ধ দৈনন্দিনতা থেকে সংগৃহীত। বিশের দশকে এই 'নন-ফিকশনধর্মী' উপন্যাসের গঠন নব্য আঙ্গিক এনে দিয়েছে; আমেরিকান ঔপন্যাসিক ট্রুমান গার্সিয়া কাপোটি (১৯২৪-২০১৬)-এর *In Cold Blood* (১৯৬৬), মাইকেল হার (১৯৪০-২০১৬)-এর *Dispatches* (১৯৭৭), নরম্যান মেইলার (১৯২৩-২০০৭)-এর *The Armies of the Night* (১৯৬৮), অ্যালেক্স হ্যালে (১৯২১-১৯৯২)-এর *Roots : The saga of an American Family* (১৯৭৬) প্রভৃতি উপন্যাসের গঠন-প্রকৃতি থেকে এগুলোকে 'নন-ফিকশন' উপন্যাস হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। দেবেশ রায়ের *প্রতিবেদন* চিহ্নিত উপন্যাসগুলোর ধরন অবশ্য পুরোপুরি সাংবাদিকতাসুলভ নয়; মিডিয়ায় পরিবেশিত সত্যতাকে বা সংবাদকে তিনি পুরোপুরি উপন্যাসই করে তুলতে চেয়েছেন। কী করে তাঁর এই উপন্যাসন প্রক্রিয়া সার্থক হয়েছে, তা বিশ্লেষণের চেষ্টা করা হয়েছে। শিল্প-সাহিত্য তথা উপন্যাস ও খবরের কাগজের রিপোর্ট সম্পর্কে জার্মান দার্শনিক-সমালোচক থিয়োডর অ্যাডর্নোর (১৯০৩-১৯৬৯) একটা উক্তি দেবেশ রায় উদ্ধৃত করেন, অ্যাডর্নো বলেছিলেন :

> ফটোগ্রাফির কাছে যেমন চিত্রকলার প্রচলিত অনেক কাজ খোয়া গেছে, তেমনি খবরের কাগজের রিপোর্ট ও সাংস্কৃতিক ব্যবসার মিডিয়া, বিশেষ করে সিনেমার কাছে, নভেলের অনেক কাজ খোয়া গেছে। (উদ্ধৃত, দেবেশ, ২০১৮ : ৪৭)

মূলত 'রিপোর্টাজে' যা আসছে না, উপন্যাসে তার ওপরেই জোর দেয়া প্রয়োজন– এ অনুভব থেকেও দেবেশ রায় তাঁর প্রতিবেদনগুলো উপস্থাপন করেন । 'প্রতিবেদন' আখ্যায়িত উপন্যাস রচনার প্রেক্ষাপট সম্পর্কে দেবেশ রায় লিখেছেন :

> আমার এই 'প্রতিবেদন'-চিহ্নিত গল্পগুলি লেখা হয়েছে ও বই হয়ে গেছে ১৫ থেকে ২০ বছর আগে। ৮৮-৮৯-তে বৃষ্টি ভাল হয় নি– কাগজে ও বিশেষ করে ম্যাগাজিনগুলোতে, খরার মড়কের খবর বেরুচ্ছে, যতটা তথ্যনির্ভর করা সম্ভব, ততটাই প্রামাণিক ছবিসহ। বিশেষজ্ঞদের লেখাও সহজে পাওয়া যাচ্ছিল। ৯২-এর শেষ থেকে শুরু হয়ে গেল মুসলমান-নিধনের দাঙ্গা– বাবরি মসজিদ নিয়ে। সে-দাঙ্গার জায়গা ছিল প্রধানত উত্তরপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, গুজরাত। বস্তুত সেটা ছিল

Dhaka University Institutional Repository

> সর্বভারতীয় রাজনীতির অংশ। সেই তিরিশের দশক থেকেই দাঙ্গা হয়ে গেছে রাজনৈতিক একটা উপায়। দেশের অর্থনৈতিক সংস্কারের দরকারে বিশ্ব বাণিজ্যকে দেশে প্রবেশাধিকার দেয়ার কর্মসূচির ফলে চিরাচরিত শিল্পগুলি– সুতো-চট-চা– ধ্বংস করা হচ্ছিল। আমি একাই যে শ্বাসকষ্ট বোধ করছিলাম, তা নয়– মনে হচ্ছিল সারাটা দেশ যেন কয়লাখনির সুড়ঙ্গ হয়ে উঠেছে, অন্ধকার পাতাল থেকে ঠাণ্ডা জল উঠে আসছে আমাদের পা বেয়ে, অন্ধকার এক আগুন থেকে কাল, কঠিন ও ঘন ধোঁয়ার শ্বাস টেনে চলেছি আমরা। (ভূমিকা, দেবেশ, ২০০৭ : দুই)

গল্প-উপন্যাস 'দেশজোড়া এই বিকারের কথা বলতে' পারে কী না এই জিজ্ঞাসা থেকে ঔপন্যাসিক প্রতিবেদনধর্মী এই কথাসাহিত্যের নব্য আঙ্গিক উপস্থাপন করলেন, এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন :

> গল্প-উপন্যাসের আকার-প্রকার নিয়ে আমার ব্যক্তিগত সঙ্কট থেকেই ১৯৯২-এ আমি *খরার প্রতিবেদন* লিখি কাগজের রিপোর্টগুলো সাজিয়ে। বানানো ঘটনা প্রায় একটিও নেই– সামান্য সংলাপ বা সংযোগের প্রয়োজন ছাড়া। যে-মিডিয়া এখন আমাদের বিশ্বজ্ঞানের অদ্বিতীয় উৎস, সেই মিডিয়াই তো বিশ্বকোষ, আর সেই বিশ্বকোষের বিষয় হিশেবে মানুষই থাকে বটে, খরা আক্রান্ত, দাঙ্গা আক্রান্ত, মন্দা-আক্রান্ত এক-একটি আলাদা মানুষই থাকে বটে, প্রমাণ হিশেবে, তবু সেই আলাদা-আলাদা মানুষগুলি কেবলই প্রমাণপত্র। তারা একটা প্রামাণিক বিশ্বকোষের অন্তর্গত, প্রতিবেদনের অন্তর্ভুক্ত। রিপোর্ট, রিপোর্ট, রিপোর্ট– কঠিন তথ্য দিয়ে তৈরি রিপোর্ট, দরকার-মত ফিগার আঁকা, কলমে ভাগ করা। (ভূমিকা, দেবেশ, ২০০৭ : তিন)

১৯৯৫-এর মধ্যেই দেবেশ রায় লিখে ফেলেন তাঁর প্রতিবেদনধর্মী চারটি উপন্যাস, যথা– *খরার প্রতিবেদন* (১৯৯২), *দাঙ্গার অসম্পূর্ণ প্রতিবেদন* (১৯৯৩), *শিল্পায়নের প্রতিবেদন* (১৯৯৬) ও *একটি ইচ্ছামৃত্যুর প্রতিবেদন* (১৯৯৪)। সাহিত্যের অন্তর্বস্তু ও প্রকরণের উপস্থিতি ও অনুপস্থিতি নিয়ে আখ্যানভঙ্গির রূপান্তর ঘটে, দেবেশ রায়ও আখ্যানভঙ্গির নব্য উপস্থাপনা প্রসঙ্গে একথাই বলেছেন। এ প্রসঙ্গে সমালোচকের জিজ্ঞাসা ঔপন্যাসিকের প্রতিবেদন–আঙ্গিককে স্বীকৃতি প্রদান করে :

> ঔপন্যাসিক দেবেশ রায়ের প্রতিবেদনমূলক উপন্যাসের স্বতন্ত্র মান নির্বাচনে উপন্যাসের আদল আমাদের ভাবিয়ে রাখে। প্রশ্ন জাগে, প্রতিবেদনের নিরিখে তিনি আমাদের কোন পাঠ দিচ্ছেন। প্রচলিত উপন্যাসের রীতি-রেওয়াজকে বিসর্জন দিয়ে, সাংবাদিকতার আদলকেই যেন আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। (অশোক, ২০১১ : ২৫০)

Dhaka University Institutional Repository

উপন্যাসগুলোর মধ্য দিয়ে দেবেশ প্রচলিত টেক্সটের আদলকে ভেঙে দিয়ে প্রতিবাদের চিহ্নায়ক রূপে পাঠকের সামনে হাজির করেছেন ভিন্ন এক নতুনতর পাঠ। এগুলোর ভূমিকাংশ বা সূচনামুখ, বিবরণ, বিশ্লেষণ, কিংবা পরিণাম যেভাবে নির্মাণ করেন তিনি, তাকে কোনোভাবেই প্রচলিত উপন্যাসের সমগোত্রীয় বলে মনে করা যায় না। "কিন্তু দেবেশের কথানুযায়ী, কোনো বিবরণ নয়, বিবরণের নেপথ্যে সত্য বয়ানই উপন্যাসের আগাম পথকে উন্মোচিতই করে নি– প্রতিষ্ঠিতও করেছে।" (অশোক, ২০১১ : ২৫১)। সর্বোপরি সাংবাদিকতা কিংবা বাস্তবতার যে প্রতিবেদন, তারই নিরিখে উপন্যাস কীভাবে গড়ে উঠতে পারে সে পাঠ পুনরুদ্ধারের একটা প্রয়াস রয়েছে ঔপন্যাসিকের বয়ানে। অনুভবে বাস্তবকে ধরতে গিয়েও কী করে ও কতটা বাস্তবানুগ হতে হয়, তারও আরেক ধরনের অভিজ্ঞতার শিক্ষা রয়েছে তাঁর প্রতিবেদনমূলক উপন্যাসসমূহে। "বস্তুত এখানেই রয়েছে উপনিবেশোত্তর চেতনার বীজ। আর এই মূল্যবোধ ও চিন্তন সাধারণত প্রতিবাদী ও বিনির্মাণপন্থী। (অশোক, ২০১১ : ২৫১)।

ক. খরার প্রতিবেদন

দেবেশ রায় *খরার প্রতিবেদন* (১৯৯৩) লিখেছিলেন ১৯৯২ সালের গ্রীষ্মের শুরুতে অনাবৃষ্টি খরা ও খাদ্যের অভাবের সূচনা থেকে মূল খরায় পৌঁছতে পৌঁছতে বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে যে ভয়াবহ মৃত্যু ও অমানবিক অবস্থার সৃষ্টি হয়, কাগজে কাগজে খবর ছড়ায় তার ভিত্তিতে। উপন্যাসের সূচনায় ভূমিকা অংশে রয়েছে বস্তুনিষ্ঠ এবং তথ্যপূর্ণ সাংবাদিকতার অবয়ব। ভারতবর্ষের বিশেষ একটি জায়গাকে উপন্যাসের কেন্দ্রে এনে উপস্থাপিত করার পাশাপাশি মৌসুমী বায়ুর প্রবাহ, বৃষ্টিপাত ও ভারতবর্ষের কৃষি সম্পর্কিত আলোচনায় এর সূচনা। বিবরণ-ক্রমে ভারতবর্ষের ছোটো বড় প্রান্তে বৃষ্টির তারতম্যজনিত ফসল উৎপাদনের রকমফেরের বর্ণনা ও অঞ্চলভেদে অনাবৃষ্টির বিষয় বিশ্লেষণ করা করা হয়েছে। সময় নির্বাচনে দেবেশ উপন্যাসে দেখিয়েছেন নব্বই-এর দশকের গোড়ায় এই অনাবৃষ্টি কীভাবে অঞ্চলভেদে খরার সূচনা করেছিল। উড়িষ্যার কালাহাণ্ডি এবং মধ্যপ্রদেশের সরগুজায় খরাক্লিষ্ট সাধারণ সর্বশ্রেণির মানুষ কেমন করে সহায়হীনভাবে মৃত্যুর মুখোমুখি আত্মসমর্পণ করেছে– উপন্যাসে রয়েছে এর প্রকৃত বর্ণনা। শুরুতে 'নভেলের বাইরে' নামক প্রস্তাবনা অংশে খরার রুদ্রতম রূপটি প্রখর

Dhaka University Institutional Repository

করার আগে বিবৃত হয়েছে বর্ষণচক্র। তবে এই বর্ণনা ভৌগোলিক নয়, সাহিত্যিক। নাইট্রোজেন চক্র তার সকল ভৌগোলিক প্রাকৃতিক সৌন্দর্য নিয়ে সাহিত্যিকের লেখনীতে পরিণত রূপ পায় :

> দক্ষিণ পশ্চিম মৌসুমি বাতাস জুন মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহেই একদিকে আরব সাগরের জলীয় বাষ্প নিয়ে ভারতবর্ষের স্থলভাগের আকাশ জুড়ে ছড়িয়ে পড়তে থাকে। সেই মৌসুমি মেঘপুঞ্জ থেকে ঝরে পড়া জলধারায় ভারতবর্ষের মাটি, পশ্চিমঘাট পর্বতশ্রেণী থেকে শুরু করে উত্তর-পূর্ব খাসিয়া-জয়ন্তিয়া পাহাড়ের মাথা পর্যন্ত ভিজে ওঠে, নরম হয়, খসে যায়, ধুয়ে যায়, ভেসে যায়, স্রোতের মুখে পড়ে, স্রোতের টানে চলে যায়, স্রোতের ভিতর থেকে গড়ে ওঠে, স্রোতের আর স্থলভূমির সীমায় জেগে ওঠে। উত্তর ভারতে গঙ্গার অববাহিকা অঞ্চল জুড়ে আর দাক্ষিণাত্যের মালভূমি দিয়ে সেই জলরাশি প্রায় ছ-মাস জুড়ে নামতে থাকে বঙ্গোপসাগরের দিকে। যমুনা, গঙ্গা, গোদাবরী, কৃষ্ণা, কাবেরী, নর্মদা, ব্রহ্মপুত্রের প্রধান খাত বৃষ্টির জলে ভরে যায়। প্রধান খাতের জলের ধাক্কায় মোহনার কাছাকাছি জল পেছিয়ে যায়। ... দাক্ষ্যিণাত্যের মালভূমির প্রাচীন পাথরের গভীর খাতও সেই জলের বেগে-আঘাতে যেন ভেঙে ভেসে যেতে যায়। রাজ্যের সীমা ভেঙে যায়, রাষ্ট্রের সীমাও কোথাও কোথাও লোপাট হয়। ছ-মাস জুড়ে সমুদ্রের জল আকাশপথে ভারতীয় ভূ-খণ্ড পেরিয়ে স্থলপথে আবার সমুদ্রে ফিরে আসে। একটা বর্ষণচক্র সম্পূর্ণ হয়।" (দেবেশ, ২০০৭ : ১৩)

উপন্যাসের শুরুতে ভারতবর্ষের এই বর্ষণচক্রের তথা নিসর্গের সংহত বিবরণের ঠিক পরেই রয়েছে খরার আগমনী সংবাদ। ১৯৯১-৯২ এর কৃষিবর্ষে পশ্চাৎভূমি ভারতবর্ষে উত্তর কর্ণাটকের উত্তর প্রান্তর থেকে খরা সন্তর্পণে ছড়িয়ে পড়ে রাজস্থানের থর মরুভূমিতে। এলোমেলো বৃষ্টিপাতে ১৯৯২-এর গ্রীষ্মের শুরুতে মে মাস থেকেই রাজস্থান ও গুজরাট প্রদেশের বেশিরভাগ জেলা খরাক্রান্ত ঘোষিত হল। গ্রাম ভারতের ৭ কোটি লোক তখন খরায় ধুঁকছে। প্রতি ৯ জনে ১ জন খরার মানুষ। "পশ্চাৎভূমি ভারতবর্ষ, ভারতবর্ষের প্রধানভূমি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে।"(দেবেশ, ২০০৭ : ১৫)। একটা বর্ষণচক্র সম্পূর্ণ হলে পরবর্তী বর্ষণচক্র শুরু হবার আগে মাসের বিরতিতে খরা সে বছর হবে কী না তা অনেক সময় বোঝা যায় না । কিন্তু ১৯৯২ সালের মে মাসে গ্রীষ্মের শুরুতেই মধ্যপ্রদেশের সরগুজা জেলায় দুর্গম গাঁয়ে গুজরাটের কচ্ছ, বনসকণ্ঠ, জামনগর, সুরেন্দ্রনগর জেলা, রাজস্থানের বিশ হাজার গ্রাম, মহারাষ্ট্র, কর্ণাটক, ঔরঙ্গাবাদ এবং আরো অনেক জায়গায় দ্রুত খরা ছড়িয়ে পড়ে। জল, খাবার না পেয়ে মানুষের মৃত্যু ঘটে, লঙ্গরখানা খুলে সরকার কুলাতে পারেনি, কারণ, আড়াই লক্ষ লোক তখন লঙ্গরখানায় এসে লাইন দিয়েছে, রাজস্থানে নামমাত্র মূল্যে গরু-মোষ বেচা শুরু হয়ে গেছে। মানুষ দল বেঁধে নতুন জায়গার দিকে চলেছে। "কিন্তু কোথাও কোথাও যেমন গুজরাটের

Dhaka University Institutional Repository

জামনগর, বনসকণ্ঠ, সুরেন্দ্রনগরে গরু-মোষের ক্রেতা নেই এবং এখন তাদের কোনো বিক্রেতাও নেই। যে যার গরু-মোষ ছেড়ে দিয়ে চলে যাচ্ছে। তারপর সেগুলো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মারা যাচ্ছে।" (দেবেশ, ২০০৭ : ১৭)।

মৃত্যুকে রূপ দিতে দিতে প্রাকৃতিক এই খরা ক্রমেই জীবনের খরা হয়ে ওঠে। খরা থেকে বাঁচতে মধ্যপ্রদেশ থেকে উত্তর প্রদেশে চলে যায় হাজার হাজার মানুষের স্রোত। "গ্রাম ছেড়ে মানুষ দল বেঁধে চলে যাচ্ছে আর গ্রামকে গ্রাম এক ভৌতিক চেহারা নিয়ে জলহীন আকাশের তলায় শুধু এই স্মারকটুকু হয়ে থাকছে– সেদিনও ওখানে মানুষ ছিল।" (দেবেশ, ২০০৭ : ১৮)। সাংবাদিকতার ধরনে খরা কবলিত মানুষের গ্রাম ভেঙে যাত্রার বিবরণ খবর বা তথ্য আকারে পরিবেশিত হয় পর পর :

> ওড়িশার কালাহাণ্ডির ছশ মানুষের চারশ মানুষই বোরগাঁও থেকে চলে গেছে মধ্যপ্রদেশের রায়পুরের দিকে কাজের খোঁজে। গ্রামে থেকে গেছে মেয়েরা কেউ-কেউ, আর বুড়োবুড়িরা। কালাহাণ্ডিরই আর-এক গ্রাম অত্রাল থেকে এক হাজার মানুষের মধ্যে পাঁচশ মানুষই চলে গেছে। মধ্যপ্রদেশের সরগুজা জিলা থেকে যারা পারছে তারা চলে যাচ্ছে উত্তর প্রদেশের শোনভদ্রাতে। সেখানে কাজ পাওয়া যেতে পারে। কাজ পাওয়া না গেলেও জল পাওয়া যাবে। মারাঠাওয়াদার বিদ জেলার কাইজ তহশিলের নানা গ্রামের লোক বালাঘাট পর্বতের ছায়া থেকে চলে গেছে পশ্চিম মহারাষ্ট্রের দিকে। ... জল আর খাবার আর কাজ আর বিশ্রামের খোঁজে মানুষ নিজের গ্রাম ছাড়ছে, তহশিল ছাড়ছে জিলা ছাড়ছে, রাজ্য ছাড়ছে। কখনো সেই জনপ্রবাহে পুরুষ তার নারীকে বৃদ্ধকে, গৃহপালিত পশুকে সঙ্গী করছে। কখনো তাদের পেছনে ফেলে রেখে যাচ্ছে। (দেবেশ, ২০০৭ : ১৮)

নির্ধারিত মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচার অন্বেষায় দলে দলে যেসব মানুষ গ্রাম ছেড়ে স্বতন্ত্র পথে পাড়ি দিয়েছে তারা বাঁচবে কী না, প্রত্যাবর্তন করবে কী না তা অনিশ্চিত। জনশূন্য সেই ভূ-খণ্ডে কয়েকজন বৃদ্ধ নারী আর গৃহপালিত পশু রয়ে গেলেও তারাও রয়েছে মৃত্যুর কাছেই। ঔপন্যাসিকের দৃষ্টি সঞ্চরণশীল হয় সাংবাদিকতার গদ্যে, আর জীবন সত্যের তীব্রতাকে আরো জোরদার করে তোলে :

> কোনো গ্রামে কম, কোনো গ্রামে বেশি, কিন্তু সব গ্রামেরই বেশিরভাগ লোক অন্য জায়গায় চলে গেছে। যারা থেকে গেছে তারা খরার বলি। খরার মধ্যে তাদের নিজেদের বাঁচিয়ে রাখতে হয় নিজেকে বাঁচিয়ে রাখার এক জৈবিক তাগিদে। তাতে কেউ বাঁচে, কেউ বাঁচে না। আর এক বর্ষণচক্র শুরু হবার আগে প্রবাসীরা দল বেঁধে ঘরে ফিরবে। তখন কারো প্রত্যাবর্তন থাকবে, কিন্তু ঘর থাকবে না। কারো ঘর থাকবে কিন্তু প্রত্যাবর্তন থাকবে না। (দেবেশ, ২০০৭ : ১৮)

Dhaka University Institutional Repository

দেবেশ রায় জানিয়ে দেন খরা আক্রান্ত জনপ্রবাহের বেশির ভাগই আদিবাসী উপজাতি। ওড়িশা থেকে মধ্যপ্রদেশের উত্তরপূর্ব দিয়ে মারাঠাওয়াদা পর্যন্ত সবচেয়ে বেশি আছে শবর, লোহুরা, কান্ধা, কুটিয়া কান্ধা, পাণ্ডো, গোণ্ড, করভা, বনজারা, দাহানু উপজাতি। "ভারতবর্ষের ভৌগোলিক অংশের সবটুকুই এখন ভারতবর্ষের প্রধান অর্থনীতির মধ্যে আসছে। সেই জনপ্রবাহ প্রবল জীবন-অন্বেষণ নিয়ে প্রবেশ করতে চাইছে ভারতবর্ষের এক বিচ্ছিন্ন খণ্ড থেকে আরেক খণ্ডে, একদিকে অর্থনীতির ধাক্কায় তারা তাদের পুরুষানুক্রমিক আবাসভূমি থেকে ছড়িয়ে পড়ছে, আর একদিকে খরা, বন্যা এরকম প্রাকৃতিক দুর্যোগ তাদের আবাসভূমি ছাড়তে বাধ্য করছে।" (দেবেশ, ২০০৭ : ১৮)। আবার কোথাও চলে যেতে অসমর্থ মানুষগুলোর কাছে খরা প্রাকৃতিকতা থেকে জীবনের, প্রাণের আর শরীরের খরা হয়ে ওঠে, মানুষ হয়ে ওঠে 'খরার মানুষ।' কারণ "একদিকে মাটির তলের জল চার-পাঁচশ ফুট তলায় নেমে যায় আর একদিকে আকাশের জল অন্য দিগন্তের আকাশে চলে যায়। মানুষের সাড়ে তিনহাতি শরীরের ভিতর জলস্রোত মন্দা হয়ে আসে। ... খরা একবার ভিতরে ঢুকলে আর নিঃশেষে বেরিয়ে আসে না।" (দেবেশ, ২০০৭ : ১১)। তাই শরীরের রক্তস্রোতে খরা ঢুকে যাওয়া এই মানুষগুলোর ভেতর থেকে আর খরা বের করা যায় না। কিছুদিন স্বাভাবিক জল আর খাবার দিলে বা হাসপাতালে নিয়ে গেলেও খরা থেকে মানুষ আর প্রাণী বেরিয়ে আসতে পারে না। কোথাও আত্মরক্ষা বা পরিত্রাণ না পাওয়া বীজকুড়ার গ্রামের রিবাই পাণ্ডো বা রামসরাইয়ের ভেতরে 'যেমন খরা ঢুকেই থাকল।' (দেবেশ, ২০০৭ : ২১)। হাসপাতালে রিবাই পাণ্ডো খবর তৈরি করতে যাওয়া সংবাদকর্মীর বিচিত্র প্রশ্নের জবাবে একটাই উত্তর দেয়-

> 'বীজকুড়ায় জল থাকে না।'
>
> 'বীজকুড়ায় পুকুরে জল থাকে না।'
>
> 'বীজকুড়ায় শুখা। জল নাই।' (দেবেশ, ২০০৭ : ২৩-২৪-২৫)

ক্রমাগত বীজকুড়ায় শুখা বা খরার বিবরণের পর হাসপাতালের ব্যর্থ শুশ্রূষা গ্রহণ করেও রিবাই পাণ্ডো শুধু আওড়াতে থাকে জল আর খাবারের অভাবে তার পুত্র, পুত্রবধূ নাতি-নাতনিদের মরে যাবার খবর। "তিনদিন আগে রামবিচার মারা গেল। তিনদিন পর রাত্তিরে নাতনি মারা গেল। সকালে নাতি মারা গেল। তারপর বহু মরে গেল।" (দেবেশ, ২০০৭ : ২৭)। তাই হাসপাতালে আসাটা তার কাছে 'গ্রেপ্তার হওয়া'; যেখানে জল আর খাবার পেলেও ভেতরের খরা আর দূর হয় না। সভ্যতার এ এক

Dhaka University Institutional Repository

চরম বিপর্যয়, যখন বাঁচা ও মরা সমার্থক হয় তাদের কাছে। আর খরা ঢুকে যাওয়া ভাষাহীন ব্রাত্যের মৃত্যু রাষ্ট্র নামক প্রতিষ্ঠানের কাছে যন্ত্রণাদায়ক তথ্যের চেয়ে বেশি কিছু নয়। মধ্যপ্রদেশের সরগুজা জেলার বীজকুড়া গ্রামের জাখলি বাঈ, তার নবজাতক মেয়ে এবং কোলের ছেলেটি, সত্তর বছরের বিরজু, পঞ্চাশ বছরের বোধন, একাত্তর বছরের পুরষোত্তম আর রূপালি বুড়ি, অত্রাল গাঁয়ের খামে হরিজন– এমনি অনেক মৃত্যুর খবর রয়েছে উপন্যাসে, যেগুলো বড় বড় সংবাদপত্র যেমন– 'সান্ডে অবজারভার', 'হিন্দুস্থান টাইমস', 'টাইমস অফ ইন্ডিয়া', 'ইন্ডিয়া টুডে', 'ফ্রন্টলাইন' প্রভৃতি কাগজে প্রকাশ হওয়া নিয়ে নানা তকবিতর্ক আছে; কারণ :

> সরকার পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, তাদের যা বয়স হয়েছিল তাতে এদের আজ বাদে কাল মারা যাবারই কথা। মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী এরকম কথা বলেছেন বলে খবর বেরিয়েছে। ওরা কালকের বদলে আজ মারা গেছে বলেই কি সরকারকে তাদের মৃত্যু নিয়ে কৈফিয়ত দিতে হবে? ... জিলার কালেক্টর বলেছেন, ওদের বাড়িতেই আচমকা মারা যাওয়ার একটা অভ্যাস আছে। (দেবেশ, ২০০৭ : ১৯)।

প্রকৃতির বিরূপ চাপে উৎপাটিত, নিঃস্ব মানুষ, যাদের নিয়ে রাষ্ট্র কখনও চিন্তিত নয়, তাদের মৃত্যু বা খরা-আক্রান্ত শরীর নিয়ে পুরো প্রশাসন-যন্ত্রের আচরণ এক তীব্র শাণিত ব্যঙ্গে গ্রন্থিত হতে থাকে *প্রতিবেদনে*। যেমন সরকারি ডাক্তারবাবুদের কাছে খরার মৃত্যু হয়ে যায় মশার কামড়ে আর অপুষ্টির মরণ। না খেয়ে মরা এত সহজ নয় বলেই ডাক্তারবাবুর স্পষ্ট মত :

> কালাহাণ্ডিতে কোনো লোকই না খেয়ে মরেনি। এইসব মরণ, অসুখের মরণ– ডাক্তারবাবু অসুখের নামও বলেন। জমির হিসেবের মত অসুখের নামও আমাদের মুখস্থ হয়ে গেছে। আইনসঙ্গতভাবে মরতে হলে, এইসব অসুখেই আমাদের মরতে হবে– গ্যাসট্রোএনটেরাইটিস, আমাশা, মেনিনজাইটিস। ... মরার আগে যদি জ্বরটর হয় তাহলে আরো নতুন নাম আসে। তার ওপরও ডাক্তারবাবুরা নতুন নাম দেন। (দেবেশ, ২০০৭ : ৫১)।

ভবানীপাটন থেকে তালবরা গাঁয়ে গাড়ি করে আসা 'ভদ্রলোক ডাক্তারবাবু' রেগে গিয়ে বলেন :

> আদিবাসীদের অপুষ্টি হয় না, ও সব ভদ্রলোকদের অসুখ। জঙ্গলের শিকড়বাকড়ে প্রচুর খাদ্যপ্রাণ থাকে। আদিবাসীরা সেইসব খায়। ফলে তাদের স্বাস্থ্য ভাল। আর আদিবাসীরা তো গরুর মাংস খায়। গরুর মাংস খেলে আর শরীরে অপুষ্টি আসবে কোত্থেকে। শহরের ভদ্রলোকেরা যেখানে পাঁঠা বা মুরগী পান না, আদিবাসীরা সেখানে খিদের সময় নিজেদের গরু কেটে নিজেরা খেয়ে নিতে পারবে। এটা কি চারটিখানি কথা!' (দেবেশ, ২০০৭ : ৫২)।

Dhaka University Institutional Repository

মূক, মুর্খ, প্রান্তীয় আদিবাসীদের বাধ্য হয়ে পরিদর্শন ও চিকিৎসা করতে আসা সরকারের প্রতিনিধি ডাক্তারবাবু শেষপর্যন্ত তাদেরকে হতভম্ব ও বিমূঢ় করে দিয়ে বলে গেলেন, "তোরা আসলে মাতালখোর, মদ ছাড়া তোরা কিছু খেতে পারিস না, এটা একটা অসুখ। রাতদিন মদ খেতে-খেতে এই অসুখ হয়। তখন জিভে মদ ছাড়া কোনো খাবার রোচে না। তোরা ভাত পেলে, ভাত না খেয়ে হাঁড়িয়া বানাস, আর মহুয়া পচিয়ে মদ বানাস। তোদের খিদেই পায় না। তোরা আবার খাবি কী?" (দেবেশ, ২০০৭ : ৫২)। সুতরাং সুশিক্ষিত ভদ্রলোক ডাক্তারবাবুর এ বক্তব্যেও তাদের আপত্তি করার কিছু থাকে না :

> কারণ সত্যি ত তারা পচাই, হাঁড়িয়া, মহুয়া খায়। সত্যি ত পচাই, হাঁড়িয়া, মহুয়া খেলে অনেকক্ষণ খিদে পায় না। মহুয়া না থাকলে ত ওরা অনেক বেশি মরে যেত। যে-কজন বেঁচে আছে সে-কজনও বেঁচে থাকত না। সরকার যদি মহুয়ারই ফরেস্ট বানিয়ে দিত তাহলে কিন্তু এই আটমাস আর-একটু কম কষ্টে কাটত। (দেবেশ, ২০০৭ : ৫২)

বীজকুড়া, কালাহাণ্ডির এই মানুষ মরা নিয়ে কেবল ডাক্তারবাবুরাই নন, জেলার কালেক্টর থেকে মিনিস্টার, প্রাইম মিনিস্টার এমন কি হাসপাতালে রিবাই পাণ্ডোর 'ইন্টারভিউ' নিতে আসা সাংবাদিকসহ প্রশাসন-যন্ত্রের অঙ্গীভূত সবাই প্রায় এক স্বরে একই রকম কথা প্রচার করতে থাকে। "উপন্যাসে সাক্ষাৎকারের ঢঙে ব্যবহৃত সংলাপ-এর মধ্যেও লক্ষিত হয় প্রশ্নকর্তা ও উত্তরদাতার শ্রেণী-বৈষম্য জনিত বিভেদ।" (প্রিয়কান্ত, ২০০৭: ১৩২)। পাণ্ডোর ছেলে রামবিচার, নাতি ও পুত্রবধূ জাখলি বাঈ এবং তার সদ্যোজাত মেয়ে মরে যাবার পর জেলার কালেক্টরের মুখ দিয়ে রাষ্ট্র রচনা করায় যে :

> ওদের বাড়িতেই আচমকা মারা যাওয়ার একটা অভ্যাস আছে। জাখলির স্বামীও কয়েকমাস আগে ও-রকমই আচমকা মারা যায়। তখন ত খরা নিয়ে, অনাহার নিয়ে এত কথা ওঠে নি। জিলার কালেক্টর বলেছেন, জাখলি মারা গেছে ধনুষ্টঙ্কারে, মেয়ে হওয়ার পরে। ঐসব গাঁয়ে ছেলেপিলে হওয়ার পর ধনুষ্টঙ্কারে মেয়েরা ও-রকম আকছার মরে। তেমন মরার জন্য খরারও দরকার হয় না, অনাহারেরও দরকার হয় না।" (দেবেশ, ২০০৭ : ১৯)।

ওড়িশার কালাহাণ্ডি জেলার সদর ভবানীপাটনের ডাক্তার ইসমাইল খাঁ বলেছিলেন :

Dhaka University Institutional Repository

> শুধু না খেয়ে ত লোক মরে যেতে পারে না, কতদিন আর মানুষ না খেয়ে থাকতে পারে, তখন সে যা পায় তাই যায়, পোকামাকড় আর গাছগাছড়া খেয়ে মানুষ বাঁচতে চাইলে মরতেই হয়। (দেবেশ, ২০০৭ : ১৯)।

সুতরাং *খরার প্রতিবেদন* হয়ে ওঠে দুই ভারতবর্ষের গল্প। একদিকে আদিবাসী-জনজাতির রুক্ষ-শুষ্ক মৃতপ্রায় ভারত আর একদিকে ভারত রাষ্ট্র বা রাজনীতি আর অর্থনীতিকে ক্রমাগত গ্রাস করা শোষক শ্রেণি। অখাদ্য-কুখাদ্য খেয়ে খরা-আক্রান্ত মানুষের মৃত্যুকে গণতান্ত্রিক সরকারের দেয়া ব্যাখ্যাগুলো এক নির্লিপ্ত আর স্বাভাবিক ভঙ্গিমায় উঠে আসে ঔপন্যাসিকের প্রতিবেদনে। নিত্যদিনের ঘটে যাওয়া বাস্তবিক অবস্থার তথা ভাষাহীন ব্রাত্যজনের ক্রমিক মৃত্যুর বিবরণকে সমালোচক বলেছেন যে তা "মূলত শিল্পিত মিথ্যার বিরুদ্ধে জোরালো এক প্রতিবাদ।" (অশোক, ২০১১ : ২৫২)। প্রতিবেদনের বিবরণে রাষ্ট্রীয় কার্যক্রম প্রসঙ্গে তীক্ষ্ণ ও বিস্ফোরক শ্লেষ বা ব্যঙ্গধর্মী ইঙ্গিতের পেছনেই রয়েছে অলিখিত সত্যের ইশারা। খামে হরিজন, জাখলি বাঈ ও রিবাই পাণ্ডো ক্রমেই খরায় আক্রান্ত হয়ে জল আর খাবারের অভাবে শুকিয়ে কাঠ হয়ে গিয়েছিল– সে সময় তাদের একটু একটু করে মরে যাওয়ার খবর সংবাদপত্রে আসেনি। ঔপন্যাসিক তাঁর প্রতিবেদনধর্মী উপন্যাসের অন্তঃপাঠে রয়ে যাওয়া আরেক ধরনের প্রতিবেদনে সেই অনুপুঙ্খকেই করে তোলেন সত্যোদ্‌ঘাটনী গ্রন্থনার উপজীব্য :

> খরায় কে বাঁচে, কীভাবে বাঁচে তার কোনো নিয়ম নেই। নিয়ম নেই বলেই হিসেব নেই। হিসেব নেই বলেই খরার কোনো সংখ্যাতত্ত্ব নেই বা খরার শুধুই সংখ্যাতত্ত্ব আছে, প্রাণতত্ত্ব নেই। সংখ্যাতত্ত্বের খরা শুরুই হয় না, শেষ তো অপ্রাসঙ্গিক। (দেবেশ, ২০০৭ : ২১)

কিংবা সরগুজা জেলার বীজকুড়া গ্রামের নিষ্পাপ শিশুদের খরায় বসবাসের বিবরণ-পাঠ লিখিত হয় এভাবে :

> চুনাপাথর, তেঁতুল পাতা আর মহুয়ায় বেশ পেট ভরে যেত, পাথর চেবালে দাঁতের গোড়া আর গালের ভিতরটা ফুলে ফুলে ওঠে। একটু-একটু ঘা হয়। যাদের তাড়াতাড়ি ঘা হয়, তারা আর পাথর চেবাতে পারে না– জ্বালা করে, সেজন্য দিনে একবারের বেশি চুনাপাথর খাওয়া যায় না। একবার খেলেই গাল, গলা, পেট জ্বালা করতে থাকে, বুরবুর করতে থাকে, ঢেকুর ওঠে...পাথরের খাবারই বীজকুড়ায় বাচ্চাদের ভাল খাবার। (দেবেশ, ২০০৭ : ৩৮)

Dhaka University Institutional Repository

বীজকুড়ার স্থানিক বিবরণে সংবাদ-প্রতিবেদনের তথ্য আর সত্যের দ্বিবাচনিক সম্পর্ক উন্মোচিত হয়ে ঔপন্যাসিকের বয়ানে খরার নব্য-ভাষ্য প্রকাশ করে :

> বীজকুড়া কোথায় এটা পাখিকে জিজ্ঞেস করলে জানা যাবে না কারণ মানুষই যেখানে গাছের ফল খেয়ে নেয়, সেখানে পাখি যাবে কেন ? বীজকুড়া কোথায় এটা পোকামাকড়কে জিজ্ঞেস করলে জানা যাবে না। কারণ মানুষই সেখানে পোকামাকড় তুলে-তুলে খেয়ে নেয়।" (দেবেশ, ২০০৭ : ৪৫)

বাস্তবকে রূপ দেবার এই ভঙ্গিমার মধ্য দিয়েই সংবাদ-প্রতিবেদন ধীরে ধীরে রূপান্তরিত হয় নভেলে; প্রতিবেদন বিনির্মিত হতে থাকে, উপন্যাসের পটে উন্মোচিত হয় এক খরা আক্রান্ত প্রান্তিকায়িত জনজীবন। সমালোচক বলেন :

> প্রতিবেদনধর্মী উপন্যাসের অন্তঃপাঠে রয়ে যায় আরেক ধরণের প্রতিবেদন। যাকে বলা যেতে পারে প্রতিবেদনের ভেতরে প্রতিবেদন। যাকে সহজে চেনা খুব মুশকিল। নিবিড় পাঠে যাতে ধরতে হয়। কথক ভাষ্যকারের এক আশ্চর্য যুগলবন্দি ঔপন্যাসিকের নিজস্বতাকে আলাদাভাবে চিনিয়ে দেয়।" (অশোক, ২০১১ : ২৫৪)

প্রতিবেদনে ওড়িষার কালাহাণ্ডি জেলার মানুষের বিবরণে, 'বীজকুড়ার জাখলি বাই-এর প্রেতজীবনের বিবরণ ও প্রেতাত্মার স্বীকারোক্তি'তে, 'মহারাষ্ট্রের বিদ জিলার কাইজ তহশিলের পিরাচওয়াদি গ্রামে রখম বাঈয়ের মৃত মোষের প্রেতাত্মার প্রতিবেদনে'[১] কিংবা সাংবাদিকের কাছে রিবাই পাণ্ডোর সম্বিতহীন বিবরণে ধারণকৃত ভাষায় ঔপন্যাসিকের নিজস্ব আদল স্পষ্ট হয়ে যায়। খরার মারণান্তিক স্বরূপ মানবতন্ত্রী ঔপন্যাসিকের নির্মোহ দৃষ্টিতে হয়ে ওঠে ব্যতিক্রমধর্মী জীবনের আর তৃষ্ণার শিল্প-দলিল। যেখানে জাখলি বাঈ-এর 'আত্মা' মরা ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে নিয়ে বীজকুড়ার বাইরে ছোট পাহাড়ে ঘুরে বেড়ায়, যার গ্রামে ঢোকা নিষেধ, জঙ্গলে ঢোকা বারণ। দু চোখে আজন্মের বুভুক্ষা নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে সরগুজার রিবাই পাণ্ডোর পুত্রবধু জাখলি বাই। 'বাঁ বুকে মেয়েটাকে চেপে ধরে আর ডান হাতে ছেলেটাকে ধরে তাকিয়ে' থাকা জাখলি বাঈ-এর বিবরণে জীবন আর মৃত্যুর কোনো সীমারেখা নেই, তার কাছে জীবনের দেখা আর মরে যাবার পরের দৃষ্টি একই রকম থাকে, বদলায় না কিছুই :

Dhaka University Institutional Repository

> আমার দেখার কোনো বদল নেই, হাওয়ার কোনো বদল নেই, আমার খিদের কোনো বদল নেই, আমার তেষ্টার কোনো বদল নেই, মরার আগে আমি যা ছিলাম, মরার পরে তা থেকে আমার কোনো বদল নেই। আমি ত ইচ্ছে করে মরিনি তখনো সারারাত ধরে আমার শক্ত আর ঠাণ্ডা মেয়েটাকে আমি বাঁ বুকে চেপে ধরে আছি। (দেবেশ, ২০০৭ : ৪৩)

> আমরা এখনো সেই খিদে নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি। ... গ্রামের বাইরে বাইরে, এই পাহাড়ে পাহাড়ে। আমাদের খোঁজার জায়গা বেড়েছে, খাওয়া বাড়ে নি। ... খিদের ত আর মরণ নেই। ... জ্যান্ত মানুষেরা ত বোঝে না, মরার পরেও খিদে একই থাকে, একটুও কমে না। (দেবেশ, ২০০৭ : ৩৭)

ঔপন্যাসিকের বয়নকৌশলে যুক্ত হয়ে যায় মৃত্যুকে প্রত্যাখ্যানের ভাষা। মৃত্যুর সংজ্ঞা পুরো বদলে দিয়ে গভীর এক ফিকশন সৃষ্টি করেন ঔপন্যাসিক, যেখানে মৃত্যুর সমতালে জীবনই পরিস্ফুট আর জীবন্ত হতে থাকে বারবার; শোনা যায় মৃত জাখলি বাঈ-এর জৈবনিক স্বর। প্রান্তিকায়িত জীবন কিংবা জীবনের সাথে ব্যবধানহীন মৃত্যুকে ঔপন্যাসিক ব্যাখ্যা করেন এভাবে :

> জীবন যখন জীবনের নিয়মে চলে না, মরার পর সেখানে মরার নিয়ম খাটে না। মারা যাওয়ার পর জাখলি বাঈয়ের খিদে ত আর মেটেনি। তাই যখন বাতাসে-বাতাসে শুনল বড় গাছতালায় রঘুনাথনগর থেকে খাওয়া আসবে তখন তার মেয়েকে সাপটে আর ছেলের হাত ধরে জাখলি বাঈও বীজকুড়ার বড় গাছতলায় এসে দাঁড়িয়েছে। শুধু এইটুকু পার্থক্য রেখেছে, সে একেবারে জ্যান্ত মানুষদের ভিড়ের মধ্যে গিয়ে দাঁড়ায়নি। রঘুনাথনগর থেকে খাবার এলে সেটা কীভাবে দেওয়া হবে তা জাখলি বাঈ জানে না। তার কোনো লাইন নেই।
>
> ... জাখলি বাঈ মরে গিয়ে ত ওটা জেনেছে যে মরা লোকের আর বাঁচা লোকের খিদে একই রকম। (দেবেশ, ২০০৭ : ৪৪-৪৫)।

আবার রখম বাঈয়ের মৃত মোষের আত্মার জবানীতে তার মরার সময়কার বিবরণ :

> বাঈ দেখছিল, আমি তখনো মরছি, নাকি আমার মরা শেষ হয়ে গেছে। আমিও ঠিক জানি না, আমি তখনো মরছিলাম, নাকি তখন আমার মরা শেষ হয়ে গেছে। ... আমি জানি না, আমি পড়ে যাওয়ার আগেই মরে গিয়েছিলাম, নাকি পড়ে যাওয়ার পরও বেঁচে ছিলাম। আমি একবারে মরিনি, অনেকক্ষণ ধরেই মরছিলাম। হয়তো অনেকদিন ধরেই। বাঈয়ের সঙ্গে জল খেতে না এলে হয়তো বাড়িতে শুয়ে-শুয়ে মরে যেতাম। ... জল খেতে এসেও বেঁচে থাকতে পারলাম না। শুখার সময় মানুষজন গরু-মোষ এ-রকমভাবেই মরে। ঘাস না পেয়ে, গম না পেয়ে, জল না পেয়ে আর ঘাস খেতে গিয়ে, গম আনতে গিয়ে, জল খেতে গিয়ে। খরার মরণ এরকমই দুমুখো মরণ। ...

Dhaka University Institutional Repository

> সামনের চব্বিশ ঘণ্টায় বাঈ আমার কথা মনে করে এটুকু জল কম খাবে– বাঈ যদি ঐ পুরো চব্বিশ ঘণ্টা বেঁচে থাকে। (দেবেশ, ২০০৭ : ৬২)

মৃত্যুর বেদনা-বিধুরতা মরমি হয়ে ওঠে আলোচ্য উপন্যাসে। যেখানে দু-মুখো মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বেঁচে থাকার অগাধ তৃষ্ণায় জল খেতে এসেও বেঁচে থাকতে পারে না মোষটি। মোষপালক রখম বাইয়েরও হয়ত ঘটে একই পরিণতি। সমস্ত প্রতিবেদন জুড়েই থাকে এই মৃত্যুর রঙরূপ :

> খরার মরণ ত এ-রকমই। কে কখন মরবে কিছু ঠিক থাকে না। (দেবেশ, ২০০৭ : ৬২)

'জাখলি বাঈ, কাদা গুলে খাওয়া খামে হরিজন, এমন কি ঐ খরাক্রান্ত মোষ যে মরে গিয়েও নভেলিস্টের কাছে তার মৃত্যুর আগের ও পরের বিবরণ এভাবেই নথিবদ্ধ করিয়ে যায়।' (স্বপন, ১৪২১ : ২৯৫)। এ পর্যায়ে ঔপন্যাসিক সম্ভবত তাড়িত হন মার্কসবাদের বিজ্ঞান দ্বারা, কমিউনিস্ট সাহিত্যিকদের মতই দেবেশ রায় ব্যক্তির ঐতিহাসিকতা খোঁজেন ও নির্মাণ করেন।[২] "মার্কসবাদের বিজ্ঞানই তাকে *খরার প্রতিবেদন* লেখায়, সেই প্রতিবেদন তথাকথিত মার্কসীয় বা কমিউনিস্ট আদর্শ প্রচার-সর্বস্ব সাহিত্য নয়। তাই তিনি প্রতিবেদন করেন মৃত মোষের প্রেতাত্মার জবানবন্দি থেকে। তার মরার ধরন ও কারণ তাতে থাকে কিন্তু কোনো প্রতিপক্ষ প্রকাশ্যে থাকে না, বিদ্রোহও না। কেবল ব্যক্তি নয়, জঙ্গল নদী হাটবাজার জানোয়ারসহ মানুষেরই ঐতিহাসিকতা বোঝার ও বোঝাবার চেষ্টা করেন।" (সাদ কামালী, ২০১০ : ৫১)।

প্রতিবেদনে লিখিত এই ইতিহাসে প্রকাশ্য প্রতিপক্ষ বা বিদ্রোহ না থাকলেও প্রতিরোধকামী শিল্পীর প্রকাশে জীবন-সমাজ-রাষ্ট্র-রাজনীতি– সকল সংঘটনাই স্তরীভূত বাস্তবতায় অন্তর্বয়িত হতে থাকে। ঔপন্যাসিক নির্লিপ্তভাবেই তাই জানিয়ে দেন রাষ্ট্র, রাজনীতির ভূমিকা। যেখানে বিষাদ-ব্যঙ্গ-তীক্ষ্ণ শ্লেষ আর আবেগও থাকে সংগোপনে। যেমন– জাখলির পরিবারশুদ্ধ মরে যাবার পর সরপঞ্চ জানায় খাবার আসছে, নতুন সড়ক হয়েছে, মন্ত্রীর পর মন্ত্রী আসছে। অর্থাৎ এই খরা আর মৃত্যু আনছে উন্নয়ন। সে উন্নয়ন যারা আনছে তারাই চাইবে বারবার খরা আসুক। "সামাজিক শ্রেণীবিন্যাস না বদলেই উৎপাদন ব্যবস্থার পরিবর্তনের ফলে উন্নয়নের গ্রাফ ঊর্দ্ধমুখী হল বটে, তবে তা ভারতবর্ষের মুষ্টিমেয় কিছু মানুষের জন্য। ... উন্নয়নও আসে মৃত্যুর সোপান বেয়ে।" (প্রিয়কান্ত, ২০০৭ : ৯০-৯২)। না হলে বীজকুড়া গ্রাম কেউ চেনে না, রাষ্ট্রের বা প্রশাসনের তালিকায় নেই এই গ্রাম। অপাঙ্‌ক্তেয় মানুষের খোঁজ রাজনীতিতে কেমন করে আসে তা ঔপন্যাসিক জানিয়েছেন :

Dhaka University Institutional Repository

> ...(খাবারের) ফর্দটার দিকে তাকিয়ে সরপঞ্চ বলল, জাখলিবাঈ বীজকুড়াকে বাঁচিয়ে দিয়ে গেল। তার নিজের বাড়ির এতগুলো লোক মরল বলে খবরের কাগজে খবর বেরল। কাগজে খবর বেরল বলে বীজকুড়ার নাম বাইরের লোক জানতে পারল। নইলে কে কবে বীজকুড়ার নাম শুনেছে। (দেবেশ, ২০০৭ : ৪৫)

খরা-আক্রান্ত ও জীবন-মৃত্যুর রেখাহীন এই বাস্তবতার আয়তন ধীরে ধীরে অনন্ত মুহূর্তায়নে মূর্ত ও বিস্তৃত হতে থাকে ঔপন্যাসিকের ভাষ্যে, বীজকুড়া গ্রামের জাখলি বাঈ-এর প্রেক্ষণবিন্দু মিলে যায় প্রতিবেদক-ঔপন্যাসিকের দৃষ্টির সাথে। অন্তিক মানবত্ব কিংবা দুঃসময়ের অন্তর্চাপে পড়া জীবন উপন্যাস-ফর্মের বিকাশ ঘটায়; রিপোর্টিং, নভেল আর মহাকাব্যের ধরন মিলে নতুন এক শিল্পবিশ্বকে তাৎপর্য প্রদান করে। তাই মৃত্যু-জীবন-রাজনীতি একই পটে বর্ণনার কাব্যিকতা লাভ করে :

> বীজকুড়া কোথায় তা মেঘকে জিজ্ঞেস করে লাভ নেই। বীজকুড়ার আকাশে যাওয়ার আগে মেঘ ফুরিয়ে যায়। বীজকুড়া কোথায় তা নদীকে জিজ্ঞেস করলে কোন লাভ নেই। বীজকুড়ায় কোনো নদী নেই। বীজকুড়া কোথায় হাওয়াকে জিজ্ঞেস করে কোনো লাভ নেই। কারণ হাওয়া বীজকুড়ায় থামে না। কিন্তু জাখলি বাঈয়ের নাম বাইরের লোক জানতে পারল বলে এই পাকা রাস্তা তৈরি হল। এই পাকা রাস্তা তৈরি হল বলে মন্ত্রীরা এলেন, নেতারা এলেন। এই নেতারা এলেন বলে আজ রঘুনাথনগর থেকে খাবারের গাড়ি আসছে বীজকুড়ার জন্য। বীজকুড়ার লোকদের এই ফর্দ বানানো হয়েছে। বীজকুড়ার বাইরে কাউকে খাবার দেয়া হবে না। (দেবেশ, ২০০৭ : ৪৫)

আর সেই নামের ফর্দে তারা থাকবে কী-না সেটা না জেনেই মেয়েকে বুকে সাপটে আর ছেলেকে হাতে ধরে জাখলি বাঈ বড় গাছতলায় অপেক্ষা করে থাকে রঘুনাথনগর থেকে আসা খাবারের গাড়ির জন্য; যেন খাবারের গাড়ির অপেক্ষায় ওরা বড় গাছতলায় অনন্তকাল ধরে দাঁড়িয়ে থাকবে। মৃত্যুতে আর জীবনের তৃষ্ণায় নির্বাসিত জাখলি বাঈ-এর আত্মা, রখম বাঈয়ের মৃত মোষ কিংবা শরীর থেকে খরা দূর না হওয়া বিরাই পাণ্ডো কিংবা কাদা গুলে খাওয়া খামে হরিজন-এদের খণ্ড খণ্ড চিত্রেই শেষ হয় *খরার প্রতিবেদন*। সমালোচকের মতে :

> দেবেশ রায় কাহিনী, ভাষা আর ফর্মের ভিতরে তাঁর দায়িত্ব পালন করেন। তাই রচিত হয় জাখলি বাঈয়ের প্রেতাত্মা বা মোষের প্রেতাত্মার প্রতিবেদন। মোষ এখানে জানোয়ার না হয়ে বরং বাঈ-এর একটা 'এক্সটেনশন' হিসেবে উপস্থাপিত হয়। কাহিনীর সবটুকু কিংবা প্রতীক উৎপ্রেক্ষা বা জোড় লাগানো ছোট ছোট টুকরা খুলে খুলে ব্যাখ্যা করার তথাকথিত যৌক্তিক কর্মটি এ কারণে

Dhaka University Institutional Repository

> লেখক এড়িয়ে যান। অর্থাৎ যৌক্তিকভাবেই কাহিনীর এমন অযৌক্তিক বিন্যাসের দিকে এগোন তিনি। (সাদ, ২০১০ : ৫১)

খরার প্রতিবেদন এক সৃজনশীল সাহিত্যকর্ম হয়ে ওঠে; যাকে বিশেষ দর্শনের উদ্দেশ্যমূলক 'প্রচার প্রোপাগান্ডা' বলা কঠিন। মানুষ ও তার ইতিহাস ইত্যাদি অনুসন্ধানে দেবেশ রায়ের এই অনির্দিষ্ট উপন্যাস পরিক্রমা– যার ভেতরে প্রায়ই কেন্দ্রিকতা তৈরি হয়, কেন্দ্রের স্বরূপও স্পষ্ট হয়; "আর তা রাষ্ট্রেরই স্বরূপ। মোষ আর প্রেতাত্মা নিয়ে ফর্মের হেঁয়ালিতে, অন্তর্গূঢ় কার্যকারণে রাষ্ট্র মেলে।" (সাদ, ২০১০ : ৫২)। রাষ্ট্রকে কিংবা নিষ্পেষিত প্রান্তিক মানুষকে, প্রকৃতিকে তিনি যেভাবে দেখেন কিংবা চিহ্নিত করেন, সেই ভঙ্গিটি সম্পূর্ণই নতুন ও নিজস্ব; এখানেই তিনি শিল্পী ও স্রষ্টা। আদিবাসী উপজাতি রিবাই পাণ্ডো, সাংবাদিকের অজস্র বাস্তবোচিত প্রশ্নের উত্তর যে দেয় নিজের মত করে; প্রাকৃতিক খরার অনিবার্যতা তার কাছে 'বনদেওতার শাপ।' জীবনের পদে পদে থাকা এ দৈববিশ্বাস গোষ্ঠী-জীবনাশ্রয়ী। তাই সে বলে :

> মরলে পাণ্ডো বীজকুড়ায় থাকে, ঘুরে বেড়ায়, জল খোঁজে, খাওয়া খোঁজে। বাঁচলে পাণ্ডো বীজকুড়ায় থাকে, ঘুরে বেড়ায়, জল খোঁজে, খাওয়া খোঁজে। ... বনদেওতার শাপ। পাণ্ডোর আদিপুরুষ বাঘ। ... বাঁচলে পাণ্ডো গাঁওয়ে থাকে, মরলে পাণ্ডো পাহাড়ে থাকে।... পাণ্ডোকে শুখায় থাকতে হয়। পাণ্ডোকে বনদেওতার শাপে থাকতে হয়। পাণ্ডোর মেঘে জল থাকতে নাই। পাণ্ডোর পুকুরে জল থাকতে নাই। বীজকুড়ার পাহাড় পার হওয়ার আগে মেঘ খালি হয়ে যায়। পাণ্ডোর পুকুরের তলায় ফাঁক। রাত্তিরে পুকুরের জল পাতালে চলে যায়। (দেবেশ, ২০০৭ : ৩৫)

বিরূপ প্রকৃতি আর অসহযোগী প্রশাসন-যন্ত্রের ক্রমিক নিষ্পেষণের বিপরীতে এই উপকথা-আশ্রিত জীবন-বিশ্বাস হয়ে ওঠে রিবাই পাণ্ডোর আশ্রয়; তাতে ঔপন্যাসিকতারও আধেয় খোঁজেন দেবেশ, বয়নে শুরু হয় বিকল্প বাস্তব, বিকল্প গ্রন্থনা আর বিকল্প আকরণের সন্ধান। তাই রিবাই পাণ্ডোর সাথেই ঔপন্যাসিকের কথক-সত্তার অন্তর্বৃত স্বর সামবায়িক হয়ে ওঠে। 'লেখকের সংযোজন' অংশে প্রতিবেদক-ঔপন্যাসিকের বর্ণনায় রূপায়িত হয় শুখা-আক্রান্ত 'ধু ধু ন্যাংটো উদাস জমি'র চিত্র। (দেবেশ, ২০০৭ : ৫৪)। যে জমি জমির বাসিন্দাদের খাওয়াতে পারে না, যে জমির ওপর হাঁটতে-হাঁটতেই মরণার্থীরা এক সময় বসে পড়েও মরে যায়। ফলনের এই জমি পতিত রেখে মানুষ মাইল-মাইল পার হয়ে বনে-পাহাড়ে যায় খাবারের খোঁজে, হাজার বছর আগে যে পাহাড় আর জঙ্গল থেকেই তারা নেমে এসেছিল নিজের ফলনের পাড়ে তার বসবাসের ঘর তোলার জন্যে। "গ্রামসীমা থেকে শুধু দেখা যাবে– কালাহাণ্ডির জমি মানুষকে ফিরিয়ে দেয়। ... কালাহাণ্ডির জমির সেই দিকে তাকিয়ে

Dhaka University Institutional Repository

থাকলে তার বৈচিত্র্য দেখা যায়, তার জীবনহীন বৈচিত্র্য। শুকিয়ে মরতে মানুষের অন্তত ছয় মাস লাগে। খামে হরিজন তার দরজায় বসে তাকিয়ে থাকতে থাকতে মরে গিয়েছিল।" (দেবেশ, ২০০৭ : ৫৫)। কিছুক্ষণের জন্য সে দৃষ্টিতে মরুর মরীচিকার মতো বিভ্রম জাগে :

> কখনো দূরের দিকে তাকিয়ে থাকলে কালাহাণ্ডির জমিকে দিগন্তে যেন পাখা মেলে আকাশে উঠতে দেখা যায়। অনেক ছোট-ছোট পাখির এক বিপুল দঙ্গল যাতে রোদ ছায়াচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। সেই দঙ্গল দিগন্ত থেকে আকাশ মুছতে-মুছতে এই দিগন্তের দিকে আসতে থাকে। কিছুক্ষণের জন্য মেঘোদয়ের বিভ্রম জাগে, মেঘ, কালাহাণ্ডির মেঘ, কাল মেঘের মত মেঘ, জল ঢেলে দেবে কালাহাণ্ডির মাটিতে, তারপর সেই জল ছুটে যাবে কালাহাণ্ডির মাটির ভিতরে। জলের সঞ্চয় থেকে শস্য মাথা তুলবে। কিন্তু দিগন্ত সেই মায়ার প্রশ্রয় বেশিক্ষণ দেবে না। ঘোর কেটে যায়। কালাহাণ্ডির মাটি কালাহাণ্ডিরই দিগন্তে গিয়ে ঠেকে। (দেবেশ, ২০০৭ : ৫৫)

প্রশাসন-পরিচালিত রাজনীতি-অর্থনীতির বিপন্নতার সংবাদটি আগেই দিয়ে দেন ঔপন্যাসিক। তিনিও খবরের কাগজে পরিবেশিত সংবাদের পাঠক, তাই তিনি জানেন ও জানান যে কালাহাণ্ডির কোনো এলাকাকে বা লোকজনের কোনো অংশকে 'সরকার শুখার মুখে, ভুখের মুখে ছেড়ে দেননি।' (দেবেশ, ২০০৭ : ৫৫)। কালাহাণ্ডির এক চিলতে মাটি বা একটা লোক পাওয়া যাবে না যে কোনো উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় পড়ে নি– 'ড্রাউটপ্রোন এরিয়া প্রোগ্রাম', 'এরিয়া ডেভেলপমেন্ট এ্যাপ্রোচ ফর পভার্টি টার্মিনিশেন', 'ইকনমিক রিহ্যাবিলিটেশন অব রুরাল পুওর', 'ইন্টিগ্রেটেড ট্রাইব্যাল ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম', 'রুরাল ল্যান্ডলেস এমপ্লয়মেন্ট গ্যারান্টি প্রোগ্রাম' ইত্যাদি ছাড়াও রয়েছে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের প্রত্যেকটি ডিপার্টমেন্টের নিজস্ব সব প্রকল্প। "কিন্তু কালাহাণ্ডি তবু কালাহাণ্ডিই থেকে গেল। কালাহাণ্ডির জমি একটার বেশি ফলন দিল না। কালাহাণ্ডির আকাশ এক ফোঁটা বেশি বৃষ্টি ফেলল না। কালাহাণ্ডির জমির তলা থেকে এক আঁজলা জল বেশি উঠল না। কালাহাণ্ডিতে লোক শুখায় বা ভুখায় একজনও কম মরল না।" (দেবেশ, ২০০৭ : ৫৩)। প্রতিবেদনে শোনা যায় শ্লেষের তীব্র ঝংকার :

> খরা আর দুর্ভিক্ষ নিয়ে কালাহাণ্ডি যেন সারা ভারতবর্ষে একা দাঁড়িয়ে আছে। পাঞ্জাবে সবুজ বিপ্লব আর তার পাল্টা কালাহাণ্ডির দুর্ভিক্ষ। (দেবেশ, ২০০৭ : ৭৬)

সুতরাং পরিণতিহীন যে দ্বন্দ্বটি প্রান্তিক, চিরায়ত জীবন ধারার অঙ্গরূপে অনাদি অনন্তকাল ধরে চলমান থাকে সেই নীরব সংঘাত বা লড়াইকেই এবার অসার, ঊষর, বিচিত্ররূপী প্রকৃতির বর্ণনায় বিন্যস্ত করে

Dhaka University Institutional Repository

দেন ঔপন্যাসিক। তাই রিবাই পাণ্ডোর প্রত্নকথা কিংবা কালাহাণ্ডির জমির বিবরণের অনুপুঙ্খই জীবন সংগ্রামের আদিকল্প হিসেবে উপস্থাপিত হয়।

খ. দাঙ্গার প্রতিবেদন

১৯৯২ সালের ৬ ডিসেম্বর ভারতের অযোধ্যায়, পাঁচশ বছরের পুরনো বাবরি মসজিদ ভাঙার মধ্য দিয়ে দাঙ্গা শুরু হয়, *দাঙ্গার প্রতিবেদন* (প্র. প্র. ১৯৯৪) উপন্যাসটি সে প্রসঙ্গেই রচিত। অযোধ্যার ফয়েজাবাদ জেলায় রামকোট হিলের ওপর ষোড়শ শতকের প্রথম দিকে এই মসজিদ নির্মিত হয়। এটা ছিল উত্তর প্রদেশের সবচেয়ে বড় মসজিদগুলোর একটা। মসজিদটি ১৫২৭ খ্রীষ্টাব্দে ভারতের প্রথম মুঘল সম্রাট বাবরের আদেশে নির্মিত হয় এবং তাঁর নাম অনুসারে নামাঙ্কিত হয়।[৩] উনিশ শতকে কিছু হিন্দু বলেন ওটা রামের জন্মস্থান, ওখানে রামমন্দির ছিল, সেসব ভেঙেই মসজিদটি তৈরি করা হয়েছে। পঞ্চাশের দশকে এ নিয়ে হিন্দু-মুসলমান দ্বন্দ্ব হলে উত্তর প্রদেশ সরকার মসজিদটি তালা বন্ধ করে দেয়। ১৯৮৩ সাল পর্যন্ত এ নিয়ে অস্থিরতার সৃষ্টি হয় নি। ১৯৮৬ সালে ফয়েজাবাদ জেলা জজের এক আদেশে মসজিদের তালা খুলে দেয় উত্তর প্রদেশের সরকার।

আশির দশকেই 'বিশ্বহিন্দু পরিষদ' ও অন্যান্য হিন্দুত্ববাদী সংগঠনগুলো এই রামজন্মভূমির মুক্তির জন্য আন্দোলন শুরু করে, তারা বলে মসজিদ ভেঙে মন্দির বসাতে হবে এবং এই দাবিকে তারা একটি রাজনৈতিক দাবিতে পরিণত করে। 'ভারতীয় জনতা পার্টি' (বিজেপি) হয়ে ওঠে তাদের রাজনৈতিক স্বর। বিজেপি নেতা লালকৃষ্ণ আদভানির নেতৃত্বে অযোধ্যার উদ্দেশ্যে এক হাজার কিলোমিটার পথভ্রমণের 'রাম রথ যাত্রা' অনুষ্ঠিত হয় অক্টোবর, ১৯৯০ সালে। ১৯৯২ সালে একটি রাজনৈতিক সমাবেশের উদ্যোক্তারা, ভারতীয় সুপ্রিম কোর্টের আদেশ অনুযায়ী মসজিদ ক্ষতিগ্রস্ত হবে না এই প্রতিশ্রুতি দিয়ে মসজিদ সংলগ্ন এলাকায় একটি রাজনৈতিক সমাবেশ শুরু করে যা 'বিশ্ব হিন্দু পরিষদ', বিজেপি ও আরএসএস (রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ)-এর প্রায় দেড় লক্ষ কর সেবকের সম্মিলিত একটি দাঙ্গার রূপ নেয় এবং মসজিদটি সম্পূর্ণরূপে ভূমিসাৎ করা হয়। এর প্রতিক্রিয়ায় ওই

Dhaka University Institutional Repository

একই সালে ভারতের প্রধান শহরগুলোতে দাঙ্গা সংঘটিত হয় যা মুম্বাই ও দিল্লি শহরে দুই মানুষের প্রাণ কেড়ে নেয়।

দাঙ্গার প্রতিবেদনে এই পুরো ইতিহাসেরই বিশ্লেষণ ও বিবরণ রয়েছে। বিশেষত বাবরি মসজিদ ভাঙার মুহূর্তে যে ঘটনাগুলো ঘটেছিলো তার একটা বিবরণ *প্রতিবেদনে* এরকম :

> শুক্রবার ১৯৯২ সাতাশ তারিখে উত্তরপ্রদেশ সরকার সুপ্রিম কোর্টের কাছে প্রতিশ্রুতি দিয়ে গেছে, সরকার দায়িত্ব নিচ্ছে আদালতের আদেশ যাতে করসেবকরা অমান্য না করে। অযোধ্যায় ছয়-ই ডিসেম্বর শুধু কীর্তন আর ভজন হবে। এই দ্বিতীয় দফার খেল শুরু হল। বিজেপি তাদের পাল্টা পরিকল্পনা কার্যকর করতে শুরু করে দিল। ... সুপ্রিম কোর্ট বিচারপতি তেজশঙ্করকে অযোধ্যা পাঠালেন, সেখানে আদালতের আদেশ লঙ্ঘিত হচ্ছে কীনা দেখতে। পাঁচ তারিখ শনিবার পর্যন্ত তেজশঙ্কর রিপোর্ট দিয়েছেন, আদালতের কোনো আদেশ লঙ্ঘিত হয়নি। যে সমস্ত করসেবক মসজিদের ওপর আক্রমণ চালানোর ট্রেনিং নিয়েছে, সঙ্গে হাতুড়ি-বাটালি ও লোহাকাটার যন্ত্র নিয়ে এসেছে, তাদের সঙ্গে বিশেষজ্ঞ ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন, এমনকী গ্যাস বার্নার পর্যন্ত তাদের সঙ্গে ছিল– তারা সবাই পাঁচ তারিখ পর্যন্ত গা ঢাকা দিয়ে ছিল। প্রকাশ্যে চলছিল রামকীর্তন ও ভজন। কল্যাণ সিং-এর সরকার না থাকলে মসজিদ আক্রমণ করা প্রায় অসম্ভব। কোর্ট সেই সুযোগ করে দিয়েছে। ... কোর্টের প্রতি আনুগত্য দেখিয়ে নরসিংহ রাও সেই সুযোগ করে দিয়েছেন। (দেবেশ, ২০০৭ : ৬৭)

দেবেশ রায় তাঁর প্রতিবেদন-উপন্যাসের শুরুটা অবশ্য ভিন্নভাবে করেছেন। আকাশের শূন্যতায় যার বিস্তার সেই পাঁচশ বছরের পুরনো গম্বুজের বর্ণনা দিয়ে উপন্যাসের শুরু। এরই সাথে সাথে বাবরি মসজিদ সংক্রান্ত অতীত-বর্তমানের দীর্ঘ ইতিহাসগত ব্যাপার বর্ণনা করে গেছেন ঔপন্যাসিক। মাঝে মাঝেই মসজিদের গম্বুজের প্রসঙ্গ আসে, নিঃসঙ্গ ঐ গম্বুজগুলো শেষপর্যন্ত ধর্ম-অতিক্রান্ত গভীর দৃষ্টির এক আবহ সৃষ্টি করে। ঔপন্যাসিকের বর্ণনা :

> গম্বুজ তো চিরকালই আকাশে মিশে থাকে, নিঃসঙ্গ। আকাশের মতই দশদিক জুড়ে মাটির দিকে নেসে আসা গম্বুজ, তার আয়তনের ক্ষুদ্রতা আর বৃহত্ব নিয়ে আকাশে মিশে থাকে আকাশেরই মত, নিঃসঙ্গ অথচ সর্বব্যাপী। গম্বুজে সর্বব্যাপিতার এক মুদ্রা থাকে।
>
> সেই নিঃসঙ্গ বর্তুল আকাশে নিঃসঙ্গ ভেসে থেকে গম্বুজ শুধু জানান দেয়, এই যে এখানে মানুষের চিহ্ন আছে, মানুষই মাটির ভিতর থেকে আকাশের দিকে গড়ে তুলেছে এই নির্মাণ... (দেবেশ, ২০০৭ : ৬৫)

Dhaka University Institutional Repository

গম্বুজের এই আদিগন্ত বিস্তার পরিণত হয় সজীব সক্রিয় অনুভূতিশীল সত্তায়, এর তলায় রচিত হওয়া সামূহিক ইতিহাস নিয়ে সে তার নির্মাতার ইতিহাস-কালের অংশ হয়ে ওঠে। এ উপন্যাসে দেবেশের ইতিহাস-পাঠের বিশেষত্ব এখান থেকেই শুরু; নিঃসঙ্গ গম্বুজের পটে বিস্তৃত ও বহমান অতীত ইতিহাস-স্মৃতিতে অনুপ্রবিষ্ট বর্তমান আর ভবিষ্যৎ ইঙ্গিতায়িত হয়ে ওঠে :

> ... এই তো গম্বুজ, ভেসে আছে রাতদিন, বছরের পর বছর, যুগের পর যুগ, শতাব্দের পর শতাব্দ, সহস্রাব্দের পর সহস্রাব্দ– এই তো গম্বুজ ভেসে আসে নিঃসঙ্গ, শুধু বহু দূরের এক ঝলক তাকিয়ে এখানে মানুষের সঙ্গের ইতিহাস পাবে বলে, কত শতকের সহস্রকের মানুষের সঙ্গের ইতিহাস, কত পুরনো হয়ে যাওয়া মানুষের সঙ্গ যাদের শরীরের সব কিছু এখন প্রকৃতিতে ফিরে গেছে, এই গাছগাছালি ঘাসজলে সেসব মানুষ ছড়িয়ে আছে তাদের সঙ্গ, কত জন্মান্তর ঘটে গেছে যেসব মানুষের তাদের আত্মার সঙ্গ, মানুষের বিচ্ছেদহীন, বিস্ময়হীন সঙ্গ। (দেবেশ, ২০০৭ : ৬৬)

প্রবহমান অখণ্ড সময়কে ধারণ ক'রে ইতিহাসের সত্য কিংবা তথ্যের সত্যকে উপন্যাসের সত্যে রূপান্তরিত করেন দেবেশ। ইতিহাসের সত্যে সম্পৃক্ত থেকে উপন্যাস এক ভিন্নতর সত্যকে আত্মস্থ করে, সময় এক মহাকাব্যিক মাত্রা পায়। এর মাঝেই প্রতিবেদক-ঔপন্যাসিক ইতিহাসের সেই সংকটতম মুহূর্তটির সংবাদ দেন:

> প্রকৃতি থেকে আলাদা হয়ে গিয়ে মানুষ আবার প্রকৃতিতে ফিরে যেতে চায় প্রকৃতির নামহীন সব নিত্যকর্মে। গম্বুজ জেগে থাকে একই সূর্যের কত উদয়ের আর অস্তের আলোতে শুকিয়ে, কত মেঘের কত বৃষ্টিপাতের জলে ভিজে, কত বাতাসের কত ঝড়ের ধুলো মেখে, কত লতাপাতা গাছগাছালির দৃঢ় টানে। আর এসবেই তো গম্বুজ প্রাকৃতিক হয়ে ওঠে।
>
> ... মানুষ ইতিহাস থেকে মাঝে মাঝে ঘোরা পথে সরে আসে। আবার মানুষ প্রকৃতির কাছ থেকেও এরকম ঘোরা পথে ইতিহাসে ফিরে যেতে চায়। যা একবার প্রকৃতিকে দিয়ে দেওয়া হয়েছে, তা আর প্রকৃতির কাছ থেকে কেড়ে নেয়া যায় না।
>
> ... ওরা ভারতবর্ষের প্রকৃতিকে লুট করতে গিয়েছিল, আর লুঠ হয়ে গিয়েছিল ভারতবর্ষের ইতিহাস ও বর্তমান। পাঁচশ বছরের প্রাচীন আকাশচিহ্ন লুপ্ত হয়ে যায়। পাঁচশ বছরের প্রাচীন দিগন্ত বদলে যায়, পাঁচশ বছরের ইতিহাস বদলে যায়। তিন-তিনটি গম্বুজের বর্তুল, আকাশের সমন্বয় থেকে ভেঙ্গে যায় মাটির সমতলে। (দেবেশ, ২০০৭ : ৬৬)

Dhaka University Institutional Repository

বাবরি মসজিদ ভাঙা ও একে কেন্দ্র করে দাঙ্গার সূচনাটি ঔপন্যাসিক তিন চারটি চরিত্রের দৃষ্টিকোণ থেকে উপস্থাপন করেছেন। মাঝে মাঝেই অবশ্য শোনা যায় লেখকের স্বর। উপন্যাসের শুরু থেকে বেশ খানিকটা ব্যয়িত হয়েছে বাবরি মসজিদ সংক্রান্ত অতীত বর্তমানের ইতিহাসগত ব্যাপারের বর্ণনায়। তারপর শুরু হয় একটি সম্পন্ন মধ্যবিত্ত ফ্ল্যাট কমপ্লেক্সে বসবাসরত মানুষের ভেতরে দাঙ্গার প্রতিক্রিয়ার বার্তা। এই কমপ্লেক্সের বাসিন্দা অরবিন্দুবাবু, যিনি একজন ভয়-ভীত চাকুরে; যার রোজকার অফিস যাবার, স্নানের, বাস ধরার, জল খাবারের

অভ্যাসের বদল হয় না, এমনকি রোজ রবিবার ছুটির দিনে, দুপুরের ঘুম সেরে জল খেয়ে বাইরের বারান্দায় বসার ভঙ্গিতেও পরিবর্তন হয় না। "সেই বারান্দাতেই গিয়ে দাঁড়ান অরবিন্দুবাবু বিরানব্বই সালের ছয়ই ডিসেম্বর রবিবার বিকেলে, দুপুরের ঘুমের শেষে, তাঁর ঘুমের মধ্যে তাঁকে নিয়ে ভারতবর্ষের ইতিহাস পাল্টে গেছে এটা না জেনেই।" (দেবেশ, ২০০৭; ৭৯)। যেখানে অরবিন্দুবাবুর বাড়ি, তাঁর মেহনতে তৈরি করা বাড়ি, ছেলেমেয়ে স্ত্রী নিয়ে যেখানে তাঁর বসবাস, তাঁর সংসার, তাঁর ঠিকানা বলতে যে জায়গাটার কথা তাঁকে লিখতে ও বলতে হয়, সেই জায়গাটার কোনো কিছু নিয়ে গোলমাল হলে তাঁর স্বস্তি নষ্ট হয়, তাঁর জীবনযাত্রার ছন্দ কেটে যায়, তাঁর মনের অভ্যাসে চিড় ধরে। তাই তাঁর বাড়ির সামনের হাউজিং এস্টেটের বিরাট মাঠে যেখানে প্লট ও এস্টেটের ছেলেমেয়েরা খেলে, সেখানে বাইরের ছেলেদের মাঠে প্রবেশ ও খেলা নিয়ে ঘটা গোলমাল, তাদের নিষিদ্ধ করা ও নিষিদ্ধ দলের ছেলেদের দল বেঁধে এসে হাউজিং-এর মধ্যে বোমা ফাটানো পর্যন্ত ঘটনাটা গড়াতে দেওয়া 'প্লট ওনার ও এ্যাসোসিয়েশন মেম্বার' অরবিন্দুবাবুর ভাল লাগেনি, অস্বস্তি হয়েছে ভীষণ, ভয়ও হয়েছে। সেই অরবিন্দুবাবু "যিনি তাঁর মনের বিরোধ ও ভাল লাগা-মন্দলাগাগুলোকে আলাদা করতে পারেন না, কোনো ব্যাপারে অস্বস্তি হলেও সেটাকে আপত্তি করে তুলতে পারেন না"(দেবেশ, ২০০৭ : ৭৯); তিনি মুখোমুখি হন ছয়ই ডিসেম্বরে হঠাৎ বদলে যাওয়া পরিবেশের। পাড়ার ডিশ এন্টেনার সংযোগ আছে কেবল মুকুলবাবুর বাড়িতে, সেখানে টিভিতে অনেকেই তখন 'লাইভ' দেখছে করসেবকদের মসজিদ ভাঙার ব্যাপার। কেউ বা তা রেকর্ড করে নিচ্ছে রেকর্ডারে। দুর্বলচিত্ত, যুক্তিভীত ও নিতান্তই পারিবারিক অরবিন্দুবাবুও অনেকক্ষণ ধরেই অস্বস্তির মধ্যে পড়ে গেছেন–

> বাবরি মসজিদ ভেঙে ফেলাটা ঠিক কাজ হল না– এরকম কোনো অনুভবের ভেতরে, এখানে আসার পর থেকে তিনি শুধু শুনছেন ভাঙার জন্য তারিফ। অরবিন্দুবাবু তাঁর অনুভবকে যুক্তি দিয়ে সাজাতে পারেন না। ... একটা শারীরিক অস্বস্তি হয় মাত্র। আর, বাবরি মসজিদ ভাঙার পক্ষে কত

Dhaka University Institutional Repository

যুক্তি, তাও তিনি জানেন না। তিনি শুধু বোঝেন, এরকমটা হওয়ার কথা ছিল না। (দেবেশ, ২০০৭ : ৮৬)

অরবিন্দুবাবু, ডাক্তারবাবু কিংবা পাড়ার মুকুলবাবুসহ অন্য সকলে শুধু কৌতূহলী, ভারতবর্ষব্যাপী বাবরি মসজিদ বা রামমন্দির সম্পর্কিত সাম্প্রদায়িক রাজনীতিকে এরা অসম্পৃক্তভাবেই দেখতে চান, এরা উচ্চশিক্ষিত হলেও মনে করেন– এ ঘটনায় 'আমাদের তো আর কোনো লস নেই!' (দেবেশ, ২০০৭ : ৮৫)। কথাটা দু-তিনবার উচ্চারণ করেন ডাক্তারবাবু। শুধু তাই নয়, দাঙ্গার ক্রিয়া-বিক্রিয়ার ভুল-ঠিক বিশ্লেষণের প্রশ্নে এই মানুষগুলো তখন 'মাইনর কমিউনিটি'র দোষ খুঁজে বের করে দাঙ্গার পরিস্থিতিকে সমীচীন বলে প্রকাশ করতে থাকেন :

–মশাই, এ তো ঘরজামাইয়ের চাইতেও বেশি আহ্লাদ, ওরা চারটে করে বিয়ে করবে আর যত খুশি বাচ্চা হবে আর আমাদের বেলায় জোড়া পিছু একটা। ...এ তো সিম্পল এরিথমেটিক। ওরাই হবে মেজরিটি আর আমরা হব মাইনরিটি।

–তাতে আর আপনার আপত্তি কী ? মাইনরিটি হলে কত সুবিধে পাবেন। চারটে করে বিয়ে করবেন, রিজার্ভ চাকরি পাবেন, মাইনরিটি কোটায় ছেলেকে স্কুলে ভর্তি করাবেন।

–হ্যাঁ ঐ আনন্দেই থাকুন। ওদের দেশে ওরা মাইনরিটির জন্য আলাদা ব্যবস্থা রাখে না, দেশ থেকে তাড়িয়ে দেয়। দেখছেন না বাংলাদেশের অবস্থা? হিন্দুদের তো তাড়িয়েছেই, এখন গরিব মুসলমানদেরও তাড়াচ্ছে। সব এসে ভিড় করছে বর্ডার জেলাগুলোতে। ... এদের ঘাড় ধরে তাড়াতে হবে। যা, নিজেদের দেশ বানিয়েছিস, সেখানে যা। আমাদের এখানে পড়ে আছিস কেন? গাছেরও খাবি, তলারও কুড়বি! (দেবেশ, ২০০৭ : ৯১)

এই সংলাপ বলা চরিত্রগুলোর কোনো নাম নেই উপন্যাসে, কারণ তখন ডিসেম্বরের ঐ বিকেলে অযোধ্যায় এবং তারপরেই প্রায় পুরো ভারতবর্ষের মানুষ দুটো ভাগে ও সম্প্রদায়ে বিভক্ত হয়ে গেছে। নিমেষে পরিবর্তিত এই পরিস্থিতিতে ক্রিয়াশীল রাষ্ট্র-রাজনীতি-সমাজ ও ধর্ম অভিজ্ঞতার যে বোধ নিবিষ্ট ছিল, ঔপন্যাসিক তা খণ্ড খণ্ড চিত্রে বিবৃত করেন। অরবিন্দুবাবুর দৃষ্টিকোণে দাঙ্গা পরিস্থিতির সূচনা ও দ্রুত সেটা ছড়িয়ে পড়ার পট উন্মোচিত হয়। তিনি টিভির দৃশ্যে দেখেন 'এতগুলো লোক মিলে এতদিনের পুরনো একটা মসজিদ ভেঙে গুঁড়িয়ে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিল, অতগুলো পুলিশ অতক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল, তাহলে এখন এখানে কয়েকটি ছেলে মিলে বাজারের কয়েকটা

Dhaka University Institutional Repository

দোকান ভেঙে দিতে পারে বা নেওয়াজের মাংসের দোকানটা তুলে দিতে পারে, নেওয়াজ মুসলমান; বা মিহিরের গ্যারাজ পুড়িয়ে দিতে পারে, মিহির মুসলমান।' (দেবেশ, ২০০৭ : ৯১)।

মাঠে খেলতে থাকা ছেলেদের মাঝে মুসলিম পরিবারের একটি ছেলেকে হঠাৎ ঘাম-জবজবে আর হন্তদন্ত হয়ে বাড়ি ফিরতে দেখা যায়, ছেলেদের ভিড় থেকে বিস্ময়ের আওয়াজ ওঠে, "আমরা তো একসঙ্গেই খেলছিলাম, সেখানেই তো শুনলাম টিভি হচ্ছে, তারপর সবাই মিলে তো টিভি দেখলাম। ও যে এরকম ভয় পেয়ে যাবে, বুঝিনি!" (দেবেশ, ২০০৭ : ৯২)। একটু পরেই শোনা যায়, "রাজাবাজারের মুসলমানরা ড্যাগার আর রড নিয়ে বেরিয়েছে। রাস্তার পাশে যত হিন্দু মন্দির আছে, ভাঙছে। কেশব সেন স্ট্রিট দিয়ে ঠনঠনের দিকে এগচ্ছে।" (দেবেশ, ২০০৭ : ৯২)। সুতরাং পরিচিত শহরটা বিকেল থেকে খুব দ্রুত অপরিচিত হয়ে উঠল অরবিন্দুবাবুর কাছে; তার ছেলে বুবুল হট্টগোলে তখনও বাড়ি ফেরেনি, আর মেয়ে টুটুল সালোয়ার কামিজ পড়ে বেরিয়েছে, যেন ডিসেম্বরের ঐ বিকেলে অযোধ্যায় বাবরি মসজিদ ধ্বংসের পর সালোয়ার কামিজ পড়ে বেরুনোই এক বিরাট ভুল। কারণ তখন :

> পাঁচশ বছরের আকাশের শূন্যতার দৃশ্য উপগ্রহ ছড়িয়ে দেয় এই ভারতবর্ষের পূর্ব প্রান্ত থেকে পশ্চিম প্রান্তে, উত্তর শিখর থেকে পশ্চিম সৈকত পর্যন্ত। এই একই ছবি বিবিসি বারবার দেখায়। ...আকাশের অদৃশ্য ছবিও একটা আলাদা গতি সঞ্চয় করে। ... অতীত আর ভবিষ্যতকে আঁকড়ে ধরে একই বর্তমান। ... এই ব্যাপকতায় ঐ ধ্বংস কী এক অনিবার্যতা পায়। (দেবেশ, ২০০৭ : ৯৫)

অযোধ্যায় হিন্দু সম্প্রদায় কর্তৃক ছ'টা মুসলমান বস্তি জ্বালিয়ে দেবার খবর পরিবেশন করে টিভি ক্যামেরায় ধারণকৃত ছবির মতই ঔপন্যাসিক এবার চলে যান অযোধ্যা থেকে শিল্পনগরী সুরাটে। "লেখকের ভাষায় এ যেন এক এক 'চলচ্চিত্র কাহিনী' কলকাতার মধ্যবিত্ত এক ধরণের অসম্পৃক্তিতে, সুরাটের হীরে কাটা কর্মীরা আর এক ধরণের অসম্পৃক্তিতে।" (রবিন, ২০১১ : ৯৮)। উপনিবেশোত্তর ভারতে নগরায়ণ, শিল্পায়ন বা পুঁজির প্রভাবে বদলে যাওয়া উৎপাদন-কাঠামো কিংবা আর্থ-সামাজিক শ্রেণিবিন্যাসের একটা সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন রচিত হয় সুরাটের বর্ণনায় :

> ইংরেজদের তৈরী কলকাতা ... ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির তৈরি বন্দর কলকাতা। এখন ডিশ এ্যান্টেনায় আর এক ইংরেজ কর্পোরেশনের ভারতীয় ছবি দেখে কলকাতা। ... সেই নতুন অর্থের

Dhaka University Institutional Repository

> নতুনতর ছবি পশ্চিম সাগরের তীরে মহানগর সুরাটে নেমে আসে তাপী নদীর মোহনায় ডিশ এ্যান্টেনায় ভর দিয়ে।
>
> দক্ষিণ এশিয়ায় প্রবেশ পথে ইংরেজ ও ডাচ্ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি সুরাট বন্দরে প্রথম নেমেছিল। ... গত পঁচিশ বছরে সুরাট পশ্চিম ভারতের প্রধান শিল্পকেন্দ্র হয়ে উঠেছে। ...তার জনসংখ্যা বিশ বছরে বেড়েছে আড়াই গুণ, তার জমির দাম বেড়েছে একশগুণ ... তার রাস্তাঘাটে মানুষ চলতে পারে না। ...এমন দূষিত জল সারা ভারতে কোনো শহরে নেই, কোথাও কোনো গাছপালার চিহ্ন নেই, কোনো আগুনে যেন সমস্ত পুড়ে ছাই হয়ে গেছে, সারা বছর ধরে আমাশা, আন্ত্রিক আর ম্যালেরিয়ার মহামারী। ...সুরাট সারা দেশের সবচেয়ে নোংরা শহর। (দেবেশ, ২০০৭ : ৯৬-৯৭)

শিল্পনগরী সুরাটের উৎপাদন ব্যবস্থার বর্ণনা :

> শহর থেকে বিশ কিলোমিটার দূরে, সমুদ্রের পারে, বিরাট পেট্রকেমিক্যাল কমপ্লেক্স তৈরি হয়েছে। বম্বে হাইয়ে যে খনিজ গ্যাসের সন্ধান পাওয়া গেছে আরব সাগরে সেখানে আধুনিক শিল্প তৈরি হচ্ছে। দেশী টাকা খাটছে, বিদেশী টাকা খাটছে, নতুন থেকে নতুনতর টেকনোলজি এসেছে, আসছে। আধুনিকতম ম্যানেজমেন্টে সেখানে উৎপাদন চলছে। (দেবেশ, ২০০৭ : ৯৮)

সুরাটের সর্বত্র 'পাওয়ার লুম' আর 'আর্ট সিল্কে'র কারখানা। সেখানে হাঁটলে বাতাসের নোংরায় চোখ জ্বালা করবে আর অজস্র কারখানার আওয়াজে কানে তালা ধরবে। কারখানায় দুই শিফটে দশ-পঁচিশ-চল্লিশ বা পঞ্চাশজন শ্রমিক কাজ করে। সৌরাষ্ট্র, উত্তর প্রদেশ, ওড়িশা, মহারাষ্ট্র, অন্ধ্রপ্রদেশ থেকে পাওয়ার লুম, আর্ট সিল্ক আর হিরেকাটা কারখানায় শ্রমিকেরা আসে। পনের থেকে পঁচিশ বয়সী এই শ্রমিকগুলো কাজ করে দিনে, রাতে মদ খায় ও নীলছবি দেখে। তারা নিয়মিত ব্লু ফিল্ম দেখে মালিকের সাথে বসে, মালিকেরই সৌজন্যে, ঔপন্যাসিকের ভাষায়, "ইনফরম্যাল সেক্টরে উৎপাদন ব্যবস্থা এক ধরণের নিম্নমানের গণতন্ত্রের জন্ম দেয়, যাতে মনে হয় মালিক-মজুর সমান।" (দেবেশ, ২০০৭ : ৯৮)।

ওদের যদিও শোয়ার জায়গা নেই, খাওয়ার জায়গা নেই, বসার জায়গা নেই, বাড়িঘর নেই, বাড়ির লোক নেই, খাবার জল নেই, চাকরির কোনো স্থায়িত্ব নেই, কবে স্ত্রী বা বাচ্চাকাচ্চার কাছে ঘরে ফিরতে পারবে তার কোনো হদিশ নেই, কাশ্লে শরীরের ভেতর থেকে কালো কালো ঝুল বেরিয়ে আসে শ্লেষ্মার সঙ্গে, আমাশা আর ম্যালেরিয়া ধরলে হয় মরতে হবে, না হয় দেশের ট্রেনে উঠে পড়তে হবে, "কিন্তু টিভি আছে, ব্লু ফিল্ম আছে, চব্বিশ ঘন্টা পাওয়ারলুমের ঐ তীক্ষ্ণ আওয়াজের মধ্যে

Dhaka University Institutional Repository

শরীর-ভোলা শরীরের ঘুম আছে। আর আছে রাত জুড়ে হাজিরার আগুন।" (দেবেশ, ২০০৭ : ৯৮)। এই হাজিরাতেও ছয় ডিসেম্বর বিকেল থেকে অযোধ্যার ছবি নেমে এসেছিল, সেদিনও এই শ্রমিকেরা নীলছবি দেখেছিল, 'অকারণ ধর্ষণ আর অকারণ হত্যার' এক ফিল্ম। বাবরি মসজিদের অকারণ ক্ষয়ক্ষতি প্রতীকায়িত হয় নীলছবির দৃশ্যে। এভাবে কখন যে 'সুরাটের সন্ধ্যা আর অযোধ্যার সন্ধ্যা মিশে যায়', বোঝা যায় না। হিরে কাটার কর্মী প্রতাপ ফিল্ম দেখতে দেখতে উত্তেজিত হয়ে ওঠে– 'ফিল্ম যাতে রেপ ভি হ্যায়, মার্ডার ভি হ্যায়, আগ ভি হ্যায়।' ছবি দেখতে দেখতেই সে শুনতে পায় দুই-তিনজন পাওয়ার লুমের মালিক বলাবলি করছে, 'রায়ট লাগ যায়গা, রায়ট লাগ গিয়া মহল্লামে, শেড বন্ধ করোঁ।' (দেবেশ, ২০০৭ : ১১১)। একটা ট্রাকের ওপর মাইক লাগিয়ে তখন বক্তৃতা দেয়া হচ্ছিল :

> কাল অযোধ্যায় বাবরি মসজিদ ধ্বংস হয়েছে। আমরা সেই পুণ্যকাজে হাত লাগাতে পারিনি। সারা দেশ এই মুসলমানদের পাপে ভরে গেছে। ... এই মুসলমানেরা রক্তবীজের ঝাড়। তারা একদিন আমাদের এই পুরো দেশটাকে পাকিস্তান বানিয়ে ছাড়বে। ... একটা দিনের মধ্যে বজরঙ্গবলীর দয়ায় করসেবকরা অযোধ্যায় এত কাণ্ড করল, সুরাটে আমরা কি চুপচাপ থাকব, মুসলমানদের ওপর আমাদের বদলা নেব না ? আপনার পাড়ায় বা আপনার রাস্তায় যদি কোনো মুসলমানের দোকান থাকে তবে সেই দোকান লুঠ করুন, সেই দোকানে আগুন লাগিয়ে দিন, দোকানদারকে খুন করুন। যদি কোনো মুসলমান বাড়ি থাকে, সেই বাড়ির সবাইকে রাস্তায় বের করে দিন, তাদের জখম করুন। তাদের খুন করুন। যতক্ষণ আপনারা জোট বেঁধে থাকবেন, দল বাড়াবেন, ততক্ষণ সরকারের পুলিশ আপনাদের চুলও ছুঁতে পারবে না। ... এখানে, ভারতে হিন্দু-মুসলমানের একসঙ্গে থাকা চলবে না, একসঙ্গে মন্দির আর মসজিদ চলবে না। অযোধ্যার অত বড় মসজিদ ভাঙতে যদি পাঁচ ঘণ্টা লাগে, তাহলে সুরাটের মুসলমানদের মারতে আমাদের আর কতক্ষণ লাগবে? (দেবেশ, ২০০৭ : ১১১-১১২)

মাইকিং-এর সত্যতা অনুভূত হয় কিছুক্ষণের মধ্যেই। মুসলমানের তালিকা তৈরি হয় দ্রুত, বাড়িতে বাড়িতে ধরে যায় আগুন; ধর্ষণ, জখম, খুন, লুঠপাট চলতে থাকে অনায়াসে, সবই ঘটে 'জয় শ্রীরাম' শ্লোগানে। এ দাঙ্গায় অংশ নেয় কিছু বুঝতে না পারা কারখানা শ্রমিক প্রতাপও। "প্রতাপ বুঝে উঠতে পারে না, এই দঙ্গলের ভিতর তার অধিকার কতদূর পর্যন্ত। বাড়িতে আগুন লাগানো, দরজা ভাঙা, লুঠ, মাথায় ডাণ্ডা মারার পরও কি তার অধিকার ধর্ষণ পর্যন্ত বিস্তৃত ? এত তাড়াতাড়ি, মাত্র একটি রাত্রির মধ্যে প্রতাপের হাতের আওতায় একটি আস্ত নারী শরীর এসে যাচ্ছে? ... এতটাই বদলে গেল

Dhaka University Institutional Repository

সবকিছু রাতারাতি ?" (দেবেশ, ২০০৭ : ১১৩)। শ্রমিকশ্রেণির দলভুক্ত প্রতাপ, যারা গোগ্রাসে বিরাট বিরাট গ্রাসে ভাত খায়, সামান্য বরবটি, লঙ্কা, পিঁয়াজ কামড়সহ, তারা মুলুকচাঁদের দোতলা কোঠিতে নীলছবি দেখে বা ঘরে ফিরে লিঙ্গমর্দনে শরীরী তৃষ্ণা মেটায়, সেই প্রতাপ বা তাদের অনেকেই পাড়ার মুসলমান ঘরে গিয়ে ধর্ষণ করে নির্বিকারে।

এ আক্রমণে কোথাও কোনো প্রতিরোধ ছিল না, প্রশাসন ছিল কার্যত অক্রিয়, 'কোথাও রাষ্ট্র বলে কোনো ধারণা ছিল না।' "মানুষ মরে পড়ে থাকে রাস্তার ধারে, নালানর্দমায়, বাড়ির ভিতরে-বাইরে, প্রাচীরের আড়ালে, প্রকাশ্য রাস্তায়, বাড়ির সিঁড়ির ওপরে, ব্যালকনিতে, জানালার গরাদে, খাটের ওপরে, মেঝের ওপরে, চৌকাঠে, ছাদের আলশেয়, খানাখন্দে।... মানুষ বাঁচার জায়গার চাইতে তার মরার জায়গা বেশি।" (দেবেশ, ২০০৭ : ১১৬)

ধর্ষণ, আগুন ইত্যাদি বর্ণনা শেষে দেবেশ রায় সরাসরি প্রতিবেদনের ভাষায় চলে যান- "দাঙ্গার শেষে সরকার থেকে বলা হয়েছিল, সুরাটে নিহতের সংখ্যা একশ পঁচাশি। সারা গুজরাটে দাঙ্গায় যত লোক নিহত হয়েছে, তার অর্ধেকের বেশি নিহত হয়েছে সুরাটে।' (দেবেশ, ২০০৭ : ১১৬)। এই খতিয়ানের সঙ্গে কার্যকারণ সূত্রে ফিরে আসে গম্বুজ প্রসঙ্গ। গম্বুজের দীর্ঘ বর্ণনা অতি বিস্তৃত ইতিহাসস্পর্শী হয়ে ওঠে। শতাব্দের পর শতাব্দ ধরে দাঁড়িয়ে থাকা মসজিদ আর এর গম্বুজ ঔপন্যাসিকের চোখে আর 'নির্মাণ' থাকে না, হয়ে ওঠে উদ্‌ঘাটন। যে শিল্পী-মানব মাটির অভ্যন্তরের রূপ দেখে পাঁচশ বছর পূর্বে কল্পচোখে আবিষ্কার করেছিল মাটির ওপর জেগে ওঠা মসজিদের শোভা, দেবেশ রায় এ পর্বে সেই মানবের বন্দনা করেন। বছরের পর বছর ধরে তৈরি এই সমাবেশের পরিবেশের সাথেই প্রোথিত পাঁচশ বছরের মানবেতিহাস বা ঐতিহ্য এক অখণ্ড সময়-রূপকে পরিণত হয়।

বাবরি মসজিদ ধ্বংস করতে করতেই সেই ধ্বংস বদলে যায় মুসলমানদের ধ্বংস করার কর্মসূচিতে। "পাঁচশ বছরের প্রাচীন মসজিদকে যদি ধ্বংস করে মাটিতে মিশিয়ে দেয়া যায় তা হলে পাঁচশ বছরের ইতিহাসকেও ভারতবর্ষের মানুষের মধ্যে থেকে মুছে ফেলা যায়। ইতিহাসের সংশোধন একবার শুরু হলে, তার আর শেষ নেই।" (দেবেশ, ২০০৭ : ১২৬)। এরই প্রতিক্রিয়ায় ছড়িয়ে-পড়া দাঙ্গার রূপ বর্ণিত হয় বোম্বাই শহরকে ঘিরে। প্রথমেই আসে বোম্বায়ের নগর বিন্যাসের কথা। কিংবা কাউন্সিলারদের মধ্যে কংগ্রেস ও শিবসেনার অনুপাতের তথ্য, দাঙ্গার কারণ সম্পর্কে নানা মত,

Dhaka University Institutional Repository

বোম্বাই-এর আন্ডারওয়ার্ল্ড-এর কথা উঠে আসে দেবেশের বর্ণনায়। ঔপন্যাসিক জানিয়ে দেন কী করে দাঙ্গার সময়ে হিন্দু-মুসলমান ভেদরেখাটা একটা জায়গায় অস্পষ্ট হয়ে যায়। "বোম্বাইয়ের আন্ডার ওয়ার্ল্ড থেকে, বোম্বাইয়ের পেটের ভিতর থেকে ধর্মনিরপেক্ষ গুণ্ডারা দলে দলে বেরিয়ে ছড়িয়ে পড়েছিল। তাদের অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা সাধারণ দাঙ্গাবাজদের চাইতে অনেক বেশি। তারা হিন্দু এলাকায় মুসলমান সেজে দাঙ্গা বাধিয়ে লুট করেছে। তারা মুসলমান এলাকায় হিন্দু সেজে লুট করেছে।" (দেবেশ, ২০০৭ : ১২৯)। ... বোম্বাইয়ের আন্ডার ওয়ার্ল্ড এই ধরনের দাঙ্গার সময় সত্যিই ধর্মনিরপেক্ষ হয়ে ওঠে। তারা দাঙ্গায় কেবল লাভের মুনাফা চায়। তারা হয়ত কোনো প্রোমোটারের সুবিধার জন্য একটা ছোট বস্তি জ্বালিয়ে দেয়। সে বস্তিতে হিন্দু ও মুসলমান বাড়ি একসাথে পোড়ে। আর বোম্বায়ের আন্ডার ওয়ার্ল্ড-এর সঙ্গে বোম্বাইয়ের পুলিশ বা প্রশাসনের কোনো গভীর পরিচয় নেই। আন্ডারওয়ার্ল্ড শহরের ওপরে উঠে এলে পুলিশ বা প্রশাসনের কাছে শহর হয়ে ওঠে অপরিচিত। আগ্নেয়াস্ত্রের মুহুর্মুহু বিস্ফোরণে পুলিশ আর প্রশাসনের কাছে তখন বিষয়টি আত্মরক্ষা হয়ে ওঠে আর প্রতিটি পুলিশ তখন হয়ে যায় 'উর্দিপরা নাগরিক'। কারণ "তখন তার একটা ধর্ম আছে, আর একটা সমর্থন আছে, তার একটা শত্রু আছে। বোম্বাইয়ের দাঙ্গায় তো এ কথা রটেছে যে পুলিশ শিবসেনাদের পুলিশের ইউনিফর্ম ভাড়া দিয়েছে।" (দেবেশ, ২০০৭ : ১৩০)। আবার এসবের মধ্যেই যারা হিন্দু নাগরিক তারা মুসলমানকে আক্রমণ করে, যারা মুসলমান তারা হিন্দুদের আক্রমণ করে। বোম্বাই-এর বিভিন্ন অনুল্লেখ্য মহল্লার যেমন– বাইগাঁওয়াদি, ছিক্কলওয়াদি, চিনচোলি, যোগেশ্বরী, প্রতীক্ষানগর, ডোংরির দাঙ্গার ভয়াবহতার চিত্র তুলে ধরেন ঔপন্যাসিক। মসজিদ, বাড়িঘর, দোকানপাটে আগুন, লুটপাট ও মুসলমানদের এলোপাথারি গুলি করে মারা, মারধর করে গুরুতর জখম করা ইত্যাদি চলতে থাকে নির্বিবাদে। বোম্বাই-য়ের দাঙ্গায় পুলিশের দায়-ই বেশি ছিল, তাদের সাথে আঁতাতে ছিল শিবসেনা। "দু-তিনদিন পর দেখা যায় হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গার চাইতেও এ দাঙ্গা পুলিশ-মুসলমান দাঙ্গা আর পুলিশের গুলিতে মৃত্যুর সংখ্যা ক্রমেই বাড়তে থাকে।" (দেবেশ, ২০০৭ : ১৩৩)। আবার দাঙ্গা জিইয়ে রাখতে সূক্ষ্ম রাজনৈতিকতা ও কেন্দ্রীয় রাজনীতির অন্তরালের রূপ ঔপন্যাসিকের বর্ণনায় হয়ে ওঠে তথ্যবহুল ও শ্লেষযুক্ত। ছয়ই ডিসেম্বর বাবরি মসজিদ ভেঙে ফেলার পর বোম্বাইতে দেড় মাসব্যাপী দাঙ্গা সংঘটিত হয়। দাঙ্গার পূর্বে দাঙ্গার ঘটক অনুঘটকদের কথা দিন তারিখসহ সবিস্তারে রয়েছে এই প্রতিবেদন-উপন্যাসে। পাঁচশো বছরের পুরনো বাবরি মসজিদ ভাঙা, মন্দির নির্মাণ, কংগ্রেস সরকার বিজেপি আর হিন্দুত্ববাদী দলগুলোর ভূমিকার সঙ্গে সুপ্রিম কোর্টের রায়

Dhaka University Institutional Repository

ও তার ফাঁকফোকর, পুলিশের নিষ্ক্রিয়তা মিলে ভারতবর্ষের খেটে খাওয়া দিনমজুর বস্তিবাসী, সাধারণ চাকুরে, নারী-শিশু, কেরানী, শিক্ষক-ছাত্র, ছোট দোকানদার, ঠিকাদার, দালাল, ছোটখাট অবৈধ কারবারি মানুষগুলোর জীবন ভয়াবহ বিপন্ন করে তুলেছিল। এই দাঙ্গার আগুনে মুসলমান, তার শরীর ও ভারতবর্ষের ধর্মনিরপেক্ষতার বিশ্বাসই পোড়েনি, পুড়েছে একই শ্রেণীর হিন্দুরাও। দুর্ভাগ্যজনক যে, ভারতীয় রাজনীতির ক্ষেত্রে ধর্মই হয়ে উঠেছে প্রধান বিষয়। এর চেয়ে বেশি কোনো বিপর্যয় আর হতে পারে না বিচিত্র ধর্ম এবং বিচিত্র জাতির সমাজে। ভারতীয় জাতীয়তাবাদ ও 'সেক্যুলার' রাষ্ট্রের মৃত্যু প্রসঙ্গে দেবেশ লেখেন :

> জাতি হিসেবে ভারতবাসীরা অন্ধভাবে গড়াতে গড়াতে খাদের কিনারে এসে পৌঁছেছে, আর কোনো প্রত্যাবর্তন নেই। ... অযোধ্যায় প্রমাণ হয়ে গেল, জাতি হিসেবে আমরা যে-সংজ্ঞায় স্বাধীনতার পর থেকে ধীরে ধীরে বিশ্বাস করে এসেছি, যে-পরিচয় ধীরে ধীরে আমাদের দৈনিক অস্তিত্বে সত্য হয়ে উঠেছে, যে-পরিচয় আমাদের অন্য নানা দেশ থেকে আলাদা করে রেখেছে এতদিন ও আমরা সেই পার্থক্যটাকে এতদিন ধরে লালন করে এসেছি, সেই সংজ্ঞা ও পরিচয় মিথ্যা। ... ধর্মনিরপেক্ষতা শব্দটি আমরা গত প্রায় পঞ্চাশ বছর ধরে কতবার ব্যবহার করেছি। অযোধ্যায় আমরা বুঝলাম– এটা কোনো শব্দমাত্র নয়, আমাদের জাতির মূল পেশি ও স্নায়ুকেন্দ্র। যদি সেই কেন্দ্রে ঘা পড়ে তাহলে শরীরের সমস্ত আচরণেই বিকৃতি দেখা দেয়। (দেবেশ, ২০০৭ : ৭১)

দেবেশ এও বলে দেন যে বিজেপি এই ধর্মনিরপেক্ষতার পেশি ও স্নায়ুকেন্দ্রের অংশ নয়। সেই দল তাই বাইরে থেকে এই জায়গাটিতেই চরম আঘাত দিতে পারল; সে আঘাত ঠেকানোর ক্ষমতা কংগ্রেসের ছিল না। অথচ বিজেপির প্রকৃত প্রস্তুতি ও আদ্‌ভানির প্রকাশ্য ঘোষণার ভিত্তিতে উত্তর প্রদেশের সরকারকে বরখাস্ত ক'রে ভারতীয় সেনাবাহিনীর মাধ্যমে ৬ই ডিসেম্বরের আগে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করা বহুবার সম্ভব ছিল। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা ঘটেনি, ঔপন্যাসিক এ পর্যায়ে খুবই তাৎপর্যপূর্ণ প্রশ্ন তোলেন– "একজন মুসলমান কোন্ বৈশিষ্ট্যে একজন হিন্দুর চাইতে কম ভারতীয় ? (দেবেশ, ২০০৭ : ১২৬)। এ প্রশ্নের জবাব দেয় আগুন, জবাব দেয় লোহার ডাণ্ডা, জবাব দেয় দা বা কুড়ুল, জবাব দেয় শাবল, লম্বা ছোরা, বাঁকা তরবারি। বাস্তব আঘাতেরও আগে তত্ত্বের ভাষায়, মুখের কথায় বাবরি মসজিদের উপর আঘাত হানা হয়েছে, সাম্প্রদায়িকতাভিত্তিক এইসব তত্ত্ব রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ আসন বিধান বা লোকসভায় উচ্চারিত হয়েছে শাণিত, ভারী ও আক্রমণাত্মক যুক্তিতে। রাজনৈতিক দলগুলো

Dhaka University Institutional Repository

নিজ নিজ স্বার্থান্বেষী উদ্দেশ্যে কী করে ভারতবর্ষে মানুষকে সাম্প্রদায়িক করে তুলেছিল তার একটা নিখুঁত বিশ্লেষণ করেন ঔপন্যাসিক:

> বাবরি মসজিদ ধ্বংসের আগেই বাবরি মসজিদ ধ্বংসের পক্ষে এই তত্ত্ব ভারতীয় রাজনীতিতে উচ্চারিত হয়েছে। ...সংসদের ভিতরে ও বাইরে, রাজপথে জনসভায়, রামশিলা সংগ্রহের উত্তর ভারতব্যাপী অভিযানে, রথযাত্রার রাজনৈতিক কর্মসূচিতে। ভারতীয় সংবিধানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহও এই তত্ত্বের ভাষার মধ্যে মিশিয়ে দেয়া হয়েছিল, 'ভারতীয় সংবিধান সংখ্যাগরিষ্ঠের প্রতি সহানুভূতিপ্রবণ নয়', 'মানুষের ধর্মবিশ্বাসের ব্যাপারে আইন-আদালতের কোনো জায়গা নেই।' মুখের কথায়, তত্ত্বের ভাষায় এই ধ্বংস চালানো হচ্ছে, এই ধ্বংসের ভাষা উচ্চারণ করেই একটার পর একটা ভোটে দাঁড়ানোর অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ...এক-একটা ভোটে বিজেপি-র আসনসংখ্যা বৃদ্ধিকে এই ধ্বংসের পক্ষে ভোট বলে গণনা করা হয়েছে, সংসদে আসনসংখ্যা বৃদ্ধির সুবাদে ভারতীয় জনতার প্রতিনিধিত্ব করার অধিকার স্বীকার করে নেয়া হয়েছে, আর এত কিছুর পর ১৯৯২-এর ছয়ই ডিসেম্বর অযোধ্যায় যদি হাজারে-হাজারে করসেবক সমবেত হয়, তাহলে তারা শুধু রামনাম গান করে নিজের নিজের বাড়িতে ফিরে যেতে পারে ? সেই পুরো সমাবেশটা তৈরি হয়েছে ঘৃণার ওপরে, সেই পুরো সমাবেশটা তৈরি হয়েছে ধ্বংসের উদ্দেশ্যে। (দেবেশ, ২০০৭ : ১২৭)

> কংগ্রেসই হোক আর জনতা দলের মত অন্যান্য সব মধ্যপন্থী পার্টিই হোক, তারা এই ভয়েই সিঁটিয়ে আছে যে বেশি বিজেপি-বিরোধিতা করে হিন্দু ভোট না হারাতে হয়, যেমন ১৯৮৯-এ কংগ্রেস হারিয়েছিল। ... একমাত্র বামপন্থীরা, কমিউনিস্টরা, বিজেপির বিরুদ্ধে তাদের অবস্থান ঘোষণা করেছে। ... সে বিরোধিতায় তাদের স্বার্থহানি হবে না বলেই হয়তো। ... গত পাঁচ-ছ বছর ধরে সব পক্ষের কাছ থেকে সমস্ত সুযোগ বিজেপি পেয়েছে। (দেবেশ, ২০০৭ : ৭১)

এদিকে সাম্প্রদায়িকতার মনোভাবপুষ্ট শিবসেনার কাছে 'দাঙ্গা যেন জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের মর্যাদা পায় আর বাল থ্যাকারে হয়ে ওঠেন সেই মুক্তি সংগ্রামের নেতা।' (দেবেশ, ২০০৭ : ১৪৫)। প্রতিবেদনে উদ্দেশ্যবাদী ও সুবিধাভোগী রাজনৈতিক ক্ষমতার উচ্চাকাঙ্ক্ষা প্রতীকায়িত হয় এক তীক্ষ্ণ প্রশ্নে :

> আকাশ, আকাশ, সবাই কি আকাশেরই দখল চায়, আকাশই কি প্রকৃত রণক্ষেত্র ? (দেবেশ, ২০০৭ : ১০৪)

Dhaka University Institutional Repository

তাই শিবসেনার যুদ্ধ ঘোষণার সামনে সরকার পিছু হটে যায়, দাঙ্গা ঠেকানোর বিপরীতে সরকার বরং শিবসেনার দাঙ্গাকে 'প্রায় বৈধ দাঙ্গার মর্যাদা দিয়ে ফেলছিল কথায় ও কাজে।' (দেবেশ, ২০০৭ : ১৪৫)। আর শিবসেনার এই 'মুক্তি সংগ্রাম'-এর ভেতর ভারতের প্রধানমন্ত্রী মকর সংক্রান্তির জন্য এসে উঠতে পারেন না। কিংবা শেষ পর্যন্ত এলেও পুলিশের আপত্তিতে নিরাপত্তার কারণে ত্রাণ শিবিরে বা দাঙ্গাবিধ্বস্ত এলাকায় নামতেই পারলেন না। দেবেশ রায় লিখেছেন :

> ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরসিংহ রাওয়ের রাজত্বকালে ইতিহাসে এই কথাটি চিরস্মরণীয় হয়ে থাকল যে তিনি মকর সংক্রান্তির জন্যে বোম্বাইয়ের দাঙ্গা দেখতে যেতে পারেন নি। ইতিহাস এই নির্মমতা দিয়েই রচিত হয়। ...স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী যেখানে নিরাপত্তার অভাবে নামতে পারেন না, সেখানে হাজার-হাজার লক্ষ-লক্ষ মুসলমান কীভাবে বসবাস করছে, এ প্রশ্ন সেদিন কেউ করেনি । ... এই প্রশ্নহীনতার ফাঁক দিয়েই ইতিহাসে নির্বোধেরা প্রবেশ করে। তারা জানে না, তারা যে-মঞ্চের ওপর দাঁড়িয়ে আছে, সেটা ইতিহাসের মঞ্চ। তারা জানে না, তারা যে কথাগুলি উচ্চারণ করছে সেই কথাগুলি দিয়েই তৈরি হচ্ছে সমকালীন ইতিহাস। (দেবেশ, ২০০৭ : ১৪৭)

সুতরাং পুলিশ-প্রতিরক্ষা আর ব্যবস্থাপনার সঙ্গেই খোদ রাষ্ট্রনায়ক প্রধানমন্ত্রীর ভূমিকা তাঁর নিষ্ক্রিয়তা নয় বরং প্রমাণ করে এ যেন তার নিভৃত ইচ্ছাপূরণ, যা 'আইনি ও রাজনীতির আড়ালে, সংবিধান গণতন্ত্র, ধর্ম নিরপেক্ষতা ইত্যাদি বুলির আড়ালে ঢেকে রাখতে চায়।' (সাদ, ২০১০ : ৫৭)। ... আর এই পুরো প্রহসনের উপসংহার হয়ে ওঠে রাওয়ের ৬ই ডিসেম্বর রাতে জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণে আহত সারল্যের উচ্চারণ, 'আমাকে ঠকানো হয়েছে।' (দেবেশ, ২০০৭ : ৭০)

দেবেশ রায় এভাবেই রাজনীতি-সম্পৃক্ত সাম্প্রদায়িকতার সূত্রকে ব্যাখ্যা ও ব্যঙ্গ করেন তীব্র শ্লেষে। যে সাম্প্রদায়িকতাকে জাতীয়তাবাদ রূপে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল বঙ্গভঙ্গ সময় থেকে ৪৭-এর দেশবিভাগ পর্যন্ত, ইতিহাস বেয়ে তারই জের এবং প্রতিফল দেখা দিয়েছে ৯২-এ অযোধ্যা কাণ্ডে। ঔপন্যাসিক ইতিহাসের সেই নির্মমতা ইঙ্গিত করেছেন। এছাড়া সাম্প্রদায়িকতার ধারণা যে রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক সূত্র ধরেই বিকশিত সে কথাটাও নানা বর্ণনায় স্পষ্ট করেন তিনি। সে কারণে অযোধ্যা-কাণ্ডের প্রতিক্রিয়ায় পুঁজির উপনিবেশায়ন আক্রান্ত দুই নগরী সুরাট এবং বোম্বের দাঙ্গা-চিত্র বিশ্লেষণ করেন তিনি; এই বিশ্লেষণের কার্য-কারণসূত্রে প্রস্ফূটিত হয় যন্ত্রশিল্পে উন্নত দুই নগরীর শিল্পায়নের প্রতিবেদন। পুঁজিবাদের অভ্যন্তরে সক্রিয় শ্রেণি বিভেদ কী করে শোষক-শ্রেণির পরিকল্পনার শিকার হয়ে পড়ে, কী করে সাম্প্রদায়িকতার মত বিভ্রান্তিমূলক, নিষ্ফল ও সমাজ প্রগতি-বিরোধী অপকাণ্ডের

Dhaka University Institutional Repository

ফাঁদে পড়ে মধ্য বা নিম্ন শ্রেণির সাধারণ মানুষ, ঔপন্যাসিক পুঁজিবাদী বিশ্বের সেই কারসাজিও তুলে ধরেন। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাভোগী দলগুলোর সঙ্গেই রয়েছে কর্পোরেশন, কর্পোরেশনের মালিকও তারাই বেশি। সংবাদপত্র বা ইলেকট্রনিক মিডিয়াও মূলত কর্পোরেশন ও রাষ্ট্রীয় মালিকানায় সবচেয়ে সফল প্রতিষ্ঠান। তাই দাঙ্গায় মিডিয়া হয়ে ওঠে রাষ্ট্রের সহযোগী সংস্থা। দাঙ্গা যখন বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে পড়েছে "তখনো বোম্বাই থেকে প্রকাশিত বড়-বড় খবরের কাগজে 'শিবসেনা'কে দায়ী করা হয়নি। অথচ শিবসেনা শুরু থেকে ঘোষণা করে দাঙ্গায় নেমে পড়েছে।" (দেবেশ, ২০০৭ : ১৪৪)। কিংবা :

> দিনের পর দিন শিবসেনার মুখপত্রে ভারতীয় মুসলমান নাগরিকদের 'জাতিবিরোধী' বলা হয়েছে, তাদের বিরুদ্ধে দাঙ্গাকে যুদ্ধজয়ের ভাষায় বর্ণনা করা হয়েছে, তাদের নেতাদের অপদস্থ করা হয়েছে, তাদের শাসানো হয়েছে ও তারপর ঘোষণা করা হয়েছে যে শিবসেনারা এখন দাঙ্গা থেকে নিবৃত্ত হবে না ও তারা দাঙ্গা চালিয়েই যাবে, তবু পুলিশ বা প্রশাসনের পক্ষ থেকে এই কাগজের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেয়ার কথা ভাবা পর্যন্ত হয় নি, পুলিশ বা প্রশাসন দাঙ্গার উশকানি দেয়ার জন্যে এই কাগজকে নিষিদ্ধ করে নি, এই কাগজের সম্পাদক বাল থ্যাকারেকে গ্রেপ্তার করে নি, এই দল শিবসেনাকে বেআইনি ঘোষণা করে নি। (দেবেশ, ২০০৭ : ১৪৫)

ইতিহাসের এক সম্রাট বাবর মন্দির ভেঙে বা রামের জন্মস্থানের পবিত্রভূমিতে মসজিদ গড়ে তুলেছিল, "এই রাজনৈতিক খবরটি রাষ্ট্র মিডিয়ার কাঁধে সওয়ার হয়ে রাষ্ট্র করে বেড়ায়।" (সাদ, ২০১০ : ৫৭)। ঘটনার বহুদিন আগে থেকে করসেবকদের যাত্রা, তাদের ধর্মীয় গীত-বন্দনা, রাম মহিমা রাজনৈতিক টানাপোড়েনের সঙ্গে সঙ্গে মিডিয়া যেভাবে প্রচার করে আসছিল, তাতে ধর্মপ্রাণ মানুষের অনুভূতি এই সেবকদের প্রতি প্রচ্ছন্নে হলেও অনুকূল হয়ে ওঠে ও এ ব্যাপারে আগ্রহী করে তোলে। আবার সাধারণ ভারতবাসীর বেশির ভাগ বাবরি মসজিদ সম্পর্কে এই প্রথম জানলো, এই ইতিহাসের খোঁজ পেল, এমনকি মুসলমানদের জীবনেও বাবরি মসজিদ প্রথমবারের মত এত অস্তিত্ববান হয়ে উঠল; তাও মিডিয়ার কারণে।

রাষ্ট্র, প্রশাসন, আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী প্রভৃতি সংস্থার ভূমিকা বিষয়ে ঔপন্যাসিকের নির্মোহ পর্যবেক্ষণ ও আর্থ সামাজিক, রাজনৈতিক ব্যাখ্যা সম্বন্ধে নির্ভুল জ্ঞানের উপস্থাপনায় তাঁর উপন্যাসগুলো অনন্য হয়ে ওঠে। "ইতিহাস, রাজনীতি, সকল পক্ষ ও তাদের শ্রেণিচরিত্র তিনি চিনিয়ে দেন নতুন আখ্যানভঙ্গির ভিতর।" (সাদ কামালী, ২০১৫ : ৫৮)। এই শ্রেণিচরিত্রের বিবরণেই আসে দাঙ্গায় কোনো প্রকারের দায় নেই যার, সেই সায়রা বেগম আর তার ছেলের কথা। জনবহুল বোম্বের

Dhaka University Institutional Repository

বস্তিবাসী ছিন্নমূল সায়রা বেগম, যার এগার মাসের ডায়রিয়া-আক্রান্ত মৃত বাচ্চার ঠাণ্ডা শরীর বুকে লেপ্‌টে ঝুপড়িতে সে পুরো এক রাত কাটিয়ে দেয়। দাঙ্গা পরিস্থিতিতে কারফিউ জারির ফল হিসেবে এগার মাসের মৃত বাচ্চাটার সৎকারের ব্যবস্থাও তার বা ঝুপড়িবাসীর জানা নেই। কারণ তখন "রাস্তার ওপর মানুষের মৃতদেহ উপুড় হয়ে পড়ে থাকে, আর মানুষের পিঠে যখন বন্দুকের গুলি লাগে, মৃতদেহগুলিকে পাশ কাটিয়ে মানুষজনকে যখন যাতায়াত করতে হয়, পুলিশের গাড়িও যখন মৃতদেহগুলিকে পাশ কাটিয়ে এগিয়ে যায়, পুলিশেরই গাড়ি এসে যখন মৃতদেহগুলিকে মাথা আর পা ধরে গাড়ির পেছনের গর্তে ভরে নিয়ে চলে যায়, কে যে কখন মারা যাবে সেটা যখন হিসেবের বাইরে থাকে ... তখন একটা এগার মাসের শিশুর সকালে মরা শক্ত শরীর নিয়ে সন্ধ্যাবেলাতে সকলের ভাবনা করার সময় জোটে।" (দেবেশ, ২০০৭ : ১৪৮)। কিন্তু তা হলেও সায়রা বেগম বা ঝুপড়ির লোকেরা বুঝতে পারে না যে কী করে তারা পুলিশকে বোঝাবে যে এই বাচ্চাটার মৃত্যুর সাথে দাঙ্গার কোনো সম্পর্ক নেই। সাহস করে কোনোরকম পাহাড়ারত পুলিশকে জানালেও ভারত মাতার পুলিশপুত্রেরা রাইফেলের বাঁট দিয়ে নির্দেশ দেয়– বাচ্চাটার লাশ দাফন হবে না, ও কাফন পাবে না, ওকে ময়লার গাদার মধ্যেই পুঁতে দিতে হবে। ময়লা ফেলার স্থান, বাসস্থান আর গোরস্তান এক হয়ে যায়। নোংরার গাদায় বাচ্চাটার লাশ দাফন করে ঝুপড়ির লোকজন যখন ফিরছে, কারফিউ কবলিত সেই বস্তি, সে ঝুপড়িগুলো থেকে পিল পিল করে মানুষ রাস্তায় বেরিয়ে আসে, লেলিহান আগুনের শিখায় সায়রা বেগম ছুটে এসে গোরের কাছে এসে দেখে তার বাচ্চাটা আর এগারো মাসের নেই, তার মৃতদেহ বড় হতে হতে কবর ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইছে, সায়রা চারপাশ থেকে ময়লা টেনে টেনে তাকে চাপা দিতে গিয়েও পেরে ওঠে না। নভেলিস্টের বয়ানে উপন্যাসের বিবরণ শেষ হয় এক 'পরাবাস্তব' চিত্রকল্পের পরিচর্যায় :

> ঐ মৃতদেহটাও ধোঁয়ার বেগে ধোঁয়ার সঙ্গেই মাটি ঘেঁষে আকাশের দিকে উঠছিল। ... কাল সকাল হওয়ার অনেক আগেই এই ঝুপড়ি পুড়ে ছাই হয়ে যাবে। কাল সকাল হওয়ার অনেক আগেই এই ধোঁয়ার সঙ্গে এই মৃতদেহ বোম্বাইয়ের আকাশে ছড়িয়ে পড়বে। বোম্বাইয়ের আকাশ জুড়ে মৃতদেহের আচ্ছাদন তৈরি হয়ে যাবে। সেই আচ্ছাদনের নীচে বোম্বাইয়ের মানুষজন নিজেদের জীবনযাপনে ফিরে যেতে থাকবে। (দেবেশ, ২০০৭ : ১৫৩)

শেষ বাক্যটিতে দৈনন্দিন জীবনযাপন ও ইতিহাসের ভয়ঙ্কর নির্মম ট্র্যাজেডির যোগাযোগ ঘটে যায় : মৃতদেহের আচ্ছাদন, এই শব্দবন্ধে তো ইতিহাসই আসে এক শিশুর মৃতদেহকে আশ্রয় করে। জীবন

Dhaka University Institutional Repository

বাড়ে না, মৃতদেহ বাড়ে, মৃতদেহকে চাপা দেওয়া যায় না। "ব্যক্তি যে দাঙ্গায়-ইতিহাসে, বিচ্যুত হচ্ছে, অনৈতিহাসিক হয়ে যাচ্ছে বা প্রাগৈতিহাসিক, তাতেই তো ঐ মৃতদেহ ঐতিহাসিক হয়ে ওঠে। এই মৃতদেহই তখন প্রতিবাদ, জীবন।" (পার্থপ্রতিম, ১৯৯৮ : ২৩৯)। এখানে "সায়রা বেগমের ছেলের লাশ আর গম্বুজও হয়ে ওঠে আদার ইন্ডিয়া, এরা আমাদের মাদার ইন্ডিয়ার কেউ নয়, কিছুমাত্র নয়। ... মাদার ইন্ডিয়ার মুসলমান সন্তানেরা হাজারে হাজারে লাশ হয়ে সমুদ্রের ঢেউয়ে ওঠানামা করে, বালিতে চিত্র হয়ে পড়ে থাকে, খাড়িতে আটকে থাকে।" (স্বপন, ১৪২১ : ২৯৫)। একদিকে রাজনীতি ও বিভিন্ন ক্ষমতাবান প্রতিষ্ঠানের স্বার্থ-পুঁজির লড়াই, অপরদিকে আবেগী সাম্প্রদায়িক চেতনায় তাড়িত অথচ নেপথ্যে কেন্দ্রীয় রাজনীতির সূক্ষ্ম চাল সম্পর্কে অজ্ঞ, নিয়ন্ত্রিত এবং পরিচালিত সাধারণ জনগণ– এই দুই শ্রেণীর চরিত্রপ্রবাহ, তাদের সংঘঠিত ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার বৃহৎ পটভূমিতে রচিত হয়েছে দেবেশ রায়ের *দাঙ্গার প্রতিবেদন*। আর কেন্দ্রে রয়েছে ইতিহাসের চলমান স্বভাবধর্মের নানামাত্রিক বিশ্লেষণ-ব্যাখ্যা। ঔপন্যাসিকের নিরাসক্ত ও উচ্চমাত্রার জীবনবোধের পরিচয়ও এখানে বিধৃত। দাঙ্গার রক্তক্ষয়ী চিত্রে তিনি সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বা এ সম্পর্কে বিশেষ দর্শন ধারণ করে এমন কোনো চরিত্র নির্মাণ করেননি, যেমনটা রয়েছে দাঙ্গা সংক্রান্ত বিভিন্ন কথাসাহিত্যে।[৪] তবে "ঔপন্যাসিক দেবেশ রায়ের নন-কম্যুনাল অ্যাটিটিউড ছত্রে ছত্রে স্পষ্ট। যেমন– তিনি যখন লিখেন : ৬ ডিসেম্বরের 'সেই পুরো সমাবেশটা তৈরি হয়েছে ঘৃণার ওপরে, সেই পুরো সমাবেশটা তৈরি হয়েছে ধ্বংসের উদ্দেশ্যে।' (রবিন, ২০১১ : ৯৮)। এছাড়া গম্বুজের নিঃসঙ্গতা এবং নির্মম আক্রোশী আক্রমণে এর ধ্বংস হয়ে যাবার চিত্রটি উপন্যাসে যেভাবে বারবার চিত্রিত হয়, কিংবা ঔপন্যাসিক যখন মুসলমান নিধনে পুলিশের ভূমিকার কথা বলেন, দলে দলে তাদের গৃহত্যাগের খবর দেন, যদিও 'সরকার দাঙ্গা পরিস্থিতির ওপর যে-নোট তৈরি করে, তাতে এ-সবের উল্লেখও থাকে না।' (দেবেশ, ২০০৭ : ১৪২); 'মহা আরতি'র হিসেব দেন, অথচ তা কোনো শাস্ত্রীয় আচার নয়, হয়ে উঠেছিল 'এক-একটি রাজনৈতিক-সাম্প্রদায়িক জনসভা' (দেবেশ, ২০০৭ : ১৪২); কংগ্রেসি দুই দলের গোলমাল মীমাংসার জন্যে ৯৩-এর জানুয়ারির দাঙ্গার ও শিবসেনার ভূমিকা এবং সর্বোপরি মুখ্যমন্ত্রীর নীরবতা ও দাঙ্গাস্থলে যেতে না পারার যুক্তির সমালোচনা করেন– তখন তাঁর এ প্রতিবেদন রচনার উদ্দেশ্যটি স্পষ্ট হয়ে যায়।

গ. শিল্পায়নের প্রতিবেদন

Dhaka University Institutional Repository

শিল্পায়নের প্রতিবেদন প্রথম প্রকাশিত হয় 'আজকাল' শারদীয় সংখ্যায় ১৯৯৫ সালে, বাংলা ১৪০২-এ। গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ১৯৯৬ সালে। আলিপুরদুয়ার থেকে ভুটান পাহাড় পর্যন্ত বিস্তৃত ফরেস্ট ও আদিবাসী যথা-সাঁওতাল-মুণ্ডা-পাহাড়ি-রাজবংশীদের গ্রাম, চা বাগান, বাঁশঝাড় ও বাঁশঝাড়ে দেবতার থান– এই বিরাট ক্যানভাসে উপন্যাসটি চিত্রিত।

ভারতের উত্তর সীমান্তের চারটি জেলা যথা– দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার ও পশ্চিম দিনাজপুর নিয়ে পশ্চিমবঙ্গের চা-বলয়। এর মধ্যে দার্জিলিং ও জলপাইগুড়ি জেলার পাহাড় ও সমতল এলাকায় ব্যাপকভাবে চায়ের চাষ হয়। সমতল এলাকা বলতে বোঝায় তরাই ও ডুয়ার্স (দুয়ার) অঞ্চল। ব্রিটিশ শাসনের বহু বছর পূর্ব থেকেই উল্লিখিত চা-বলয়ে সমতলের সংকর বাঙালি সম্প্রদায় ও মঙ্গোল জনজাতি গোষ্ঠীভুক্ত কোচ, মেচ, রাডা, পলিহা, ক্ষেণ, গারো, টোটো, ধীমল, থারু, ভুটিয়া, লেপচা প্রভৃতি সম্প্রদায়ের মানুষের বাস ছিল। (সমীর, ১৯৯২ : ১)।

"উত্তরবঙ্গে চা বাগানের সংখ্যা ১৯৯১-তে ১০২ (দার্জিলিং জেলা) + ৮২ (তরাই) + ১৬৩ (ডুয়ার্স) মোট ৩৪৭ টি। (রবিন, ২০১১ : ৯৯)।" ১৯৮৯-৯০ সালের 'চা পরিসংখ্যান' অনুযায়ী উত্তরবঙ্গে চা-বাগানে কর্মরত পুরুষ, মহিলা, শিশু ও কিশোর শ্রমিকের সংখ্যা মোট ২,৫২,০৮১ জন। আরো প্রায় সাড়ে তিন লক্ষ লোক চাকুরীরত পরিবারগুলোর ওপর নির্ভরশীল এবং আরো অন্তত চার লক্ষ লোক এই শিল্পের ওপর নানাভাবে নির্ভরশীল। বিশ্বের বাজারের মোট ২৮ শতাংশ চা রপ্তানি হয় ভারত থেকে। উত্তরবঙ্গে চা-চাষের প্রচলন হয় দার্জিলিং-এ ১৮৩৯ সালে, মতান্তরে ১৮৪০-৪১ সাল থেকে; তরাই ও ডুয়ার্সে যথাক্রমে ১৮৬৫ ও ১৮৭২ সাল থেকে। নীলচাষ এ সময়ে লাভজনক বিবেচিত না হওয়ায় ইংরেজ পুঁজিপতি ও ব্যবসায়ীরা নীলের চেয়ে বরং সম্ভাবনাময় চা-চাষ ও চা-বাগান পত্তনের কাজে এগিয়ে আসে। "তাদের শ্রমিক চাহিদা পূরণ করতে থাকে হতভাগ্য ও দরিদ্র আদিবাসী জনজাতি সম্প্রদায় ভূমি থেকে, অরণ্য থেকে, জীবিকা থেকে উৎখাত হয়ে কঠোর দারিদ্র্যের নিষ্পেষণে, জীবিকার তাড়নায় এরা তিন থেকে পাঁচ পুরুষ আগে দলে দলে ছোটনাগপুর মালভূমি ও বৃহত্তর ঝাড়খণ্ড অঞ্চল থেকে উত্তরবঙ্গে এসে উপনিবিষ্ট হন, যেমন করে একদিন সমতল বাংলার ভূমিহীন, গরীব চাষীদের দাসখৎ লেখাতে হয়েছিল আসামের চা বাগানে এসে। ডুয়ার্সের ও তরাইয়ের জমি পরিষ্কার করে চাষোপযোগী করে তোলার কাজেও এঁদের নিয়োগ করা হয় এবং চাষবাসের জন্য ভূমিগত ও খাজনাগত কিছু সুযোগ সুবিধাও তাদের দেওয়া হয়। (সমীর, ১৯৯২ : ৩)। এভাবে বিভিন্ন ও বিচিত্র নরগোষ্ঠী ও বিভিন্ন ভাষাভাষী মানুষের তাদের প্রাচীন বংশানুক্রমিক বাসভূমি ত্যাগ

Dhaka University Institutional Repository

করে ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে চা-বাগানে স্থিত হয়েছিল। চা-কে শিল্প হিসেবে গ্রহণ করা হলে পাহাড়ী বিভিন্ন অঞ্চলে উপযোগী আবাদী ও অনাবাদী জমিতে প্রচুর চা-বাগানের পত্তন হতে থাকে। চায়ের উৎপাদন বৃদ্ধি ও এটিকে একটি সমৃদ্ধ শিল্প হিসেবে গড়ে তোলায় ভারতবর্ষে চা স্থানীয় বাজারের চাহিদা মিটিয়ে আন্তর্জাতিক বাজারে জায়গা করে নেয় এবং পর্যাপ্ত বিদেশী মুদ্রার উৎস হয় এই শিল্প। তবে পুঁজি বাজারে প্রতিযোগিতার নিয়ম অনুযায়ী এক পর্যায়ে সত্তর দশক থেকে পশ্চিম ও উত্তরবঙ্গে চা-শিল্প বিপর্যয়ের মুখে পড়ে। বিভিন্ন অঞ্চলে চা-বাগান বন্ধ হতে ব্যাপকভাবে। এর পেছনে যে কারণসমূহ নির্দেশ করা যায় তা হল- ঋণ পরিশোধ না করতে পারা, শিল্প-পুঁজির বদলে ব্যবসা-পুঁজি ও ফাটকা-পুঁজির আধিপত্য বিস্তার, ফলে চা-বাগানের মালিকানা নিয়ে ফাটকাবাজির উদ্ভব হয়। এছাড়া চা-বাগানগুলোতে দীর্ঘমেয়াদী পুঁজি লগ্নী না করা, চা-বাগান মর্টগেজ রেখে স্বল্প সুদে প্রচুর পরিমাণ টাকা ঋণ নেয়া, কিন্তু সেই টাকা চা-বাগানে বিনিয়োগ না করে অন্য কোনো লাভজনক ব্যবসায় খাটানো-ইত্যাদি কারণে "পশ্চিমবঙ্গের চা-শিল্প রুগ্নতর হতে থাকল, সরকার, শ্রমিক, কর্মচারীরা তাঁদের ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত হতে থাকলেন।" (সমীর, ১৯৯২ : ৭৩)। অন্যান্য শিল্পের তুলনায় চা-শ্রমিক ও কর্মচারিদের মজুরি কমে যাওয়া, উৎপাদন ব্যবস্থা বিপর্যয়ের সম্মুখীন হওয়া ইত্যাদি কারণে চা-বাগান বন্ধ হতে শুরু করে। *শিল্পায়নের প্রতিবেদন* (১৯৯৬) উপন্যাসটিতে সেই বাস্তবতারই একটা অংশ তুলে ধরা হয়েছে। ঔপন্যাসিক অবশ্য চা-শিল্প বা দেশীয় অন্যান্য শিল্প ধ্বংসের পেছনে বিশ্ব বাণিজ্যকে দায়ী করেছেন। তিনি লিখেছেন:

> দেশের অর্থনৈতিক সংস্কারের দরকারে বিশ্ব বাণিজ্যকে দেশের প্রবেশাধিকার দেয়ার কর্মসূচির ফলে চিরাচরিত শিল্পগুলি সুতো-চট-চা-ধ্বংস করা হচ্ছিল। (দেবেশ, ২০০৭ : দুই)

মূলত বিশ্ব বাণিজ্যের প্রভাবেই বিপর্যস্ত হয় চা-শিল্প। ফলে ক্রমেই বিভিন্ন স্থান ও জেলা হয়ে ওঠে শিল্পহীন। মজুররা হয়ে ওঠে ক্রীতদাস। রাজ্য সরকারের শ্রম দপ্তরে এ ব্যাপারে অভিযোগ গেলেও ফল পাওয়া যায় না। ট্রেড ইউনিয়ন নেতারা আদিবাসীদের পক্ষে ফলপ্রসূ ভূমিকা রাখতে পারেনি। তারা "আদিবাসিদের পক্ষ থেকে রণহুংকার দেয় আবার নেতা হয়ে গাড়ি বাড়ি, পার্লামেন্ট টিকিট, প্লেনে যাতায়াত, দেশি-বিদেশি কনফারেন্সে গরম গরম কথা বলে। ফলে মালিকেরা যা ইচ্ছে তা করতে পারত। কোনো হাসপাতাল, সরকারি স্কুল, পরিপূরক শিল্প সরকার করে নি।" (রবিন, ২০১১ : ৯৯)। এছাড়া শ্রমিক স্বার্থে কোনো নির্দিষ্ট ও উপযোগী আইনও তৈরি করা হয়নি। "স্ত্রী শ্রমিকদের Exploitation ছিল বেশি। পুরুষ নারী কোনো শ্রমিকই বাগান ছেড়ে অন্যত্র যেতে পারে না। স্থানীয়

Dhaka University Institutional Repository

লোকেরা চা বাগানে প্রায় যোগদান করেনি বললে অত্যুক্তি হবে না।" (রবিন, ২০১১ : ১০০)। চা শিল্পের বিপর্যয়ের কারণ বন্ধ হয়ে যাওয়া বাগানগুলোর অধিকাংশ চাকরি হারানো শ্রমিকেরা এক কঠিন জীবন সংগ্রামের মুখোমুখি হয়। স্বাভাবিকভাবেই তখন বহু শ্রমিক মারাও গেছে। "১৯৯৮ থেকে ২০০১-এর মধ্যে মৃত্যুর গড় ১০৬, পরে ২০০২ থেকে ২০০৩-এ গড় ১৯১। চা বাগানের মৃত্যুর কারণ– অনাহার, যদিও অনাহারে মৃত্যু সরকার মানে না। চালু থাকার সময় প্রাপ্য মজুরিও কম পেত তারা।" (শুভেন্দু, ১৯৯৫ : ১৩৪, উদ্ধৃত, রবিন, ২০১১ : ১০০)।

শিল্পায়নের প্রতিবেদন উপন্যাসে রয়েছে উত্তরবঙ্গের ধওলঝোরা চা বাগান উঠে যাবার পর পরিত্যক্ত এ বাগানে এক চৌকিদার অগাস্টাস টোপনো মুণ্ডার নিঃসঙ্গতার কথা। অগাস্টাস-এর জীবন-বৃত্তান্ত সূত্রে অবশ্য চা-শিল্পের বিপর্যয়ের দীর্ঘ ইতিহাস, শ্রমিক আইন, ট্রেড ইউনিয়ন ও কেন্দ্রীয় রাজনীতির সম্পর্ক ইত্যাদি প্রসঙ্গের সঙ্গে পাঠকের বিস্তৃত পরিচয় হয় না। চা-বাগান শিল্প অনুষঙ্গে 'প্রতিবেদন উপন্যাস' নির্মাণ ও এর প্রাসঙ্গিকতা বিচার সম্পর্কে সমালোচক বলেন:

> ...ঔপন্যাসিক যখন দেবেশ রায়, যিনি ঔপন্যাসিক হিসেবেও বিশিষ্ট-সমাজমনস্কতার কারণে, নামে যখন 'প্রতিবেদন' তখন চা-বাগানের শিল্প-অবস্থার কথা আসবেই এই উপন্যাসের বিচারে। (রবিন, ২০১১ : ১০০)

উপন্যাসটি 'প্রতিবেদন' সংকলনে যুক্ত হবার পূর্বে স্বতন্ত্র আকারে যখন প্রকাশিত হয়েছিল, তখন এর অধ্যায় বিভাজন ছিল; ছিল চারটি অধ্যায়– 'মুষিক বর্ষ', 'বাগানে', 'হাটে', 'ফরেস্টে' (উদ্ধৃত, রবিন, ২০১১ : ১০০)। উপন্যাসটির প্রথমে আছে অরণ্যের বর্ণনা, সেই সূত্রে রাজবংশী, সাঁওতাল, মুণ্ডা, পাহাড়ি, পাথুরে দেবতা, বাঁশঝাড়, চেংতাম ও মাওতাম বাঁশ, বাঁশফুল, পাখিদের মড়ক, মাটি বিষিয়ে ওঠা, মাটি খুঁড়তে থাকা ইঁদুর, ভৌগোলিকভাবে ভুটান পাহাড়, গোয়ালপাড়ার পাহাড়, সঙ্কোশ নদীর উৎস, রাতের চক্র, তারার চক্র, বাতাসের চক্র, দিনে-রাতের পাহাড়ের চক্র প্রভৃতির বর্ণন-চিত্র কবিতার মতই মনে হয়:

> এই যে এত ফরেস্ট, সেই আলিপুরদুয়ার থেকে মাইল-মাইল ফরেস্ট, সেই ভুটানের দিকে মাইল-মাইল ফরেস্ট, আর তার মাঝখানে ছড়ানো-ছিটানো কিছু চা-বাগান, চা-বাগানও আসলে ফরেস্টই, তার ভিতরে কত বাঁশবন। ... এইসব বাঁশঝাড় অনেক বছর বাঁচার সুবাদে তাদের আত্মপরিচয় পরিস্ফুট হতে পারে। ... একই বাঁশঝাড় তখন কত আলাদা হয়ে যায়। বাঁশঝাড় তার আপন স্বভাবে জেগে ওঠে। ... চেংতাম বলে একটা বাঁশ আছে, পঞ্চাশ বছর পর পর তার ফুল

Dhaka University Institutional Repository

> ফোটে। মাওতাম বলে একটা বাঁশ আছে, আঠার বছর পর পর তার ফুল ফোটে। বাঁশগাছে ফুল ফুটেছে কী না সে-খবর কে পায়? যে-রাতচরা পাখি গভীর ফরেস্টের এক অন্ধকার থেকে আর এক অন্ধকারের দিকে শুধু উড়ে যায়, সে জানে।
>
> ... ঋতুবদলের সময় পাখিরা দিকবদল করে। তখন ত আকাশের তারারাও দিকবদল করে, তারায় আঁকা তীরের মুখ বদলে যায়, তারায় আঁকা কাঁকড়ার দাঁড়া উল্টে যায়, সাতটি তারার ঝাঁকের লেজ মাথায় উঠে যায়। আবার অনেক সময় মেঘে-মেঘে তারার ঝাঁক অদৃশ্য হয়ে যায়, মাটি থেকে দেখাই যায় না। তখন সেই নক্ষত্রবদল, বাতাসবদল, মেঘবদলের সঙ্গে-সঙ্গে পাখিরাও দিকবদল করে। (দেবেশ, ২০০৭ : ১৫৯-১৬১)

উপন্যাসের শুরুতে অরণ্যের বর্ণনা কিংবা ইঁদুর আর পোকামাকড়ের খাদ্যে পৃথিবী ভরে ওঠা আর মানুষের খাদ্য ধ্বংস হবার ব্যাপারটা প্রতীকী হয়ে ওঠে। এক পর্যায়ে শুরু হয় অগাস্টাস টোপনো মুণ্ডার গল্প। সে ধওলঝোড়া চা বাগানের চৌকিদার ছিল। চা বাগান বন্ধ হয়ে যাওয়ায় সে বেকার, নিঃসঙ্গ ও নেশাগ্রস্ত, তার বৌ-ছেলে ও পরিবারের সবাই তাকে ফেলে পালিয়েছে। উপন্যাস জুড়ে অগাস্টাসের নিঃসঙ্গতাই প্রকট হয়ে ওঠে। "...এই বন্ধ চা বাগান ছেড়ে সাহেবরা, বাবুরা, কুলি কামিন সবাই চলে গেলেও তার এখনো কোথাও যাওয়া হয়ে ওঠেনি, সে এখানেই পড়ে আছে। তার কোথাও যাওয়ার জায়গা নেই, একথা ঠিকই। কিন্তু এই যে লাইন লাইন কুলিকামিন বাগান ছেড়ে চলে গেল, তাদের সবারই কি যাবার জায়গা ছিল? না, ছিল না। কিন্তু না থাকলেও যেতে হয়।" (দেবেশ, ২০০৭ : ১৬৯)। চা-বাগান বন্ধ হয়ে যাওয়ায় শ্রমিকদের জীবনে সৃষ্ট বিপন্নতা, তাদের চাকরি আর বাস্তুচ্যুতির বর্ণনার ভাষিক পরিসর অগাস্টাস টোপনো মুণ্ডার নিঃসঙ্গ জীবনকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয়েছে। চা-বাগান ছেড়ে টোপনো মুণ্ডার যাওয়ার আসলে জায়গাও নেই, তবু সে কোথাও না কোথাও যেতে পারতো। কিন্তু বাগান ছেড়ে না যাবার বড় কারণ টোপনোর ঈশ্বর-বিশ্বাস, তার সৃষ্টিতত্ত্বের বিশ্বাস :

> যে বাগান বন্ধ হয়ে গিয়েছে, সে-বাগানে আর থাকা যায় না। অগাস্টাস টোপনো মুণ্ডাও হয়তো একদিন এই বাগান ছেড়ে চলে যাবে। ... কিন্তু এখনো যায়নি। ... এমনকী কোথাও যাবার মত করে তার নিদ্রাভঙ্গও হয়নি। তার নিদ্রাভঙ্গ হয়েছে প্রার্থনায়, তার ভগবানের কাছে প্রার্থনায়, তার ভগবানগুলির কাছে প্রার্থনায়। সে বিশ্বাস করে– চাঁদ বোঙ্গা, মারাং বুরু এই পৃথিবী বানিয়েছেন। এই পৃথিবীর মধ্যে সূর্য, চন্দ্র, নদী, ফরেস্ট, এই চা-বাগান, ভুটান পাহাড়, ধওলা নদী, ডাঙির মাঠ, ভুটানের দিকে যাওয়ার রাস্তা, হাতির পাল, গণেশ হাতি, বাস, ট্রাক, রেলগাড়ি, ভুটান

Dhaka University Institutional Repository

> পাহাড়ের মাথার শেষ, শালগাছের সাদা ফুল, পলাশগাছের লাল ফুল– এই সব আছে। (দেবেশ, ২০০৭ : ১৬৯)

অগাস্টাসের পৃথিবী, তার ধর্ম-বিশ্বাস, নিস্তব্ধ বাগানে তার নিঃসঙ্গ পায়চারি আর চারপাশের প্রকৃতি ও জীবনকে ঘিরে তার আচ্ছন্ন এক দৃষ্টি প্রভৃতি বর্ণনার দৃশ্যপট গভীর সংবেদনশীল হয়ে ওঠে, কথকও এ পর্যায়ে আর নিরপেক্ষ প্রতিবেদক থাকেন না। অগাস্টাসের ক্রম-রূপান্তরিত জীবন-সংগ্রাম গ্রোথিত হতে থাকে গীতিকবিতার আবহে :

> অগাস্টাস জানে, এই সূর্য, চন্দ্র, এই সকাল, সন্ধ্যা এই ভাঙা ঘর আর ঐ ফ্যাক্টরির শেড, এই ইলেকট্রিকের বাতি আর এই অন্ধকার, এই কলের জল আর বৃষ্টির জল, এই শালগাছ, এই তীর-ধনুক, এই হাঁড়িয়া, এই যে নতুন-নতুন পথ তৈরি হয়, সেই সব পথ, এই ভুটান পাহাড়ের গায়ে মেঘের মত জঙ্গল, সেই জঙ্গলের সঙ্গে গায়ের রঙ মিশিয়ে পালকে পাল হাতির মাটিতে নেমে আসা ... এই যে, ধওলা নদীর জলস্রোতের ওপরে দিন রাত জেগে থাকা সাঁকোর ওপর দিয়ে কত লোক কত গাড়ি কোহিনুর বাগানের ভিতর দিয়ে সাঁওতালপুর দিয়ে আলিপুরদুয়ারের দিকে চলে যায়, আলিপুরদুয়ার জংশনে যে লাল-সবুজ আলোর সিগন্যাল জ্বলে... মাঝে-মাঝে সঙ্কোশ নদীর বাঁধ যে ভাঙে, শালবনের মাথায় মাথা যে ফুলের পাহাড় জেগে ওঠে, শালফুল যখন ফোটে তখন তার গন্ধে জ্বর এসে যায়, তারপর গাছের মাথা থেকে ফুলগুলো মাটির দিকে ঝরে পড়তে থাকে জলের স্রোতের মত, এই যে শালগাছের এক-একটা গুচ্ছ তাদের বাড়িঘর, গির্জা, ছেলেপিলে সবাইকে ঘিরে রাখে দু-হাতের দশটা আঙুলের মত– এ-সবই প্রভু যিশু ক্রিস্তের ক্ষমায় আর দয়ায়। (দেবেশ, ২০০৭ : ১৬৯)

টোপনো বিশ্বাস করে চাঁদ বোঙ্গা, মারাং বুরু, প্রভু যিশুতে, চা-বাগানের মালিকও ছিল তার কাছে ভগবানের মতো। "তার বিশ্বাসের জগৎ তাই একটু বেশি শাদাসিধে, একটু বেশি সরল।" (দেবেশ, ২০০৭ : ১৭০)। টোপনো জানে ভগবান না থাকলে সৃষ্টি হয় না, কিন্তু ভগবান না থাকলেও তো সৃষ্টি চলে। তারা ভগবান নয় কিন্তু ভগবানের মতই। যেমন এই ধওলঝোরা চা বাগানের মালিক দাগাবাবু। এ পর্যায়ে শোনা যায় টোপনোর বিশ্বাসকৃত সৃষ্টিতত্ত্বের বয়ান :

> দাগাবাবু আছেন বলেই ত এই এত বড় চা-বাগানটায় এত হাজার হাজার চা গাছ মাথা ঝাঁকিয়ে ওঠে আবার কাঁচিকাটা হয়ে মাথা নুইয়ে থাকে। ... প্রভু যিশু ক্রিস্ত আর চাঁদ বোঙ্গা যে সূর্য-চন্দ্র বানিয়েছেন, দাগাবাবু সেই সূর্যচন্দ্রের তাপকে ঠেকিয়ে দিয়েছেন আর গাছের ওপর মেলে দিয়েছেন গাছের ছায়া। (দেবেশ, ২০০৭ : ১৭০)

Dhaka University Institutional Repository

টোপনো মানে, দাগাবাবু আছেন বলেই চা-বাগান এত নম্বরে বিভক্ত কিংবা বাগিচার ভেতরে সরাসরি রাস্তা, রাস্তার শেষে কাঁটাতারের বেড়া টপকানোর কাঠের সিঁড়ি, বর্ষার জল বেরুনোর জন্য বাগিচার পাশে কাটা নালী, গাছের পোকা লাগলে তাতে ছেটানো ওষুধ, উইদারিঙের শেড, ফ্যাক্টরির জেনারেটর, ট্যাঙ্কির জলব্যবস্থা, রাত্রির বাল্ব– এই সব কিছুর জন্য দাগাবাবু দায়ী। তাই "অগাস্টাস টোপনো মুণ্ডার সৃষ্টিতে চাঁদ বোঙ্গা আছেন, প্রভু যিশু আছেন, দাগাবাবু আছেন।" (দেবেশ, ২০০৭ : ১৭০)।

টোপনো তার নিজস্ব সৃষ্টিতত্ত্বে বিশ্বাস করে বলেই এই বন্ধ চা বাগানে একা একা ঘুরে বেড়াচ্ছে সে। তার কখনো মনে হয় নি এত বড় চা বাগানে সে একা। তবে তার একাকীত্বের বর্ণনাই উপন্যাস জুড়ে, সেই সাথে রয়েছে পূর্ণ উৎপাদন কাঠামো নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা মৃত চা-বাগান, মৃত শিল্প, বন্ধ হয়ে যাওয়া বিনিয়োগ কিংবা উন্নয়ন, বাস্তুচ্যুত অসংখ্য ভবিষ্যতহীন শ্রমিক, আর তাদের জীবন-সংগ্রামের ব্যাখ্যাহীন অস্থিরতা। চা-বাগান বন্ধের পেছনে পুঁজি বা মুনাফা সম্পৃক্ত আর্থ-সামাজিক কিংবা রাজনৈতিক ক্ষমতা-দ্বন্দ্বের বিবরণ-বিশ্লেষণ ছাড়াই ঔপন্যাসিক টোপনোর সরল অজ্ঞ দৃষ্টিতে বাগান বন্ধের বর্ণনা দেন :

> কতদিন আগে বাগান বন্ধ হয় তার হিসেব টোপনোর হারিয়ে গেছে। শামুকতলার হাট তারপর ক'বার বসেছে সেটা সে আর গুনে গুনে মনে রাখতে পারে নি। বন্ধ হওয়ার মুখে সে শুনেছে, এবার আর বাগান লক আউট হচ্ছে না বা বাবুরা আর কুলিরা আলাদা-আলাদাভাবে বা একসঙ্গে স্ট্রাইক করছে না। বাগান তুলে দেয়া হল। এই যে এত বড় বাগানে এত মণ-চা তৈরি হয় তাতে কোম্পানির কোনো লাভ হচ্ছে না। সরকারের নতুন আইন হয়েছে- কোনো ক্ষতির ব্যবসা আর রাখা হবে না।" (দেবেশ, ২০০৭ : ১৭১)

"কেন এই ব্যবসা ক্ষতির, সেখানে মালিক, ট্রেড ইউনিয়ন, সরকার এদের ভূমিকা কী তা আসে না। পাঠকের মনে এসব প্রশ্ন উঠবে। এ চা বাগান কি ছিল সরকারি ? কেন ক্ষতি হল।" (রবিন, ২০১১ : ১০১)। এসবের অনুপুঙ্খ বিশ্লেষণ সত্যিই *শিল্পায়নের প্রতিবেদন*-এ নেই। টোপনোর আহত এক জিজ্ঞাসাই কেবল আবর্তিত হতে থাকে :

> এই এত বাবুমন, এত কুলিমন, এত গাছ, এত ফ্যাক্টরি, এত জেনারেটর, এত কলের লাইনে জল এই সবকিছু সহ ... বাগানটা আর থাকল না। কথাটা বুঝতে টোপনোর দু-চারদিন সময় লেগেছে। তাতেও সে কিছু বুঝে উঠতে পেরেছে মনে হয় না। এখন চিহ্নহারা সময় জুড়ে সে

Dhaka University Institutional Repository

ঘুরতে ঘুরতে বুঝতে চাইছে, বাগানটা তুলে দেয়া কাকে বলে, বাগানটা উঠে যাওয়া কাকে বলে? (দেবেশ, ২০০৭ : ১৭১)

দিগদিগন্ত জোড়া শূন্য ও ধীরে ধীরে ফরেস্টে পরিণত চা বাগিচায় টোপনোর একাকীত্ব স্পষ্ট একটা আকার পায়, আর তা হয়ে ওঠে মৃত চা-বাগানের প্রতীক। তার স্মৃতিবাহিত নানা অনুভূতিতে বিবৃত হয়েছে বন্ধ বাগানের চাকরি ও বাস্তুচ্যুত সকল শ্রমিকের বাগান ছেড়ে যাবার বিভিন্ন দৃশ্যপট। ধওলাঝোরা চা বাগান উঠে গেল, কোম্পানি তার আগে কুলিকামিনদের পাওনা পরিশোধ করে দিল। প্রবিডেন্ট ফান্ডের টাকা স্থায়ী মজুরদের দিয়ে দেয়া হল। তারা গ্র্যাচুইটির টাকাও পেল। বিঘা শ্রমিকেরা অত পেল না। কিন্তু সরকারি আইনকানুনে তাদের হাতেও টাকা এল। নগদ এত টাকা কোনোদিন কোনো লেবার হাতে পায়নি। লেবাররা ভুলে গেল তাদের আরো অনেক দিন কাজ করার কথা, কিংবা সেই কাজ থেকে পাকাপাকি ছুটি বাবদ তারা কম টাকাই পাচ্ছে। "কিন্তু একসঙ্গে অত টাকা পেলে আর ঐ সব খুচরো হিসেব কে করে। তখন লেবাররা ভাবছে– বাগান রোজ উঠে যায় না কেন, যেন তা হলে তারা রোজই এত টাকা পাবে। অন্তত মাসে একবার উঠে গেলে ত তাদের মাসমাইনেটা বাড়ে" (দেবেশ, ২০০৭ : ১৭৩)।

ঔপন্যাসিকের নির্মোহ বর্ণনায় উঠে আসে ইন্ডাস্ট্রি বন্ধ হওয়া শ্রমিক জীবনের অন্তহীন বিপর্যয়ের ট্রাজেডি; তাদের অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ জীবনের লড়াইটা তারা ঐ মূহূর্তে বোঝে বা বোঝে না কিংবা সম্মুখ ক্ষতির অজ্ঞতা ইচ্ছে করেই আমল দেয় না। টোপনোর মনে পড়ে তখন দিনরাত হাঁড়িয়ার ফোয়ারা ছুটল আর মুরগির লড়াই। সাঁওতালপুর থেকে বাংলা মদের দোকানি এখানে একটা স্থায়ী দোকানই বসিয়ে দিল। মাইক বেঁধে হিন্দি গান বাজানো শুরু হল আর তার সঙ্গে লটারির টিকিটের দোকান। "দুনিয়ার লটারির টিকিট এই এক ধওলঝেরাতেই বেচা শুরু করল। ধওলঝোরা উঠে যাচ্ছে ত কী হল, তার বদলে হরিয়ানা আছে, সিকিম আছে, তামিলনাড়ু আছে। এছাড়াও ঘোড়দৌড়ের টিকিট ছিল– সে-সব নাকি ফরেনে দৌড়য়। (দেবেশ, ২০০৭ : ১৭৩)। জুয়োর দোকান ও মেলায় ডুগডুগি, ঘুলঘুলাইয়া, বেলুন ফাটানো, বন্দুক ছোঁড়া, কৌটা উপুর, ছকের চাল, টিয়াপাখির ঠোকর, মুরগির লড়াই ইত্যাদি খেলা চলতে থাকে। আর একটা হাটে শামুকতলা হাটের শাড়ি, রোল্ডগোল্ডের আর কাচের গয়নার দোকান। তখন "কোনো কিছু দিতেই ধওলার লেবারদের আপত্তি নেই। তাদের বাগান উঠে গেছে। তারা ত আর হাজরি পাবে না। তারা তাদের শেষ হাজরির টাকা দিয়ে দুনিয়ার

Dhaka University Institutional Repository

সব জুয়ো খেলবে, সব লড়াই লড়বে, সব হাঁড়িয়া খাবে, সব বোতল শেষ করে দেবে।" (দেবেশ, ২০০৭ : ১৭৩)।

কুলি লাইন উঠে গেলে দু-চারদিন বাদে মেলার শেষে শ্রমিকদের ঘর ছেড়ে চলে যেতে হবে। আস্তে আস্তে দলের নেশা পাতলা হয়ে এলে "তারা হঠাৎ দেখে তাদের শরীরের ভিতর থেকে উল্লাসের বদলে বিষাদ উঠে আসতে শুরু করেছে। এরপর তারা মাঠে বসে কান্না শুরু করবে। না, কান্না নয়। না, বিষাদ নয়। উল্লাস, উল্লাস। কোম্পানি বাগান তুলে দিয়েছে। তাদের নগদ টাকা দিয়ে দিয়েছে। আজ হোক, কাল হোক, তারা কুলি লাইন ছেড়ে চলে যাবে। এর মধ্যে কান্না কোথায়?" (দেবেশ, ২০০৭ : ১৭৫)। তাই নেশা শরীরে পাতলা হচ্ছে বুঝেই ওরা দল বেঁধে দোকানের মাঠ ছেড়ে হাঁড়িয়ার মাঠের দিকে ছোটে। আর মেলার সব আওয়াজ শেষ হয়ে নাচের আওয়াজ শুরু হয়। ঢিমে সুরে মাদল বেজে ওঠে, ঢোলক বেজে ওঠে, "কিন্তু সব ঢোলকই বুকে গিয়ে ঘা মারে। কত বাঁশি বেজে ওঠে, সব বাঁশিই এক সুর বাজায়। নাচের বৃত্ত বড় হতে থাকে, আরো বড় হতে থাকে। ... আর গান যত বেশি সমবেত হয়, তত বেশি বিষাদে আচ্ছন্ন হয়ে যায়। সেই বিষাদময় নৃত্যবৃত্ত মাঠ জুড়ে ঘোরে, মাঠ ছাড়িয়ে ঘোরে। যেন বাগান উঠে যাওয়ার পর পুরো বাগানের ওপর যেন বাতাসে এই নৃত্যবৃত্ত পাক খাচ্ছে।" (দেবেশ, ২০০৭ : ১৭৬)

এই মেলা ভাঙার পরেই অগাস্টাস টোপনো মুণ্ডার স্ত্রী এঞ্জেলো টোপনো মুণ্ডা আর তার দুই ছেলে তাকে ছেড়ে চলে গেছে। হয়তো এঞ্জেলা অগাস্টাসকে 'মদের, নাচের, গানের উল্লাসে ঠাসা' সেই শেষ কয়েকটা দিনের পরে জিজ্ঞেস করেছিল এর পরে কী হবে। টোপনো অবশ্য মনে করতে পারে না সেকথা। অগাস্টাস জানে না, এঞ্জেলা আর তার দুই ছেলে এখন কোথায়। চৌকিদারের ডিউটি শেষ হয়ে গেছে, তাই তার নিজের ডিউটি এখন নিজের কাছে। নিজের মনেই সে সারা বাগান ঘুরে বেড়ায়, বাগানের আনাচে কানাচে, সীমান্তে সীমান্তে। যেন, বাগান উঠে যাবার পর তাকে পাকাপাকি ডিউটি দেয়া হয়েছে, বাগান কীভাবে পাকাপাকি উঠে যায় সেটা তন্ন তন্ন করে দেখতে। টোপনোর নিঃসঙ্গ জীবনের প্রতিবেদন তৈরি করেন ঔপন্যাসিক :

> দিনযাপনের এইটুকুই টোপনোর নির্দিষ্ট– ঘুম থেকে ওঠা, সে-জাগরণ যেখানেই ঘটুক না কেন সেখান থেকে সকালে এই অফিস-ফ্যাক্টরির কাছে এসে একটু ঘোরাফোরা করা, তারপর জনশূন্য এই বাগানের কোনো একদিকে হাঁটা দেয়া। ... হাঁটতে-হাঁটতে সে কাছাকাছি কোনো কুলিলাইনে

Dhaka University Institutional Repository

ঢোকে, সন্ধ্যা হয়ে গেলে সবচেয়ে কাছে যে শোয়ার জায়গা পায় সেখানে শুয়ে পড়ে। (দেবেশ, ২০০৭ : ১৭৯)

টোপনোর পরিত্যক্ততার, একাকীত্বের দুঃখকে বড়ো করে তুলতে গিয়ে লেখক তাঁর ক্ষুধা, ক্রমান্বয় নেশাগ্রস্ততা ও নিঃসঙ্গতাকে বার বার তুলে আনেন পাঠকের সামনে। ঔপন্যাসিক লিখেছেন কী করে একটা জায়গায় এসে টোপনো প্রত্যেকদিন পাক খায় আর নতুন করে বুঝে নেয় বাগান উঠে গেছে। একবার সে দেখে অসমতল ও জঙ্গলে পরিণত চা-বাগানের ভেতরে কোথাও কোথাও কচি পাতা বেরিয়েছে, পাতার শিষ বেরিয়েছে। তার মনে হয়, এখন যদি বাগান খোলা যেত, জেনারেটর চালু করা যেত, ফ্যাক্টরি চালানো বা সাইরেন বাজানো যেত, তা হলে গাছগুলোর পাতা আর ডাল ছেঁটে এগুলোকে বাগিচার চা গাছ বানানো হত। কিন্তু তা যেহেতু আর হয় না, তাই সে নিজেই তার মলিন গামছায় চা পাতা তোলে, শুকাতে দেয়। তারপর ভাবে এই শুকনো চা, চা পাতা হাতে তুলে গ্রিন-টি বানিয়ে গামছায় বেঁধে সে বিক্রি করতে বেরুবে, বসে বসে সে হিসেব কষে কোথায় যাবে গ্রিন-টি বেচতে। তারপর বাগান বন্ধের দু'মাস পরে অনেক মাইল নির্জনতা আর একটা সূর্যাস্ত ও সূর্যোদয় পেরিয়ে এবং শরীরে-মনে তার বিশ্বাসকৃত সৃষ্টিতত্ত্ব ঘটিত সংঘাত, বিষাদ ও একাকীত্ব নিয়ে অগাস্টাস টোপনো মুণ্ডা ধওলঝোরা থেকে শামুকতলা হাটের উদ্দেশ্যে বের হয়। হাটে যাবার দীর্ঘ পথে এক জায়গায় ঘুমিয়ে পড়া টোপনোর কাছে "শাল আর গাম্বারি গাছের ঘন ফরেস্ট জেগে ওঠে। সেই ফরেস্টের ভিতর দিয়ে সে হেঁটে যায়।" (দেবেশ, ২০০৭ : ১৯০)। দীর্ঘ সময় ধরে ঘুমের মধ্যে টোপনোর অতীত ও ভবিষ্যতের অনেক আখ্যানই জেগে ওঠে। কিন্তু এগুলো কোনো স্বপ্ন নয়। কারণ "ডিউটি করতে-করতে, হাঁটতে-হাঁটতে, হাঁড়িয়া খেতে-খেতে,খালি পেটে থাকতে-থাকতে– স্বপ্ন দেখা ঘুমের শরীরবৃত্ত টোপনোদের ধ্বংস হয়ে গেছে। যদি তারা কখনো কোনো স্বপ্ন দেখে, তাহলে প্রত্যাদেশের মত দেখে, শোনে। যার যে ভগবান সে তার প্রত্যাদেশ দেখে, শোনে।"(দেবেশ, ২০০৭ : ১৯০)। ঔপন্যাসিকের সমাজতাত্ত্বিক বয়ানে উঠে আসে আর্থ-সামাজিক শ্রেণী-সম্পৃক্ত ধর্ম-বিশ্বাস ও এর রূপান্তরের বাস্তবতা। পুঁজিপতি হয়ে পড়ে ভগবান; কৌম সমাজের টোটেমের উৎস হিসেবে চাঁদ বোঙ্গা, মারাং বুরু ও সেইসাথে প্রভু যিশুর পুরাকল্প ঘুরেফিরে আসে। স্বপ্ন হয়ে পড়ে কাঠামো-সংশ্লিষ্ট, তাই "চাঁদ বোঙ্গা, মারাং বুরুর স্বপ্ন দেখে ভগ্তরা। প্রভু যিশুর স্বপ্ন দেখে চার্চের ফাদার। বাগানে একটা কালীবাড়ি আছে। তার পুরুতও নিশ্চয়ই তেমন স্বপ্ন দেখে। দাগাবাবু ভগবানের স্বপ্ন দেখে ম্যানেজারবাবু, লেবারবাবু, কোম্পানিবাবু।" (দেবেশ, ২০০৭ : ১৯০-১৯১)। টোপনোর ঘুম স্বপ্ন

Dhaka University Institutional Repository

দেখার জন্য নয়। সে তার নিদারুণ সংঘাত, নির্জনতা বিষাদ ও একাকীত্ব নিয়ে সে শামুকতলায় হাটে গামছার পুটুলিতে বাঁধা অল্প কয়েকটি শুকনো চা পাতা বেচতে বসে এবং বেলাশেষে খদ্দের না পেয়ে তার অবিক্রিত চা পাতা সন্ধ্যার আকাশে উড়িয়ে দেয়। সে বুঝতে পারে শামুকতলার হাট তার জায়গা নয়, তাকে যেতে হবে কিন্তু ধওলঝোরা চা বাগানেও তার জায়গা নেই; "তারপর তার নেশাতুর হাঁটা শুরু করে– গামছাটা মাথায় পেঁচিয়ে। কোথাও ত তাকে যেতে হবে । কোথাও?" (দেবেশ, ২০০৭ : ২০২)। টোপনো জানে, সে এখন এই রাস্তা দিয়েই যাচ্ছে বটে কিন্তু সে ধওলাতে যাচ্ছে না, সে ফরেস্টে যাবে। "টোপনো ফরেস্টে বাঁচবে। ফরেস্টে ভিতরে-ভিতরে টোপনো নিজের জীবনযাপনের এক ভুবন বানিয়ে নেবে।" (দেবেশ, ২০০৭ : ২০২)।

যদিও জীবনযাপনের স্বাভাবিক ভুবন গড়ে নেয়া সম্ভব হয় না আর। অরণ্য সম্পর্কে টোপনোর পূর্ব ধারণা ছিল যে, "ফরেস্ট খাবার দেয়, কাঠ দেয়, ঘুমবার জায়গা দেয়, সেই কাঠ হাটে এনে বেচে আবার কিছু খেয়ে ও কিছু নেশা করে সে আবার ফরেস্টে ফিরে যেত। তাকেই তো ফরেস্টে যাওয়া বলে।" (দেবেশ, ২০০৭ : ১৭৩)। কিন্তু অনেক অন্ধকার পেরিয়ে দীর্ঘপথ হেঁটেও তারার আলোয় অথবা সূর্যোদয়ের পরেও সে কাঙ্ক্ষিত ফরেস্ট খুঁজে পায় না। কারণ সরকার কর্তৃক গৃহীত এক অরণ্যনীতি কার্যকর করে ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট টোপনোর ফরেস্টের শালবন অবশেষহীন কেটে ফেলেছে আর সেখানে বুনে দিয়েছে ইউক্যালিপটাস গাছ। উপন্যাসের শেষে সংবাদ প্রদান করা হয়, ফরেস্ট টোপনোর নয়, ফরেস্ট সরকারের। সরকার ঠিক করেছে– শালগাছ বড় ধীরে ধীরে বড় হয়, পূর্ণ ও পরিণত একটি গাছের আকারে পৌঁছতে শালগাছের লেগে যায় বছরের পর বছর, শালগাছ এক আশ্রয়ের মায়া তৈরি করে আর তার টানে শালবনে মানুষের বসতি গড়ে ওঠে। ইউক্যালিপটাস গাছ অনেক তাড়াতাড়ি বাড়ে, অনেক তাড়াতাড়ি সে গাছ বিক্রি করা যায়, শালগাছের বন ক্ষতির ব্যবসা। ক্ষতির ব্যবসা আর চলবে না। সুতরাং "টোপনো সেই শেষ রাত ও সূর্যোদয় জুড়ে এইটুকুই শুধু জানল, তার আর কোনো ফরেস্ট নেই।" (দেবেশ, ২০০৭ : ২০৭)।

ঔপন্যাসিক এভাবেই প্রাকৃত জীবনের এক শেকড়ের ঐতিহাসিকতা ও জীবন-সংলগ্নতার আভাস দিয়েছেন। কিন্তু জীবনের সঙ্গে আর্থসামাজিক উৎপাদন কাঠামোর পরিপার্শ্ব যেভাবে সময়ের ধারায় পরিবর্তিত হতে থাকে, যেভাবে ক্ষণে ক্ষণে জীবনকে করে তোলে প্রান্তিক– সেই বাস্তবতা ঔপন্যাসিকও এড়িয়ে যেতে পারেন না। পুঁজির অভিঘাতে একদিকে পুঁজি-আক্রান্ত শিল্পায়ন ম্রিয়মান হয় কিংবা মুনাফার নতুন বাস্তবায়ন হয়; অন্যদিকে ঐ একই সংজ্ঞায় বদলে যায় আদি প্রাকৃতিক

Dhaka University Institutional Repository

জীবন। উপন্যাসের পাঠকৃতিতে অগাস্টাস টোপনো মুণ্ডা তার অরণ্যচারী আদি-পুরুষের বসবাসের অধিকার পায় না, উৎপাদন ব্যবস্থাকে ঘিরে সামাজিক ইতিহাসের গভীরে নিরন্তর ঘটে যাওয়া অনিবার্য রূপান্তরে ঘুরপাক খায় সে। সুতরাং উপন্যাসে তার আস্তিত্বিক অভিজ্ঞানের উপস্থাপনা প্রত্যাশিত বাস্তবতার আড়ালে চলে যায়। তার পরিণতি বিষয়ে সমালোচক বলেন:

> উপন্যাস কখনও যায় ব্যক্তি থেকে সমষ্টির দিকে, কখনও তা সমষ্টি থেকে ব্যক্তির দিকে, অথবা ব্যক্তির আবহে সমষ্টির আভা রচনা– এ সবই তো হয়, হয়ে থাকে। টোপনোর যে সংকট, সে দেশ, মাটি থেকে উৎখাত হয় ইঁদুরের সক্রিয়তায়– এই তাহলে দীর্ঘপথ হাঁটার ফলশ্রুতি! হবেও বা। 'কোথাও তো তাকে যেতে হবে'– সে কোথায় যাবে? সে কি উৎখাত হওয়া চা বাগান-কর্মী আন্দোলনে যাবে, না কি কোনো নেশার গাড্ডায় পড়বে– কে জানে।" (রবিন, ২০১১ : ১০২)

জীবন এখানে প্রশ্নের ভেতরে ঘুরপাক খায় আর অসমাপ্ত থাকে প্রতিবেদনের পরিণতি। *তিস্তাপারের বৃত্তান্ত*-এর বাঘারুর মতই অগাস্টাস টোপনো মুণ্ডার জীবনের যাত্রা অন্তহীন হয়ে ওঠে।

ঘ. একটি ইচ্ছামৃত্যুর প্রতিবেদন

একটি ইচ্ছামৃত্যুর প্রতিবেদন গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ১৯৯৫ সালে। তার আগে 'আজকাল' শারদীয় সংখ্যা ১৪০১-এ প্রকাশিত হয়েছিল উপন্যাসটি। দেবেশ রায় রচিত প্রতিবেদনমূলক উপন্যাসসমূহ *প্রতিবেদন* (২০০৭) নামক সংকলনে একত্রে সংকলিত হয়েছে। এই সংকলনের এটি শেষ উপন্যাস। প্রতিদিনকার সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয় নিত্যদিনঘটিত নানা ঘটনা-দুর্ঘটনা। দেবেশের মতে :

> এই প্রতিবেদনগুলি যদি নথিভুক্ত হয়ে যায়, তখনই সেগুলো কি নভেলের আকার অনেকটা পেয়ে যায় না? রিপোর্টে যা ছিল কোটেশন-চিহ্ন ছাড়া খবর, নভেলে তাতে শুধু লাগল কোটেশন চিহ্ন। (দেবেশ, ২০০৭ : ২৭৩)

তবে নভেলে যেহেতু এক একজন মানুষের গল্প এবং সে গল্প যেহেতু একজন মানুষের মৃত্যুর গল্পও হতে পারে, সেই সূত্রে *একটা ইচ্ছামৃত্যুর প্রতিবেদনে* 'নভেলের কৌশল ঢুকিয়ে প্রতিবেদনকে একটু যুক্তিসহ করে তোলার' (দেবেশ, ২০০৭ : ২৭৫) প্রচেষ্টা বাস্তবায়িত হয়েছে *একটি ইচ্ছামৃত্যুর প্রতিবেদন* উপন্যাসে। নিঃসন্তান, জৈন পরিবারের বিধবা কুসুমবালার ধীরে ধীরে আত্মহননের বা ইচ্ছামৃত্যুর প্রতিবেদন এটি। তবে উপন্যাসের মূল বিষয়বস্তু কেবল এক মৃত্যুর প্রতিবেদন তৈরি করা

Dhaka University Institutional Repository

নয়। এটি খরা-দাঙ্গা-শিল্পায়নের প্রতিবেদনের তুলনায় অনেকটাই ভিন্ন। উপন্যাসের ভুবন ও আখ্যান নির্মাণে পরীক্ষাপ্রবণ ঔপন্যাসিক দেবেশ *একটি ইচ্ছামৃত্যুর প্রতিবেদন* নামক নভেলের পূর্ব বয়ানে নিবেদন করেছেন :

> আমি এক ইচ্ছামৃত্যুর কাহিনী কল্পনা করতে চাই যে মৃত্যুকে স্বীকার করে জীবন বেঁচে থাকে। আমাদের মৃত্যু বড় অসম্মানজনক হয়ে উঠেছে– খরায়, তৃষ্ণায়, বন্যায়, দুর্ভিক্ষে প্রতিদিনের মৃত্যু। আমি এমন এক ইচ্ছামৃত্যুর কাহিনী কল্পনা করতে চাই মৃত্যু যেখানে তার সম্মান ফিরে পাবে। (দেবেশ, ২০০৭ : ২২৩)

উপন্যাসের শুরুতেই বাঁকুড়া ও পুরুলিয়ার জলহীন বৃষ্টিহীন দীর্ঘ গ্রীষ্মকাল, শক্ত পাথুরে মাটি, শুষ্ক নদী, মাটির নীচে নিঃশেষিত হওয়া জলের সঞ্চয়, বাঁকুড়া পুরুলিয়ায় বসবাসকারী মানুষের অবিচিত্র তৃষ্ণা আর অতৃপ্ত শরীরের বর্ণনা উপন্যাসে তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে ওঠে। এই নেপথ্য বিবরণ এক তীব্র জীবনাকাঙ্ক্ষা কিংবা তৃষ্ণার জীবন-সত্যের চিত্রেই পরিণত হয়। ঔপন্যাসিক লিখেছেন :

> বাঁকুড়া-পুরুলিয়ায় খরা হয় না, যদি সারা দেশেই কোনো বছর মৌসুমি বৃষ্টিপাত বিপজ্জনক কম না হয়। বাঁকুড়া-পুরুলিয়ায় খরা না হওয়া সত্ত্বেও জেগে থাকে তৃষ্ণা। (দেবেশ, ২০০৭ : ২১৯)

আলোচ্য দুটি জলহীন জেলার তৃষ্ণার কোনো তৃপ্তি নেই। মূলত জীবনতৃষ্ণারও কোনো নিবৃত্তি নেই। বাঁকুড়া ও পুরুলিয়ার শুষ্ক জমিতে জলের অভাব শুধুমাত্র প্রাকৃতিক বিপর্যয়কে নয় বরং জীবনের বিশেষ এক আদর্শ উপন্যাসিত করেছেন দেবেশ। "সময়ের দর্পণে খুব সূক্ষ্মভাবে তৃষ্ণার ভূগোল রচিত হয়েছে তৃষ্ণার দর্শনে।" (অশোক, ২০১১ : ২৫৬)। দেবেশ জানিয়ে দেন– 'জলের সঙ্গে মানুষের দূরত্ব কমে না। ... পুরুলিয়া-বাঁকুড়ার এই তৃষ্ণা পুরুষানুক্রমিক ঐতিহাসিক।" (দেবেশ, ২০০৭ : ২১৮)। অর্থাৎ এটা হল অনুসন্ধান বা জলের কাছে পৌঁছানোর ব্যগ্রতা। যেখানে সংকট বেশি, সেখানে উত্তরণের তৃষ্ণাও বেশি। তাই বাঁকুড়া-পুরুলিয়ায় ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা ভেজা বালি খুঁড়ে 'মাটির ভেতরের জলের উৎস খুঁজে বের করে।' (দেবেশ, ২০০৭ : ২২০)। প্রান্তিকায়িত নিরুচ্চার মেয়ে মানুষেরাও জানে কোন্ পাথরের পেছন থেকে জল বেরোয় এবং জলের পাশ্ববর্তী অঞ্চল শুকিয়ে গেলে পাড়ি দিতে হয় দূর থেকে দূরান্তরে :

> কোন পাথরের পেছন থেকে জল বেরয় তা তাদের পুরুষাণুক্রমে জানা হয়ে আছে। কখন সেই পাথরের কাছে যেতে হয় সেটাও তাদের পুরুষাণুক্রমে জানা হয়ে আছে। তাই তারা ঠিক সময়ে নিজেদের শরীরের ভিতর ঐ পাথরের ডাক শুনতে পায়। সে-ডাক দুপুর বেলায় চিলের ডাকের

Dhaka University Institutional Repository

> মত একটা মাত্র ডাক নয় বা বাড়ির পোষা পায়রার মত বুকের ভিতরের কোনো সমবেত স্বর নয়, বা নিশির ডাকের মত নিদ্রাচ্ছন্ন স্বর নয়। ওরা জানে, গাঁয়ের সবচেয়ে কাছের জলের উৎস কবে শুকিয়ে যাবে। (দেবেশ, ২০০৭ : ২২১)

প্রতিবেদনের অভিব্যক্তিতে এভাবেই তৃষ্ণার মিথিক আবহ সৃষ্টি করেন ঔপন্যাসিক। সমালোচকের মতে, এর মধ্য দিয়ে "পিছিয়ে পড়া প্রান্তিকায়িত সেইসব মানুষের উপস্থিতি স্বীকৃত হচ্ছে উপনিবেশোত্তর চেতনা-সম্পৃক্ত ভিন্ন ভিন্ন প্রতিবেদনে।" (অশোক, ২০১১ : ২৫৭)। এটি স্পষ্ট হয় যখন বাঁকুড়া পুরুলিয়ার তৃষ্ণা আর জলের অন্বেষার বিবরণের সমান্তরালে ঔপন্যাসিক ভারতবর্ষে কোল্ডড্রিংকের ব্যবহারের প্রসঙ্গটি উত্থাপন করেন। কারণ ভারতবর্ষে কোল্ডড্রিংক তৈরির খরচ দিয়ে এক বছরে বাঁকুড়া ও পুরুলিয়ার জল-তৃষ্ণা অস্থায়ীভাবে মেটানো যায়। দেবেশ রায় একে 'বিপুল মানবিক ব্যত্যয়' বলে ঘোষণা করেছেন। সাংবাদিকসুলভ দৃষ্টিতে তিনি লক্ষ করেছেন বাঁকুড়া পুরুলিয়ার মানুষগুলো মানুষ হয়েও নিরুপায় হতভাগ্যের মত মানবেতর জীবন-নির্বাহে বাধ্য হচ্ছে। এদিকে খুব সু-কৌশলে আমাদের স্বদেশীয় পুঁজি এবং উৎপাদন আত্মসমর্পণ করেছে বিশ্ব পুঁজিবাদের কাছে। ভারতবর্ষের নিজস্ব অনেক ঠাণ্ডা-পানীয় থাকা সত্ত্বেও কোকা-কোলা আর পেপসির প্রতিদ্বন্দ্বিতা নতুন যুদ্ধক্ষেত্রের সংকেত নিয়ে এসেছে। ঔপন্যাসিক বলেন :

> আমরা দেশের ভিতরে যথেষ্ট রকম কোল্ড ড্রিংক থাকা সত্ত্বেও বিদেশী কোল্ড ড্রিংকের জন্য আমাদের তৃষ্ণাকে তৈরি করে তুলি। আমরা শরীরের তৃষ্ণা ভুলে আমাদের তৃষ্ণাকে আন্তর্জাতিক করে তুলি। সেখানে বাঁকুড়া পুরুলিয়ার জলকষ্টকে মনে হয়, আমাদের দেশ বলতে আমরা যা বুঝে নিয়েছি, তার বাইরের কোনো কথা। (দেবেশ, ২০০৭ : ২২৩)

তাই স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীর দীর্ঘ বছর পেরিয়ে যাওয়ার পর আজও নির্মম সত্যকে আড়াল করা গেল না। স্বাধীনোত্তর ভারতবর্ষের ইতিহাস আজও ধনিকবর্গের লজ্জাহীন শোষণের ইতিহাস। তাই ঔপন্যাসিকের ক্ষোভ-মিশ্রিত ব্যঙ্গ-উক্তি:

> একথা ত নিদারুণ সত্য যে আমাদের দেশের ভিতরে সভ্যতার আর বেঁচে থাকার সংজ্ঞা আমরা নির্ধারণ করেছি দেশের মাত্র দশ কোটি মানুষের সুখসুবিধে বিবেচনা করে। ... একথা ত নিদারুণ সত্য যে গত পঞ্চাশ বছর ধরে আমরা শুধু প্রতিশ্রুতি ভুলেছি, সংজ্ঞা ভুলেছি, উদ্দেশ্য ভুলেছি। এক বিকট বিভ্রান্তির পাকেচক্রে সমস্ত দেশটা এক কেন্দ্রহীন আবর্তনে ঘুরছে। (দেবেশ, ২০০৭ : ২২৩-২২৪)

Dhaka University Institutional Repository

এই বিপুল অসমতার প্রতিক্রিয়াতেই একদিকে দুটি জেলার প্রান্তিকায়িত মানুষেরা জলহীন তৃষ্ণার্ত সময়ের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে আর ভিন্ন দিকে ভারতে কোল্ড ড্রিংকের দাম বাড়ছে। "ঔপন্যাসিক খুব সূক্ষ্মভাবে এখানে দেখিয়েছেন নব্য-উপনিবেশবাদের গোপন ও প্রকাশ্য আঁতাতের ফলে আমাদের মধ্যে বদ্ধমূল ধারণাগুলোকে কাজে লাগিয়ে আমাদের মগজ ধোলাই করছে বিদেশী কোম্পানিগুলো। দেবেশ চাইছেন এই ধরনের প্রতীকের মাধ্যমে আমাদের মধ্যে উপনিবেশের দৃশ্য ও অদৃশ্যের শেকলগুলো ভেঙে ফেলতে। আর এরই পাশাপাশি উপনিবেশোত্তর চেতনাকে আমাদের মধ্যে আরো বেশি করে সজাগ করতে চাইছেন। এভাবে সমস্ত উপন্যাসের মধ্যে দেবেশ রায়ের নিজস্ব প্রতিবাদ মূলত মানুষের চেতনাকে ফিরিয়ে দেওয়ার প্রয়াসেই রূপান্তরিত হয়েছে।" (অশোক, ২০১১ : ২৫৮)। দেবেশ রায়ের প্রতিবেদনমূলক উপন্যাসের মধ্যে *একটি ইচ্ছামৃত্যুর প্রতিবেদন* এক সচেতন ও ভিন্নতর উপস্থাপনা। উপন্যাসের আদল ক্রমেই কীভাবে নতুন মাত্রা পায় তারই ভিন্ন রূপান্তরের প্রক্রিয়া দেখা যায় এখানে। তাই দীর্ঘ পুঞ্জীভূত বেদনার ক্ষোভ এবং তা ক্রোধে রূপান্তরিত হওয়ার দীর্ঘ বর্ণমালা ও প্রশ্নমালা এই প্রতিবেদেনে তীব্র স্বরে অনুরণিত হয়েছে। কুসুমবালার মত ধার্মিক নারীব্যক্তি– যার প্রতিপত্তি ও সবকিছু থাকা সত্ত্বেও অনাহারের জীবনকে বেছে নিয়ে স্বেচ্ছামৃত্যুকে কেন এবং কীভাবে আলিঙ্গন করে নিয়েছেন তারই প্রতিবেদন একটি ইচ্ছামৃত্যুর কাহিনী। প্রাত্যহিক জীবনে বেঁচে থাকা যখন অযৌক্তিক এবং খরায়-তৃষ্ণায়-বন্যায় মৃত্যুও অসম্মানজনক সে সময় কুসুমবালার ইচ্ছামৃত্যুর কাহিনী মৃত্যুকে তার সম্মান ফিরিয়ে দিতে চায়।

কলকাতার ব্যবসায়ী বনেদী পরিবারের বড় ছেলের বৌ কুসুমবালা জৈন ধর্মাবলম্বী। তার জীবনের অন্যতম বড় অসুখ– তিনি নিঃসন্তান এবং স্বামীর মৃত্যুর পর নিঃসঙ্গ বিধবা। দেবর ও তার পরিবারের সঙ্গে কলকাতার সল্টলেকে নাগরিক অভিজাত পরিবেশে বাস করেন তিনি। সন্তানহীনতার প্রাথমিক দায় সমাজে মেয়েদেরই, পরিবারের কেউ তার কাছে কোনো কৈফিয়ত না চাইলেও কুসুমবালাকে সমাজের কাছে একটা কৈফিয়ত দিতে হয়েছে যে "নারী হিসেবে সে কেন অসম্পূর্ণ? ... কুসুমবালার জগতে সন্তান ঈশ্বরের দান, মানুষ তার বাহনমাত্র। এই কৈফিয়ত খোঁজার সময় যখন কুসুমবালার এল তখন কুসুমবালাকে ত রক্ষা করেছেন মহাবলী আর জৈন তীর্থঙ্কররা আর জৈন মুনিগণ। সন্তানহীনা নারীর কাছে ধর্ম ত চিরকালই এক বড় আশ্রয়– কুসুমবালা পৃথিবীর সব দেশের সব ধর্মের সব সন্তানহীনা নারীর কাছেই ধর্ম সন্তানের বিকল্প। (দেবেশ, ২০০৭ : ২২৮)। শরীরের সন্তানহীনতাকে কুসুমবালা ক্রমেই তাঁর মনের ধর্মের সাথে মেলাতে পেরেছিলেন। ধর্মের কাছে তিনি

Dhaka University Institutional Repository

শরীরের সান্ত্বনা খোঁজেননি বলেই তিনি তাঁর ধর্মীয় মননে এক সময়ে ভাবতে পেরেছিলেন– "ভগবান তাঁকে অদয়া দিয়েছেন, সেই অদয়া গ্রহণের ক্ষমতা তাঁর ভিতর থেকে তৈরি করে তুলেই ভগবান তাঁর এই অদয়া নিক্ষেপ করেছেন। জৈন তীর্থঙ্করদের কঠিন ব্রতের জীবন তাঁর মনে পড়েছে আর মনে হয়েছে সন্তানহীনতাকে বহন করাই তাঁর ব্রত।" (দেবেশ, ২০০৭ : ২২৯)। সুতরাং স্বামীহীনতা, সন্তানহীনতা– সর্বোপরি এক কঠিন নিঃসঙ্গ সময়ের ভেতরে নিজের শোক ও বেদনার যোগ্য আধার নির্মাণ করতে পেরেছিলেন তিনি। জৈন বিধবা হিসেবে অত্যন্ত আচারনিষ্ঠ ও নিয়মানুবর্তী জীবনে অভ্যস্ত কুসুমবালা, যিনি দিনে কখনও ঘুমান না, চব্বিশ ঘণ্টায় মাত্র একবার ভরপেট খান, রান্নাঘরে দেওর ও তার পুরো পরিবারের খাবারের তদারকি করেন, সন্ধ্যাবেলা নিয়ম করে টিভি দেখেন, খবর কাগজ, হিন্দি কাগজের পাতা ওল্টান, পোষা একটা কথা বলিয়ে টিয়ার ডাকে যার ভোরের অনেক আগে ঘুম ভাঙে, তাঁর কাছে জীবনের সব অর্থ ধীরে ধীরে নষ্ট হতে শুরু করে। টিয়ার সাথে নিঃসঙ্গ কুসুমবালা তার ক্ষয়িত অনুভবের বিবরণ দেন :

> মানুষের কথা প্রতিদিন তার অর্থ হারিয়ে ফেলছে? এখন কোনো কথাকেই আর তার কোনো অর্থে নিষ্কলঙ্ক রাখা যায় না। টিয়া, আমি রোজ মন্ত্রপাঠ করি, রোজই কি তা থেকে একটু একটু করে অর্থ ক্ষয়ে যাচ্ছে না। ...আমি ত অর্হৎ নই, সিদ্ধাচার্য নই, মুনি নই যে আমি কথাকে নতুন জীবন দিতে পারি। ...ক্ষয় হচ্ছে আমার। ....আমার অর্হৎ আমার সিদ্ধাচার্য, আমার মুনিদের জীবনের সব অর্থ আমারই পাঠের ফলে ধীরে ধীরে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে? (দেবেশ, ২০০৭ : ২৬১)

কুসুমবালার মনে হয়েছে যে, মন্ত্রের ক্ষয়ে ভগবান ক্রমশ দূরে সরে যাচ্ছেন, ফলে ভগবানের জন্য তিনি নতুন মন্ত্র, নতুন ভাষা তৈরি করতে চান। তাছাড়া তাঁর মতে, ভগবান জিনেন্দ্রনাথ তার জীবনের লক্ষ্য কিন্তু সর্বস্ব নন। 'তাই ভগবানকে ছাড়া ত এ-জীবন রাখার কোনো মানে হয় না।' (দেবেশ, ২০০৭ : ২৬১)। জীবনের অর্থ খুঁজতে গিয়ে কুসুমবালা দেখেন যে তা জীবনযাপনের চাইতে জটিল, যে পুজোপাঠ জীবনকে সরল করে দেয় বলে মানুষ হিসেবে কুসুমবালাও বিশ্বাস করতে চেয়েছেন, তিনিও চান না পুজোপাঠ তার জীবনকে জটিল করে তুলুক। সান্ত্বনার কোনো বাধাধরা খাতেও তিনি সন্তুষ্ট হতে পারে নি, হতে চানও নি। তাই সন্তানহীনতা নিয়ে পূর্ব জীবনে কেউ তাকে সান্ত্বনা দিতে এলে তিনি প্রচণ্ড রেগেও যেতেন। পূঞ্জীভূত সেই ক্ষোভ ও তার কারণ তিনি পোষা টিয়ার কাছে প্রকাশ করেন। "আসলে একটা অযোগ্যতার ব্যাপার ত! আমার এই এত বড় শরীরটা মা হওয়ার অযোগ্য– এ কথাটা কিছুতেই মেনে নেয়া যায় না। আমি যেন মেয়ে না, আমার যেন কোনো লিঙ্গ নেই, আমার

Dhaka University Institutional Repository

যেন কোনো গর্ভ নেই। এই কথাগুলি রাগের কথা ছিল।' (দেবেশ, ২০০৭ : ২৬২-৬৩)। তাঁর ক্ষোভের তীব্রতা এতটা বেশি, কারণ তিনি জানেন একটা মেয়ে যতটা পূর্ণ মেয়ে হতে পারে তিনি ততটাই পূর্ণ মেয়ে। ভগবান তার শরীরকে সুন্দর করে তৈরি করেছেন। তাই তিনি তাঁর জীবনের মধ্যভাগে এসে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হলেন:

> ভগবান যে সুন্দর পূর্ণতা আমার শরীরে দিয়েছেন, সেই সুন্দর পূর্ণতা ভগবান যদি আমার শরীরে দিলেন, তাকে আমি বৃথা যেতে দেব কেন? ভগবান যে সুন্দর পূর্ণতা আমার শরীরে দিয়েছেন, সেই সুন্দর পূর্ণতা আমি ভগবানকেই ফিরিয়ে দেব। সেই কত-কত বছর আগে থেকে আমি এর প্রস্তুতি নিয়েছি, আজ সেই প্রতিশ্রুতি উচ্চারণ করব– যা আমার শ্রেষ্ঠ তা আমি ভগবানকে দেব, আমার এই শরীর আমি ভগবানকে দেব, আমি আহার ত্যাগ করলাম, জলপান ত্যাগ করলাম। আমার মৃত্যু দিয়ে ভগবানের অদয়া গ্রহণ করলাম। (দেবেশ, ২০০৭ : ২৬৩)

কুসুমবালার এই ব্রত কেবল ভগবানের কৃপাধন্য হবার জন্য নয়, "বরং নিবিড়পাঠে এ অনুভবে আমরা পৌঁছাই– স্বেচ্ছায় মৃত্যুকে বরণ করার মধ্য দিয়ে তিনি যেমন আত্মগৌরবে উন্নীত হন, তেমনি অভিমান ও প্রতিবাদের অভূতপূর্ব আয়োজনকে আমাদের আরেকবার প্রত্যক্ষ করতে বাধিত করেন।" (অশোক, ২০১১ : ২৬০)। কুসুমবালার বয়ানেই তার সেই আত্মগৌরব, মৃত্যু-সত্যকে গ্রহণ করার কাঠিন্য, সর্বোপরি এক প্রতিবাদের রূপটি স্বচ্ছ ও প্রকট হয়ে ওঠে :

> যে নদীতে জল বয় না, সেই শুকনো নদীখাতের জন্য আমি আমার এই শরীর নিবেদন করলাম। যে-মানুষ তৃষ্ণায় জল পায় না, তার তৃষ্ণার নিবৃত্তির জন্যে আমি আমার এই শরীর নিবেদন করলাম। যে জল মানুষের তৃষ্ণা থেকে দূরে চলে গিয়েছে সেই জলকে মানুষের কাছে আনার জন্য আমি আমার শরীর নিবেদন করলাম। ...যে-পুকুরের জল লবণাক্ত হয়ে গেছে আর যে-সমুদ্রের জল তার লবণ হারিয়েছে, সেই সব ধর্মহীন জলের জন্যে আমি আমার শরীর নিবেদন করলাম। ... যে-সূর্য স্নিগ্ধ হয়ে গেছে, আার যে-চন্দ্রমা তপ্ত হয়ে উঠেছে, সেই সূর্য ও চন্দ্রের জন্যে আমি আমার শরীর নিবেদন করলাম। আমার এই শরীর জিনেন্দ্রনাথ গ্রহণ করুন।" (দেবেশ, ২০০৭ : ২৬৪)

এভাবে এক গহন ও স্তব্ধ নিঃসঙ্গতা বহন করতে করতে কুসুমবালা মৃত্যুশয্যা নিলেন, যেখানে রয়েছে সকল বিপর্যয়ের বিপরীতে প্রাণ-শরীর নিবেদনের দর্শন। তার জীবন জুড়েই যেন তিনি এই ইচ্ছামৃত্যুর দুর্জয় সংকল্প গড়ে তুলেছেন। "তবে, তার ঈশ্বর ভজনা, শান্ত সম্মানিত ও সমৃদ্ধ জীবনের অর্থহীনতার কারণ কিন্তু কোনো বিপন্ন বিস্ময় নয়, একেবারে অতিনির্দিষ্ট।" (স্বপন, ১৪২১ : ২৯৭)।

Dhaka University Institutional Repository

সমালোচকের মতে, "ঔপনিবেশিক মন ও তার শোষণ এবং শাসনের বিরুদ্ধে অঙ্গুলি সংকেত এক অভিনব নীরব প্রতিবাদ। ...সমস্ত উপন্যাসের মধ্যে দেবেশ রায়ের নিজস্ব প্রতিবাদ মূলত মানুষের চেতনাকে ফিরিয়ে দেওয়ার প্রয়াসেই রূপান্তরিত হয়েছে।" (অশোক, ২০১১ : ২৫৮-২৫৯)। পৃথক এক মৃত্যুশয্যা প্রস্তুত করতে কুসুমবালার ইস্পাতদৃঢ় ইচ্ছার প্রকাশে তার প্রতিবাদী চিত্ত অনেকটা স্পষ্ট হয়:

> মৃত্যুশয্যা বানানোর জন্য কুসুমবালার আদেশই যথেষ্ট ছিল না। কিন্তু তাঁর দেওরের কাছে কুসুমবালার আদেশ ছিল যথেষ্টরও বেশি। তাঁকেই সেই আদেশটি দিতে হয় যার পর পরিচারিকারা পাঠস্থানে শয্যা বানাবার কাজে লাগে। তাঁর মাথার ওপরে কুসুমবালার হাতটা স্থির ছিল। কুসুমবালা সেটা আর তোলেন নি। তাঁর দেওর দুই হাতে নিজের মুখটা ঢেকে অঝোরে কাঁদতে-কাঁদতে কান্না-বিকৃত গলায় ডুকরে ওঠেন, 'শয্যা বানাও।' (দেবেশ, ২০০৭ : ২৭১)

কুসুমবালার এই ইচ্ছামৃত্যুর ব্রত তার দেওর ও পরিবারের অন্যান্যের কাছে ধর্মীয় আচার হিসেবেই প্রতিষ্ঠা পায়, তারা এর প্রতিবাদ করতে সম্পূর্ণ অপারগ হয়ে পড়ে। কারণ, "জৈন ধর্মানুসারে কেউ যদি নিজেকে ভগবানের কাছে সমর্পণ করে, অন্নজল ত্যাগ করে দেহাবসান ঘটান, তাঁকে বাধা দেয়ার অধিকার কারো নেই।" (দেবেশ, ২০০৭ : ২৭১)। যদিও কুসুমবালা নাগরিক এক নারী; তার ধর্মবিশ্বাসও এখানে খুব প্রথাগত নয়, বরং তাকে যুক্তিবাদী ও দৃঢ় ব্যক্তিত্ব-কাঠামো ও নিজস্ব মনন-চিন্তার অধিকারী বলেই মনে হয়। তার ইচ্ছামৃত্যু আসলে জীবনকে সঙ্গে করে জীবনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ আর তা একই সাথে ব্যক্তিগত এবং নৈর্ব্যক্তিকতার প্রতীক হয়ে ওঠে। ইচ্ছামৃত্যুর ব্রতে পৌঁছে যাওয়ার মুহূর্তে কুসুমবালা অনুভব করেছেন যে, "মানুষকে আর মানুষের মত করে বেঁচে থাকতে দেয়া হবে না।" (দেবেশ, ২০০৭ : ২৫৬)। বিপন্ন জীবন ও অস্তিত্বের রূপচিত্রও অনুভব করেন তিনি :

> এখন সমুদ্রের জলে তেল ভাসছে, যে-সব মাছ কোনোদিন সমুদ্রের তলায় জলচ্ছায়া ছাড়া কিছু দেখে নি, তারা পারে উঠে আসছে... সমুদ্রের তেলে পাখিদের পাখা ভারী হয়ে গেছে, বাতাস কাটতে পারছে না, এত বড় মাথা আর পেট আর হাড় জিরজিরে বুক নিয়ে একটা বাচ্চা যখন হামাগুড়ি দিয়ে লঙ্গরখানার দিকে হাঁটে, তখন তার পেছন-পেছন সদর রাস্তা দিয়ে শকুন হেঁটে যায়, মাটির নীচে খনিতে আগুন লেগে গেছে... মানুষের পায়ের তলায় পিষে যাচ্ছে মানুষেরই মাথা। (দেবেশ, ২০০৭ : ২৫৬)

Dhaka University Institutional Repository

ব্যক্তিক ও সামগ্রিক জীবনের ও সময়ের বাস্তব চেহারা এবং এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদের রূপক হিসেবে কুসুমবালার ইচ্ছামৃত্যুর পথ নির্দেশিত হয়েছে, তা আসলে ঔপন্যাসিকেরই নির্দেশিত পথ। সন্তানহীনা বিধবা নারী কুসুমবালা তার সন্তানহীনতা কিংবা সন্তানজন্ম ও সন্তানপালনের ক্রিয়া থেকে বেরিয়ে আসতে চেয়েছেন, সর্বোপরি নিজের গতানুগতিক পরিচয় থেকে বেরিয়ে আসতে চেয়েছেন। এই ইচ্ছেমৃত্যুর আয়োজনকে ঔপন্যাসিক ব্যাখ্যা করেন :

> তিনি যে ঈশ্বরের অদয়া গ্রহণের জন্যে নির্বাচিত তা তিনি শেষ পর্যন্ত প্রমাণ করেন কিন্তু সে-প্রমাণ আর কেউ বোঝে না। মানুষের জীবন-যাপনে শুভ-অশুভের বিপর্যয় ও পৌর্বাপর্ব বিনষ্ট হয়ে যাওয়ার প্রায়শ্চিত্তও তিনি তাঁর আত্মদানে করেন কিন্তু সে-আত্মদানও আর-কেউ বোঝে না। (দেবেশ, ২০০৭ : ২৭২)

সমালোচকের মতে, "যদি বলি নিঃসন্তান, জৈন পরিবারের বিধবা কুসুমবালার ইচ্ছামৃত্যুর প্রতিবেদন এটা, খুবই হালকা হয়ে যাবে। আমাদের চারপাশে, আমাদেরই মধ্যে কে যে কত গহন স্তব্ধ নিঃসঙ্গতা বহন করে চলেছে, দীর্ঘ দীর্ঘ বছর জুড়ে গড়ে তুলেছে ইচ্ছামৃত্যুর দুর্জয় সংকল্প– তার 'খপর নাই'। কুসুমবালা তাদেরই একজন।" (স্বপন, ১৮২১ : ২৯৭)। কুসুমবালার অদয়া গ্রহণের বিবরণ, দার্শনিক প্রত্যয়, তৃষ্ণার ব্যবহারিক ও জাগতিক তাৎপর্য, ধর্মীয় আবেদন কিংবা প্রতিবেদনের শুরুতে বাঁকুড়া-পুরুলিয়ার উষর ভূমির দীর্ঘায়িত ও আপাত সম্পর্কহীন বর্ণনাও এভাবেই বহুমুখীনতা পায়। এ প্রসঙ্গে সমালোচকের অভিমত :

> উপন্যাসে কিংবা প্রতিবেদনধর্মী আখ্যানে একমুখীনতা এখন আর তেমন করে বিবেচ্য বিষয় নয়। বহুমুখীনতাই আজ মান্যতা পাচ্ছে সর্বত্র। ফলে চট করে বিষয়ানুভবকে ধরতে চাওয়া সহজ হয় না। প্রত্যেক ব্যক্তির বিশ্বাস, অবিশ্বাস, অনুভূতি ও অনুভূতিহীনতা প্রতিবেদনের অংশ হিসেবে সর্বাগ্রে মান্যতা পাচ্ছে। সঙ্গে সাম্প্রতিক ভারতবর্ষের কিছু কিছু সমস্যা এবং রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক সংকটের আবর্ত সবকিছুকেই জটিলতর করে তুলছে। আর এরই প্রতিফলন রূপান্তরিত হচ্ছে পাঠকৃতিতে। (অশোক, ২০১১ : ২৬১)

বাঁকুড়া-পুরুলিয়ার শুষ্ক জমিতে জলের অভাব ও সেখানকার ভূ-প্রাকৃতিক বিষয়ে নেপথ্যে এক দীর্ঘ বিবরণ সম্পর্কে অবশ্য সমালোচকের দ্বিমত রয়েছে। কেউ বলেছেন যে, "উপনিবেশোত্তর চেতনা-সম্পৃক্ত এই উপন্যাসে বিবরণের পেছনে বিবরণ যে পেরিয়ে যেতে পারে– উপন্যাসটির তাৎপর্য

Dhaka University Institutional Repository

অনুধাবনের ক্ষেত্রে তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ইঙ্গিত।" (অশোক, ২০১১ : ২৫৬)। উপন্যাসের সূচনায় লেখক নিজের স্বভাবে নিজেই লিখেছেন পরবর্তী পরিচ্ছেদগুলোর সঙ্গে সম্পর্কহীন বাঁকুড়া-পুরুলিয়ার ভূ-বৃত্তান্ত সংক্রান্ত ভূমিকা। "তাৎপর্যপূর্ণভাবে লক্ষণীয় এ সাংবাদিকতা যে সাহিত্যিক সাংবাদিকতা তা শুরু থেকেই আমাদের ভাবিয়ে রাখে।" (অশোক, ২০১১ : ২৫৬)। আবার বাঁকুড়া-পুরুলিয়ার শুষ্ক ভূমির সূক্ষ্ম ও প্রলম্বিত এই বর্ণনাকে কেউ মনে করেন যে তা এতটা দীর্ঘ না হলেও উপন্যাসের তেমন ক্ষতি হত না :

> উপন্যাসের প্রথম দীর্ঘ পরিচ্ছেদটি জুড়ে লেখক বাংলার নদ-নদীর চলাচল, তাদের উৎস, প্রকৃতি, সম্মিলন, বিচ্ছেদ নিয়ে এতটা অনুপুঙ্খ না সাজালেই পারতেন। 'তথ্য এখানে 'প্রাণবান' হতে পারেনি বলেই আমার মনে হয়।" (স্বপন, ১৪২১ : ২৯৭)

তবে এই দীর্ঘ পর্বমালা জুড়ে বাঁকুড়া ও পুরুলিয়ার জলহীন বৃষ্টিহীন দীর্ঘ গ্রীষ্মকালের বিবরণ, কুসুমবালার মন ও জীবন সর্বোপরি তার আত্মদানের কাহিনীর সাথে সংলগ্ন হয়ে উপন্যাসের কাহিনী ও আখ্যানে স্বাতন্ত্র্য এনে দিয়েছে, গড়ে উঠেছে উপস্থাপনার নতুন এক ভঙ্গি। কারণ, এক্ষেত্রে "সবচেয়ে জরুরি বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে জীবন সত্যের চিত্র।" (অশোক : ২০১১ : ২৫৭)। ঔপন্যাসিকের ভাষায় : "বাঁকুড়া-পুরুলিয়ায় খরা না হওয়া সত্ত্বেও জেগে থাকে তৃষ্ণা ... সে তৃষ্ণার কোনো আকস্মিকতা নেই, কোনো নাটকীয়তা নেই।" (দেবেশ, ২০০৭ : ২১৯)। সুতরাং 'দেবেশের নির্মাণ সুচিন্তিত ও সুপরিকল্পিত।' (অশোক, ২০১১ : ২৫৭)। উপন্যাসে কুসুমবালা জৈনর বৃত্তান্ত প্রতীকী তৎপর্য হয়ে দেখা দিয়েছে। তৃষ্ণা যত বাড়ে, মাটির ভেতর থেকে নিঃসাড়ে উঠে আসা জলের সীমাও তত নিচে নেমে যায়। কুসুমবালার ইচ্ছামৃত্যুর বিবরণ সমাপ্তির দিকে এগিয়ে গেলে ঔপন্যাসিক *একটি ইচ্ছামৃত্যুর প্রতিবেদন*-কে কাঙ্ক্ষিত পূর্ণতার দিকে নিয়ে যান :

> বাঁকুড়া-পুরুলিয়া আরো একটি জলহীন তৃষ্ণার্ত গ্রীষ্মের দিকে আবর্তিত হয়। ভারতে ঠাণ্ডা পানীয়ের বিক্রি গত বছরের চাইতে পরের বছরে বাড়ে। (দেবেশ, ২০০৭ : ২৭২)

যেখানে কোকাকোলা আর পেপসিকোলা মিলে আটাশি কোটি ভারতবাসীর কোল্ড ড্রিংকের তৃষ্ণা মেটাবে বলে বাজার দখল করেছে, কিংবা যেখানে দক্ষিণ কোরিয়া ও চীন দেশের চাইতে আমরা কোল্ড ড্রিংক কম খাই বলে আন্তর্জাতিক ভোগ্যপণ্যের উৎপাদকের কাছে আমাদের মাথা হেঁট হয়ে যায়, ঔপন্যাসিকের মতে, "সেখানে বাঁকুড়া-পুরুলিয়া বা এই ধরণের অঞ্চল ভারতের মানচিত্রের

Dhaka University Institutional Repository

অন্তর্গত আর থাকে না।" (দেবেশ, ২০০৭ : ২২৩)। সুতরাং আমরা আর পুরো অস্তিত্ব নিয়ে বেঁচে থাকতে চাই না। মূলত বাঁকুড়া-পুরুলিয়ার তৃষ্ণায় মহানাগরিক জীবনের কোনো ব্যত্যয় ঘটেনি। মহান জাগতিক আলোড়নের কোলাহল কোথাও মুহূর্তের জন্যে থেমে থাকে নি। "নির্মম সময়ের পেছনে হাঁটতে হাঁটতে প্রতিবেদন থেকে এই বার্তাই যেন বারংবার প্রতিধ্বনিত হচ্ছে।" (অশোক, ২০১১ : ২৫৯)। কারণ "আমরা তৃষ্ণা দূর করার বদলে তৃষ্ণার যুক্তি বের করি আর দুই জায়গায় দুই তৃষ্ণাকে পরস্পরের প্রতিযোগী করে তুলি।" (দেবেশ, ২০০৭ : ২২২)। সমালোচকের মতে :

> লক্ষণীয়ভাবে এই দার্শনিক ভাবনাকে দেবেশ উপনিবেশোত্তর সাম্প্রতিক অভিজ্ঞতার সঙ্গে মিলিয়ে মিশিয়ে দিয়েছেন। (অশোক, ২০১১ : ২৫৭)

তৃষ্ণাকে বিলাসে বদলে নেয়া আর এর পেছনে সক্রিয় সূক্ষ্ম পদ্ধতি ও প্রক্রিয়াকে ভুলে যাওয়া এবং জীবনকে ভগ্নাংশিক করে তোলা– সর্বোপরি উত্তর-উপনিবেশিত সময়ের ও অস্তিত্বের নিদারুণ সংকটকেও ঔপন্যাসিক চিহ্নিত করেন :

> যেন ভগ্নাংশিক জীবনই আমাদের সমগ্র জীবন। মৃত্যু, নিশ্চেতনা, পক্ষাঘাত যখন এমনই অবধারিত তখন একটি ইচ্ছামৃত্যুর পূর্ণাঙ্গ কাহিনী কল্পনা করার সাধ হয়– এই সমবেত জীবন তার অগ্রাধিকারের শৃঙ্খলা বিধ্বস্ত করেছে বলে সেই মানুষ আর বেঁচে থাকতে চায় না, সে তার বাঁচার স্বাধীনতাকে প্রত্যাহার করে নিক। (দেবেশ, ২০০৭ : ২২৩)

উত্তর-উপনিবেশিত সময়ে বেঁচে থাকার স্বাধীনতা প্রত্যাখ্যাত কিংবা হরণকৃত যা-ই হোক না কেন, "ঔপন্যাসিক মূলত সময়ের বাস্তব ঘটনাকে ধরতে চেয়ে উপনিবেশোত্তর কালেও উপনিবেশের করাল গ্রাসে অবশ হয়ে যাওয়া আমাদের মন ও মানসিকতার খোল-নলচে পাল্টে দিয়ে আমাদের মধ্যে জাগিয়ে তুলতে চাইছেন নতুন নতুন অঙ্কুর। তিনি উপনিবেশের ছায়াকে স্পষ্টতর করতে চেয়ে উপনিবেশোত্তর চেতনাকে সমৃদ্ধ করতে চাইছেন। (অশোক, ২০১১ : ২৫৮)।

ঔপন্যাসিক কর্তৃক নিবেদিত 'প্রতিবেদন' থেকে পরিণত হওয়া 'নভেল' এবং নভেলের বাইরে খবর-কাগজের টুকরো টুকরো সকল প্রতিবেদনের তথ্যই এ প্রসঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। খরায়, দাঙ্গায়, যুদ্ধে, ধনবাদী সমাজের নানা সংকটে মানুষের মৃত্যু, ইচ্ছেমৃত্যুসহ কোনো এক খবরের কাগজে 'বিদর্ভের তুলাচাষীদের গণ আত্মহত্যার খবর, কিংবা ঐ একই কাগজে বলিউডি নায়িকার বিয়ের সংবাদ, রিয়ালিটি শো 'বিগ ব্রাদার'-এ ভারত-প্রতিনিধিত্বের নামে নায়িকা শিল্পা শেঠির পোশাকের

Dhaka University Institutional Repository

'আটপৌরে আরাম' ও 'Big Boob'-এর প্রদর্শন নিয়ে কলকাতার একটা কাগজে এর প্রতিবাদ ইত্যাদি কোনো প্রতিবেদনই চোখ এড়ায় না প্রতিবেদক-ঔপন্যাসিকের। আর "প্রতিবেদনে থাকা ফাঁক থেকেই তৈরি হয় নভেলে ঢুকে পড়ার দরজা।" (দেবেশ, ২০০৭ : ২৭৭)। প্রতিনিয়ত তৈরি হওয়া প্রতিবেদন থেকে রচিত এই উপন্যাসের ধরন কেবল আঙ্গিকের সংকট থেকেই সৃষ্ট নয়। তাছাড়া, "মহাকালের ধাবমান স্রোতে ব্যক্তি চরিত্রের প্রবল উপস্থিতির প্রবণতাকে পাল্টে দিয়ে লেখক যে ঔপন্যাসিক প্রতিবেদন তৈরি করেছেন তাতে সমাজ ও সময় প্রধান অংশ হিসেবে আসে নি– বরং মুখ্য উপজীব্য ও কুশীলব হয়ে ওঠে।" (অশোক, ২০১১ : ২৬১)।

উপন্যাসের ভুবন ও আখ্যানে ঔপন্যাসিক যেমন তার সূক্ষ্ম পরীক্ষা-নিরীক্ষাকে সম্পূর্ণ করেছেন অন্যদিকে আঙ্গিক ও ভাবনায় 'উপন্যাস' নামক শিল্পরূপকে ভিন্ন মাত্রা দিয়েছেন। *একটি ইচ্ছামৃত্যুর প্রতিবেদন*-সহ *প্রতিবেদন* সংকলনে স্থান পাওয়া প্রতিটি প্রতিবেদন-শীর্ষক উপন্যাসেই দেবেশ রায় ঔপনিবেশিক নির্মিতিকে প্রত্যাখ্যান করেছেন। তিনি নিশ্চিতভাবেই প্রমাণ করেছেন উপন্যাস কিংবা উপন্যাসের প্রতিবেদন উপস্থাপিত হতে পারে বিচিত্র রূপে ও আদলে; যা আখ্যানের চিরাভ্যস্ত রূপকে অতিক্রম করে।

Dhaka University Institutional Repository

টীকা

১ ১৯৯২-এ প্রথম প্রকাশিত সংস্করণে *খরার প্রতিবেদন* উপন্যাসটির চারটি পরিচ্ছেদ ছিল, যা *প্রতিবেদন* (২০০৭) নামক সংকলনে বাদ দেয়া হয়েছে। পরিচ্ছেদগুলো হল : ১. 'মধ্যপ্রদেশের সরগুজা জিলার বীজকুড়া গ্রামে অনাহারে মৃত জাখলি বাঈয়ের রিবাই পাণ্ডোর সঙ্গে অম্বিকাপুর সদর হাসপাতালে সাক্ষাৎকার' ২.'মধ্যপ্রদেশের সরগুজা জিলার রঘুনাথপুর থানার বীজকুড়া গ্রামে অনাহারে মৃত জাখলি বাঈয়ের প্রেতজীবনের বিবরণ ও প্রেতাত্মার স্বীকারোক্তি' ৩. 'ওড়িশার কালাহাণ্ডি জেলার অত্‌রল গাঁয়ে খামে হরিজনের অনাহারে মৃত্যুর প্রত্যক্ষদর্শী তুলসী নায়কের বিবৃতি' ৪. 'মহারাষ্ট্রের বিদ জিলার কাইজ তহশিলের পিরাচওয়াদি গ্রামে রখমবাঈয়ের মৃত মোষের প্রেতাত্মার প্রতিবেদন।' এমনকি উপন্যাসের শিরোনাম-ও বাদ দেয়া হয়েছে। সংকলনে স্থান পেয়েছে মোট চারটি প্রতিবেদন-উপন্যাস, যথা– *খরার প্রতিবেদন* (১৯৯২), *দাঙ্গার প্রতিবেদন* (১৯৯৩), *শিল্পায়নের প্রতিবেদন* (১৯৯৬) ও *একটি ইচ্ছামৃত্যুর প্রতিবেদন* (১৯৯৪)। এই সংস্করণের ভূমিকায় দেবেশ এ সম্পর্কে লেখেন :

> পর-পর লেখা হয়েছিল– খরার, দাঙ্গার, ইচ্ছামৃত্যুর প্রতিবেদন, ৯৫-এর মধ্যেই। আলাদা-আলাদা বইগুলোও তখন বেরিয়ে গেছে। ... কিন্তু তখন থেকেই এই দশ-বার বছর ধরে আমার খুঁত-খুঁত লাগছে যে এমন পৃথক পৃথক বই হওয়ার ফলে 'প্রতিবেদন' তার আকারের সমগ্রতা খুইয়েছে। ... এতগুলি বছর পর 'প্রতিবেদন'কে একটা সম্পূর্ণ চেহারা দেয়া গেল। কোন-কোন বদলকে আমার মনে হয়েছে– এই সম্পূর্ণতার পক্ষে অপরিহার্য–
>
> এক– লেখাগুলির পার্থক্য ঘুচিয়ে দিতে শুধুই এক, দুই এমন চারটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। স্বতন্ত্র সময় ও নাম বাদ দেয়া হয়েছে। ...
>
> তিন– এ বদলের সঙ্গত অন্য বদলগুলিও ঘটেছে– পরিচ্ছেদ নাম নেই, পরিচ্ছেদ ভাগ টানা।
>
> চার– কিছু অংশ বাদ গেছে, নতুন কিছু অংশ আছে।

২ মার্কসীয় চিন্তক ও গবেষক-প্রাবন্ধিক শিবাজী বন্দ্যোপাধ্যায় দেবেশ রায়কে প্রশ্ন করেন, "ব্যক্তির জীবন যে ইতিহাসের অন্তর্গত সেই ইতিহাসকে যদি একজন ঔপন্যাসিক খোঁজেন তা হলে তিনি কমিউনিস্ট পার্টিকে কীভাবে দেখবেন ?" উত্তরে দেবেশ রায় বলেন :

Dhaka University Institutional Repository

অতি বৈজ্ঞানিক, অতি পূর্বনির্দিষ্ট, অত্যন্ত উপরতলার বাস্তবতাবোধ, একেবারে ফালতু কতগুলো শব্দ, এর সঙ্গে হয়তো পার্টির দৈনন্দিন কাজ মিলে, কিন্তু আমার কাছে পার্টিটা তা নয়। আমার উপন্যাস লেখবার একমাত্র কাজ যদি হয় ব্যক্তির ঐতিহাসিকতা খোঁজা, তাহলে আমাকে আর-একটা শক্তিতেও বিশ্বাস করতে হয় যে শক্তি ইতিহাসটা তৈরি করতে পারে। ব্যক্তি, দেশ ও কালের সীমা অতিক্রম করেও সেই শক্তি সক্রিয় থাকতে পারে। সেই শক্তিই কমিউনিস্ট পার্টি। ব্যক্তির একটা ইতিহাস আছে এটা যদি আমি বিশ্বাস করি, তাহলে সে-ইতিহাস আরো বড় একটা ইতিহাসের অংশ– এটাও আমাকে বিশ্বাস করতে হয়। আর সেই ইতিহাসটা মানুষ তৈরি করে– এটা বিশ্বাস না করলে আমার ব্যক্তির ইতিহাসের কাহিনীও হয়ে যাবে– ব্যক্তির নিয়তির কাহিনী। কিন্তু আবার ব্যক্তির নিয়তিও ইতিহাসের অন্তর্গত। আর কমিউনিস্ট পার্টি ছাড়া ত কেউ বলে না যে তারা ইতিহাসকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। (দেবেশ, ১৯৯১ : ২০০)

৩ *The Geography of War and Peace : From Death Camps to Diplomates* গ্রন্থে (সম্পাদক Colin Fint) বলা হয়েছে :

> The mosque (Babri) takes its name from the Mughal rular Babar who ordered its construction in the early 1500s'. Hindu tradions maintains that the mosque was built on the side of a Hindu temple destroyed by the Mughals, a practice that they apparently used elsewhere in northern India to assert their dominance. Hindu nonetheless continued to worship at the site, which they believed to be the birthplace of the god Ram, one of the incarnations of Vishnu. (Fint, 2005 : 165)

৪ মহাশ্বেতা দেবী তাঁর ৬ই *ডিসেম্বরের পর* (১৯৯৬) উপন্যাসে বাবরি মসজিদ ভাঙা ও দাঙ্গার প্রেক্ষাপটে সাম্প্রদায়িকতা-বিরোধী সংস্কারমুক্ত মানবিকতার বয়ান পেশ করেন, দুই নারী চরিত্র রুচিরা ও কেতকীর মাধ্যমে। অধিকাংশ কথাসাহিত্যিকই দেশবিভাগ ও বিভিন্ন সময়ে ঘটা নানা দাঙ্গার সংকটময় মুহূর্তকে চিত্রিত করতে ধর্মনিরপেক্ষতা ও অসাম্প্রদায়িক চেতনাকে তাদের শিল্প-বিবেচনায় এনেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থপঞ্জি

অশোক দাশ (২০১১)। *দেবেশ রায়ের প্রতিবেদনমূলক উপন্যাস : উপনিবেশোত্তর চেতনার আখ্যান প্রকল্প*। বাংলা আখ্যান : বহুমাত্রিক পাঠ [সম্পা. বেলা দাস ও বিশ্বতোষ চৌধুরী] রত্নাবলী, কলকাতা। পৃ. ২৪৭-২৬২

দেবেশ রায় (১৯৯১)। *উপন্যাস নিয়ে*। দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা।

দেবেশ রায় (২০০৭)। *প্রতিবেদন*। দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা।

দেবেশ রায়(২০১৮)। *উপন্যাসের বিধি সংকট*। প্রতিভাস, কলকাতা-৭০০০৭২

পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯৯৮)। *দেবেশ রায়ের উপন্যাস-গল্প : এক পাঠকের পাঠক্রিয়ায়*।

পঞ্চাশের দশকের কথাকার [সম্পা. উজ্জ্বলকুমার মজুমদার] পুস্তক বিপণি, কলকাতা। পৃ. ২২৮-২৪৭

প্রিয়কান্ত নাথ (২০০৭)। *কাল-বিভাজিত বাংলা উপন্যাস*। বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা।

রবিন পাল (২০১১)। *উপন্যাসের বর্ণময় ভুবন*। অক্ষর প্রকাশনী, কলকাতা।

সমীর চক্রবর্তী (১৯৯২)। *উত্তরবঙ্গের আদিবাসী চা-শ্রমিকের সমাজ ও সংস্কৃতি*। মণীষা গ্রন্থালয় প্রা. লি., কলকাতা।

সাদ কামালী (২০১০)। *চলতি রীতি ঘরোয়া মেজাজ*। ধ্রুবপদ, ঢাকা।

Colin Fint (2005). The Geography of War and Peace: From Death Camps to Diplomates. Oxford University Press, Inc. New York.

সহায়ক পত্রিকা

স্বপন পাণ্ডা (১৪২১)। 'দেবেশ রায়ের *প্রতিবেদন* নিয়ে দুই পাঠকের বাক্যবাজি'। কঙ্ক (দেবেশ রায় সম্মাননা সংখ্যা), ইম্প্রেশন, কলকাতা। পৃ. ২৯০-২৯৭

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায় : বিবিধ উপন্যাস
প্রথম পরিচ্ছেদ : ইতিহাসিত মানুষ

সাহিত্য ও ইতিহাস কিংবা ইতিহাস ও সাহিত্যের এবং জীবন-জগতের পারস্পরিক অন্বিত স্বরূপ অনুধাবন করে উপন্যাস সৃষ্টি করেন একজন সফল সাহিত্যিক। উপন্যাস ও ইতিহাস, ইতিহাস ও ব্যক্তিমানুষের সম্পর্ক এক কথায় ঔপন্যাসিক দেবেশ রায়ের ইতিহাস-পাঠ ও অনুশীলন বৈচিত্র্যময়। ঘটনার বিবৃতিমুখিনতা কিংবা ঘটনার ফলিত রূপের ঊর্ধ্বে উঠে কল্পনাকে স্বাধীন অথচ জীবন-সংলগ্ন করা এবং ইতিহাস ও জীবনের নবভাষ্য নির্মাণ ঔপন্যাসিক দেবেশ রায়ের সহজাত। ব্যক্তি-নিরপেক্ষ নিরন্তর ও শাশ্বত সময় আর ব্যক্তিগত সময়স্রোত এবং এই দু'য়ের সম্পর্ক নির্ণয়ই সাহিত্যিকের অন্বিষ্ট। *ব্যক্তি-পুরুষেরা* (১৯৯৫) নামক প্রবন্ধ সংকলনের ভূমিকায় দেবেশ রায় লিখেছেন : "সমাজ ও সভ্যতায় ব্যক্তির ভূমিকা চিরকালই রহস্যময় থেকে গেল। কখনো-বা ইাতহাস তার মাধ্যম হিসেবে বেছে নেয় কোনো ব্যক্তিকে, কখনো-বা কোনো ব্যক্তি ইতিহাসকে তার মাধ্যম হিসেবে বেছে নেয়। কখনো ব্যক্তি হয়ে ওঠেন ইতিহাসের প্রণেতা, কখনো ইতিহাস হয়ে ওঠে ব্যক্তির রচয়িতা।" (উদ্ধৃত, পার্থপ্রতিম, ১৯৯৮ : ২২৯)। অস্তিত্বের শেকড় অনুসন্ধানে পুনরাবিষ্কার এবং অস্তিত্বের আধুনিক সঙ্গতির প্রয়োজনে করতে হবে ইতিহাস পাঠ– এই নবার্জিত উপলব্ধি দেবেশ রায়ের শিল্পচিন্তাতেও রয়েছে। তবে তাঁর কাছে ইতিহাস হল অতীত ও বহমান বর্তমানের এক নিবিড় ঐকিক পাঠ। তাই চলমান সময়কে তিনি ইতিহাসের নিরিখেই বিচার করেন। বহমানতার প্রশ্নেই ইতিহাস স্বতন্ত্র কোনে ব্যাপার নয় দেবেশ রায়ের কাছে; তা বর্তমান ও ভবিষ্যতের সীমায় লীন।

দেবেশের উপন্যাসে বৃহৎ অর্থে 'ইতিহাসিত' মানব আসলে সবাই। *তিস্তাপারের বৃত্তান্ত*, *সময়-অসময়ের বৃত্তান্ত* যেমন এই সময়ের নতুন ইতিহাস ও মানুষ, ব্যক্তি ও ইতিহাস আবিষ্কার। ইতিহাস ও ভূগোলের দ্বৈত টানে এপিসোডিক বিন্যাসে নদীধৃত মানুষের জীবনযাপন কেমন করে বদলে যায়

Dhaka University Institutional Repository

তারই দীর্ঘ কাহিনীস্রোত *তিস্তাপারের বৃত্তান্ত*। এ উপন্যাস ব্যক্তি ও ইতিহাসের, প্রকৃতি ও মানব ইতিহাসের সম্পর্কের এক আধুনিক ফর্ম।

তবে ঐতিহাসিক পট, ইতিহাস-বিশ্বস্ত বা বর্ণিত চরিত্রও দেবেশের উপন্যাসে আছে; যেমন– *স্বামী-স্ত্রী* উপন্যাসটি সত্তরের দশকের নকশাল আন্দোলন সময়কার। শৌরীন্দ্র ও হৈমর নিতান্ত ব্যক্তিক জীবন ও পারিবারিকতায় একটি ছেলের সাময়িক আশ্রয় নেওয়ার প্রসঙ্গে অলক্ষ্যে ঢুকে পড়ে ইতিহাস। *আপাতত শান্তিকল্যাণ হয়ে আছে*-র করুণামোহন সমাদ্দারের কাহিনী প্রসঙ্গেও এসেছে নকশাল সমাচার। *সময়-অসময়ের বৃত্তান্ত* উপন্যাসের নকশাল-চরিত্র বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর ঐতিহাসিকতা বিষয়ে দেবেশ গ্রন্থ ভূমিকায় নিজস্ব মত প্রকাশ করেছেন। *বরিশালের যোগেন মণ্ডল*-এর যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব। দেবেশের উপন্যাসে যোগেন মণ্ডলের রাজনীতি, সক্রিয়তা পরিণতিসহ-ই উপস্থাপিত।

দেবেশের উপন্যাসের চরিত্রেরা কিংবা তাদের জীবনযাপন যেন হয়ে ওঠে ইতিহাসের মতই তথ্যনির্ভর, ইতিহাসের মতই কালানুক্রমিক। একজন ব্যক্তি, ইতিহাসের আধার হয়ে উঠেছে, তার আনন্দ-বিষাদ, সম্ভাবনা অথবা ট্রাজেডি তারই অস্তিত্বের অংশ, একই সাথে ইতিহাসেরও। "এই বীক্ষাগত সংহতিতে ডিটেল্‌স আসঞ্জিত থাকে বলেই, এ-শুধু অনুপুঙ্খ নয়।" (পার্থপ্রতিম, ১৯৯৮: ২০১)। 'সময়, সমাজ আর ইতিহাস-বিধৃত ব্যক্তিমানুষের অনুসন্ধানই হল উপন্যাসের অন্বিষ্ট' বলেছিলেন দেবেশ রায়, মানুষের আখ্যান গড়নে তিনি সে চেষ্টা করেছেন; দেবেশের নির্মিত 'ইতিহাসিত' মানুষেরাও সেই নিরিখে দ্রষ্টব্য।

ক. ইতিহাসের লোকজন

ইতিহাসের লোকজন উপন্যাসটি 'আজকাল' শারদীয় সংখ্যায় বের হয় ১৯৯১ সালে। গ্রন্থাকারে প্রথম প্রকাশ ১৯৯২-এ। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির একজন অধ্যাপক সৌরাংশুকে ঘিরে উপন্যাসের পট, যাঁর পঁয়ত্রিশ বছরের শিক্ষকতার জীবন সাফল্যমণ্ডিত, যিনি জীবনভর সমাজতন্ত্র বা মার্কসবাদের আদর্শ সযত্নে লালন করেছেন। ছেলেমেয়েদের পড়াতে পড়াতে শিক্ষক জীবনের প্রায় শেষ পর্যায়ে এসে সমাজতন্ত্র কিংবা তাঁর যাবতীয় রাজনৈতিক মতাদর্শ ও প্রাতিষ্ঠানিক তত্ত্বের জগৎ ও বিশ্বাসে শুরু হয় দ্বন্দ্ব ও গভীর সংকট। আন্তর্জাতিক জগতে ঘটে যাওয়া বিশ শতকের কিছু গুরুত্বপূর্ণ

Dhaka University Institutional Repository

ঘটনা তার দীর্ঘদিনের চিন্তার পৃষ্ঠপোষকতায় গড়ে ওঠা বিশ্বাসে আত্মবিধ্বংসী ফাটলের সৃষ্টি করে, তারই প্রতিক্রিয়ায় তিনি নিদারুণভাবে হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়েন। তাই 'আত্মজীবনযাপন শেষ করার আগেই তাঁর আত্মজীবনের সামনে সৌরাংশুকে প্রশ্নাতুর থমকাতে হয়।' (দেবেশ, ১৯৯২ : ৯)। অধ্যাপক সৌরাংশুর দৃষ্টিকোণে নিয়ন্ত্রক পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্রের উত্থান-পতন বিশ্লেষিত হয়েছে, নির্ণীত হয়েছে বিশ্বায়ন শুরুর আদি 'পলিসি'। সমসাময়িক বিশ্বরাজনীতির প্রেক্ষাপটে একজন সচেতন মানুষের অন্তর্গত অস্থিরতা ও একটি ক্রান্তিকালকে উপন্যাসের উপজীব্য করেছেন দেবেশ। উপন্যাসের ঐতিহ্যিক কিংবা অভ্যস্ত কাঠামো-বিবর্জিত গল্পহীন এই প্রতিবেদনে দেবেশ রায়ের নিজেরও আত্ম-বিশ্লেষণ রয়েছে যেন; তাঁর বিশ্বাসকৃত ও চর্চিত রাজনৈতিক চিন্তাকে চুলচেরা বিশ্লেষণ ও জিজ্ঞাসার মুখোমুখি দাঁড় করিয়েছেন তিনি।

যেসব নীতি প্রচলিত সমাজপদ্ধতি বা রাষ্ট্রপদ্ধতির বিরুদ্ধে বহুদিন ধরে সংগ্রাম করছে তার মধ্যে সোভিয়েত রাশিয়ার 'বলশেভিজম' ছিল সবচেয়ে বেশি প্রভাবশালী। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য আংশিক বা সম্পূর্ণ লোপ করে সমাজ ও সমষ্টিগত একীকরণ ও সমান বণ্টনই 'সোশ্যালিজম' প্রভৃতি সমাজতান্ত্রিক মতবাদের লক্ষ্য। আঠার ও উনিশ শতকে বিজ্ঞানের শ্রেষ্ঠ দানসমূহ ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্পজগতে যে যুগান্তর এনেছিল তাতে পৃথিবীর অর্থনীতি একটা নতুন ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠা পেয়ে রাষ্ট্র ও সমাজকে অর্থনৈতিক অগ্রগতির সাথে অচ্ছেদ্য বন্ধনে বেঁধেছে। বিভিন্ন দেশে রাষ্ট্রনৈতিক সমস্যার সমাধানকল্পে অর্থনীতির উদ্ভাবিত নব নব ব্যাখ্যা এ ক্ষেত্রে শুধু থিওরিতেই সীমাবদ্ধ থাকে নি, পরন্তু রাষ্ট্রগত গণবিপ্লবের ধারায় সে সব থিওরিকে কার্যক্ষেত্রে রূপদানেও সফল হয়েছে। এছাড়া পুঁজি-নির্ভর নব অর্থনৈতিক ব্যবস্থার অনিবার্য প্রতাপ সমাজতন্ত্রবাদের বিরোধীই হয় নি কেবল, সূক্ষ্মরূপে সমাজতান্ত্রিক মতাদর্শের নানা দিককে ক্রমশ গ্রাসও করেছে।

রাশিয়ায় সমাজতন্ত্রবাদ প্রসারের মাধ্যমে উচ্চ-নীচ, শিক্ষিত-অশিক্ষিত ও প্রতিভাশীল বা প্রতিভাহীন ব্যক্তির সমানাধিকারকরণ, ব্যক্তিগত অধিকারবাদ ও স্বত্ব উপস্বত্ব লোপ এবং ধনসম্পত্তি সমান বণ্টনের তাগিদই ছিল রাষ্ট্রের একমাত্র লক্ষ্য। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য সম্পূর্ণ অস্বীকার করে ব্যক্তিমাত্রকে বৃহত্তর সমাজের নামে শ্রমিকে পরিণত করা রাশিয়ার সমাজতন্ত্রের অন্যতম ত্রুটি। এছাড়া নানা কারণে পার্টির অভ্যন্তরীণ (সংশোধনবাদী ও অন্যান্য) দ্বন্দ্ব, ব্যক্তিস্বার্থের ক্রমবিকাশ ও পরিণতি, ব্যক্তিস্বার্থ ও

Dhaka University Institutional Repository

সামাজিক স্বার্থের দ্বন্দ্ব এবং সর্বোপরি সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিতে পুঁজিবাদী অর্থনীতির অনুপ্রবেশ রাশিয়ার সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে ব্যর্থ করে দিতে থাকে। এছাড়া যে জাতীয়তাবাদী চিন্তা থেকে সোভিয়েত জাতিরাষ্ট্রগুলো ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল সেটাও পরবর্তীকালে একইরকম থাকে নি।

সোভিয়েত রাশিয়ায় সমাজতন্ত্র বিপ্লব ও তার পরবর্তী অবস্থা সম্পর্কে *ইতিহাসের লোকজন* উপন্যাসে দেবেশ রায়ের ঐতিহাসিক ও সমাজতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা রয়েছে। রাষ্ট্র-সমাজ-রাজনীতি-অর্থনীতি সর্বোপরি বিজ্ঞান প্রযুক্তি-পুঁজিবাদ প্রভৃতির আলোকে ঔপন্যাসিক সোভিয়েতের ইতিহাস বিশ্লেষণের চেষ্টা করেছেন। উপন্যাসের অধ্যাপক চরিত্র সৌরাংশুর পঠন-পাঠন, দ্বান্দ্বিক চিন্তা-চর্চার মধ্যে এসব স্পষ্ট হয়েছে। সৌরাংশু অর্থনীতির অধ্যাপক। অর্থনীতি-তত্ত্বের ভিত্তিতে তিনি উন্নয়নের সূচক পড়ান কিংবা তাত্ত্বিকভাবে তিনি জানেন কোন্ কোন্ সূচক উন্নয়নকে প্রমাণ করে। তাঁর জ্ঞানতত্ত্বে দেশের বা জাতির উন্নয়ন; আর্থিক-বাণিজ্যের কিংবা জীবনযাপনের উন্নয়ন কখনোই পৃথক উপাদান নয়। সৌরাংশুর মতে– এই সমগ্রতার ধারণা খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে পড়ে আছে সোভিয়েত ইউনিয়নে, সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায়। সৌরাংশু আরও ভাবেন :

> টেকনোলজিকে জীবনের, সমাজজীবনের সর্বত্র এমন স্বীকার করে নেয়ার ফলেই কি সমাজতন্ত্রে বিপ্লবের এক পর্ব থেকে আর-এক পর্বে উত্তরণ হয়ে উঠল প্রাত্যহিক রুটিন, একঘেয়ে অপ্রামাণিক ? মাথাপিছু গড় আয়ুবৃদ্ধিতে ও এমন-কি আয়ুবৃদ্ধিতেও সোভিয়েত ইউনিয়নে মাদকাসক্তি, আত্মহত্যা, মানসিক ব্যাধি কমেনি। আবার আর-একদিকে টেকনোলজিও ত তেমন সর্বব্যাপক হয়ে ওঠেনি সোভিয়েত ইউনিয়নে। ... বিজ্ঞানকে তত্ত্ববিশ্বের জায়গায় বসিয়েছিল এনলাইটেনমেন্ট। মার্ক্সবাদই 'বিজ্ঞানের যুগ'-এর অবসান ঘোষণা করে। অথচ নব্যবিজ্ঞানের নামে সমাজতন্ত্রে শুধু যে বিজ্ঞানের বিপরীত চর্চা প্রাধান্য পেল তা নয়, বিজ্ঞানকে ব্যবহার করা হল কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বের একটা দলকে ক্ষমতায় রাখার উদ্দেশ্যে মার্ক্সবাদী তত্ত্ববিশ্বের এক বানানো ছাঁচ তৈরির কাজে। (দেবেশ, ১৯৯২ : ২৯)

ইতিহাস-পাঠ সৌরাংশুকে বলে দেয়– তাঁর মনন-তত্ত্ব ও জ্ঞান আছে; কিন্তু বাস্তবতা বদলে গেছে কিংবা যাচ্ছে। সমাজতন্ত্রের ধ্বংসস্তূপের ওপর দাঁড়িয়ে সৌরাংশু এক আত্মচেতনায় পৌঁছান, যা– "বাস্তব আর মননের বৈষম্যের ভিতর থেকে উত্থিত পরাজিতের আত্মসচেতনতা, বাস্তবের সাযুজ্য থেকে সঞ্চারিত এক মানবিক আত্মসচেতনতা।" (দেবেশ, ১৯৯২ : ৯৪)। সমকালে সমাজতান্ত্রিক

Dhaka University Institutional Repository

ভিত্তিতে রাষ্ট্র গঠন ও অর্থনৈতিক সাম্য রক্ষা-আন্দোলন একসঙ্গে আর হতে পারে না– সর্বগ্রাসী ধনতন্ত্র তা হতে দেয় না। ধনতন্ত্রের মূল পলিসি কিংবা অন্ধকারতম দিক হল– ধনবৈষম্য, শিল্পবাণিজ্যে সংকট আর সর্বাংশে নিয়ন্ত্রণমুক্ত অবাধ অর্থনীতির নৈরাজ্য।[১] শিল্পনির্ভর ধনতন্ত্র ক্রমেই হয়ে ওঠে আগ্রাসী। ক্রমপ্রসারিত শিল্পপুঁজি একচেটিয়া পুঁজিতে বদলে যায়– ফলে জাতীয় পুঁজির সম্প্রসারণ হয়ে ওঠে এক অনিবার্য প্রক্রিয়া। অধ্যাপক সৌরাংশু এই সম্প্রসারণের ভয়াবহতা অনুভব করেছেন যে– 'মার্কসবাদের দর্শনকেও একসময়ে অর্থনীতির তত্ত্ব খেয়ে নেয়।' (দেবেশ, ১৯৯১ : ১১০)। তাঁর মনে হতে থাকে– অর্থনীতিকেই তিনি এতকাল মার্কসবাদ বলে জাহির করে এসেছেন। তিনি এই অভিজ্ঞানে পৌঁছান– "মানুষের অনুভবের একটা নিজস্ব গতি আছে, মানুষের বুঝে যাওয়ার একটা নিজস্ব পদ্ধতি আছে। সেই গতি আর পদ্ধতিই মানব ইতিহাসের কার্যকারণ হয়ে ওঠে। মানুষের আপত্তিই সোভিয়েত ও পূর্ব ইয়োরোপের শাসকদের শাসন ক্ষমতা থেকে সরিয়েছে। মানুষের নৈতিক আপত্তি, মানুষের খিদে নয়। খিদে নয়।" (দেবেশ, ১৯৯১ : ১১০)।

সংহত ও সংক্ষিপ্ত এ উপন্যাসের পরতে পরতে জটিল ও ঘোলাটে বিশ্বরাজনীতি, অনুন্নত বিশ্বের অনুন্নয়ন বিষয়ে সমাজবিজ্ঞানীদের অভিমত ও তার সঙ্গে সঙ্গত মতান্তর, সমকালীন বিশ্বরাজনীতিকদের কার্যকলাপ বিশ্লেষণ এবং তা থেকে একটি সমন্বিত সিদ্ধান্তে উপনীত হবার প্রয়াস (যদিও সেই সিদ্ধান্ত চিত্তের চাঞ্চল্যকে প্রশমিত করে না) উপন্যাসটিকে জটিল ও অনন্য করে তুলেছে। সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে যাবার সময়টাতে *ইতিহাসের লোকজন* উপন্যাসটি লিখেছেন দেবেশ রায়। ইতিহাস ও সমকালীন বাস্তবতার নিরিখে একজন মার্কসবাদ বিশ্বাসী সাহিত্যিক ও রাজনৈতিক কর্মী হিসেবে দেবেশ রায় নিজের বিশ্বাসকৃত রাজনৈতিক মতাদর্শের একটা পর্যালোচনাও এতে করেছেন। ইতিহাস পাঠেই ঔপন্যাসিক এই বোধে পৌঁছাতে চান যে– যারা সমাজতন্ত্রকে সমর্থন করত, যারা সমাজতন্ত্রের জন্যে প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে মূল্য দিয়ে আসছে, যারা সমাজতন্ত্রের মানবভিত্তি নির্মাণ করেছে– রাজনীতিতে ও ব্যক্তিজীবনে ভালমন্দের এক নৈতিক নিরিখের প্রতি আনুগত্য থেকেই তারা সে-সব করত। কেউ তা করেছে সুন্দর-অসুন্দরের এক নিরিখ থেকে– মানুষের পক্ষে যে-পথ সুন্দর, যে গতি সুন্দর। "... সমাজতন্ত্রের সেই নীতি আর সৌন্দর্যই তার কর্মীদের এমন পরাক্রান্ত করে তুলেছিল– মানুষের ইতিহাস বদলে দেবার এমন সামর্থ্য, আগে কখনো এমন সংগঠিত আকার নেয়নি।" (দেবেশ, ১৯৯১ : ১১২)। এই সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা থেকেই

Dhaka University Institutional Repository

নিজেদের সুবিধাজনিত সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্য দোহন করেছিল কয়েক লক্ষ লোক। ঔপন্যাসিক এ পর্যায়ে সেই গুরুতর প্রশ্নটি উত্থান করেন :

> সমাজতান্ত্রিক প্রতিশ্রুতি আর বাস্তবতার ভিতর ফারাক ঘটতে-ঘটতে কোন্ এমন খাত তৈরি হয়ে গেল যার ওপর কোনো সেতু-বন্ধন সম্ভব ছিল না ? গত সত্তর বছর ধরে সোভিয়েতে ও সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ায় মানুষ সেই চেষ্টাই করেছে– তারা তাদের আস্তিক্য রক্ষা করতে চেয়েছে, কোনো জ্ঞানতত্ত্বের কাছে আস্তিক্য বিকিয়ে দিতে চায় নি। শেষে, শতাব্দীর শেষ দশকে এসে মানুষ ঘুরে দাঁড়াল। তার আস্তিক্যের ওপর নির্ভর করে কমিউনিস্ট পার্টিগুলি যদি আসলে কতকগুলো লোকের বা বড় জোর কিছু গোষ্ঠীর প্রতিষ্ঠান হয়ে থাকে তা হলে চুলোয় যাক তার জ্ঞানতত্ত্ব। মানুষের অন্তত নিজের আস্তিক্যের পক্ষে বিদ্রোহের অধিকারটুকু থাক। (দেবেশ, ১৯৯১ : ১১১)

আত্মজ্ঞানে বা আত্মপর্যালোচনায় এ সূত্রে প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে সৌরাংশুর মার্কসীয় চেতনা। সমকালীন মার্কসবাদ চর্চায়, সমাজতান্ত্রিক আদর্শের পরিণতি কিংবা রূপান্তরের সমান্তরালে সৌরাংশুর বিশ্বাসকৃত মার্কসবাদ যেন মেলে না, তাতে তাঁর চর্চিত অর্থনীতির জ্ঞানসূত্রও বদলে যায়। সৌরাংশু এ পর্যায়ে হয়ে পড়েন কিছুটা নস্টালজিক। পঞ্চাশ বছর আগে পার্টি করতে গিয়ে আত্মগোপন পর্বের জীবনও যেন এখনকার আত্মগোপনহীন প্রশ্নাতুর, দ্বান্দ্বিক মার্কসিস্টের (সৌরাংশুর মতে, 'বিলিভিং, আনপ্রফেশনাল, আনরিভলিউশনারি মার্কসিস্ট') চেয়ে ভালো ছিল। (দেবেশ, ১৯৯১ : ৯৪)। ছাত্রজীবনে তিনি কমিউনিস্ট পার্টি করেছেন, জেল খেটেছেন, পুলিসের মার খেয়েছেন, জেলে বসে মার্কসবাদ পড়েছেন, মার্কসবাদ পড়ার জন্যই পড়েছেন অর্থনীতি; জেলে অবস্থান করে এম. এ পরীক্ষা দিয়েছেন; সেইসব কারণেও বোধহয় মার্কসবাদ আর সমাজতন্ত্রের সংকট তাঁর পক্ষে আরো তীব্র হয়ে ওঠে। ইতিহাস আর অনুঘটক সময়ের পরিক্রমায় মানুষের মননক্রিয়ার পরিবর্তন, রাষ্ট্রব্যবস্থা-সমাজ-অর্থনীতি-রাজনীতি-দর্শন এই সকল কিছুর বিবর্তনিক প্রক্রিয়াকে মূলত ইতিহাসের বোধেই বিচার করেন সৌরাংশু। তাঁর এই ইতিহাস পাঠে সময়-সমকালের পরিণতি হয়ে ওঠে দুর্বিষহ, অনেকটা কাঠামো-স্বীকৃত অনিবার্য নিয়তির মতই। সর্বগ্রাসী ধনতন্ত্রই যেন হয়ে ওঠে এই নিয়তি বা নিয়ন্তা। মার্কস যেমন বলেছিলেন– 'সংকটকালেই ধনতন্ত্রের একমাত্র আত্মসমালোচনার ইচ্ছে হয়'[২] – সৌরাংশুর মতে– ভারতবর্ষে এই কাজটা মার্কসবাদীরা করে দেয়। তাঁর আত্মসমালোচনায় ইতিহাস-পাঠ তাই বারবার ফিরে আসে :

Dhaka University Institutional Repository

> ইতিহাস গতিমুখ বদলেছে– সোভিয়েত-চীন থেকে, অন্তত সৌরাংশুর জীবৎকালের জন্য। সৌরাংশু অন্তত এটুকু মার্কসবাদী থেকে যেতে চান– তাঁর মৃত্যুর পরেও ইতিহাসের জয় হবে এমন কোনো উপকথা তিনি রটাবেন না। ... ইতিহাস বলতে সৌরাংশুরা যা বুঝতেন সেই পাঠ এখন ভুল প্রমাণ হয়ে গেছে।
>
> ... আমার ভিতরে বিনিময়যোগ্য উদ্বৃত্ত কিছু নেই, ইতিহাস যখন নিঃশেষ করে তখন নিঃসীম করেই নিঃশেষ করে। (দেবেশ, ১৯৯১ : ১০৯)

কর্মজীবনের শেষে এসে সৌরাংশুর মনে হয় যে– তিনি যে অর্থনীতি পড়ান সেটা বিজ্ঞান নয়, 'বিজ্ঞানের ফলস কনসাসনেস।' (দেবেশ, ১৯৯১ ; ১০৮)। মানুষের ইতিহাসে ধনতন্ত্র একটা অনন্ত শক্তি। এই ধারণা থেকেই তৈরি হয়েছে টেকনোলজি আর আর্থিক উন্নয়নের ধারণা। মার্কস তাঁর ক্রিটিকে ইতিহাসে ধনতন্ত্রের স্থায়িত্বের ধারণাটাকে সবচেয়ে বেশি আক্রমণ করেছিলেন। সৌরাংশুর পর্যালোচনায় এ সূত্রেই আসে ভারতবর্ষের আর্থ-উৎপাদন কাঠামো চিত্র; ভারতের পেশাজীবী (ফর্মাল/ইনফর্মাল সেক্টর) নানা অর্থনৈতিক শ্রেণির মানুষের কথা– যারা আসলে কোন্ অর্থনৈতিক সম্পর্কে সম্পৃক্ত বা কোন্ উৎপাদন কাঠামোর অন্তর্ভুক্ত সৌরাংশু তা মেলাতে পারেন না। ভারতবর্ষের কৃষিতে ধনতন্ত্র প্রবেশ করেছে কী না এও যেমন জিজ্ঞাসার তেমনি রাষ্ট্রব্যবস্থা সামন্ততান্ত্রিক না ধনতান্ত্রিক তা-ও প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে পড়ে :

> ভারতের রাষ্ট্রব্যবস্থা সামন্ততান্ত্রিক ও ধনতান্ত্রিক, নাকি ধনতান্ত্রিক ও মধ্যবিত্ত, নাকি আধা-ঔপনিবেশিক এই তর্কে ভারতের মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট আন্দোলন এখন টুকরো-টুকরো হচ্ছে। এর মীমাংসা কি হওয়া সম্ভব ? (দেবেশ, ১৯৯১ : ৭১)

মীমাংসা সম্ভব নয় কারণ, উদ্ভূত সামাজিক ক্ষমতা-বিন্যাস, প্রতিষ্ঠা-প্রভুত্ব এবং পুনরাবর্তনের প্রক্রিয়া, বাজার-অর্থনীতি ও শিল্পায়নের বিভ্রম ভারতীয় শাসনব্যবস্থাকে ক্রমান্বয়ে প্রভাবিত করেছে। অর্থনৈতিক সম্পর্কে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় রয়েছে উৎপাদকবর্গ, শ্রেণিকরণে যাদের অধিকাংশই হল 'ইনফরমাল সেক্টরে' কাজ করা নিম্ন আয়ের বা বর্গের মানুষ। সৌরাংশুর পি. এইচ. ডি ছাত্রী শমিতার গবেষণায় যাদের একটা শ্রেণি উঠে আসে। অর্থনীতির অধ্যাপক সৌরাংশুর পুরনো অভ্যাসে তিনি এই শ্রেণিকে ইনফরমাল সেক্টরে ভাগ করলেও শেষপর্যন্ত তাঁর পাবলিক-প্রাইভেট সেক্টর আর ইনফরমাল সেক্টরের যুক্তির কাঠামো ভেঙে পড়ে। শমিতার গবেষণায় বা লেখায় দেখা যায়, পেশা থেকে পেশায়

Dhaka University Institutional Repository

মানুষ চলে যাচ্ছে অবলীলায়। ভারতীয় ধনতন্ত্রের জনভিত্তি ১০০ কোটি মানুষ, শ্রমিক যেখানে সবচেয়ে সহজলভ্য, সেই প্রক্রিয়ায় পেশায় রূপান্তরও নিয়মিত ঘটে; সেখানে "ট্র্যানজিস্টরের মেকানিক হয়ে যায় ক্যাটারারের ঠাকুরের শাগরেদ, শ্রমের বিমূর্তনে তাঁতি থেকে হয়ে যায় গাড়ির বডিমিস্ত্রি, আর সেখান থেকে হয়ে যায় ইটের গাড়ির দালাল; পেশার কোনো স্থিরতা, রুজির বা বসবাসের কোনো স্থিরতা তাদের জীবনে নেই। মার্কসের উদ্ধৃতি দিয়ে সৌরাংশু এই শ্রেণির পেশার রূপান্তরও বুঝতে চেষ্টা করেন :

> 'গ্রুন্ডরিজ'-এ শ্রমের বিমূর্তন প্রসঙ্গে মার্ক্স বলেছিলেন শ্রমের নির্দিষ্ট কোনো ধরনের প্রতি এই উদাসীনতা 'ইনডিফারেন্স' টু স্পেসিফিক লেবারস করেসপন্ডস টু এ ফর্ম অব সোসাইটি ইন হুইচ ইনভিডিজুয়ালস ক্যান উইথ ইজ ট্রান্সফার ফ্রম ওয়ান লেবার টু এনাদার।' সৌরাংশু মনে-মনে উচ্চারণ করেন, 'উইথ ইজ...' এবং এর পরের অংশটুকুও, কোন ধরণের কাজ কে করবে তা 'ম্যাটার অব চান্স ফর দেম।' শিল্প বিপ্লবের ইয়োরোপে কে খনিতে কাজ করছে, কে চটকলে, কে জাহাজ তৈরির কারখানায় কাজ করছে আর কে দুধ দোয়ানোর বা মাংসকাটার বা ইস্পাত গলানোর কারখানায় সে সবই ত তার পক্ষে 'ম্যাটার অব চান্স'; একটা ঘটনা মাত্র, আর এক পেশা থেকে আর এক পেশায় চলে যাওয়া ঘটে যেতে পারে অবলীলায় 'উইথ ইজ'। (দেবেশ, ১৯৯১ : ৭৪)

সৌরাংশু বুঝে যান গভীর, জটিল, গূঢ়, বিপরীত নিয়তিসদৃশ ধনতন্ত্রের গতি, তার সর্পিলতা, পরিপাকশক্তি, চোয়ালের জোর– 'সমস্ত পূর্বতন ব্যবস্থাকে সে কেমন নিজের ভিতর টেনে নেয় আবার নিজের সুবিধেমত অপরিবর্তিত রাখে।' (দেবেশ, ১৯৯১ : ৭৫)। সৌরাংশু কিছুটা আত্মসমালোচনাপ্রবণ হয়ে ওঠেন তাঁর পি.এইচ. ডি ছাত্রী শমিতার গবেষণায় উঠে আসা মানুষের চিত্রে। শমিতার লেখায় রয়েছে সেইসব মানুষের বেঁচে থাকার দলিল যাদের মধ্যে বেঁচে থাকাটা আসলে এক জৈব আকাঙ্ক্ষা, তত্ত্বহীন জৈব আকাঙ্ক্ষা। অধ্যাপকের টেবিলে স্তূপীকৃত বইয়ের তাত্ত্বিক আড়ালের বাইরে এইসব মানুষের বেঁচে থাকা– যেখানে সৌরাংশুর অর্থনীতি-বিদ্যা, জ্ঞানচর্চা-এপিসটেমোলজি ঠেকে গেছে। এদেরই একটা শ্রেণি নগর কলকাতার ঢাকুরিয়া রেল কলোনির মানুষজন; যারা মৃত্যুর নিশ্চয়তার ভিতর থেকে সরে আসার জায়গা হিসেবে রেললাইনের পাশের বা মাঝের জায়গাটা বেছে নিয়েছে। কখনও কখনও রেললাইনের পাশে খেলতে থাকা উদাসীন কোনো শিশু কাটা পড়ে ট্রেনে, তখন "হাহাকার ডোবানো ট্রেনের ছুটন্ত আওয়াজের ভিতর ছুটে-ছুটে-ছুটে-

Dhaka University Institutional Repository

ছুটে বাচ্চার মৃতদেহের টুকরো কুড়তে হয়েছে আর কুড়তে-কুড়তেও আত্মরক্ষার জন্য শবকুড়ুনিদের ট্রেনের লাইন ছেড়ে দিয়ে দাঁড়িয়ে ট্রেন যেতে দিয়ে আবার সেই লাইনে সমবেত হতে হয়।" (দেবেশ, ১৯৯১ : ৪৩)। প্রাচীন অভ্যাসে ট্রেনের অবধারিত গতি ভুলে যাওয়া মানুষ, জীবিকার অনিশ্চয়তায় থাকা মানুষ কিংবা এক পেশা থেকে অন্য পেশায় চলে যাওয়া মানুষ– এদেরকে নিয়ে শমিতার জিজ্ঞাসা। সে ঘুরে ঘুরে জেনে নিতে চায় এঁরা কে কোথা থেকে এসেছেন, কেন এসেছেন, এখানে কী করেন– গ্রামে এঁদের জীবনের অনিশ্চয়তা কোথায় ছিল আর এখানে সেটা দূর হয়েছে কি-না। তেমনি এক নারীর দীর্ঘ সাক্ষাৎকার রয়েছে উপন্যাসে, যে নারী যোধপুরে ঠিকে ঝি-র কাজ করে, কখনো বিয়েবাড়ির ঠাকুরকে সহযোগিতার কাজ, যে জানে নগর কলকাতায় 'রেট ছাড়া কোনো কাজ হয় না', মথুরাপুর থেকে কলকাতায় এসে সে চা খাওয়াও শিখে গেছে, টিভিতে সিনেমা-সিরিয়াল দেখে, কাজে যাওয়া প্রতিটা বাড়ির মালিক তার কাছে সাহেব আর যোধপুরটা বিলেতের মতো। শমিতার সাথে তার কথোপকথন বা সাক্ষাৎকারের অংশবিশেষ :

'আচ্ছা, কাজেকম্মে যারা বাইরে যায়, তারা সবাই সাহেব ?'

'তা ত হয়ই। সাহেবরা বাড়ি থেকে বেরলে তবে আমাদের কাজ।'

'এই যারা গাড়ি চড়ে যায়, ট্রেনে চড়ে যায় সবাই সাহেব?'

'হতে পারে। প্লেনেও ত যায় শুনি।'

'আপনি প্লেন দেখেছেন?'

'রোজই দেখি। ঐ সব দেখে আমরা টাইম ঠিক করি। সাড়ে সাতটায়, সন্ধ্যায়, আবার রাত দুটোয়।'

...

'মথরাপুরে আপনারা কবে ছিলেন, কলকাতায় কবে এলেন, ঢাকুরিয়াতে কবে থেকে থাকলেন। এগুলো একটু ভেবে-ভেবে বলুন-না। মানে, এতটা সময় ত গেছে।'

'সময় ত যায়ই দিদি।'

'তার ত একটা হিশেবনিকেশ থাকবে।'

'থাকবে না ? থাকবেই ত ! এতটা সময় দিদি যে একটা মানুষের সারা জীবন বাঁচার চাইতেও বেশি।' (দেবেশ, ১৯৯১ : ৫৪)

Dhaka University Institutional Repository

সাধারণ মানুষের সাথে শমিতার কথোপকথন সৌরাংশুকে আরো আহত ও ব্যথিত করে তোলে। এসব মানুষ দেশ কী তা জানে না, রাজনীতি জানে না, রাষ্ট্রশোষক কিংবা শাসকদের চেনে না, যাদের জীবনযাপনে কোনো বৈচিত্র্য নেই, কী পরিমাণ ভাত খেলে পেট ভরে তা জানে না, একাধিক বেলায় যে খাবার গ্রহণ সম্ভব তা-ও জানে না– কিন্তু গুহ বাবু নিয়ে গেলে ভোটকেন্দ্রে গিয়ে তার কথামত ব্যালটে সিল মেরে আসে। গবেষক শমিতা বিশেষত অধ্যাপক সৌরাংশুর জ্ঞানতত্ত্ব, অনুভব, সারা জীবন ধরে লালিত আস্তিক্য বিধ্বস্ত হতে থাকে এইসব মানুষের বেঁচে থাকার সত্যে, তাদের মুখের কথা বলার ভঙ্গিতে কিংবা ভাষায়, তাদের সময়জ্ঞানে। শমিতা-সৌরাংশুর সময় আর এই মানুষের সময় হয়ে পড়ে পৃথক। ঐ নারী জানিয়ে দেয়, সময়ের যে একটা হিসেব আছে সেটা সে জানে, কিন্তু সময় তার পক্ষে এমন বাঁচামরার ব্যাপার যে হিসেব রাখার সময় সে সারাজীবনেও পায়নি। সময়কে ভুলে, জীবনকে ভুলে এ এক কঠিন বেঁচে থাকা। উচ্চবিত্ত বা মধ্যবিত্ত নাগরিকের ভাষা ও অর্থের সাথেও সংযোগহীন এরা। শমিতা তার অর্থ নিয়ে জ্ঞানের সীমা যতই বাড়াতে চেয়েছে, আর সেই সময়ভোলা নারী ততটাই তার নিজস্ব শব্দ, অর্থ নিয়ে শমিতার জ্ঞানের বিপরীতে চলে গেছে। ধনতন্ত্রের অপ্রতিহত গতি ও ক্ষমতাতেই গ্রাম্যজীবন বদলে যায় পৌরজীবনে। কলোনি যা করতে পারে নি, উত্তর-কলোনি বা স্বাধীন দেশগুলিই সে পৌরজীবন নব উদ্যোগে গড়ে তোলে। ভারতীয় ধনতন্ত্রেও এর বাইরে নয়। সমান তৎপরতায় সেও উৎপাদনকে করে তোলে বিমূর্ত, বরং "প্রাক্তন উপনিবেশের ধনতন্ত্র বলে সে কিছু অতিরিক্ত লাম্পট্যের সুযোগ পেয়েছে। আর সেই লাম্পট্য সত্ত্বেও ধনতন্ত্রের নিয়মেই ভারতীয় ধনতন্ত্র সমস্ত কিছুকেই গ্রাস করে নিতে পেরেছে, মার্ক্সবাদকেও।' (দেবেশ, ১৯৯১ : ৭৭)।

শমিতার লেখার মানুষজনের চেহারাও পেয়ে যান সৌরাংশু, রেললাইনের বসবাসকারী সেই মানুষজনের 'ইতিহাসভোলা পদক্ষেপ, পদক্ষেপভোলা ইতিহাস !' (দেবেশ, ১৯৯১ : ৭৭)। যাদের সময়জ্ঞান নেই, সময়ের বোধ নেই, জীবনযাপনের বোধ নেই, কিন্তু সময়ব্যাপী জীবনের অভ্যাস আছে। এ অনুভবের পর সৌরাংশুর আক্ষেপ :

> আঃ ধনতন্ত্র যদি আর-একটু কম সর্বগ্রাসী হত ! (দেবেশ, ১৯৯১ : ৭৭)

চলমান সময় আর ইতিহাসের মানুষ সৌরাংশু সময়ের বাইরে থাকা কিংবা সময়কে প্রত্যাখ্যান করা মানুষের জীবনযাপনের তল খুঁজে পান না। অধ্যাপকের আইডিওলজিকে নিঃসার প্রমাণ করা সেই

Dhaka University Institutional Repository

সময়হীন মানুষেরাও ইতিহাসেরই মানুষ। কিন্তু সেই ইতিহাস সৌরাংশুদের নয়, তাঁর ভেঙে যাওয়া আস্তিক্য, জ্ঞানতত্ত্বের অদ্বৈত, রাজনৈতিক মতাদর্শ, বিশ্বাস কিংবা দর্শন সবই ভেঙে পড়ে জীবনের শেষে; যে ভেঙে যাওয়াটাকে তিনি আবার নতুন করে জুড়তে অসমর্থ হয়ে পড়েন। আচ্ছন্ন মনে ক্লান্তি-অবসাদ-ক্ষিদেও যেন ভুলে যান তিনি। আর নিজের অর্জিত সকল জ্ঞান থেকে পলায়নপর হয়ে অর্জন করতে চান সময় ও পৃথিবীর চলমানতার নতুন কোনো জ্ঞানতত্ত্ব।

খ. যোগেন মণ্ডল : উদ্বাস্তু ইতিহাসের প্রত্যাবর্তনে

২০১০ সালে প্রকাশিত হয় দেবেশ রায়ের হাজারোর্ধ্ব পৃষ্ঠার সুবৃহৎ উপন্যাস *বরিশালের যোগেন মণ্ডল*। নিকট ইতিহাসকে অবলম্বন করে লেখা এই উপন্যাসের কালপর্ব মোটামুটিভাবে ভারত-স্বাধীনতার আগের কয়েকটি দশক। উক্ত সময় সময়পর্ব একদিকে যেমন ঘটনাবহুল, তেমনি নানা বিতর্কের আধার।

স্বাধীনতা ও দেশভাগের সময়কালে যোগেন মণ্ডল ছিলেন দুই বাংলার রাজনীতির অন্যতম আলোচ্য ও প্রভাবসঞ্চারকারী ব্যক্তিত্ব। পরবর্তীকালে বাংলার রাজনীতি বা ইতিহাসের এত বিস্তৃত আলোচনার মাঝে যোগেন মণ্ডল ক্রমশ পরিণত হয়েছিলেন এক বিস্মৃত মানুষে। প্রবল প্রভাব থেকে প্রায় বিস্মৃতির কারণ এই মহা আখ্যানে খুঁজতে চেয়েছেন দেবেশ রায়। যোগেন মণ্ডলের রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ, দর্শন যা একসময়ে প্রবল সাড়া ফেলেছিল– এই উপন্যাসে তা বিস্তারিতভাবেই রয়েছে। দেবেশ রায় গোটা আখ্যান জুড়ে অনুপুঙ্খ বিস্তারে দেখিয়েছেন যোগেন মণ্ডল বরিশালের মাটি থেকে উঠে এসে কীভাবে গোটা উপমহাদেশের রাজনীতিকে প্রভাবিত করেছেন; বিশেষত বাংলার নমঃশুদ্র আন্দোলন কীভাবে তাঁকে ঘিরে আবর্তিত হচ্ছে।

যোগেন মণ্ডলের জন্ম ২৯ জানুয়ারি, ১৯০৪ সালে। বরিশাল জেলার গৌড়নদী উপজেলার মৈস্তারকান্দি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন তিনি। ১৯২৪ সালে মেট্রিকুলেশন এবং ১৯২৬ সালে বরিশাল বি.এম কলেজ থেকে আইন পাশ করেন। একই কলেজ থেকে ১৯২৯ সালে ডিগ্রি পাস করার পর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৩৪ সালে আইন পাশ করেন। কলেজে তিনি অশ্বিনীকুমার দত্তের সামাজিক সংগঠনের সাথে যুক্ত হন। এই সংগঠনের কাজ ছিল কৃষকদের দারিদ্র্য ও স্বাস্থ্য সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে।

Dhaka University Institutional Repository

এরপর তিনি বরিশাল সদর কোর্টে আইন ব্যবসা শুরু করেন। এ সময় যোগেন্দ্রনাথ বরিশাল জেলা বোর্ড-এর সদস্য হন। ১৯৩৭ সালের বঙ্গীয় আইন পরিষদ নির্বাচনে তিনি বাকেরগঞ্জ উত্তর-পূর্ব সাধারণ নির্বাচনী এলাকা থেকে একজন স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে সরলকুমার দত্তকে (অশ্বিনীকুমার দত্তের ভ্রাতুষ্পুত্র ও উত্তরসূরি) পরাজিত করে জয়ী হন। ১৯৪৫-৪৬ সালের নির্বাচনেও তিনি তফসিল ফেডারেশনের হয়ে বাকেরগঞ্জ দক্ষিণ-পশ্চিম (সংরক্ষিত) নির্বাচনি এলাকা থেকে নির্বাচিত হন। উত্তর পূর্ব বরিশালের আপামর 'চণ্ডাল-অচ্ছুৎ' এবং প্রগতিশীল হিন্দু ভোটারদের অকুণ্ঠ সমর্থনই এর বড় কারণ।

ল' কলেজে পড়ার সময় যোগেন্দ্র মণ্ডল থাকতেন প্যারীমোহন দাশের বাড়িতে, প্যারীমোহন দাশের ছেলেমেয়েদের পড়িয়ে আর প্রুফ রিডিং করে। ভারতবর্ষে তখন উত্তাল জাতীয়বাদী আন্দোলনের সময়। রাজনীতি জীবনের শুরুতে যোগেন্দ্রনাথ কংগ্রেস নেতা শরৎচন্দ্র বসুর সংস্পর্শ লাভ করেন। সে সময়ে তিনি স্বতন্ত্র তফশিলি দলের সেক্রেটারি নির্বাচিত হন। ১৯৩৮ সালের ১ আগস্ট মন্ত্রিসভার বিপক্ষে দাঁড়ানোর এবং অনাস্থা উত্থাপনকারীদের মধ্যে তিনি ছিলেন অন্যতম। যদিও ১৯৪০ সালে কলকাতা কর্পোরেশনের নির্বাচনে শরৎ বসু দে'র সুপারিশক্রমে তিনি কংগ্রেসের প্রার্থী হিসেবে তফশিলি সম্প্রদায়ের জন্য সংরক্ষিত আসনে কাউন্সিলর নির্বাচিত হন। ১৯৪৩ সালে ২৪ এপ্রিল খাজা নাজিমুদ্দিন মন্ত্রিসভা গঠন করলে যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল তাঁর ২১ জন তফশিলি সদস্য সহকারে ঐ মন্ত্রিসভার পক্ষে সমর্থন জানান। যদিও এই মন্ত্রিসভা বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। ১৯৪৫ সালে ২৯ মার্চ তা ভেঙে দেয়া হয়। ইতোমধ্যে মণ্ডল 'All India Schedeuled Caste Federetion' গঠন করেন। মন্ত্রিসভায় থাকাকালে যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল সর্বভারতীয় পর্যায়ের তফশিলি নেতা ড. বি. আর. আম্বেদকরের সাহচার্যে আসেন। তাঁরই পরামর্শে যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল বাংলায় 'Bengal Provincial Scheduled Caste Federation' গঠন করেন এবং সভাপতি হিসেবে একে বাংলার তফশিলি সম্প্রদায়ের একমাত্র দেশভক্ত সংগঠন হিসেবে ঘোষণা দেন। তাঁর দৃষ্টিতে কংগ্রেস ছিল শুধুমাত্র হিন্দু সম্প্রদায়ের সংগঠন। তিনি নিজেকে 'হিন্দু' মনে না করলেও নিজেকে তফশিলি সম্প্রদায়ের সদস্য হিসেবে এ শ্রেণির উন্নয়নে যথাসাধ্য চেষ্টা করেন।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৪৬ সালের সাধারণ নির্বাচনে মুসলিম লিগ নিরঙ্কুশ জয় লাভ করে এবং হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীকে প্রধানমন্ত্রী করে লিগ মন্ত্রিসভা গঠন করে। যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল ছিলেন মন্ত্রিসভার একমাত্র তফশিলি সদস্য। ১৯৪৬ সালে গঠিত অর্ন্তবর্তীকালীন সরকারে মুসলিম লিগ তাৎক্ষণিকভাবে যোগ না দিলেও মাসখানেক পরে যোগ দেয়। মন্ত্রিসভায় অন্তর্ভুক্ত মুসলিম লিগের পাঁচ সদস্যের মধ্যে যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল তফশিলি সম্প্রদায়ের হিন্দু একমাত্র সদস্য হিসেবে আইনমন্ত্রীর পদ লাভ করেন। ১৯৪৬ সালের ১৬ আগস্ট মুসলিম লীগের ডাকা 'প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবস' উপলক্ষ্যে সারা ভারতব্যাপী সাম্প্রদায়িক অসহিষ্ণুতার সূত্রপাত হয়। তফশিলি সম্প্রদায় ও মুসলমানদের মধ্যে কোনো প্রকার ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি যাতে না হতে পারে তা তত্ত্বাবধানের জন্য যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডলকে বিভিন্ন জেলায় প্রেরণ করা হয়। মণ্ডল বিশ্বাস করতেন যে, ভারতবর্ষে মুসলিম ও তফশিলিদেরই অভিন্ন অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক স্বার্থ ছিল।

১৯৪৭ সালের ২০ জুন মন্ত্রিসভার বিশেষ অধিবেশনে সদস্যগণ বাংলা বিভাজনের পক্ষে ভোট প্রদান করেন। কিন্তু যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল এরূপ বিভাগের বিপক্ষে রাষ্ট্রের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রতিবাদ সভা করেন। বাংলা বিভাগের প্রয়োজনেই সাংবিধানিক সভার জন্য ১৯৪৭ সালের জুলাই মাসে নতুন নির্বাচনের আয়োজন করা হয়। ভারতীয় সাংবিধানিক সভার এ নির্বাচনে পশ্চিম বাংলা থেকে মোট ২৫ জন (২১ সাধারণ ও ৪ জন মুসলিম) প্রার্থী নির্বাচিত হন। পূর্ব বাংলা থেকে ৪১ জন (২৯ মুসলিম ও ১২ সাধারণ) প্রার্থী নির্বাচিত হন।

১৯৪৭ সালের দেশ বিভাগের পর যোগেন্দ্রনাথ পাকিস্তানের প্রথম মন্ত্রিসভার আইন ও শ্রম মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রিত্ব লাভ করেন। তিনি মুসলিম লিগের সংসদীয় বোর্ডের সদস্য হন। ১৯৪৮ সালের করাচিতে সংঘটিত সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় মণ্ডল মন্ত্রী হিসেবে তাঁর সম্প্রদায়কে নিরাপদ রাখার যথাসাধ্য চেষ্টা করেন। কিন্তু ১৯৫০ সালে পূর্ব বাংলায় সংঘটিত ধ্বংসাত্মক দাঙ্গায় সময় কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হওয়া সত্ত্বেও মণ্ডল সংখ্যাগরিষ্ঠদের কাছ থেকে পাকিস্তান সৃষ্টির পূর্বে যেরূপ গুরুত্ব পেতেন সেরূপ আর পাননি। তিনি মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগ করেন এবং ১৯৫০ সালের ১৪ সেপ্টেম্বর করাচি থেকে পালিয়ে কলকাতায় আসেন ও ভারত সরকারের কাছে রাজনৈতিক আশ্রয় লাভ করেন। যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল একজন সাংবাদিক হিসেবেও আত্মপ্রকাশ করেছিলেন এবং ১৯৪৩ সাল থেকে 'জাগরণ' নামে

Dhaka University Institutional Repository

একটি খবরের কাগজ প্রকাশ করে আসছিলেন। ১৯৪৭ সালের বিভাগের পর এ পত্রিকার অফিস ঢাকায় স্থানান্তর করা হয়। যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল ১৯৬৮ সালের ৫ অক্টোবর কলকাতায় মারা যান।

দেবেশ রায় ইতিহাসের এই যোগেন মণ্ডলকে নিয়ে লিখলেন তাঁর সুবৃহৎ উপন্যাস *বরিশালের যোগেন মণ্ডল*। বিশটি অধ্যায়, ১৮১টি উপশিরোনামসমৃদ্ধ এই বিস্তৃত আখ্যানটিতে রয়েছে যোগেন মণ্ডলের দীর্ঘ জীবনবার্তা ও উপনিবেশী ভারতের চিত্র। বিশেষত ১৯৩৬ থেকে ১৯৪৭-এ স্বাধীনতা-প্রাপ্তির সময় পর্যন্ত ভারতের বিচিত্র রাজনৈতিক ও সম্পৃক্ত সামাজিক গুরুত্বপূর্ণ ইতিহাস বিধৃত আছে এতে। অধ্যায় বিন্যাসের শুরুতে লেখক বলেছেন :

> যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল প্রায় সম্পূর্ণ বিস্মৃত এখন। ১৯৩৭ থেকে ১৯৪৭ এই দশটি বছরে তিনি ছিলেন বাংলার নমশুদ্রদের অবিসংবাদী নেতা। বাংলা ও ভারতের রাজনীতিতে পরে তিনি প্রধানতম বিসংবাদী নেতা হয়ে ওঠেন। ১৯৪৩-এ খাজা নাজিমুদ্দিনের প্রাদেশিক মন্ত্রিসভায় তিনি ছিলেন। ৪৬-এ পুনর্নির্বাচিত হয়ে সারওয়ারদির মন্ত্রিসভাতেও। ১৯৪৬-এ তিনি মহম্মদ আলি জিন্না কর্তৃক অন্তবর্তী মন্ত্রিসভায় মুসলিম লীগের প্রতিনিধি মনোনীত হওয়ায় হিন্দু ও মুসলিম দুই জাতেরই শত্রু হয়ে পড়েন। তিনি পাকিস্তানের প্রথম মন্ত্রিসভায় আইনমন্ত্রী ছিলেন। ১৯৫০-এ কলকাতায় চলে আসেন। আম্বেদকর ও যোগেন মণ্ডল তাদের শুদ্রতার কারণে কোনো জাতীয়তাবাদেই গৃহীত হন নি। কিন্তু বহু নিন্দা ও বিরোধিতার পর কংগ্রেস দলিত-ভোটের জন্য আম্বেদকরকে জাতীয়-আখ্যানের দেবমণ্ডলিতে জায়গা করে দেয়। বাংলা বিভক্ত হওয়ায় যোগেন মণ্ডল সম্পর্কে তেমন কোনো দায় বা ভয় জাতীয়তাবাদীদের ছিল না। তাঁকে তাই ইতিহাস থেকে স-ম্-পূ-র্ণ মুছে দেয়া হয়েছে। তাঁর নাম এখন কোনো স্থানীয় ইতিহাসের ফুটনোটেও থাকে না।' (দেবেশ, ২০১০ : অধ্যায়সূচি)

ইতিহাস-উপেক্ষিত এই নেতা তথা সংস্কারককে দেবেশ রায় তাঁর বিনির্মিত দীর্ঘ ইতিহাসে ফিরিয়ে আনলেন। কেবল যোগেন মণ্ডলই নন, তাঁর পারিবারিক জীবন, প্রতিবেশ তাঁর সময়ের বাংলার রাজনীতি সবই উঠে এসেছে এই উপন্যাসে। তাঁর রাজনৈতিক উত্থানের মূলে যে 'বরিশাল হিতৈষী'র সম্পাদক দুর্গামোহন সেনের ভূমিকা ছিল, কাহিনীর শুরু সেখান থেকেই। দুর্গামোহন সেনের কলমে যোগেন হয়ে ওঠেন 'বরিশালের মেগাস্থিনিস'। দেবেশ রায় ঔপনিবেশিক বাংলার অন্যতম বৃহত্তর জেলা বরিশালের তৎকালীন রাজনৈতিক পরিবেশ, অর্থনৈতিক কাঠামো তথা উৎপাদন ব্যবস্থার স্বরূপ

Dhaka University Institutional Repository

ও রাজনীতিতে যোগেন মণ্ডলের প্রবেশ নিয়ে বিস্তারিত লিখেছেন। নমঃশূদ্রদের নেতৃত্বের প্রয়োজন, নতুন নেতৃত্ব সৃষ্টি বিষয়ে দেবেশ রায়ের বিশ্লেষণ :

> নমশূদ্রদের যারা নেতা ছিল তারা যদি-বা ২০-২৫ সালে জনগোষ্ঠীভিত্তিক নানারকম আন্দোলন করেছে, সেসব আন্দোলন বেশিরভাগটাই ছিল হিন্দু বর্ণসমাজে নমশূদ্রদের জায়গায় ওপরের দিকে তোলার চেষ্টা। '৩০ সাল নাগাদ সেই নেতারা কৃষক-নমশূদ্রদের নিয়ে মাথা ঘামায়নি– তখন কাউন্সিল, লোকাল বোর্ড আর ইউনিয়ন বোর্ডে ঢোকার হাওয়া। নমশূদ্র নেতাদের অনেকেই কংগ্রেসেরও নেতা হয়ে গেছে– কেশবচন্দ্র দাস, মোহিনীমোহন দাস। ফজলুল হক কৃষক প্রজা পার্টি তৈরি করেছিলেন। সে পার্টি মুসলিম রাজনীতির এই ফাঁকটা ভরে দিল বটে কিন্তু তফশিলি জাতি নিয়ে তাদের মাথা ব্যাথা ছিল না। নমশূদ্র নেতারা কেউ বর্ণাশ্রম ও শ্রম দাসত্বের কথা ভাবেনি। ... তাই তফশিলি জাতির জন্য আসন সংরক্ষিত রেখে প্রায় সর্বজনীন ভোটাধিকার দিয়ে '৩৭ সালের যে ভোট হল সেটাকে উপলক্ষ করেই বরিশালে নমশূদ্রদের নতুন নেতৃত্ব তৈরি হয়ে গেল নিজে থেকেই। ... যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল, বি.এ বিএল যে মাত্র ৩২ বছর বয়সে বরিশাল বারে ঢুকল আর বছর ঘুরতে-না-ঘুরতেই আইনসভার ভোটে দাঁড়াল সাধারণ আসন থেকে, সংরক্ষিত আসন থেকে নয়।... যোগেনের মত নেতা পাওয়ার ফলেই ফাঁকটা চেনা হয়ে গিয়েছিল বরিশালের একটা নেতা চাই। এই ভোটেরই দিন পনের আগে বরিশাল টাউন হলের সেই সভা, যোগেন সেখানে উপযাচক হয়ে বক্তৃতা করেছিল। সেই বক্তৃতা শুনে 'বরিশাল হিতৈষী'র সম্পাদক দুর্গামোহন সেন এতটাই মুগ্ধ হন যে তাঁর কাগজে যোগেনকে নতুন বরিশালের নতুন নেতা, 'বরিশালের মেগাস্থিনিস' বলে বর্ণনা করেন। (দেবেশ, ২০১০ : ২১-২২)

উপন্যাসের দীর্ঘ পরিসরে বারবারই নমঃশূদ্রদের অবস্থান স্পষ্ট করেছেন দেবেশ রায়। উপন্যাসে বাংলায় নমঃশূদ্রদের নিয়ে করা পরিসংখ্যানে দেবেশ রায় ঐতিহাসিক তথ্যসহ লিখেছেন :

> ১৯১১-এর সুমারিতে সারা বাংলায় নমশূদ্রদের সংখ্যা গোনা হয়েছিল প্রায় ২১ লক্ষ। এর পরের সুমারিগুলোতে জাত জানাতে আপত্তি শুরু হয়ে যায়। ১১ সালের সুমারিকেই প্রামাণিক বলে নেয়া যায়। এই প্রায় ২১ লক্ষ নমশূদ্রের ছ-আনি, আট লাখই থাকত– বাখরগঞ্জ, দক্ষিণ ফরিদপুর, নড়াইল, মাগুরা, খুলনা, বাগেরহাট মিলিয়ে যে-ডাঙা, সেখানে। ... ১৯২০ থেকেই সরকার, ভাঙনের নদীর চর দখল মেনে নিতে শুরু করে। সেই চরের দখল নিতে জমিদাররা এই নমশূদ্র আর মুসলমান জনগোষ্ঠীকে কাজে লাগাত। তখন থেকেই এই স্থলদেশ একটা মারামারি-কাটাকাটির জায়গা হয়ে যায় কিন্তু তাতে হিন্দু-মুসলমান ভাগাভাগি ছিল না। (দেবেশ, ২০১০ : ২১-২২)

Dhaka University Institutional Repository

সামগ্রিকভাবে দরিদ্র, শিক্ষার দিক থেকে অত্যন্ত পশ্চাদপদ এই নমঃশূদ্রের শোচনীয় পরিণতি হল– তারা বর্ণহিন্দুর জাত-পাত বোধের শিকার। প্রজন্ম পরম্পরায় অর্জিত ও মনস্ক প্রশিক্ষণে নমঃশূদ্র জেনে যায় তার নাম বা পদবীও থাকতে নেই; থাকতে নেই নিজস্ব জমি কিংবা ঘরও। দেবেশ রায় 'কাটা জিভের ভাষা' শিরোনামের একটা উপ-অধ্যায়ে জানিয়ে দেন বহু পুরনো ও প্রচলিত গল্প। উপনিবেশকালে কখনও কোনো এক সময় কোনো এক সাহেব একজন চাঁড়ালকে ডেকে নাম-পদবী জিজ্ঞেস করলে গ্রামের বামুন জমিদার ঐ চাঁড়ালের জিভ কেটে দেন এই বলে যে, 'বেটা চাঁড়ালের নামও থাকে, নামের আবার পদবীও থাকে !' (দেবেশ, ২০১০ : ৭৭)। যোগেন মণ্ডলেরও এই কাহিনী জানা। মোক্তার প্রহ্লাদ দত্তের বড়িতে শূদ্র যোগেন ঠাঁই পেয়েছিল, পড়াশোনাও করেছিল। প্রহ্লাদের মা কেষ্টামাসির সাথে আলাপে বর্ণহিন্দুর ধর্মাচার বিশেষত সতীদাহ প্রথা নিয়ে অসহিষ্ণু যোগেনের প্রথম প্রতিবাদ :

> তোমাগ এই হিন্দু ধর্মখান বড় নিষ্ঠুর গ কেষ্টা! মানুষরে বড় দুঃখ দেয়। নিজের ভাইবৌ-ব্যাটারবৌ গ পিটাইয়্যা পুড়াইয়া মারে। ধুত, এরে আবার ধর্ম কয়? কেষ্টা আমার মাঝে মাঝে মনে হয়, আমি অন্য কোনো ধর্ম নেই। আমার আর হিন্দুধর্মে থাকার বাসনা নাই।' (দেবেশ, ২০১০ : ৭৫)

এই সূত্রেই জাত-পাত আর পদবী ধারণ করা নিয়ে যোগেনের আক্ষেপ :

> যার যেমন সাধ তেমন পদবী নেওনের কুনো বাধা নাই হিন্দুগরে। এক নমশূদ্র যদি একখান পদবীও বলে তাহাইলে তার জিভখ্যান টাইন্যা কাইট্যা দিতে হয়। চাঁড়ালের আবার নাম! নামের আবার পদবী ! (দেবেশ, ২০১০ : ৭৫)

উচ্চবর্ণের অর্থনৈতিক ক্ষমতাই কেবল দায়ী নয়, দীর্ঘকালীন বোধের অপ্রতিসম চাপে সৃষ্ট এই জাত-ভেদের পরিবেশ। ভোটে জিতেও নমঃশূদ্র যোগেন মণ্ডল সেই জয়কে আনন্দে রূপ দিতে বিব্রত হয়, তার চেতনায় অভিঘাতের রূপায়ণ ঘটে। ঔপন্যাসিকের ভাষায় :

> চিরকাল যাদের 'নমো' বলে ডাকা হয়, 'চাঁড়াল' বলে বর্ণনা করা হয় বা যাদের সঙ্গে হিন্দুরা খেতে বসে না বা যাদের ছোঁয়া কোনো খাবার খায় না বা হাতের দুই পাতা মিলিয়ে ঘটি বা পাউলি থেকে ঢালা জল যাদের খেতে হয় সেই নমোদের ভিতর অপরাধবোধ ও অনধিকারবোধ জন্ম থেকে, হ্যাঁ জন্ম থেকে, এমনই শারীরিক যে ... যোগেন মণ্ডল হয়েও, পরমুহূর্তেই সে হয়ত ভেবে ফেলেছেও

Dhaka University Institutional Repository

> তার জয়ের কথা কিন্তু তেমন ভেবে-ফেলাও তো অপরাধ বা অনাধিকার, এখন এমন একা-একা, এই স্থায়ী বোধ তাকে প্রত্যাঘাতে ফিরিয়ে দিয়েছে। ভাবনার ঐ আত্মতা থেকে– সে একজন নমশূদ্র, সে কী করে নিজের জীবনে এমন আত্মতা খুঁজতে পারে, যে-আত্মতা খোঁজার অধিকার হিন্দুসমাজ তাকে দেয়নি, খোঁজার ক্ষমতা তো দেয়ইনি। (দেবেশ, ২০১০ : ৬৪)

আত্মতার আবিষ্কারেই আশ্লিষ্ট যোগেন মণ্ডলের রাজনৈতিক অভিযাত্রা, তার রাজনীতি, দর্শন, আন্দোলন ও জাতীয়তাবাদ ও স্বদেশ অন্বেষণ– আর এই সবকিছুকে ঘিরে যোগেনের জীবনের দ্বান্দ্বিকতা তথা সংকট। এই দ্বান্দ্বিকতা উচ্চবর্ণের সাংস্কৃতিক আধিপত্যের কারণেই ঘটেছে। এছাড়া উপনিবেশায়নের ফলে পরিবর্তিত রাষ্ট্রীয় ও রাজনৈতিক অর্থনীতি ও এর অংশীদার ক্ষমতাধর উচ্চশ্রেণির শোষণ এবং কর্তৃত্ব বজায় ছিল বলেই অন্ত্যজ যোগেনের শ্রেণি-সংকট প্রবল হয়। তাই ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত হবার পরেও তার স্পষ্টই মনে হয় যে সে উচ্চবর্ণের আরোপিত শিক্ষা গ্রহণ করেই শেষপর্যন্ত শ্রেণি-বৈষম্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের যোগ্যতা অর্জন করল এবং তা সত্ত্বেও 'এলিট' হতে পারল না। যোগেনের নমঃশূদ্র পরিবারে কেউ কোনোদিন পাঠশালা পেরিয়ে স্কুল পর্যন্ত পৌঁছেনি। তাই যোগেনের আইন পাশ, ওকালতি পেশা ও নির্বাচনে জেতা– এই সব উন্নতি শুধু তার পরিবার-পরিজন কিংবা বরিশালের নমঃশূদ্র সমাজের কাছেই নয়, তার আশেপাশের গ্রামের সকলের কাছেই একটা গর্বের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ১৯৩৬-৩৭ এর নির্বাচনী প্রচার আর জয়লাভ যোগেন মণ্ডলের জীবন প্রায় সম্পূর্ণ বদলে দিল। 'আর যোগেন মণ্ডল ঢুকে পড়ল ইতিহাসের ভিতরে।' (দেবেশ, ২০১০ : ১৩৬)।

তবে যোগেন মণ্ডলের এই ইতিহাস-পরিক্রমা তথা রাজনৈতিক জীবন সহজ ছিল না। দেবেশ রায় তাকে যুদ্ধসৈনিকই আখ্যা দিয়েছেন। যার যুদ্ধে যাবার নির্দিষ্ট কোনো সফরসূচি নেই, "এদের পৌঁছানোর কোনো সময় বাঁধা থাকে না। তাঁরা যখন হাজির নেই, তখনো তাঁরা যুদ্ধেই থাকেন। ... যোগেন এমন এক সেনাপতি। যোগেন তো লড়েই যাচ্ছে।" (দেবেশ, ২০১০ : ১৬৭)। বর্ণহিন্দুদের বিরুদ্ধে তফশিলিদের[৩] (Scheduled Caste) নির্দিষ্ট অবস্থান বজায় রাখতে গিয়েই মূলত যোগেনের রাজনীতি সংগ্রাম। "যোগেন ঠিক করে উঠতে পারে না– নমশূদ্র হিসেবে পৃথক রাজনৈতিক পরিচয় তৈরি করে তোলা ও সেই পরিচয়ের জোরেই ভারতের স্বাধীনতা পাওয়ার কাজে তার জায়গার হদিশ করে নেয়া কী করে সম্ভব ? সম্ভব হত– কংগ্রেস যদি শুধুই বাবুহিন্দুদের পার্টি না হত। সম্ভব হত–

Dhaka University Institutional Repository

শিডিউলদের যদি হিন্দু-পরিচয় থেকে একেবারে বাদ দেয়া হত।" (দেবেশ, ২০১০ : ১৯৮)। এছাড়া চলমান রাজনীতিতে জননেতার সম্মান সে কোনোদিন পাবে কী না সেসব বিষয়েও সন্দিহান হয়ে ওঠে যোগেন। কেননা বংশ, শিক্ষা, জাত, পূর্বপুরুষ, টাকা-পয়সা, মেলামেশা– এইসব যা দিয়ে কিছু হওয়ার জমি তৈরি থাকে তার একটিও তার নেই। তার যা আছে, তা থাকার কোনো দরকারই নেই– "নিজের ওপর বিশ্বাস আর যে মানুষজনের সঙ্গে তার সম্পর্ক সেই একটুকরো মানবসমাজেরও তার ওপর বিশ্বাস।" (দেবেশ, ২০১০ : ২৯৩)। নিজের মতামতের সূক্ষ্মতা ও মৌলিকতা দিয়ে যোগেন খুব দ্রুতই নিজেকে আলাদা করে ফেলতে পেরেছিল; যে কারণে আইনসভার নির্বাচিত ২৩ জন স্বতন্ত্র শিডিউলদের নিয়ে 'বেঙ্গল অ্যাসেম্বলিজ ইনডিপেডেন্ট শিডিউল্ড কাস্ট মেম্বার্স লিগ'-এর সম্পাদক পদে প্রস্তাবিত হয় যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল। তবে সে অনুধাবন করে, একটা অ্যাসেমব্লি তৈরি হয়ে খুব একটা লাভ নেই। "শরৎ বোস, তুলসী গোস্বামী, কিরণশঙ্কর রায়, জে. সি. গুপ্ত, বরদা পাইন, শশাঙ্ক সান্যাল, সারওয়ারদি, আবু হোসেন সরকার, শাহাবুদ্দিন, সামসুল হুদা, স্যার ফারুকি, আবদুর রহিম, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি– এ তো হিন্দু-মুসলমান মিলে কুলীন বামুন-কায়েত সব। মুসলমানদের মধ্যে সব উর্দুওয়ালার ভিড় আর হিন্দুদের মধ্যে সব ইংরেজিওয়ালার।" (দেবেশ, ২০১০ : ১৯০)। আইনসভায় অবশ্য যোগেন্দ্রনাথকে নিজ দলে নিতে চেয়েছেন অনেকেই। এদের মধ্যে এ. কে. ফজলুল হক ছিলেন অন্যতম। ১৯৩৭ সালে ফজলুল হকের নেতৃত্বে কৃষক প্রজা পার্টি ও মুসলিম লীগের সমন্বয়ে প্রজা-লিগ মন্ত্রিসভা গঠিত হয়। উপন্যাসে এ. কে. ফজলুল হককে কৌশলী রাজনীতিবিদ হিসেবেই দেখা যাচ্ছে, যিনি যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডলকে পার্টির স্বার্থে আপন করতে মন্ত্রী হবার আমন্ত্রণ জানান। যোগেন মণ্ডল বিনয়ের সাথে তা প্রত্যাখ্যান করে, তার প্রত্যাখ্যানের সে ভাষায় কোনো সংশয় বা জড়তা ছিল না :

> হকশাহেব! একা একা মন্ত্রী হইয়্যা গেলে আমিও মুকুন্দ মল্লিক হয়্যা যাব। শিডিউল-স্বার্থডা আর কেউ আমার থিক্যা বুইঝতে চাইব না। সেডাই আমার কাজ। যোগেন মণ্ডল হইয়্যা মন্ত্রী চাই না। শিডিউল হইয়্যা আরো শিডিউল মন্ত্রীর একজন হইয়্যা মন্ত্রী চাই। (দেবেশ, ২০১০ : ৬২৩)

উল্লেখ্য যে, ১৯৩৭-এর নির্বাচনে বাংলায় মধ্যবিত্ত ও সাধারণ মুসলমানদের নেতৃত্বে এ. কে ফজলুল হকের কৃষক-প্রজা পার্টি ৩৫টি আসন পেয়েছিল, মুসলিম অধ্যুষিত হয়েও মুসলিম লিগ বাংলায় আশানুরূপ আসন দখল করতে পারে নি। কৃষক-প্রজা পার্টি ও মুসলিম লিগের রাজনৈতিক মতাদর্শ প্রায় ভিন্ন ছিল এবং ৩৭-এর নির্বাচনে বাংলার প্রায় সকল জায়গায় কৃষক-প্রজা পার্টি ও মুসলিম

Dhaka University Institutional Repository

লিগের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ঘটে। অন্যদিকে পাঁচটি প্রদেশে কংগ্রেস সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভে সক্ষম হয় এবং ৭ জুলাই কংগ্রেস সংখ্যাগরিষ্ঠ ৭টি প্রদেশে মন্ত্রিসভা গঠন করে কার্যভার বুঝে নেয়, চারটি প্রদেশে গঠিত হয় অ-কংগ্রেসি সরকার, এদের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে বাংলা। ফলে মন্ত্রিসভা গঠনে বিপত্তি ঘটে এখানে, "কারণ বাংলায় কংগ্রেস ফজলুল হকের সাথে মিশে কোয়ালিশন সরকারে যায়নি।" (কল্যাণ, ১৯৯৯ : ৮৮)। কৃষক-প্রজা পার্টির সাথে যুক্ত মন্ত্রিসভা গড়তে কংগ্রসের আপত্তির নানা ঐতিহাসিক ব্যাখ্যা আছে। তবে শেষ পর্যন্ত কৃষক-পৃজা পার্টি, মুসলিম লিগের সাধে বাধ্য হয়েই মন্ত্রিসভা গঠন করে। এ সম্পর্কে ঔপন্যাসিকের বিশ্লেষণ– "বাংলার মানুষজন হিন্দু-মুসলমানে ভাগ হয়ে গিয়েছিল। গ্রাম-শহরের হিন্দুরা ভয় পেয়েছিল। লিগ ও প্রজাপার্টির মধ্যে মুসলিম লিগের ভোটের ভাগাভাগিতে নতুন সরকারের ওপর মুসলমানদের আধিপত্য থেকে রেহাইয়ের একটা সম্ভাবনা হিন্দুরা হিশেবে এনেছিল। কংগ্রেস সমর্থন দিতে আপত্তি করায় হিন্দুদের তেমন কিছু আশা করার মত থাকল না। পরন্তু প্রজা পার্টি ও মুসলিম লিগ একত্র হওয়ায় মুসলমান জনসাধারণ নতুন আশা পেয়েছিল।" (দেবেশ, ২০১০ : ২৩৬-৩৭)।

১৯৩৭-এর নির্বাচন ও মন্ত্রিসভা তৈরি হওয়ার পর থেকে বাংলায় তফশিলিদের রাজনীতি ক্রমেই দুর্বল হতে থাকে। তফশিলিদের মধ্যে যারা শিক্ষিত ও সম্পন্ন, তাঁদের প্রতি ব্রিটিশ সরকারও মনোযোগ দিতেন। এ সময়ের তফশিলি রাজনীতি নিয়ে দেবেশ রায় লিখেছেন :

> ১৯৩২-এর গোলটেবিলে বি. আর আম্বেদরকারের নাম প্রথম শোনা গিয়েছিল। গোলটেবিলে আম্বেদকার হিন্দু মনুবাদী ধর্মকে তুলোধোনা করেন– একেবারে ঢাকিসহ বিসর্জন। হিন্দুধর্মের বিরুদ্ধে মুসলিমদের কথায় এত মর্মদাহ থাকে না। ... গোলটেবিলে গান্ধীজীর ধারণা হয়েছিল বর্ণ হিন্দু কেউ তফশিলিদের নেতা সাজছে। তাঁর জিজ্ঞাসার জবাবে তখন এটুকুই মাত্র শুনেছিলেন, 'দলিত। মহারাষ্ট্রের।' ... আর নমশূদ্রদের মধ্যে মল্লিক ভাইরা, রাজবংশীদের মধ্যে প্রসন্নদেব রায়কত ও উপেন্দ্রনাথ বর্মণ। ১৯৩৭-এর ভোটের পর তপশিলিদের প্রতি ব্রিটিশ-সরকারের খাতির ক্ষিদে একটু বাড়ল ও ছড়াল। তাঁদের অনেকেই কংগ্রেসের দিকে ঝুঁকলেন। যদিও তখনো তাঁদের প্রাথমিক আনুগত্য নিজেদের জাত-সমাজের দিকেই। যোগেন এ-বিষয়ে একটু স্পর্শকাতর ছিল। তার সঙ্গে সব দলের সব নেতারই ছিল বিশ্বাস ও বন্ধুত্বের সম্পর্ক। কিন্তু তার কাছে প্রধানতম বিষয় ছিল নমশূদ্ররা। (দেবেশ, ২০১০ : ৬২৭)

Dhaka University Institutional Repository

এম. এল. এ নির্বাচিত হবার পর থেকেই যোগেনের পূর্ববর্তী জীবনের সংগ্রাম থেকে যে রাজনৈতিক বিশ্বাস ও মতাদর্শ সে লালন করেছে, তা এবার স্পষ্টতা পায়; তার রাজনৈতিক প্লাটফর্ম তাকে ক্ষমতালোভী করেনি কখনও বরং নিজ জাতের স্বার্থ বিষয়ে আরো মনোযোগী করেছিল। তাছাড়া সমকালীন রাজনৈতিক পরিবেশ থেকে ভারতের স্বাধীনতা বিষয়ে শক্তিশালী জাতীয়তাবাদী চেতনায় স্বাধীন, স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের ধারণা যোগেন স্পষ্ট করে পায় নি বলেই মনে হয়। ঔপন্যাসিকের সমীক্ষণ :

> রাজনৈতিক ক্ষমতা বলতে যোগেনের কাছে ভারতের স্বাধীনতা খুব একটা প্রত্যক্ষ বিষয় হয়ে ওঠেনি। এমন কী যে স্বাধীনতার কথা সে শুনছে এখানে, সে স্বাধীনতায় তপশিলি জনগোষ্ঠীর বিশেষ উপকার কী হবে– তাও তার কাছে পরিস্কার ছিল না। সামাজিক যে অসম্মানের মধ্যে তপশিলিদের জীবনযাপন করতে হয়, তার জন্য সবচেয়ে বেশি দরকার শিক্ষিত হয়ে ওঠা। যোগেন তপশিলি এলাকায় নতুন স্কুল তৈরির জন্য, কলকাতায় তাদের থাকার ছাত্রাবাস তৈরির জন্য, কোনো কোনো বিষয়ে উচ্চ শিক্ষার বৃত্তির ব্যবস্থার জন্য, তপশিলি মেয়েদের অন্তত নিম্ন প্রাথমিক শিক্ষার জন্য ব্যবস্থা করতেই বেশি ব্যস্ত থাকে। (দেবেশ, ২০১০ : ৬২৮)

এই সূত্রে যোগেনের প্রধান কাজ হল আইনসভার ৩১ জন তফশিলি সদস্য নিয়ে একটি স্বতন্ত্র ব্লক তৈরি করা, যারা নিজেদের ভেতর আলোচনা করে সব বিষয়ে একত্রে ভোট দেবে। "এভাবেই শুরু হলো যোগেনের নিজস্ব রাজনৈতিক মতবাদ নির্মাণ, যার প্রাথমিক শর্ত হলো নমশূদ্র হিসেবে পৃথক রাজনৈতিক পরিচয় তৈরি করা। (পার্থ, ১৪২১ : ৬০)। যোগেন মণ্ডল বর্ণহিন্দুদের বিরুদ্ধে তফশিলিদের নির্দিষ্ট অবস্থান সবসময় বজায় রাখতে চেয়েছে। যোগেনের স্পষ্ট ব্যক্তব্য ছিল যে "এই দেশ হিন্দু এবং মুসলমানদের মধ্যে বিভক্ত হয়ে যায়নি, তফশিলিদের আলাদা অবস্থান রয়েছে এবং তারা হিন্দুসমাজের অংশ নন।" (দেবেশ, ২০১০ : ৩১৯)। তাছাড়া দাঙ্গা-হাঙ্গামার রাজনীতিতেও উচ্চবর্ণ হিন্দুদের রক্ষা করা শূদ্রদের কাজ নয় ও মুসলমানদের সঙ্গে শূদ্রদের শ্রেণিগত মিল অনেক বেশি। অ্যাসেম্বলিতে যোগেনের বক্তৃতার অংশ এ. কে. ফজলুল হকের বয়ানে পাই; যোগেনের সাথে কথোপকথনে তিনি যোগেনের নমঃশূদ্র বিষয়ক প্রস্তাবের পুনরাবৃত্তি করেন :

> -'তুমি যে একডা মৌলিক কথা শুনাইল্যা সেদিন অ্যাসেম্বলিতে কাট মোশনে। কইল্যা-না, নমশুদ্দুররা হিন্দু না, হিন্দুগ লাইঠ্যাল হইয়া নমশূদ্ররা আর মুসলমানগ মাইরব না। কইল্যা না।'
> -'হ্যাঁ। কইছি। আরো কব। এডাই তো কহার।' (দেবেশ, ২০১০ : ৬২৩)

Dhaka University Institutional Repository

যোগেন তার স্বতন্ত্র রাজনৈতিক পথসন্ধান করছিল তখন থেকেই; সরকারি আইনে নমশূদ্ররা তখন আলাদা জাত হিসেবে স্বীকৃত। ১৯৩২-এর সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদের[৪] ফলে এটা আরো স্পষ্ট হল। যোগেনের গ্রামবাসী প্রহ্লাদ-শিবুর সাথে আলাপে নিজের রাজনৈতিক দর্শন উত্থাপনকালে যোগেন বলে :

> কও প্রহ্লাদদা, নমশুদ্দুররা তো কবে থিক্যাই নমশুদ্দুর, রাজবংশী তো কবে থিক্যাই রাজবংশী, বাগদিরা তো কবে থিক্যাই বাগদি। মানে কই এইসব মানুষকে এক কইর‍্যা শুদ্দুর, চাঁড়াল এমন কইর‍্যা কথা বলা হয় ঠিকই কিন্তু এই ভোটের আগে কুনোদিন এই হিশাব কারো মাথায় আসে নাই যে বাংলায় এইসব জাইত একসঙ্গে বত্তিরিশডা মেম্বার হব্যার পারে। এইডা, এই এক-কইর‍্যা বলা সম্ভব হইল তো কমিউন্যাল অ্যাওয়ার্ডের লগে। হ্যাঁ। এডা তো ঠিক কথা– ঐ ৩২ জনের মধ্যে সাতজন পুরানা কংগ্রেসি, একজন পুরানা হিন্দু। (দেবেশ, ২০১০ : ৩১৮)

বরিশালের যোগেন মণ্ডল উপন্যাসে দেবেশ রায় মহাত্মা গান্ধীর 'হরিজন আন্দোলন' প্রসঙ্গটি উত্থাপন করেছেন। গান্ধী নমঃশূদ্র জাতিকে বলেছেন 'হরিজন'। তাঁরই উদ্যোগে বের হয় পত্রিকা 'হরিজন'; গঠিত হয় 'হরিজন সেবা সংঘ'। হরিজন উন্নয়নের কর্মসূচি হিসেবে মন্দির প্রবেশের অবাধ অধিকার নিশ্চিত করার চেষ্টা ছিল। আগস্ট, ১৯৩২-এ ম্যাকডোনাল্ড-এর সাম্প্রাদায়িক রোয়েদাদের ফলে অস্পৃশ্যদের জন্য আলাদা নির্বাচকমণ্ডলী গঠন করা হয়। ২০ সেপ্টেম্বর অস্পৃশ্যদের জন্য আলাদা নির্বাচকমণ্ডলীর বিষয়টি নিয়ে গান্ধী 'আমরণ অনশন' শুরু করেন এবং বর্ণহিন্দু ও অস্পৃশ্য নেতাদের মধ্যে একটা মীমাংসা করতে সমর্থ হন, যা 'পুনা চুক্তি' বলে পরিচিত। "কিন্তু এই চুক্তিতে পাকাপাকিভাবে বর্ণ হিন্দুদের সংখ্যালঘু অবস্থা মেনে নেওয়ার ব্যাপারটাকে তীব্র আক্রমণ করেন বাংলা গোঁড়া হিন্দু মতবাদীরা। এপ্রিল থেকে জুলাই ১৯৩৪-এর মধ্যে বাক্সার, জসিডি ও আজমীরে কংগ্রেসের সনাতনপন্থীরা গান্ধীর হরিজন সভা বানচাল করার চেষ্টা করেন, এমনকি ২৫ জুন পুনায়, তাঁর গাড়িতে বোমাও ছোঁড়া হয়। "যে ব্রিটিশ সরকার দাবি করত যে তাদের প্রভাব আধুনিকীকরণের কাজে লাগে, তাদেরও কিন্তু গোঁড়া মতবাদীদের বিচ্ছিন্ন করার কোনো ইচ্ছেই ছিল না। আগস্ট ১৯৩৪-এ ব্যবস্থাপক সভার সরকারি সদস্যরা মন্দির প্রবেশ (সংক্রান্ত) বিলটি না পাশ করানোয় সাহায্য করেন।" (সুমিত, ১৯৯৩ : ২৮২-২৮৩)।

Dhaka University Institutional Repository

উপন্যাসে গান্ধীর হরিজন ভাবনা ও কর্মসূচি সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন দেবেশ রায়। যোগেন মণ্ডলকে গান্ধীজীর সাথে আইনসভার তফশিলি সদস্যদের মতবিনিময় সভায় দেখা যায়। সভায় কংগ্রেসের শক্তি বৃদ্ধির জন্য গান্ধী সবাইকে আহ্বান করেন। জাতপাতের ভিত্তিতে আসন ভাগের ফলে যারা ভোটে জিতে আইনসভার সদস্য হয়েছিলেন তিনি তাদের আইনসভার ভিতরে কংগ্রেসে যোগ দেবার কথা বলেন। সভায় যোগেন মণ্ডল কংগ্রেসকে উচ্চবর্ণের হিন্দুদের পার্টি বলে অভিহিত করেন এবং 'শূদ্র, চাঁড়াল অচ্ছুৎ' হিসেবে নিজেদের স্বতন্ত্র পার্টির প্রয়োজনীয়তা দাবি করেন। উপন্যাসে যোগেন মণ্ডলের দাবির জবাবে গান্ধীর বক্তব্য :

> আমি আপনাদের কাছে ও সকলের কাছে একটা মাফি মাংছি। হাজার-হাজার বছর ধরে উচ্চবর্ণের হিন্দুরা নিম্নবর্ণের মানুষের ওপর এত অত্যাচার, এত অন্যায়, এত ব্যভিচার করেছে যে নিম্নবর্ণের হিন্দুরা এখন যে-প্রতিকারের ব্যবস্থা নিতে চান, সেই প্রতিকারের ব্যবস্থাই নিতে পারেন। এ নিয়ে তাঁদের স্বাধীনতা মেনে নিতে আমার কোনো পিছুটান নেই। আমার পেছুটান এই জায়গায় যে আমি একজন হিন্দু, বর্ণভেদেও বিশ্বাস করি, কিন্তু বর্ণবিদ্বেষ ও অস্পৃশ্যতাকে আমার অন্তরের সমস্ত ধর্মবোধ দিয়ে আমি বর্জন করি। মানুষের স্পর্শকে পাপ মনে করার মত অপরাধ আর কী হতে পারে ? সেই কারণেই আমি 'হরিজন সেবা সংঘ' করেছি। এটাই এখন আমার জীবনের প্রধান কাজ। আর মন্দির প্রবেশাধিকার দেয়ার জন্য বিভিন্ন প্রদেশের আইনসভাকে অনুরোধ করেছি। (দেবেশ, ২০১০ : ৫০৭)

এই বক্তব্যের পর যোগেন মণ্ডলের সময়োচিত জিজ্ঞাসা ছিল– 'মন্দিরে শূদ্রদের ঢুকতে দিলেই কি আমরা যারা পতিত, তাদের সমস্যা মিটবে?" (দেবেশ, ২০১০ : ৫০৭)। গান্ধীজী দেশ এবং দেশের সর্বস্তর ও শ্রেণির জনগণের আবেগ ও সমস্যাকে 'এক' ঘোষণা দিয়ে কংগ্রেস ও হিন্দুধর্মের আদর্শের মাঝে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ থাকতে অনুরোধ জানান। কিন্তু "যোগেন বুঝে নিতে পারে, এই প্রথম সে তার প্রতিদ্বন্দ্বীকে চাক্ষুষ করছে, – বর্ণভেদবিশ্বাসী নির্লজ্জ এক হিন্দু, স্বাধীনতায় বিশ্বাসী নির্ভয় এক ভারতীয়। যোগেন, যে তার নিজের অহিন্দু ভারতীয়তার ভিৎ খুঁজতে ডুবে আছে মহাসাগরের জলে।" (দেবেশ, ২০১০ : ৫০৮)। যোগেন মণ্ডলের বেড়ে ওঠার পরিবেশে গান্ধী-আন্দোলন ছিল ভদ্রলোকদের বাড়ির ব্যাপার। ওদের নেতারাও ভদ্রলোক। "বয়কট, 'পরোক্ষ প্রতিরোধ', আইন অমান্য, অহিংসা, সত্যাগ্রহ, অনশন– এসবের কোনো বার্তাই নমশূদ্র, অন্যান্য অন্ত্যজ বা মুসলিম সমাজের ভিতর পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে নি।" (দেবেশ, ২০১০ : ৫১২)। বরং গান্ধীকে প্রায় অবতার

Dhaka University Institutional Repository

ভাবতেন অনেক হিন্দু। গান্ধীর স্বাধীনতা-ভাবনায় দ্বিমত না থাকলেও তাঁর চিন্তাপ্রণালির সাথে তীব্র সংঘাত বোধ করে যোগেন। তাঁর মতে, মন্দিরে প্রবেশের অধিকারই নিচু জাতের একমাত্র পরিত্রাণ নয়– শিক্ষা ও অর্থনীতি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। একজন ডোম ডোম-ই কেন হয়, বিপরীতে একজন বামুন হয় বামুন– এর ব্যাখ্যায় যোগেনের শিক্ষিত মনে শাস্ত্র-বিধি-সমাজতত্ত্ব ও রাষ্ট্রতত্ত্বের নানা যুক্তিকেই অনিবার্যরূপে বিশ্লেষণযোগ্য মনে হয়; সুতরাং কেউ একজন বর্ণভেদ মানে, অস্পৃশ্যতা ও জাতিভেদ মানে না– কারণ অস্পৃশ্যতা কোনো ধর্ম নয়, উঁচুজাতের কৃত অপরাধ বা পাপ এবং 'কেবল এই কারণেই হিন্দুধর্মকে ভাগ করা যায় না, সেটা নিজের ধর্মকে অস্বীকার করা হয়'– গান্ধীজীর এই ধরনের বক্তব্যকেও অসার মনে হতে থাকে যোগেন মণ্ডলের। হরিজন আন্দোলনের সূত্রে তফশিলিদের হিন্দু সমাজের অন্তর্ভুক্ত করে নেওয়ার রাজনীতির বিরোধিতা যোগেনের এই কারণেও। স্বাধীনতাকে একটি রাজনৈতিক অধিকার এবং হরিজনসেবাকে একটা সামাজিক কর্তব্য হিসেবেই ধরে নেয় সে। কারণ দেশ অস্পৃশ্যতার দোষে পরাধীন হয়নি। তাই গান্ধীর যুক্তিকে তার সার্বজনীন মনে হয় না, সেটা যৌক্তিক হলেও তাঁর 'নিজস্ব' বলেই বোধ হয় যোগেনের।

বঙ্গীয় রাজনীতিতে যোগেন্দ্রনাথ কিছুটা সুভাষচন্দ্রের অনুগামী ও যথেষ্ট ঘনিষ্ঠ ছিলেন। ১৯৪০ সালে সুভাষ বসু যোগেন মণ্ডলকে কলকাতা কর্পোরেশন নির্বাচনে সমর্থন করেছিলেন। জাতীয় কংগ্রেস থেকে সুভাষচন্দ্রের বিদায়ের পরও তিনি সুভাষচন্দ্রের সঙ্গেই ছিলেন। কিন্তু তাঁকেও স্পষ্ট করে তিনি তাঁর অবস্থান জানান। নিজেকে 'বিশ্বাসী হিন্দু' না বলে সুভাষকে যোগেন এও জানান যে শূদ্রদের গ্রাস করার জন্যই কংগ্রেস ও গান্ধীজী কর্মসূচি বানিয়েছেন। সুভাষের কাছে যোগেনের বক্তব্য : 'আমি আপনাকে স্বমুখে ও সজ্ঞানে জানাই যে আমার কিন্তু কোনো পার্টি নাই, কোনো পালিটিক্সও নাই। মানে, পার্টি-পলিটিক্স নাই। ... আমি অ্যান্টি-কংগ্রেস দলেও নাই। আমি শুধু শিডিউল কাস্টদের নিয়ে আছি, আরো ঠিক করে বললে বলব নমশূদ্রদের নিয়েই আছি।' (দেবেশ, ২০১০ : ৪৯২)। যোগেনের কাছে অস্পৃশ্যতা ও বর্ণভেদে সমান শব্দ নয়– 'অস্পৃশ্যতা একটা রিলিজিয়াস কালচার, উঁচু জাতগুলোর উচ্চতা রক্ষার জন্য তৈরি। আমার বিশ্বাস তপশিলদের স্বাভাবিক বন্ধু মুসলমানরা, কারণ, তারাও হিন্দু অত্যাচারের শিকার।" (দেবেশ, ২০১০ : ৪৯৫-৪৯৬)। যোগেন বুঝে যান যে সুভাষ কিংবা গান্ধীজী কিংবা ফজলুল হক কাউকেই তিনি তাঁর এই কথা ও চিন্তা দিয়ে তাদের বদলাতে পারবেন না। যোগেনের দুঃখ যে সুভাষ বসুও অনায়সে বলতে পারেন না পরাধীন এই দেশে 'আমরা

Dhaka University Institutional Repository

সবাই চাঁড়াল।' (দেবেশ, ২০১০ : ৪৮৯)। কারণ, আমরা সবাই চাঁড়াল একথা সুভাষের 'রাজনৈতিক গ্রাহক' মেনে নিবেন না'– বরং তাঁকে সাহেবদের বানানো শব্দে বলতে হয় 'সারা দেশটাই পরাধীন, অপ্রেস্‌ড, ডিপ্রেস্‌ড, সাপ্রেস্‌ড।' (দেবেশ, ২০১০ : ৪৮৯)। কোনো একটা জাতের উপর হাজার-হাজার বছরের অত্যাচারের বিরুদ্ধে কিছুই করা হবে না– কারণ তাদের কষ্ট সারা দেশের কষ্ট হিসেবে স্বীকৃতি পায়নি– এও যোগেনকে ধারণ করে চলতে হয়েছিল সামনের পথে। তাঁর ভেতরে সব রাজনৈতিক-সামাজিক কিংবা ধর্মীয় প্রশ্নই উত্থাপিত হয়– তার শূদ্র অস্তিত্ব থেকে। অথচ তাঁর তীব্র রাজনৈতিক সংকট শুরু হয় তখনই যখন তিনি ভেবে ফেলতে পারেন যে– তাঁকে বর্ণহিন্দুর মত শিক্ষিত ও সফল হতে হয় বর্ণভেদের বিরুদ্ধতা করার অধিকার অর্জনের জন্য ! "একটা কি ফাঁকে পড়ে যাচ্ছে না সেই মানুষটি যে শূদ্র অথচ বর্ণহিন্দুর সমতুল্য নয়।" (দেবেশ, ২০১০ : ৪৭৩)। এভাবে সংকট সাথে করেই যোগেন মণ্ডলের রাজনীতি একটা স্পষ্ট আকার ধারণ করতে থাকে। ইতিহাসজ্ঞান থেকেই তিনি জানতেন, ব্রাহ্মণবিরোধী আন্দোলনকেও নিজের পক্ষপুটে নিয়ে আসার কী আশ্চর্য ক্ষমতা রাখে ব্রাহ্মণ্যবাদ। যোগেন মণ্ডলের সংকট বা দ্বন্দ্ব ছিল বহুমাত্রিক, নমঃশূদ্র হিসেবে, বর্ণবাদী 'এলিট' হিন্দুর সাথে নব্য রাজনীতিক হিসেবে, নিজ জাতির সংগ্রামে, দেশভাগ পূর্ব ও সংলগ্ন দ্বান্দ্বিক রাজনীতি-উদ্ভূত সংকীর্ণ পরিবেশে। যোগেন মণ্ডলের ভারতবর্ষ-অনুসন্ধানী ধ্যান এবং অপর দেশযাত্রায় এই মহাকাব্যোপম উপন্যাসের সমাপ্তি হলেও সেটি তার জীবন ও অস্তিত্বের ব্যাপ্ত সংগ্রামের অসমাপ্ত অন্বেষণকেই ব্যাখ্যা করে। ঔপন্যাসিক দেবেশ রায়ের কেন্দ্রীয় মনোযোগ যোগেন মণ্ডলের উত্থাপিত প্রশ্নগুলোর ওপর, তাঁর ভাবনা ও ক্রমান্বয়ে সংগ্রামে গড়ে ওঠা রাজনৈতিক মতাদর্শ এবং স্বদেশ ভাবনায়। পাকিস্তান থেকে ভগ্নমনে ফিরে আসার বাস্তবিকতার পটও এই ভাবনায় সংলগ্ন হয়ে আছে, ঔপন্যাসিক তার-বিবরণ না দিলেও এই 'নভেলে'র ক্ষতি হয় না।

চল্লিশের শুরুতে আম্বেদকারের সংস্পর্শে যোগেন মণ্ডলের রাজনৈতিক ভাবনার উত্তরণ বা বড় এক পরিবর্তন ঘটে। ১৯৪৩ সালে যোগেন আম্বেদকারের 'অল ইন্ডিয়া সিডিউল কাস্ট ফেডারেশনের' বাংলা শাখার প্রতিষ্ঠাতা এবং সক্রিয় নেতা হিসেবে কাজ শুরু করেন। আম্বেদকারের রাজনৈতিক 'মুভমেন্ট' সম্পর্কে বলা হয়েছে :

> Ambedkar argued that the Depressed Classes constituted a third community alongside Hindus and Muslim, who required adequate representation. (Anupama, 2007 : 142)

Dhaka University Institutional Repository

আম্বেদকার দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন যে, ধর্ম ও রাজনীতির বিষয়ে হিন্দু পরিমণ্ডল থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার পরই কেবল নিম্ন শ্রেণীর হিন্দুরা তাদের অবস্থার উন্নতি করতে পারবে। কারণ তাঁর মতে, "হিন্দু ও মুসলমানদের মনোমালিন্য ধর্মীয়– সামাজিক নয়। আর হিন্দু ও অস্পৃশ্যদের মনোমালিন্য ধর্মীয় এবং সামাজিক– ক্ষমতা যেহেতু সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুদের কাছে হস্তান্তরিত হতে যাচ্ছে সেহেতু তাদের কিছুটা হলেও রাজনৈতিক রক্ষাকবচ থাকতে হবে।" (Ambedkar, 2008 : 58)

১৯৪৩-এ মুসলিম লিগ এবং খাজা নাজিমুদ্দিন-এর কোয়ালিশন সরকারের কৃষি এবং সমবায়মন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন যোগেন মণ্ডল। সরকার মুসলিম এবং সিডিউল কাস্টের মেলবন্ধনের প্রতীক হয়ে ওঠে। যোগেনের রাজনৈতিক অভীষ্ট এ পর্বেও বদলায়নি। তিনি ক্রমাগত এবং প্রায় একাকীই লড়তে চেয়েছেন নমঃশূদ্র বিষয়ে। ১৯৪৬ সালে 'কনস্টিটুয়েন্ট অ্যাসেমব্লি'র নির্বাচনে আম্বেদকার বম্বে প্রেসিডেন্সি থেকে জিততে পারেন নি। যোগেন্দ্রনাথ তাঁকে বাংলার তফশিলি আসন থেকে জিতিয়ে সাংবিধানিক সভায় পাঠালেন। আবার ১৯৪৬ সালে যোগেন মণ্ডল ছিলেন একমাত্র 'শিডিউল কাস্ট' প্রার্থী যিনি সাধারণ নির্বাচনে নির্বাচিত হয়েছিলেন 'শিডিউল কাস্ট প্লার্টফর্ম' থেকে। সোহরাওয়ার্দীর মন্ত্রিসভায় তিনি মন্ত্রী হিসেবে কাজ করেন। ৪৬-এর আগস্টের ভয়াবহ দাঙ্গায় সময় সিডিউল কাস্টকে যোগেন মণ্ডল এই দাঙ্গা থেকে বিরত থাকতে বলেন। তফসিল নেতা রসিকলালের বয়ানে ঔপন্যাসিক দেবেশ রায় দাঙ্গার সংজ্ঞা দেন; তথ্যসহ ব্যাখ্যা করেন '৪৬-এর দাঙ্গায় হিন্দু-মুসলিম-শিডিউল কাস্টের পরিবেশ পরিপ্রেক্ষিত ও অবস্থান :

> দাঙ্গা মানেই তো মারার স্বাধীনতা। যখন বাঁচার স্বাধীনতা থাকে না আর আর-একজনকে মারার স্বাধীনতাই মাত্র থাকে– তখনই সেই অবস্থাকে দাঙ্গা বলে। আমাদের দেশে হিন্দু আর মুসলমান এই দুই প্রতিপক্ষ হয়ে গেছে। (দেবেশ, ২০১০ : ৮৯৪)

এই প্রতিপক্ষ মনোভাবই ভারত-বিভাজনের মূল কারণ। যোগেন মণ্ডল বাংলার বিভিন্ন জেলা বা স্থান ঘুরে কষ্টকর অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করছিলেন; তিনি দেখেন হিন্দুরা কোনোক্রমেই এটা মেনে নিতে পারেন না যে তাদের মুসলমানদের শাসনে থাকতে হবে। হিন্দুদের মধ্যে যারা চায় মুসলমানদের শাসন শেষ করতে, তারা হরেক রকম মিশন-পার্টিতে কাজ করছে– হিন্দু সেবাশ্রম, হিন্দু মিশন, হিন্দু মহাসভা, স্থানীয় সব সেবা মিশন ইত্যাদি। যোগেন এও বোঝে যে হিন্দুদের সামাজিক সংগঠনগুলো ও

Dhaka University Institutional Repository

মুসলমানদের রাজনৈতিক পার্টি ছাড়া কোনো দাঙ্গা হতেই পারে না। "প্রত্যক্ষ না হলেও, অনতিদূর ভবিষ্যতে হিন্দুদের সঙ্গে হিন্দুদেরই দাঙ্গা বাঁধবে। সেটাই কি আজ শুরু হল আর-এক নয়া দাঙ্গায় যেখানে যোগেন মার খেল হিন্দুদেরই হাতে, যেখানে কংগ্রেস আর হিন্দু মহাসভা একসঙ্গে মুসলমানদের বিরোধিতা করছে।" (দেবেশ, ২০১০ : ৮৯৪)। কিন্তু এর চেয়ে বড় অনুভূত সত্য হল– "হিন্দু বড়জাতের কাছে তপশিলি বা শূদ্র আর মুসলমানরা পৃথক কোনো জনসত্তা নয়। চাঁড়াল আর নেড়া– দুইয়ে মিলে একটাই ছোটলোক।" (দেবেশ, ২০১০ : ৮৯৪)। তবে এর মধ্যে তপশিলি, যাদের পুরনো নাম শূদ্র, নতুন নাম সিডিউলড। নতুন আরো নাম হরিজন; তাদের অবস্থাই সর্বাধিক করুণ, কারণ তারা রইল 'ছাগলের মধ্যপুত্র' হয়ে, "যাদের–মুসলমানরা শাসায় হিন্দু বলে, আর হিন্দুরা শাসায় লোয়ার ক্লাস বলে।" (দেবেশ, ২০১০ : ৮৮৬)। যোগেন মণ্ডল দাঙ্গা প্রসঙ্গে এ কারণেই আইনসভার বক্তৃতায় বলিষ্ঠ ঘোষণা দেন :

> কোনো নমশূদ্র বা রাজবংশী, বা তপশিলি জনগোষ্ঠীর একজনও আর উঁচুজাতের হিন্দুদের জীবনমান রক্ষা করতে মুসলমানদের সঙ্গে দাঙ্গা করবে না। হিন্দু-ঐক্য একমাত্র তখন সরব হয়, যখন বর্ণহিন্দুরা আক্রান্ত হন। আমরা হিন্দু না। (দেবেশ, ২০১০ : ৫৯২)

সিডিউল কাস্টকে প্ররোচনা দিয়ে মুসলমানদের বিরুদ্ধে খেপিয়ে তোলার চেষ্টার অভিযোগে যোগেন মণ্ডল কংগ্রেস এবং হিন্দু মহাসভাকে সরাসরি অভিযুক্ত করেন। অবশ্য তাঁর মতামত এবং বক্তব্য তৎকালীন হিন্দু কাগজগুলোতে প্রকাশিত হয়নি। (দ্রষ্টব্য : Dwaipayan Sen, 2018 : 80)। ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের লক্ষ্যে জাতীয় আন্দোলন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে পরিচালিত হলেও একথা অনস্বীকার্য যে, "ঐ আন্দোলনে ধর্মকে ব্যবহার করা হয় ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে মানুষের ধর্মীয় অনুভূতিকে জাগ্রত করার জন্য।" (জয়া, ভূমিকা : ৩)। সময়ের দুর্বিনীত সত্যকেও ঔপন্যাসিক তুলে ধরেন নির্মোহ ভঙ্গিমায় :

> ধর্মান্ধগত্য থেকে থেকে জাতিবোধ, জাতিরক্ষণ আর আত্মরক্ষা একার্থক হয়ে যাওয়া, আত্মরক্ষার বাধ্যতা থেকে চণ্ড রিরংসা তৈরি করে তোলা, সেই রিরংসার তৃপ্তি এক তীব্র তুঙ্গ শঙ্কুন ক্ষমতায় পোঁছে। একমাত্র তেমন ক্ষমতার বশেই বিধর্মী পরিচয়ের কাউকে খুন করে ফেলাটাই নৈতিক মর্যাদা পেয়ে যায়। এটা নিশ্চয়ই দঙ্গল পাকিয়ে একটা স্বপরিচয় লাভের জটিল, গভীর, ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ফলেই ঘটে। (দেবেশ, ২০১০ : ৮৫২)

Dhaka University Institutional Repository

এছাড়া দেবেশ রায়ের মতে, ব্রিটিশরাজ্যের প্ররোচনায় সাম্প্রদায়িকতা বেড়েছে বা সাম্প্রদায়িকতা ধারণাটাই ব্রিটিশরাজের আমদানি– এমন সিদ্ধান্তের মধ্যে একটা কোনো সত্য হয়তো আংশিক আছে কিন্তু সঙ্গে আছে বহুতর অসত্য। সমকালীন রাজনৈতিক-পরিস্থিতির একটা ছোট উদাহরণ টেনে ঔপন্যাসিক ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করেছেন :

> একটা জেলা বোর্ডে বা স্কুলবোর্ডে বা মিউনিসিপ্যালিটিতে বা টাউনকমিটিতে বা ইউনিয়ন বোর্ডে বা ফজলুল হকের তৈরি নানাবিধ মনোনীত প্রার্থীপদে একজন উঁচু জাতের হিন্দু মনোনীত হলে সে যে হিন্দু এটা হিশেবে ততটা আসত না, যতটা আসত তার যোগ্যতার প্রসঙ্গ। কিন্তু কোনো মুসলমান মনোনীত হলে, বা তপশিলি কোনো প্রার্থী মনোনীত হলে, সে যোগ্য কী না– এ প্রশ্ন উঠতই না, উঠত তার ধর্ম-পরিচয় ও জাত-পরিচয়, সেটা যুক্তপ্রদেশ ও তামিলনাড়ুর মত বড়-বড় সব জায়গায়। ... মুসলমান ব্যতীত অন্য ধর্মই যেন হিন্দু সংস্কৃতির অংশ। এমনকি আদিবাসী (ওরিজিন্যালস) হলেও। ভারতবিদ্যার পেডাগজিতেও (Pedagogy) এই অসমব্যবধান মেনে নেয়া হয়েছে। (দেবেশ, ২০১০ : ৯৩০)।

ভারতের স্বাধীনতা পর্বে কংগ্রেসের নেতাদের কাছে ব্রিটিশ শাসকদের সঙ্গে আপসহীনতার পাশাপাশি বড় চ্যালেঞ্জ ছিল মুসলিম লিগের সাথে আলাপ-আলোচনা চালানো। ঔপন্যাসিক দেবেশ রায় গুরুতর প্রশ্ন তোলেন– "জিন্নার দ্বি-জাতিতত্ত্বটা এল কোত্থেকে ? কেন অসংখ্য জাতির দেশ ভারতবর্ষে জাত আর জাতির ফারাক তৈরি হল ? আর জাত গোণা কেন এই দুইয়েই থেমে থাকল– হিন্দু ও মুসলমান ? এর আগে ও পরেও শিখ, হিন্দু ও মুসলমানরা সবাই মিলে পাঞ্জাবীও ছিল।" (দেবেশ, ২০১০ : ৯২৯)। প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের প্রথম ভোটের সময়েও কংগ্রেস ও মুসলিম লিগের রেষারেষির চেয়ে ঐক্যের ভাবই ছিল– যুক্তপ্রদেশ, আসাম, পাঞ্জাব, সিন্ধু, বাংলা সর্বত্রই এই দুটি দলের– কংগ্রেস ও মুসলিমদের প্রাদেশিক কোনো দলে কোয়ালিশন সরকার গঠনের কথা ছিল। ভোটের পর মন্ত্রিসভা তৈরির কথা উঠলে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু একটি প্রকাশ্য বিবৃতিতে জানালেন যে, তিনিই তখন কংগ্রেসের রাষ্ট্রপতি– 'দেশের রাজনীতির বিবর্তনে এখন ভারতের ভবিষ্যত নিয়ে দুটি মাত্র পক্ষ মতবিনিময় করতে পারে– ব্রিটিশরাজ ও কংগ্রেস।' এরই উত্তরে জিন্না বলেছিলেন "তিন নম্বর আর এক পক্ষও আছে মুসলমানরা। .... আমরা কোনো পার্টিরই তল্পিবাহক নই, কিন্তু ভারতের কল্যাণকর যে-কোনো কাজে আমরা সমানাধিকার নিয়ে প্রস্তুত থাকি।" দেবেশ রায়ের মতে :

Dhaka University Institutional Repository

> জওহরলালের ঠিক এই বিবৃতিটি থেকেই ভারতের জাতীয়তাবাদ সংখ্যা দিয়ে গোনার শুরু কী না, তার দলিল প্রমাণ তেমন কিন্তু কেউ যদি চান, তাহলে তিনি এই তারিখটাকে তেমন জাতিসুমারির শুরুর বছর ধরতে পারেন। জওহরলাল সারা দেশের সব নেতাদের মধ্যে বেশি আধুনিক, সংস্কারমুক্ত, ধর্মীয় প্রভাবমুক্ত ও গণতন্ত্রী। আর তিনিই কী না ব্রিটিশ বনাম ভারত, পাশ্চাত্য বনাম প্রাচ্য, সাম্রাজ্যবাদ বনাম গণতন্ত্রের ঐতিহাসিক মহারণে পক্ষ স্থির করলেন ধর্ম দিয়ে? ... কিন্তু জওহরলাল নিজে তাঁর জীবনের শেষ পর্যন্ত মনে করে গেছেন, তখনকার সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতিতে সাম্প্রদায়িক ক্ষমতাকেন্দ্রগুলির বিরুদ্ধে ওই জায়গায় দাঁড়ানো ছাড়া কোনো পথ খোলা ছিল না। (দেবেশ, ২০১০ : ৯৩০)

ভারতবর্ষে ইতিহাসের এই সংকটতম মূহূর্তকে বিশ্লেষণ করার সূত্রেই ঔপন্যাসিক 'ভারতের জাতীয়তাবাদ' প্রসঙ্গটি সমকালীন সাম্প্রদায়িক রাজনীতির প্রেক্ষাপটে বিচার করেন। তিনি ভারতবর্ষের জাতীয় ইতিহাস বা জাতীয় আখ্যান নির্মাণে প্রশ্ন তোলেন "হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গাই কী এক্ষেত্রে সবচেয়ে 'মূল্যবান' উপাদান? আর তার সঙ্গে জড়িয়েই গান্ধীজী ও জিন্নার রাজনৈতিক সব কাজকর্ম দেখা কি সঙ্গত ? আর সেই দেখা থেকেই কি আমাদের তিন দেশেই দরকার দেশভাগের একজন শহিদ, একজন খলনায়ক ও একজন মতলবি ?" (দেবেশ, ২০১০ : ৯২৭)। ভারতের জাতীয়তাবাদ প্রসঙ্গে সমালোচক লিখেছেন :

> আদর্শ ও রাজনৈতিক আচরণের দিক থেকে ভারতীয় জাতীয়তাবাদ ও সাম্প্রদায়িকতার মধ্যকার সম্পর্ক জটিল এবং দুই বিপরীতধর্মী শক্তির একটি সংশ্লেষিত রূপ। ভারতীয় জাতীয়তাবাদ আদর্শিকভাবে সত্যিকার অর্থে যেমন ধর্মনিরপেক্ষ নয়, তেমনি তার দার্শনিক ভিত্তিও সুদৃঢ় নয়। (জয়া, ২০০৩ : ১)

উপন্যাসে দেবেশ রায়ের জাতীয়তাবাদের অনুসন্ধানেও এ সত্য গভীরভাবে অনুভূত হয়। এছাড়া জাতীয়তার দার্শনিক রূপ অন্বেষণে তিনি 'উত্তর-উপনিবেশবাদী' দৃষ্টিতে বিবেচ্য ইংরেজ সংসর্গে পাওয়া 'নেশন'-এর মহত্ত্বও এড়িয়ে যেতে পারেন না বলে সূক্ষ্ম আক্ষেপ করেন। কারণ কলোনি-অস্তিত্বও আমাদের জাতীয় আখ্যানের অন্তর্গত। তাঁর মতে, জাতীয়তাবাদের ধারণাটি একরকম নিষ্পত্তিহীন থাকে মূলত হিন্দু-মুসলিম শ্রেণিদ্বন্দ্বে, "জাতীয়তাবাদের বিরোধিতায় তাই সাম্প্রদায়িকতা সংক্রমণের ভয় থেকে যায়। আবার সাম্রাজ্যবাদের মুৎসুদ্দি হওয়ার ভয়ও থেকে যায়।" (দেবেশ, ২০১০ : ৯২৯)। জাত, জাতি, জাতীয়তা সম্পর্কিত বিভ্রাট থেকে দেবেশ আবার মনোযোগ ফেরান বরিশালের শূদ্র নেতা যোগেন মণ্ডলের দিকে। 'দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ', 'ক্রিপস্ মিশন', 'ভারত ছাড়ো',

Dhaka University Institutional Repository

'দিল্লী চলো' প্রভৃতি ঘোষণায় উদ্ভূত পরিস্থিতিতে দিশেহারা বোধ করতে থাকে যোগেন। "তার দিশে আরো হারিয়ে গেল বাংলার রাজনীতির অস্থিরতায়। ১৯৪২ সালেও বাংলায় যাদের কিছু-না-কিছু-সংগঠন ও কর্মী আছে তাদের কেউ এই তিনটি প্রস্তাব নিয়ে একটি কথাও বলেনি।" (দেবেশ, ২০১০ : ৯৫৭)।

ভারত স্বাধীনতা বিষয়ক প্রস্তাব এবং কেন্দ্র তথা দিল্লীর নেতাদের সাথে ব্রিটিশ-পক্ষের আলাপ-আলোচনা প্রসঙ্গে কংগ্রেস নেতা কিরশঙ্কর রায়ের কাছে যোগেন জানতে চায় : "দাদা, এই যে দিল্লিতে এত লেনদেন হচ্ছে, একটু বুঝায়্যা দেন-না। কিরণশঙ্কর খুব হেসে বলেছিলেন, 'যোগেনবাবু, আমি বুঝলে তো আপনাকে বলব?" (দেবেশ, ২০১০ : ৯৫৭)। যোগেন ক্রিপস্ প্রস্তাব ও বাংলার নেতাদের সাথে কেন্দ্রের বিচ্ছিন্নতা প্রসঙ্গে বলে : 'খুব পরিষ্কার না থাইকলেও ভাগাভাগির একটা কথা কিন্তু উইঠ্যা পইড়ছে। হাওয়াডা যে উইঠল, তাতে বারবারই কয়েকডা জায়গার নামই ঘুর‍্যাফিরা উইঠল– পাঞ্জাব, উত্তর-পশ্চিম, বাংলা আর বাংলার সঙ্গে মিশ্যাইয়া দুই-একবার আসাম। তো বাংলার একডা নেতার সঙ্গে কোনো কথা হইল ন্যা ? বাংলার যে-পার্টিরই হোক, একটা মতামত তো নিব?" (দেবেশ, ২০১০ : ৯৫৮)। প্রাদেশিক রাজনীতিতে বাংলার নেতৃবৃন্দের ক্ষমতা ক্রমেই লঘু হচ্ছিল; জমিদারি পদ্ধতিও দ্রুত অবক্ষয়িত হয়েছিল। ফলে মূল জাতীয়তাবাদী রাজনীতি থেকে হতাশাগ্রস্ত বাংলার নেতারা সরে যান। ১৯৪৬-এর ১২ মে গমনোদ্যোগী ব্রিটিশদের ক্যাবিনেট মিশন বিষয়ক প্রস্তাব-সভায় বাংলার কোনো নেতা ছিলেন না। ঔপন্যাসিক ও যোগেনের সামবায়িক দৃষ্টিকোণে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এবং দেশভাগ-সংলগ্ন বাংলার পরিস্থিতি চিত্রায়িত হয়েছে উপন্যাসে। ফজলুল হকের মন্ত্রিসভা থেকে শুরু করে স্বাধীনতার পূর্বদিন পর্যন্ত হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর অধীনে মুসলমানরা বাংলা শাসন করছিল বলেই স্বাভাবিকভাবে হিন্দু-মুসলমান দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে একটা বিভেদের প্রাচীর গড়ে ওঠে। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার উপায় হিসেবে লিগও বাংলাকে হাতিয়ার করেছে, এছাড়া কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ বাংলাকে কখনই নিজেদের মতো সংগঠন এবং সংগ্রাম করার অধিকার দেয়নি। কেন্দ্রীয় রাজনীতিতে বসু ভ্রাতৃদ্বয়ের পরিণতি প্রসঙ্গে ঔপন্যাসিক দেবেশ রায় তা বিশদভাবে বর্ণনা করেছেন। বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে বিশেষত ৪২' থেকে ৪৭'-এর মধ্যে যুদ্ধসময় ও তার বিভীষকায় কিংবা যুদ্ধ-আক্রান্ত দুর্ভিক্ষের করালরূপ (যা গণহত্যার শামিল) এবং অন্যদিকে ঘনায়মান গণবিক্ষোভ ('ভারত ছাড়ো' ও দাঙ্গা পরিস্থিতি) প্রভৃতি সংঘটনায় বাংলা ক্রমেই বৃত্তকেন্দ্র থেকে চ্যুত

Dhaka University Institutional Repository

হতে থাকে। ঔপন্যাসিক যার নাম দিলেন 'খরচের খাতায় বাংলা' (অধ্যায় : ১৭১, *বরিশালের যোগেন মণ্ডল*)।

১৯৩৭-এ ভোটে মুসলিম-মন্ত্রিসভার শাসনে বসবাস বাঙালি উচ্চবর্ণের হিন্দুদের কাছে সুখকর ছিল না। হিন্দু-মহাসভার নেতা শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি ১৯৪৭-এ বাংলা ভাগের পক্ষে আন্দোলনের সময় সর্বত্র এই কথা প্রচার করেন যে- "দীর্ঘ মুসলমান শাসনে বাংলার হিন্দুদের সমস্ত সম্পদ লুট হয়েছে, হিন্দু সংস্কৃতি ও ধর্ম হয়ে দাঁড়িয়েছে পরাজিতের সংস্কৃতি ও ধর্ম, মুসলমানদের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক না রেখে বাঙালি হিন্দু বাঁচতে চায়, পশ্চিমবঙ্গ ও উত্তরবঙ্গকে নিয়ে আমরা হিন্দুপ্রধান একটি প্রদেশ চাই, সে-প্রদেশ ভারতের সঙ্গে যুক্ত থাকবে। শ্যামাপ্রসাদের হিন্দু সবসময়ই উচ্চবর্ণ হিন্দু।" (দেবেশ, ২০১০ : ১০৩৭)। তফশিলিদের মধ্যে হিন্দু মহাসভার প্রচার বিশেষ করে বাড়তে থাকে ১৯৪১ সালের জনগণনার সময়। যদিও যুদ্ধের সময় জনগণনার কাজ খবই সংক্ষেপে করা হয়েছিল, তবু হিন্দু মহাসভা চেষ্টা করেছে তফশিলি জাতিরা যাতে নিজেদের হিন্দু বলে পরিচয় দেয়। এছাড়া, "পাকিস্তানের দাবি যতই জোরদার হতে লাগল, অন্ত্যজ জাতির মধ্যে হিন্দু মহাসভার প্রচার তত বাড়ল।" (উদ্ধৃত, পার্থ, ১৪২১ : ৬৫)। হিন্দুত্বের গৌরববোধ থেকেই বাংলার উচ্চবর্ণের হিন্দুরা কংগ্রেস ও হিন্দু মহাসভা আর বাইরের নেতারাও বাংলা বিভাজনে কেন্দ্রীয় কংগ্রেসকে রাজি করান। ১৯৪৭ সালের জানুয়ারি থেকে এ ব্যাপারে কংগ্রেস মহলও সক্রিয় হয়ে ওঠে। যে যুক্তিতে তারা অখণ্ড ভারতের দাবিতে সোচ্চার ছিলেন, বাংলা ও পাঞ্জাব ভাগ করার দাবি ছিল তার সম্পূর্ণ বিপরীত। সাম্প্রদায়িকতা বা দ্বিজাতিতত্ত্বের বিরোধিতার নামেই তারা ভারত-বিভক্তি রোধ করতে চেয়েছিলেন। অথচ সেই সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধিই তাদেরকে বাংলা ও পাঞ্জাব বিভক্তির মত সংকীর্ণ দাবির পথে টেনে নিয়ে গিয়েছিল। ১৯৪৭ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি কংগ্রেসের পক্ষ থেকে সাম্প্রদায়িকতার ভিত্তিতে বাংলা ভাগের দাবি জানিয়ে এক বিবৃতি প্রকাশ করা হয়। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি আচার্য কৃপালিনীও আরেকটি বিবৃতিতে 'বঙ্গভঙ্গে'র দাবি জানান। তিনি বাংলা ও পাঞ্জাব ভাগের প্রশ্নে হিন্দু মহাসভার সাথে একাত্মতা ঘোষণা করেন। প্রাসঙ্গিক যে, ১৯৪২ এর মধ্যেই বাঙালির সমাজ শরীরে দুটি দেহ– (১) 'স্বাধিকার বঞ্চিত' হিন্দুসমাজ (২) 'অধিকার অর্জন প্রয়াসী' (প্রত্যক্ষ সংগ্রাম ছিল সেই অধিকার ফিরে পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা) মুসলমানসমাজ। তাই ১৬ আগস্টের পার্টিশনে বাংলা ভাগ ছিল অনিবার্য। এ সম্পর্কে দেবেশ রায়ের মূল্যায়ন :

Dhaka University Institutional Repository

> ভারতের প্রদেশগুলিকে তিনটি আলাদা গুচ্ছে ভাগ করার ও সেই ভাগের ভিত্তিতে যুদ্ধের পর ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাস নিয়ে কথা-বলার ক্রিপস প্রস্তাব বাতিল হল তামাদি হুন্ডি বলে। কিন্তু ধর্মের ভিত্তিতে প্রদেশগুলিতে তিনটি গুচ্ছে যে সাজানো হয়েছিল সেটা থেকেই গেল। ক্যাবিনেট মিশন ফিরে যাওয়ার পর ওয়াভেল 'ইনটেরিম গভর্নমেন্ট' শব্দটি– ব্যবহার করলেন ভাইসরয়ের 'একজিকিউটিভ কাউন্সিলে'র বদলে। ... ব্রিটেন যাকে বলে ক্ষমতা-হস্তান্তর, ভারতীয়রা যাকে বলে স্বাধীনতা, পাকিস্তানি যাকে বলে পার্টিশন– সেই ঘটনা ঘটল ১৪-১৫ আগস্ট, ১৯৪৭। (দেবেশ, ২০১০ : ১০৩৮)

পশ্চিমবঙ্গে যখন বাংলা ভাগ নিয়ে তুমুল বিতর্ক চলছে ঢাকায় তখন তফশিলি সম্প্রদায় ও মুসলমানদের যৌথ আন্দোলন চলছিল অবিভক্ত বাংলার পক্ষে। ১৯৪৭ সালের ১৫ এপ্রিল ঢাকার অদূরে পূবাইল স্টেশনের কাছে তাজুল হাইস্কুল মাঠে কামরুদ্দীন আহমদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয় তফশিলি ও মুসলমানদের যৌথ জনসভা। 'দৈনিক আজাদে'র রিপোর্টে সভার সভাপতি কামরুদ্দীন আহমদের বক্তব্য এভাবে তুলে ধরা হয় :

> আজ বঙ্গবিভাগের জন্য যে আন্দোলন শুরু হইয়াছে তাহা বাহিরের শত্রুদেরই আক্রমণ। এই আক্রমণ নমঃশূদ্র, অন্যান্য তফসিলি ও মুসলমানদের মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া দিবার জন্যই করা হইতেছে। ... তিনি স্মরণ করাইয়া দেন যে, ২৫ বৎসর পূর্বেও কোন তফসিলি সম্প্রদায়ের লোক বর্ণহিন্দুদের সম্মুখ দিয়া জুতা পায়ে দিয়া যাইতে পারিত না। এবং ১৯৩৭ সালে লীগ ও তফসিলিদের মিলিত মন্ত্রিসভা গঠিত হইবার পূর্ব পর্যন্ত এই উচ্চশ্রেণীর হিন্দুরা মহাজনী ব্যবসার দ্বারা তফসিলি ও মুসলমানদের শোষণ করিয়াছে এবং হাজার হাজার তফসিলি ও মুসলমানকে গৃহহারা, ভিটাহারা, দিনমজুরে পরিণত করিয়াছে। (উদ্ধৃত, মান্নান, ২০০৭ : ২৬৬)

১৯৪৭ সালের ২২ এপ্রিল যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল দিল্লিতে এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন :

> বাংলার অধিকাংশ অমুসলমান বাংলা ভাগ সমর্থন করে না। বাংলার দাঙ্গা একটি ক্ষণস্থায়ী ঘটনা মাত্র বরং তা সর্বতোভাবেই পরিকল্পিত। এই অজুহাতে বাংলা ভাগ করা অবিবেচকের কাজ হবে। দাঙ্গা কখনোই সমস্যার সমাধান হিসাবে গণ্য হতে পারে না। (উদ্ধৃত, মান্নান, ২০০৭ : ২৬৬)

যোগেন বাংলাদেশ ভাগ করার মত একটি আত্মঘাতী সিদ্ধান্ত নেয়ার আগে প্রয়োজনে সারা বাংলায় গণভোট অনুষ্ঠানের আবেদন জানান। তিনি স্মরণ করিয়ে দেন, "বর্ণহিন্দুগণ যে আটটি জেলা নিয়ে

Dhaka University Institutional Repository

একটি হিন্দু প্রদেশ (পশ্চিম বাংলা) গঠন করতে চাইছেন সেখানেও শতকরা ৩৮ জনই তফসিলি সম্প্রদায়ের লোক রয়েছেন।" (উদ্ধৃত, মান্নান, ২০০৭ : ২৬৬)।

অখণ্ড ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন অথবা স্বাধীনতা প্রাপ্তির ইতিহাসে নমঃশূদ্র যোগেন মণ্ডল প্রায় হঠাৎই ইতিহাসের কেন্দ্রে ঢুকে পড়া মানুষ। "১৯৪৫-৪৬-এ ইতিহাসের নির্ঘন্ট (সচেতন বা অসচেতন) ও যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল নামের একটা লোকের "ব্যক্তিগত কোষ্ঠী (সচেতন বা অসচেতন)' পরস্পরের মধ্যে ঢুকে পড়ল।" (দেবেশ, ২০১০ : ১০৩৪)। কারণ যোগেন মণ্ডল এমন বিশিষ্ট কোনো নেতা নয় যে অখণ্ড ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে কোনো একটি টুকরো জায়গাতেও তার কোনো জায়গায় তৈরি করা যায়।" (দেবেশ, ২০১০ : ১০৩০)। যোগেনের রাজনৈতিক দর্শন সরল, নির্মোহ ও আপসহীন ছিল। তফশিলিদের মধ্যেই তাঁর রাজনীতির বিরোধী নেতা ছিল; আম্বেদকারের সংস্পর্শে যোগেনের থাকা নিয়ে ছিল এই বিরোধিতা বা বিতর্ক। কিন্তু যোগেনের সাফল্যকে তাতে সংকুচিত করা যায়নি। শূদ্র যোগেনের অদ্বিতীয়তাও প্রমাণিত ; ঔপন্যাসিকের মতে তার কারণগুলো হল :

- ১৯৩৭-এর ভোটে সাধারণ আসন থেকে জয়।
- ১৯৪৬-এ স্বায়ত্তশাসনের দ্বিতীয় ভোটে 'ভারতীয় তপশিলি জাতি ফেডারেশন'-এর প্রার্থী হিসেবে জয়
- সংবিধান রচনা পরিষদে আম্বেদকরকে বাংলার তপশিলি আসন থেকে জিতিয়ে নেয়া এবং
- একমাত্র যোগেনেই নিজের তপশিলি পরিচয় ভাঙ্গিয়ে অন্য কোনো 'বড় পার্টির' লেজ হতে যায়নি। চায়ও নি। ... (দেবেশ, ২০১০ : ১০৩১)।

এক যোগেনই ছিল নিজের তফশিলি ও নমঃশূদ্র পরিচয়ে সম্পূর্ণ এক নেতা, আইনসভায় সম্মানিত ও বিভিন্ন রকম সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত। তপশিলিদের রাজনৈতিক পরিচয় তফশিলি, অন্য পার্টিতে বা আন্দোলনেও তফশিলিরা থাকতে পারে। যেমন– মজুর বা কৃষক আন্দোলন, যোগেনের দৃষ্টিতে তফশিলি-সম্প্রদায়ের মূল্যায়ন : "কিন্তু তাদের রাজনীতির পরিচয় তপশিলি হিসেবেই। যোগেন 'শূদ্র' কথাটাই বলে বেশি। 'শুদ্দুর'ও বলে। 'চাঁড়াল' বলেও নিজের পরিচয় দেয়। এমন একটা

Dhaka University Institutional Repository

আত্মপরিচয়কে এতটা প্রাধান্য দেয়ার মধ্যে একটা অস্বীকার অযোষিত ছিল– নমশূদ্র বা রাজবংশী ইত্যাদি জনগোষ্ঠীর সাবেক নেতৃত্বকে অমান্য করা। হয় বামুনদের মত গুরুগিরি করে, পৈতে পড়ে, মন্ত্র দিয়ে তারা গুরু হওয়ার সূত্রে নেতা হত। না-হয় পূর্ব পুরুষের বড় জমিদারি বা রাজাগিরির সুবাদে অনগ্রসরদের নেতা হত।" (দেবেশ, ২০১০ : ১০৩১)। যোগেনের রাজনীতির সূত্রগুলো স্পষ্ট ও সাদাসিধে ছিল– "শূদ্ররা শূদ্র। তারা হিন্দু হওয়ার ফলে শূদ্র নয়। কোনো রকম হিন্দুগিরির ছোঁয়া শূদ্রকে রক্ষা করে না। গান্ধীজীরও না। হিন্দু মিশনেরও না। মন্দিরে ঢোকার আইন পাশ করে বা শুদ্ধি করে শুদ্রের শূদ্র থাকাটাকে শুধু অস্থির করা যায়।" (দেবেশ, ২০১০ : ১০৩২)।

যোগেন মণ্ডল তফশিলিদের স্বতন্ত্র রাজনৈতিক পরিচয়কেই তার রাজনৈতিক সংগ্রামে মুখ্য ব্যাপার ভেবেছেন। কিন্তু গান্ধী-কংগ্রেসে সে সুযোগ মেলেনি। তাঁর রাজনৈতিক তত্ত্ব-ধারণা; স্বদেশ চিন্তা দৃঢ় এবং জোরালোভাবে প্রকাশিত হয় ১৯৪৬ সালে নির্বাচনের আগে নমঃশূদ্র সমাজের অন্যতম প্রধান নেতা, হরিচাঁদ-গুরুচাঁদের বংশধর বিলেত-ফেরত ব্যারিস্টার প্রমথরঞ্জন ঠাকুরের সঙ্গে বির্তকে। সভায় পি আর ঠাকুর বলতে শুরু করেন যে জিন্নাহ-র পাকিস্তান প্রস্তাব দেশের সামনে এক বিরাট বিপদ নিয়ে এসেছে। যোগেন উঠে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করেন, "কোন দেশ? কার বিপদ? আপনি কোন দেশের বিপদের কথা বলতে চান?" পি আর ঠাকুর ঠাট্টার স্বরে বলেন– 'আপনার আমাদের দেশের মধ্যে তফাৎ কি এত বড় হয়ে গেছে যে আপনি দেশ চিনতে পারছেন না। এখন আমাদের জাতীয় মূলধারা হিন্দু-মুসলমান-তপশিলি জাতীয় ঐক্য বদলে আর-এক ঐতিহ্য বানালেন ও আমাদের সেইটা মানতে বাধ্য করছেন।' যোগেনও উচ্চকণ্ঠে প্রতিবাদ করেন– "ও-সব কথা রাখান। ঐ বাসি পচা সব হিন্দু ছলনা দিয়্যা একডা দ্যাশ বানাইয়্যা একডা ধর্ম বানাইয়া মুসলমান গ একটা শত্রু খাড়া কইর‍্যা শুদ্দুরগ সর্বনাশ আর কইরবেন না। মিস্টার জিন্না-র পাকিস্তান যদি আপনার দ্যাশের বিপদ হয়, তাইলে মিস্টার গান্ধীর হরিজনও আমার দ্যাশের পক্ষে আরো বড় বিপদ।" (দেবেশ, ২০১০ : ১০২৩)। তবে তফশিলি সমাজের ভেতর বাংলা ভাগ নিয়ে বিতর্কে যোগেন্দ্রনাথ শেষ পর্যন্ত পরাজিতই হলেন। কিন্তু তাঁর রাজনৈতিক কণ্ঠস্বর স্তিমিত হয়নি। ব্রিটিশ কারসাজিতে অনেকটা প্রহসনপূর্ণ 'ইনটেরিম গবর্নমেন্টে'র লিগের আইনমন্ত্রী হিসেবে নির্বাচিত যোগেন মণ্ডলের নাম শুনে "প্রায় বিশ্বব্যাপী আলোড়ন দেখা দিল– অন্তত ইংল্যান্ডে, আমেরিকায় ও ভারতে। কংগ্রেসে। ভাইসরয় ও ইন্ডিয়া অফিসে। ইউরোপিয়ার ব্লকে। লিগে। কাগজপত্রে। ... (কারণ) এ-নামটা কারো চেনা নয়" (দেবেশ,

Dhaka University Institutional Repository

২০১০ : ১০৩৬)। এ পর্যায়ে নমঃশূদ্র যোগেনের মন্ত্রীত্ব নিয়ে বিশিষ্টদের প্রতিক্রিয়া তুলে ধরেন ঔপন্যাসিক :

> মৌলানা আবুল কালাম আজাদ পরে লিখেছেন, '(মি. জিন্না) যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডলকে মনোনীত করলেন। এমন মনোনয়নে সবাই মজাও পেয়েছিল, রেগেও গিয়েছিল।' ... সম্রাট ষষ্ঠ জর্জকে বড়লাট লর্ড ওয়াভেল ১৯৪৭-এর ২৪ ফেব্রুয়ারি জানালেন, 'লিগের তপশিলি প্রতিনিধি মণ্ডল হয়েছেন আইনমন্ত্রী। তিনি গ্রামে গ্রামে তপশিলিদের রাজনৈতিক মিটিং করে বেড়ান।'
>
> সম্ভাব্য পাকিস্তানের নিশ্চিত প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলি খান ও তাঁর অনুগামী লিগ নেতারা জিন্নার এই মনোনয়নে বিরক্ত হয়েছিলেন ও যোগেনকে পাকিস্তানের গণ পরিষদের অস্থায়ী সভাপতি করতে চান নি।
>
> যোগেন্দ্রনাথ সম্পর্কে বাংলার উচ্চবর্ণের হিন্দু নেতারা, এমন কোনো নোংরা কথা নেই যা বলেননি। উচ্চবর্ণের এই হিন্দু নেতারা শুধুই কংগ্রেসের বা হিন্দু মহাসভার সমর্থক নন, এমনকী বামপন্থী হিন্দু নেতারাও তার সম্পর্কে ঘৃণা প্রচার করেছেন। এখনো করেন। (দেবেশ, ২০১০ : ১০৩৬)

এর কারণ অনুসন্ধানেই *বরিশালের যোগেন মণ্ডল*-এর মত উপন্যাস-সম ইতিহাস অথবা ইতিহাস-সম উপন্যাসের সৃষ্টি। '৪৭-এর দেশভাগ ও যোগেনের অবস্থান নিয়ে ঔপন্যাসিকের তীক্ষ্ম শ্লেষযুক্ত জিজ্ঞাসা:

> এত বড় আন্তর্জাতিক বিনিময়ে এই শূদ্রসন্তান কোত্থেকে এল?
> কে ও ?
> কে চেনে ওকে?
> তাহলে?
> একটা চাঁড়াল গিয়ে বসল রাজসিংহাসনে?
> ...
> তাহলে? ভারত ভাগের আন্দোলনে তার ইন্টারেস্ট কী?
> কিছু না।
> অপরাধ কী?
> শুদ্দুর হয়ে জন্মানো। (দেবেশ, ২০১০ : ১০৪১-৪৩)

Dhaka University Institutional Repository

ভারতের স্বাধীনতা পাওয়ার চেষ্টায় একেবারে শেষ দশকে সারা ভারতে সে একমাত্র নেতা যে পাকিস্তান-প্রস্তাব সমর্থন করেছিল, বঙ্গভঙ্গের (৪৭'-এর) বিরোধিতা করেছিল, তফশিলি হলেও হিন্দু থাকে নি ও "পাকিস্তান প্রস্তাব মানলেও যে শূদ্র মুসলিম হয় নি।" (দেবেশ, ২০১০ : ১০৫১)। ১৯৫০ সালের দাঙ্গায় পূর্ব পাকিস্তানে সংখ্যালঘু, প্রধানত নমঃশূদ্র, হত্যার প্রতিবাদ করেছিল পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় মন্ত্রী হিসেবে। "জিন্নাহীন পাকিস্তানের সামরিক ও সাম্প্রদায়িক রাজনীতির নেতারা তাকে খুন করার ষড়যন্ত্র ফেঁদেছিল, সে তাদের ফাঁসিয়ে দিয়ে পালাতে পারে।" (দেবেশ, ২০১০ : ১০৫১)। মন্ত্রিসভায় শূদ্রদের পরিণতি কিংবা বাংলা ভাগ বিষয়ে যোগেনের এটা প্রথম প্রতিবাদ নয়। অর্ন্তবর্তী সরকারের মিটিং-এ মাউন্টব্যাটেন, জওহরলাল, লিয়াকত আলি প্রমুখের সামনে যোগেন বলেছিলেন– "এটা খুব অদ্ভুত ঠেকছে যে সমস্ত সমাধান যে প্রদেশের ওপর নির্ভর করছে বা এখানকার সমাধানের ওপর যে প্রদেশের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে সবচেয়ে বেশি, সেই বাংলার কোনো প্রতিনিধি এই মন্ত্রিসভায় নেই।" (দেবেশ, ২০১০ : ১০৪৪)। মাউন্টব্যাটেনের ব্রিটিশ কায়দার ব্যঙ্গে ও ঠাট্টায় যোগনের শূদ্র পরিচয় স্পষ্ট স্বীকৃত হয় : "মাউন্টব্যাটেন তাঁর সামনে রাখা ফাইলের পাতাগুলো কোণা দুটো-একটা নাড়িয়ে মুখটা নিচু রেখেই সামান্য হেসে খুব চাপা গলায় বললেন, 'আমাদের অবিশ্যি তেমন মনে হচ্ছে না, বরং মাননীয় মিস্টার মণ্ডলের দিকে তাকিয়ে আমরা বাংলাকে যথেষ্ট উপস্থিত মনে করছি।" (দেবেশ, ২০১০ : ১০৪৫)। দাঙ্গায় তফশিলি মানুষ সম্পর্কে ব্রিটিশরাজ ও কংগ্রেস লিগ নেতাদের প্রতি যোগেনের আরো প্রশ্ন–

> বাংলার দাঙ্গা বললেই তো আমরা বুঝে নিচ্ছি হিন্দু মুসলমনা। পাঞ্জাবের দাঙ্গা বললেই আমরা বুঝে নিচ্ছি হিন্দু শিখ ও মুসলমানদের দাঙ্গা। কিন্তু বাংলাতেই হোক আর পাঞ্জাবেই হোক, যে দুটি সম্প্রদায়ের দাঙ্গা, সেই দুটি সম্প্রদায়ের বাইরেও তো অনেক মানুষ থাকেন, যেমন, তপশিলিরা, তাঁরা কী করছেন।
>
> সকলেই ধরে নিয়েছেন, যোগেনের তৃতীয় পক্ষ কাল্পনিক। এতে সবাই এমন হেসে উঠলেন। (কিন্তু) বিহারের দাঙ্গা নিয়ে প্যাটেল (যখন) বললেন, "গভর্নর নাকি বরাবরই বলছেন, সাহেবরা যেন কোনো ভাবেই দাঙ্গা-হাঙ্গামায় থার্ড পার্টি না হয়ে যায়। তখন কেউ আর হাসে নি। (দেবেশ, ২০১০ : ১০৪৫)

বরিশালের যোগেন মণ্ডল উপন্যাসের এই দীর্ঘ ইতিহাসপটে যোগেন মণ্ডলকে এক নিঃসঙ্গ রাজনৈতিক নায়ক হিসেবেই প্রতিষ্ঠা করেছেন দেবেশ, শূদ্র হিসেবে যোগেন তাঁর "স্বজাতির অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে

Dhaka University Institutional Repository

রাজনৈতিক সংগ্রামে নেমেছিলেন, তিনিই শেষ জীবনে রাজনৈতিক অস্পৃশ্য হয়ে গেলেন, এর চেয়ে মর্মান্তিক ঐতিহাসিক রহস্য আর কী হতে পারে?" (পার্থ, ১৪২১ : ৬৩)। ১৯৬৮-তে মৃত্যু পর্যন্ত এই রাজনৈতিক বিচ্ছিন্নতা তাঁর সঙ্গী ছিল। উপন্যাসে লেখকের আয়োজিত যোগেনের 'নভেল ত্যাগ' অংশে যোগেনের সেই আত্ম-আক্ষেপে নির্জনতারই ক্রম-অনুরণন :

> আমার মত লোক তো অন্য পার্টিতেও খুব ছিলনা– কমিউনিস্ট ছিল দু'একজন। তারা তো বিলাত ফেরত। আমার মত সর্বঘটে বিল্বপত্রের মত হাত বাড়ালেই পাওয়া যায় আর কাজ চুকে গেলে কোনো দায় নেই, ছাগলে খেয়ে নেবে- এমন তো আর কেউ ছিল না। (দেবেশ, ২০১০ : ১০৫০)

ঔপন্যাসিকের আক্ষেপ, 'যোগেন যে-শূদ্রদের নেতা ছিল, সেই শূদ্রতা হয়ে গেল একাডেমিক পলিটিক্যাল বিষয়।' (দেবেশ, ২০১০ : ১০৫১)। তাছাড়া, কোনো রাজনৈতিক নেতাকে সারা ভারতে এতটা অপমানিত হতে হয় নি, এতটা ঘৃণিত হতে হয় নি, এতটা তুচ্ছ হয়ে যেতে হয় নি। হিন্দুয়ানি বোধ যোগেন মণ্ডলের মত এক শূদ্রের এই স্বাধীনতা ও সাহস মেনে নিতে পারেনি– "যে নিজের শূদ্র-পরিচয়টাকেই একমাত্র পরিচয় করে তোলে ও হিন্দু পরিচয়কে অস্বীকার করে একেবার ছলচাতুরিহীন সরলতায়। হিন্দু সংস্কারে অস্পৃশ্য এই নমশূদ্র জাতীয় অস্পৃশ্য থেকে অস্পৃশ্য থেকে গিয়ে নিজের শূদ্র-আত্মপরিচয়ের মাহাত্ম্য রচনা করেছে।" (দেবেশ, ২০১০ : ১০৫১)। এ উপন্যাসের সমাপ্তি ১৯৪৭-এর দেশভাগের এক নাটকীয় মুহূর্তে। তখনও যোগেন মণ্ডল এক নতুন উদ্যমে উদ্দীপিত; ক্রমাগত আঘাত সত্ত্বেও তাঁর নিজস্ব রাজনৈতিক সমীকরণ পুরোপুরি অটুট ছিল। জাতীয়তাবাদ ও সাম্প্রদায়িকতা প্রভৃতি তীক্ষ্ণ বিতর্কের পটভূমিতে তফশিলি ধারার নেতৃত্ব যোগেন মণ্ডল ও আম্বেদকরপন্থীর হাত থেকে ক্রমশ সরে যেতে থাকে। যোগেন মণ্ডল পাকিস্তানের আইনমন্ত্রক থেকে পদত্যাগ করে এপার বাংলায় ফেরেন। কিন্তু তফশিলিদের নেতা হিসেবে তিনি আর নিজের জায়গা ফিরে পাননি। তাঁর রাজনৈতিক মতাদর্শ কিংবা তাঁর উত্থাপিত জিজ্ঞাসা এবং সাম্প্রতিক সময়ে এর প্রাসঙ্গিকতা বিষয়ে সমালোচক বলেন :

> সাম্প্রতিক সময়ে হিন্দুত্ববাদের দেশজোড়া (ভারত) উত্থান ও আগ্রাসী চেহারায় প্রত্যুত্তর হিসেবে আবার নতুন করে সামনে আসছে। অনেকেই দলিত-সংখ্যালঘু সমীকরণটিকে নতুন করে রাজনীতিতে প্রয়োগ করতে চাইছেন। বাবরি মসজিদের ভাঙন, রাম মন্দির আন্দোলনের মধ্য দিয়ে হিন্দুত্ববাদের নয়া উত্থান ও রাজনৈতিক স্তরে তার ক্ষমতা দখলের প্রেক্ষাপটে এই নতুন সমীকরণটি অনেক মহলে সাড়া ফেলছে। এই কারণেই গত সিকি শতাব্দীর মধ্যে (অর্থাৎ এদেশে

Dhaka University Institutional Repository

> নয়া উদারবাদের জমানা শুরুর পর থেকে) রচিত আখ্যানের মধ্যে দেবেশ রায়ের এই মহাগ্রন্থ বিশেষ তাৎপর্যমণ্ডিত হয়ে গেছে। শুধু সাহিত্য আলোচনার জগতেই নয়, রাজনীতি-সমাজবিজ্ঞান চর্চার জাগতেও এটি এখন গুরুত্বপূর্ণ চর্চার বিষয়। (সৌভিক, ২০১৭ : ৭)

যোগেন মণ্ডলের রাজনৈতিক আদর্শের স্বাতন্ত্র্য বিষয়ে সমালোচক অভিমত :

> খ্যাতিমান ঔপন্যাসিক দেবেশ রায় যোগেনকে নিয়ে লেখা তাঁর উপন্যাসের নাম দিয়েছেন *বরিশালের যোগেন মণ্ডল*। এই নামের ভেতর শ্লেষ আছে, নাকি প্রশংসার অর্ঘ্য আছে, সে নিয়ে সাহিত্য ক্রিটিকদের মাঝে অনেক বিতর্ক। কিন্তু এটা সত্যি যে প্রান্তিক জনপদ বাকেরগঞ্জ তথা পূর্ববঙ্গ থেকেই নমশূদ্র যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল একদা পুরো অবিভক্ত ভারতবর্ষে নতুন এক 'সর্বজনবাদী/বহুজনবাদী' (inclusive) রাজনীতির সূচনা ঘটিয়েছিলেন এবং কথিত মূলধারার শহুরে এলিট রাজনীতির তৎকালীন ছকটি পাল্টে দিয়েছিলেন। (আলতাফ, প্রথম আলো, ৩০ অক্টোবর, ২০১৭)

এই আখ্যানের ইতিহাসত্ব নিয়ে ঔপন্যাসিকের স্পষ্ট অভিমত রয়েছে। উপন্যাসে বিধৃত ঘটনাকালের সত্যতা প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন "কেউ পরীক্ষা করলে দেখবে– দুটো-একটা ছাড়া সে সব ঠিকঠাকই আছে। কারণ এগুলো ঠিকঠিকই ঘটেছিল, বদলানো যায় না।" (দেবেশ, ২০১০ : ১০৪৮)। আখ্যানের ভেতরে আখ্যানের চরিত্রানুযায়ী এটা ইতিহাসের পুনঃ কিংবা নব-নির্মাণ কী না সে প্রসঙ্গে ঔপন্যাসিক বলেন :

> যেহেতু বানানোটা এ-খেলার নিয়ম হয়ে আছে, এই গল্প-বলার বা হিস্ট্রি-হিস্ট্রি খেলার। সেই নিয়ম মেনেই এই আজগুবি সন-তারিখের বহু রকম প্রমাণ মজুত।
> ...কিছু ঘটনা যে জানাশোনা ঠেকে ও কিছু লোকজনকেও যে চেনা-চেনা ঠেকে?
> সে সবই এক বানানো অসত্যের অছিলা। বানানো হলেও তো হিস্ট্রি। প্রমাণের কোনো অভাব নেই। বানানোরও কোনো প্রমাণ নেই। (দেবেশ, ২০১০ : ১০৪৮)

এ আখ্যানের ঐতিহাসিকতা প্রসঙ্গে সমালোচক-মূল্যায়নও যথার্থ :

> দেবেশ নিবিষ্ট চিত্ত নিপুণতায় প্রায় একটি মহাকাব্য লিখেছেন যা একই সঙ্গে উপন্যাস এবং সমকালীন ইতিহাস। কিন্তু ঐতিহাসিক উপন্যাস নয়। (শিবনারায়ণ, প্রসঙ্গ-কথা, উদ্ধৃত, *বরিশালের যোগেন মণ্ডল*)

Dhaka University Institutional Repository

'দেবেশ রায়ের এই রচনাটি যুগপৎ উপন্যাস ও ইতিহাস'[৫] এমন আখ্যা আরো অনেকে সমালোচক দিয়েছেন। *বরিশালের যোগেন মণ্ডল*-এর 'নভেলাইজেশন' প্রক্রিয়াটিও এ প্রসঙ্গে আলোচ্য। বিশটি পর্বে ও অসংখ্য অধ্যায়-শিরোনাম-উপশিরোনামসমৃদ্ধ এ উপন্যাসের দীর্ঘ অবয়বে স্থান পেয়েছে ভারতবর্ষের ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। পৃথক সীমারেখাসহ একটা জাতি হিসেবে আত্মপ্রকাশের সেই ক্ষণে ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষের ভেতরকার দ্বন্দ্বময় শ্রেণি-সংগ্রাম, অখণ্ড দেশে বসবাসরত মানুষের বৈচিত্র্যময় সামাজিক-ধর্মীয় সংস্কৃতি, জীবনযাপনের ভেতর ঢুকে যাওয়া অলংঘ্য বিশ্বাস-সংস্কার বিশেষত সাম্প্রদায়িকতার বোধ ও তা নিয়ে বিপুল রাজনীতিকরণ, সাম্রাজ্যবাদিতার কৌশল-প্রতিঘাতে বিপন্ন জীবন– প্রায় সবটাই ধারণ করেছে উপন্যাসটি, সাথে আছে ক্রমাগত শোষিত সেই দেশে একজন নিম্নবর্ণের মানুষ ও তার জীবন-ইতিহাস যা উপনিবেশোত্তর ভারতবর্ষের সংকটকেই প্রতীকায়িত করে। বিভাজনের মধ্য দিয়ে একটি জাতির, একটি দেশের সামগ্রিক পরিণতি হয়ে ওঠে ব্যাপ্ত, জাতির ইতিহাস নির্মাণে ও বিশ্লেষণে মহাভারত-রামায়ণ কিংবা ইলিয়াড-ওডেসির মতই এর ভেতরকার আয়তন। একজন যোগেন মণ্ডল ও একটি ভারতবর্ষকে সাবয়ব করতে দেবেশ রায়ের এ উপন্যাসে বর্ণনায় ইতিহাস এসেছে জরুরী অনুষঙ্গ হয়ে; কিন্তু এটি হয়ে উঠেছে ইতিহাস-অতিক্রান্ত বা বিপরীতের এক গভীর জীবনসত্যের ন্যারেটিভ। ইতিহাস-সৃষ্ট আদর্শিক কিংবা প্রাতিষ্ঠানিক 'বৈধতাপ্রাপ্ত জ্ঞান' (idilogical or institutional form of knowledge) তথা 'মেটান্যারেটিভ'-এর বিশ্লেষণও করেছেন দেবেশ; যেমন– ভারতের 'জাতীয়তাবাদ' বিষয়ক তত্ত্ব-চিন্তা। যে তত্ত্ব একজন যোগেন মণ্ডলের স্বদেশ অন্বেষণের সূত্রে কিছুটা প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে ওঠে। শ্রেণি-সংগ্রামী, স্বদেশ-অন্বেষী একজন সাধারণ মানুষের দেশ হারানোর এই গল্পটি তাই ইতিহাস ও সময়ের বিরুদ্ধে এক বিরাট প্রতিবাদ হয়ে ওঠে।

যোগেন মণ্ডল, যে বর্ণহিন্দুর উচ্চতা অস্বীকার করতে তার জন্মের নীচতা স্বীকার করেছে, 'শূদ্র হিন্দু নয়; সে স্বতন্ত্র' – শূদ্রের এই স্বাধিকারের যে গর্বিত ব্যবহার করেছে; উপন্যাসের শেষেও সেই যোগেনের তীক্ষ্ণ প্রশ্ন জবাবহীন থাকে, সামাজিক শ্রেণি সম্পর্কিত চর্চিত ও অনড় বোধে, অবরুদ্ধ জাত-পাতে, অনিবার্য হয়ে ওঠা দেশ বিভাজনে, বিখণ্ডিত স্বদেশ চিন্তায়। যোগেন শেষপর্যন্ত তার শূদ্রত্বের পরিচয়কেই একমাত্র করে তোলেন :

Dhaka University Institutional Repository

> চাইলেই কি আর বামুন হওয়া যায়? বামুন হয়ে জন্মাতে হয়। তেমনি গান্ধীজী আর সেনসাস চাইলেই কি শূদ্র হয়ে যায় হিন্দু। শূদ্র হয়ে জন্মাতে হয়। একমাত্র তাহলেই পাওয়া যায় শুদ্রের এই স্বাধীনতা, আমি স্বাধীন শূদ্র। (দেবেশ, ২০১০ : ১০৫৯)

স্বদেশ-কাঠামো থেকে উদ্বাস্তু, ইতিহাসিত মানব যোগেন ইতিহাসের বিপরীতে তার পথ আর একবার চাক্ষুষ করতে চায়– "সেই পথ, তার বিদ্রোহের, আর্য প্রবেশের ও এখন স্বতন্ত্র স্বাধীনতার। যোগেন নিজেকে দেখতে চায়, ভারতবর্ষ নামে হাজার-হাজার বছরের ধ্যানের একমাত্র প্রতিনিধি সে, এক শূদ্র। চলেছে পাকিস্তানে"। (দেবেশ, ২০১০ : ১০৫৯)। যোগেনের স্বদেশ, যে দেশ এক ডিনায়াল পলিসি-তে অক্রান্ত, সেই 'বেকবুল (ডিনায়েড) দেশে'র জনহীন জলভুবনে বহু পথ হেঁটে সে দেখল, "সেখানে মানবনসম্পর্কোচিত সমস্ত সম্বোধন লোপাট। সেই জলপ্রান্তরে যাতায়াতের কোনো পথও নেই, ... সেখানে মানুষের পায়ের ছাপ ফেলা আইনত নিষিদ্ধ।" (দেবেশ, ২০১০ : ৯৭৯)। বিভাজিত দেশে বিতাড়িত অস্পৃশ্য যোগেন স্বদেশকে হারিয়ে ফেলার মুহূর্তে অনুভব করে :

> এই বিপুল জলদেশ মহাদেশ স্রোতোদেশ ঘূর্ণিদেশ, নৌদেশ মেঘদেশকে কতটাই শিক্ষিত নিশ্চয়তায় চিহ্নহীন করে দেয়া হল। এমন শিক্ষিত নিশ্চয়তা থাকে শুধু তেমন কল্পনাক্ষমদের যারা এক কল্প পরিমাণ সময় দেখে ফেলতে পারে সেই সময়ের সূচনার আগে।... যারা নিজেরও অজ্ঞাতে ইতিহাসের বাহক। যারা অনেক অতীত থেকে স্থির মানব বসতিকে অনায়াসে বাতিল করে দিতে পারে... ইতিহাসকে ধ্বংসচিহ্নহীন, ক্ষতহীন, আদিম ও নৈসর্গিক করে দিতে পারে। (দেবেশ, ২০১০ : ৯৮১)

আধিপত্যের কাঠামোর কাছে পরাজয়, বহিষ্কারের বোধই জন্ম দেয় অন্তর্ঘাতের রাজনীতি ও ইতিহাসের, অন্তর্ঘাতের ভাষার, সর্বোপরি অন্তর্ঘাতের নন্দনতত্ত্বের। ধ্যানে অখণ্ড বাংলা, অখণ্ড ভারতবর্ষ তথা দেশ-মাতৃকার এক অপরূপ মহাকাব্য-গাথা নিয়েই যোগেনের উদ্বাস্তু হওয়া, সেটা তার কোনো নব অর্জনের নয়, বরং পরম একাকীত্ব আর চিরতরের স্বদেশহীনতার-ই যাত্রা। দেবেশের মতে, 'শূদ্র ছাড়া সে-দায় আর কে নেবে?' (দেবেশ, ২০১০ : ১০৫৯)।

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায় : দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

শরীরী-বৈকল্যের মনস্তত্ত্ব

মন ও শরীরের ক্রিয়াকে একান্ত বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিতে বিশ্লেষণ এবং সাহিত্যে রূপদান শুরু হয়েছে বিশ শতক তথা আধুনিক কাল থেকেই। ফ্রয়েডীয় মনোবিজ্ঞানের মূল গুরুত্ব হল মনের অবচেতনলোকের আবিষ্কারে ও তার প্রকৃতি নির্ণয়ে। মন আর শরীরের মিলিত প্রক্রিয়ায় মানবচরিত্রের প্রতিষ্ঠা। প্রেম-অনুভূতি এবং শরীর মানুষের পক্ষে সবচেয়ে জটিল এবং বিচিত্রতম অভিজ্ঞতা, যেখানে যথেষ্ট রহস্যও আছে বলে মনে করা হয়। মানব-মনস্তত্ত্বের ত্রিস্তর ভূমি– সচেতন, অবচেতন, অচেতন– এসবের মধ্যে প্রেম এবং শরীর-চেতনার স্বাদ-বৈচিত্র্য, সংকট, সংশয়, যন্ত্রণা, ব্যর্থতা, অতৃপ্তি, গ্লানি, বিকার, কিংবা আকর্ষণ– সব কিছুর সমবায়েই শিল্পীর সৃষ্টি।

দেবেশ রায়ের কথাসাহিত্যে প্রথাগত প্রেম প্রায় অনুপস্থিত। শরীরের ব্যাখ্যাও তাঁর কাছে কেবল নর-নারীর যৌনজীবন-এর সম্পূরক নয়। বরং শরীরকে তিনি উপস্থাপন করেছেন ভিন্ন পরিকল্পনায়, আরেক বাস্তবতায়। ব্যক্তি সেখানে একান্তভাবে তার শরীরের সর্বস্বতা নিয়ে উপস্থিত। দেবেশ রায়ের শরীরতত্ত্ব বিজ্ঞাননিষ্ঠ, এখানে নর-নারীর মানসিক সম্পর্ক শরীরকে নিয়ন্ত্রণ করলেও, তাঁর আখ্যানগুলোতে সম্পর্কটা কেন্দ্র কথা নয়; শরীর সেখানে স্বতন্ত্র, স্বাধীন শরীরের নিজস্ব নিয়মতান্ত্রিকতায় নিয়ন্ত্রিত শরীরী ব্যাখ্যানে পূর্ণ ঔপন্যাসিকের গল্পপট।

২০১৩ সালে দেবেশ রায়ের পাঁচটি উপন্যাস যথা : *লগন গান্ধার* (১৯৯৫) *জন্ম* (১৯৯৭), *আঙিনা* (২০০৫) *ব্যক্তিগত ফ্যাসীবিরোধী যুদ্ধ নিয়ে একটি উপন্যাস* (২০০৬) এবং *অতল তলের জলে* (২০০৭) একসাথে সংকলিত হয়ে, 'পাঁচটি নভেল মিলে একটি নভেলে' পরিণত হয়। নাম দেয়া হয় *শরীরের সর্বস্বতা* (২০১৩)। এই নবরূপের সংকলনে অবশ্য কালানুক্রমে উপন্যাসগুলোর ক্রম সাজানো হয়নি; বরং দেবেশের মতে বিষয় ভাবনায় 'পুরনো লেখাগুলো (হয়েছে) নতুন' (দেবেশ, ভূমিকা : ০৭)। ভূমিকায় দেবেশ রায় লিখেছেন :

Dhaka University Institutional Repository

> নভেলগুলি পর পর লেখা নয়, অনেক-অনেক বছরের ব্যবধানে ওগুলো লেখা। ... নানা সময়ে লেখা টুকরো নভেলগুলি যেন মিলে গেল নতুন এক নভেলের বিন্যাসের টানে। (দেবেশ, ভূমিকা : ০৭)

এটা যে দেবেশের রচিত ছোট ছোট উপন্যাসের সংকলন নয়, সেটা তিনি স্পষ্ট করে জানিয়েছেন এবং বলেছেন বইটির আলাদা নাম *শরীরের সর্বস্বতা*। তিনি আরও জানান নভেলগুলি সবই শরীর নিয়ে লেখা। অর্থাৎ শরীর যেন সর্বস্ব। আর "সেই সর্বস্বতা; মাথা খাটিয়ে বুদ্ধি খাটিয়ে মানুষ-বলতে যে-অস্তিত্ব বোঝায় তার ভিতরে সেঁধিয়ে যায় অনবরত, পৃথিবী জুড়েই, কিন্তু যেহেতু সেই মানুষ-অস্তিত্বের আধার এই শরীর, তাই শরীর তার সর্বস্বতা নিয়ে তার দর হাঁকলে, অস্তিত্ব, পাঠকাঠির পুতুলের মত ভেঙে টুকরো-টুকরো হয়ে অসংলগ্নতা ঘটিয়ে ফেলে।" (দেবেশ, ভূমিকা : ০৭)। শরীর মাত্রই বেঁচে থাকা; আর বেঁচে থাকার সাথে সম্পর্কিত আর সব মানসিক-মানবিক অনুভবও। দেবেশের কাছে শরীর তাই মৃত্যুবিরোধীও। জ্যান্ত শরীর ও তার রূপান্তরের বৈচিত্র্য দেবেশের বর্ণনায় ঐকান্তিকভাবে 'ফিজিওলজিক্যাল'। মানুষের অস্তিত্বের আধার এই শরীর সবসময় তার ইচ্ছের অধীন নয়, শরীর বদলালে অস্তিত্ব-জীবনাচরণ সবকিছু বদলে যেতে পারে। *শরীরের সর্বস্বতা*-য় পাঁচ উপন্যাসকে এক করে প্রকাশ করবার পরিকল্পনা নিয়ে এর ভূমিকায় দেবেশ আরো লেখেন :

> যে-কটি উপন্যাস মিলিয়ে এই একটি নতুন উপন্যাস তৈরি করলাম, সেগুলি প্রথম লেখার নানা ছড়ানো সময়ে, শরীর ও অস্তিত্বের এমন আপৎকালীন বৈরিতা আর সেই বৈরিতার বিপরীতে শরীরের সর্বস্বতা, আমার কল্পনায় ছিল না। সেই কল্পনাটি জেগে উঠেছে, এখন, এই পুরনো লেখাগুলি পড়তে পড়তে। বেশি দিন বেঁচে থাকলে ও লিখতে-লিখতে বেঁচে থাকলে, জলে জোয়ার-ভাঁটা দেখতে দেখতে, নদীর অর্থ তো বদলে-বদলে যেতেই পারে। (দেবেশ, ভূমিকা : ০৭)

গল্প-উপন্যাসের অর্থান্তর কেবল পাঠকের কাছে নয়, ঘটে যায় লেখকেরই কাছে– এ কথা স্বীকার করে দেবেশ রায় তাঁর শরীর-প্রধান উপন্যাসগুলোকে নতুন অর্থ ও ব্যাখ্যার সমকালীনতায় সমর্পণ করলেন এক নব আঙ্গিক ও ক্রমধারায়। আখ্যানগুলোতে থাকা এগুলোর নিজস্ব ঘটনা বা সংকট পরে কখনও কখনও দেবেশ 'দৈনিক মিডিয়ার নিত্য বিষয়' হয়ে উঠতে দেখেছেন বলে ভূমিকায় লিখেছেন, পরিচ্ছিন্ন স্বতন্ত্র গল্পগুলোর ভিতরকার মিলও তিনি নিজেই পাঠ করেন পুর্নবার। *শরীরের সর্বস্বতার*

Dhaka University Institutional Repository

পাঁচ উপন্যাস ছাড়াও দেবেশ রায়ের প্রথম উপন্যাস *যযাতি* (১৯৭৩)-তে ভিন্নমাত্রিক শরীর-মন ভাবনা উপস্থাপিত, *বেচেঁ বত্তে থাকা* (১৯৯১), *স্বামী-স্ত্রী* (১৯৮৬) এবং আরো কিছু উপন্যাসে রয়েছে এই ভাবনা।

ক. যযাতি

যযাতি 'পরিচয়' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয় ১৯৬৪ থেকে ১৯৬৮-র মধ্যে। বই আকারে প্রথম প্রকাশ ১৯৮০-তে। *যযাতি*র প্রতিটি চরিত্রের নিজস্ব বিবরণ বা বয়ান রয়েছে নিজস্ব যুক্তিতে, যা বিবরণকে এনে দেয় স্বাবলম্বন। এখানে বিষয় ও ফর্ম একে অপরের সম্পূরক হয়ে এই আখ্যানকে আধুনিক করেছে। মফস্বলের একদা-নিম্নবিত্ত ও অধুনা উচ্চবিত্ত পরিবারের তিনজন গিরিজামোহন-রেণু-খোকার আত্মকথন সূত্রে গাঁথা এই উপন্যাসের আখ্যান। তিনজনের পৃথক বিবরণ স্ব স্ব যুক্তি ও দৃষ্টিকোণে স্থিত, স্বতন্ত্র, সম্পূর্ণ। বিবরণের মধ্যে ব্যক্তিগত পরিবারগত টানাপোড়েনের মধ্যে ছায়া ফেলে বাইরের ইতিহাস। কিন্তু এই সময়ের ইতিহাস ও মনের বিবরণ প্রকাশিত হয় গিরিজা-রেণু-খোকার শরীরের ভাষায়; যদিও *যযাতি*র শরীরী ভিত্তি শেষ পর্যন্ত একই রকম থাকে নি। উপন্যাসে প্রত্যেকটি চরিত্রের আত্মবিবৃতি উপস্থাপিত হয়েছে মাত্র একবার করেই। *যযাতি*র কেন্দ্রীয় ঘটনা– বাবার অসৎ উপায়ে অর্জিত অর্থ প্রতিপত্তির উত্তরাধিকার থেকে বাড়ির বড় ছেলে খোকার প্রবল ঘৃণা ও মুক্তি-বাসনায় বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাওয়া। এই তুমুল ঘটনায় 'খোকা' চরিত্রের যে সত্তা-বিস্ফোরণ ঘটে তাকে অবলম্বন করেই চরিত্রগুলির মানসিক প্রতিক্রিয়া, স্মৃতি-জড়িত বিচিত্র অনুভূতি, অকপট আত্ম-উদ্‌ঘাটন ইত্যাদি প্রকাশ পেয়েছে। বাবা গিরিজামোহনের চরম পুরুষতান্ত্রিকতা, আত্ম-আধিপত্য বিস্তারের নির্বিকার ও রূঢ় প্রবণতা, প্রভুত্বস্পৃহাই খোকার এবং কিছুটা অর্থে গিরিজা-স্ত্রী রেণুর বিদ্রোহের মূল কারণ। এ যেন পিতৃতন্ত্রকেই এক ধরনের অস্বীকার করা। নিজের পুত্রের মধ্যে আত্ম-অধিকারের গূঢ়-গহন অভিপ্রায়ও তাঁর ছিল। পুত্রের মধ্যে নিজেকেই ফিরে পেতে চেয়েছিল গিরিজামোহন। খোকাও পিতার প্রতি তীব্র ঘৃণা, গ্লানি ও নিজেকে পিতার শৃঙ্খল থেকে পরিচয়হীন করার বিদ্রোহের ভেতরেও আবিষ্কার করে ফেলে নিজের ভেতর গিরিজার ছায়া ও স্বভাবের উত্তরাধিকার। এ অক্ষম আবিষ্কার তার আত্মহননের প্রক্রিয়াকে এগিয়ে দেয়।

Dhaka University Institutional Repository

উৎপাদনের সম্প্রসারণশীলতা রোধের প্রতিক্রিয়ায় মূলধনের পথরোধ, ফলে মূলধনের মালিকানার প্রতিযোগিতা দেখা দেওয়ায় বিশ শতকের পঞ্চম দশকের পটভূমিতে গিরিজামোহনের ক্রম উত্থান আর তার সামন্ত আভিজাত্যের লোভ এই বদ্ধতার সাথে যুক্ত হয়ে যে বিকার সৃষ্টি করে, খোকা তারই প্রতিবাদ, "ব্যক্তিগত এ কাহিনীতে ঐ ইতিহাসের প্রক্রিয়ার পঙ্গুত্ব বিকারই ঢুকে যায়।" (পার্থপ্রতিম, ১৯৯৮ : ২৩৭)।

গিরিজামোহনের দৃষ্টিতে জীবন ও যৌবন হল পূর্ণ ভোগ্যবস্তু; স্ত্রী রেণুকেও সে সেভাবেই বিচার করে, বিয়ের পর স্ত্রীর প্রতি দৃষ্টি সম্পর্কে তার আত্মস্বীকৃতির বয়ান :

> আমার চোখ ছিল শুধু নিজের দিকে, আমার হাতে ছিল শুধু গ্রাস। রেণুর নতুন শরীরকে আমি ভোগ করেছিলাম ভোগীর মত। আমি দুহাতের গ্রাস ভরে মুখ পুরে আস্বাদ নিয়েছিলাম। সে ভোগে আমি তৃপ্তি পেয়েছি প্রচুর, কারণ রেণু আমার স্পর্শে উদ্দীপিত হয়ে উঠত না, সে শুধু বিবশ হয়ে পড়ত, উদ্দীপনার ত আবার একটা স্বাতন্ত্র্য থাকে, বিবশ আত্মসমর্পণের মধ্যে সে স্বাতন্ত্র্যের বিরক্তিকরতাও নেই। (দেবেশ, ১৯৯১ : ১৩-১৪)

কেবল শরীরে নয়, জীবন-যাপনের সমস্ত অভ্যাসে রেণুকে পূর্ণ ভোগ্যপণ্য করেই গড়ে তুলতে বাধ্য করে সে। পুরুষের ভোগবাদ অধিকারবোধের প্রকাশ সে ঘটিয়েছে স্বাভাবিক অভিব্যক্তিতে, যেন এটাই নিয়ম। চাষার বাড়ির মেয়ে বলে এ ব্যাপারে স্বামীর অসহিষ্ণু মনোভাব ও চাষাবাড়ির সংস্কৃতি বর্জন করে পুরোমাত্রার শহুরে নারী (থিয়েটারের সাজানো নারীর মতন) করে তোলা হয় রেণুকে। শিক্ষা-সংস্কৃতির আলোকবর্জিত পরিবারের মেয়ে বলে হীনমন্যতাবোধে পীড়িত হয়েছে সে; স্বামীর প্রভূত্বকামিতার কাছে নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ করতে হয়েছে তাকে। তার মনে কখনও কখনও এমন অনুভূতিও জেগেছে যে, "উনি আছেন বলেই আমি আছি, আমার ছেলেমেয়ে আছে, আর সব কিছু আছে।" (দেবেশ, ১৯৯১ : ৫৫)। কিন্তু দীর্ঘ বছর ধরে পুতুলের মত স্বামীর সকল ইচ্ছে-আদেশ-সংকল্পকে নিপুণ রূপ দেবার পর রেণুর মনে হল :

> ওঁর চোখের দৃষ্টি দেখে বুঝেছি কখন কী চাইতেন নিজেকে সেই মতো তৈরি করেছি। কিন্তু তাতে লাভ হলো কি ? তিরিশ বছর ঘর করার পর পঞ্চাশের কোঠায় পা দিয়ে মনে হচ্ছে এতদিন যা করেছি সব বাজে, কোনো মানে হয় না, তাতে কারোই কোনো লাভ হয় নি। আমি যে আমি সেটা

Dhaka University Institutional Repository

এত বেশি করে করে মুছে ফেলেও আমার বড় ছেলে, আমার খোকাকে বাঁচাতে পারলাম না। (দেবেশ, ১৯৯১ : ৫৭)

রেণুর সত্তার এই বিলোপ-অনুভব আসলে শরীরে ও মনে আজীবন বিবিক্ততারই তীব্রতম প্রকাশ। গিরিজামোহনের কাছে সত্যিকার অর্থে শরীর সমর্পণ সে কোনোকালেই করেনি। তাই শেষপর্যন্ত কেবল রেণুর মাতৃশরীরটাই বেঁচে থাকে। রেণু অর্থাৎ মাকে হত্যা চেষ্টায় মায়ের অসার জীবনকে বা বিকারকেই যেন হত্যা করতে চেয়েছিল খোকা। সে মুহূর্তের চিত্রায়ণে এক ধরনের 'ইডিপাসীয় গূঢ়ৈষণা'-এর সংশ্লেষ থেকে যায়। খোকার মা-ও মাতৃত্বের অনুভবে এবং পিতা গিরিজার দর্পিত সত্তাকে একরকম ভেঙে দিতেই খোকাকে নিরন্তর অন্তরালে রেখেছিল, শৈশব থেকে খোকার জগতকে করে রেখেছিল মাতৃময়।

উত্তরাধিকারের সব সূত্র ছিন্ন করে গিরিজামোহনকে অস্বীকার করার মধ্য দিয়ে খোকা নতুন অবয়বে জন্মাতে চেয়েছিল। মাতৃসত্তা বনাম পিতৃসত্তার আদিম এই দ্বন্দ্বের বিন্যাসটির আধুনিক প্রকাশ ঘটিয়েছেন ঔপন্যাসিক। বাবা গিরিজামোহনের মিথ্যা আভিজাত্য, বাবার তৈরি করা সমৃদ্ধ জমিদারি অতীত, কপট উত্তরাধিকার থেকে যেকোনো মূল্যে মুক্ত হতে চেয়েছিল খোকা; পৌঁছুতে চেয়েছিল এক নিখিল শূন্যতায়। অথচ তারই কোনো অন্যমনস্ক বসে থাকার ভঙ্গিতে, চুল আঁচড়ানোর কায়দায়, পা ফেলার ছন্দে সাবয়ব হয়ে ওঠে গিরিজামোহন। খোকার জীবনের ট্রাজেডিও ঘটে সেখানে। কারণ, দূরে সরেও বাবা গিরিজাকে শক্তিমান ভাবার আত্মপ্রতারণা খোকার যায় না; নিয়তির মতই তা ঘোরে তার পেছন পেছন। কিন্তু খোকা বহন করছিল বাবার প্রতি তীব্র ঘৃণাও; গিরিজার উত্থানের পাশে বেশ্যা মেয়ের নগ্নতার বা পেশার স্বাচ্ছন্দ্য তাকে মুগ্ধ করে, বেশি চরিত্রবান মনে হয়। মৈথুনক্রিয়ার জন্যই সে বেশ্যার শরণাপন্ন হয়েছে; স্বাধীন শরীরী ক্রিয়াকে খোকার মনে হয়েছে– "সেটা গিরিজামোহনের চোরাই মূলধনের নকল জীবন থেকে আদি অকৃত্রিম শেষতম ব্যক্তিগত মালিকানার মূলধনের ব্যবহার এবং তা ন্যূনতম সময়ের মধ্যে।" (দেবেশ, ১৯৯১ : ১৫০)। তার নিজের শরীর তার বাবার মূলধনে সৃষ্টি– এ ছিল খোকার চরম গ্লানি; বাবার অর্জিত ধনসম্পত্তি ভোগ ছিল তার কাছে পাপতুল্য। পাপ অনুভূতির যন্ত্রণা থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য বা যন্ত্রণাকে জীবনের সঙ্গে অভিযোজিত করতে জীবন যৌবনের সমস্ত আচরণীয় বা পালনীয় অভিব্যক্তিতে পলায়ন-উন্মুখ খোকার মনে হয় :

Dhaka University Institutional Repository

> আমার এই শরীরটা মানে মনটা শরীর-মনসহ আমি যে গিরিজামোহনের তৈরি– এই কথাটাই আমি কোনোদিন, আজও ভুলতে পারি নি, পারি না। গিরিজামোহনের মূলধনে আমি সৃষ্টি– এই আত্মপরিগ্লানি থেকে বাঁচবার দুটো পথ আমার সামনে ছিল। এক– নিজেকে ধ্বংস করা মানে গিরিজামোহনের মূলধন ধ্বংস করা। দুই, আমাকে যাতে গিরিজামোহনের মূলধন হিশেবে ব্যবহার করতে না পারে তার জন্য নিজেকে গিরিজামোহনের দায়ে পরিণত করা। দুটোই আমি করেছি। কোনোটাতেই আমি সফল হইনি। (দেবেশ, ১৯৯১ : ১৪৬)

কলকাতার রাস্তায় নিরন্তর হাঁটছিল খোকা। নিজ সত্তা ও জীবন অনুসন্ধানের তাগিদেই হয়তো সে এটা করেছে, কিন্তু তার সে চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। তাই কলকাতার রাস্তায় দিশেহারা সঞ্চরণে বারবার পথ-হারানোই হয়ে ওঠে তার জীবনকে হারিয়ে ফেলার সংকল্প :

> গিরিজামোহনকে এড়াতে এই প্রাসাদ আর ইট-সিমেন্টের বিস্তারে আর উচ্চতায় আর স্ফীতিতে আমি নিজেকে হারাবার চেষ্টা করেছি।... ড্যালহৌসি এলাকার এক একটা গলির মধ্যে ঢুকে, গাড়ির সারির মধ্য দিয়ে কোনো কোনোদিন আমি ভেতরের কোনো বাড়ির করিডোরে পথ হারিয়ে সিঁড়ি হারিয়ে সারাদিন ঘুরেছি।... নিশ্চিত আত্মবিলোপের সেই সম্ভাবনা কতোদিন ধরে কতোভাবে আমাকে ঘুরিয়ে মেরেছে। (দেবেশ, ১৯৯১ : ১৩৪)

নিজের জীবন ও যৌবনকে অকাতরে, অকপটে ধ্বংসের মুখে ফেলে দিয়েছিল সে। আর পৌরাণিক যযাতির পুত্রের মতই তার শরীর-মন তথা পুরো জীবনকে বঞ্চিত করেছিল। সে এটা করেছিল পিতার অর্জিত সকল সুখ-ব্যবস্থা থেকে নিজেকে সম্পূর্ণ বিবিক্ত করে। যে যৌবন তার অনায়াসভোগ্য ছিল, সেই যৌবন তথা জীবনকে পরিপূর্ণতার সকল আকাঙ্ক্ষা থেকে সরিয়ে নেবার পরে *যযাতি*র খোকার আত্মবয়ানের সারমর্ম ছিল :

> আমার যৌবন আমি তোমাকে দিয়ে এসেছি গিরিজামোহন। তোমার উত্তরাধিকার আমি স্বীকার করি না। আমার উত্তরাধিকার তোমাকে স্বীকার করতে হবে। আমারই ধার দেয়া যৌবনের শক্তিতে তোমার প্রতিটি ক্ষণ আর ঘন্টা, দিন আর মাস আর বছর কাটাতে হবে। আমার এই যৌবনের রক্তগতি বইবার ক্ষমতা তোমার স্নায়ুর উপশিরায় কতোদিন থাকবে। তারপরও কি তোমার যক্ষিণী ঐ পাহাড় বইতে বইতে পারবে ? আমার সব সঙ্গিনীই তোমার যক্ষিণীর, আমার গর্ভধারিণীর, আমার মানস প্রতিবিম্ব।

Dhaka University Institutional Repository

> ... আমার এ যৌবন তোমাকে মারুক, নিঃশেষ করে মারুক। তোমার সেই মৃত্যুতে বোধহয় আমাদের দুজনেরই তর্পণ। (দেবেশ, ১৯৯১ : ১৫১-১৫২)

শবদেহসম খোকার শরীরের ভাষা নষ্ট হয়ে যায় এভাবেই, আর আজীবন ভোগাসক্ত গিরিজার জ্যান্ত শরীরের ভেতর মনের হাহাকার মৃত্যুকোষের মতই বেড়ে চলে। সমস্ত প্রভুত্ব-প্রতিপত্তি ধন-বৈভবের আড়ালে গিরিজামোহন এক পরাজয়ের গ্লানিতে নিবীর্য অক্ষমতার যন্ত্রণায় দগ্ধ হয়েছে। বিদ্রোহী, উদ্ধত পুত্রের আরোপিত ও অনাকাঙ্ক্ষিত বৈরাগ্য তাকে শেষ বয়সে নিরন্তর পরাজয়েরই বোধ এনে দিয়েছে :

> এই চারতলা বাড়ি, এই অত বড়ো কোম্পানি আর এত নগদ টাকা– এত সব সত্ত্বেও বারবার মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে আমার বাড়ির খোকার হাতে বোনা ছায়াচ্ছন্ন স্থলপদ্ম– রঙ যার বদলায় না। উচ্চ রক্তচাপের ভার স্নায়ুতে বহন করে, শেষ রাত্রিতে, এলাচের অবসিত গন্ধলীনা প্রৌঢ়া স্ত্রীর পাশে চোখ খুলে তাকিয়ে দেখি, জানালায়, বাইরের অর্ধ-অন্ধকারে আমার সাধের পাম ছায়াচ্ছন্ন দাঁড়িয়ে অনিবার্য বজ্রপতনের অপেক্ষায়। (দেবেশ, ১৯৯১ : ৫৩-৫৪)

পুত্রের উদ্দেশে দর্পিত সত্তা চিরে গিরিজামোহনের এক ব্যাকুল আহ্বান আর্তনাদের মতই বেরিয়ে আসে। যাপিত সুষ্ঠু ও সম্পূর্ণতাপূর্ণ জীবন হয়ে ওঠে পুরোপুরি অনর্থক :

> তোর যৌবনের ঋণ এ বার্ধক্যের শোধে না, শুধবে না। তোর যৌবনের ভারে আমার বার্ধক্যকে পেষণ করিস না খোকা। তোর যৌবনের ভার থেকে আমাকে মুক্তি দে, মুক্তি দে। (দেবেশ, ১৯৯১ : ৫৪)

মহাভারতের পুরাণকথায় যযাতি তীব্র ভোগ-লালসায় পুত্র পুরুর যৌবন গ্রহণ করেছিলেন। যযাতির সেই পৌরাণিক আদল দেবেশ রায় পিতা-পুত্রের সম্পর্কে রূপায়ণ করেছেন। খোকা শেষে যেন তার পিতাকে এ কথাই জানিয়ে গেছে যে তার পিতা এক পূর্ব র্নিধারিত চক্রের মধ্যে আটকে গেছে, তার মুক্তি নেই। পুত্রের যৌবনভারে পীড়িত ও স্মৃতির সন্তাপে ক্লিষ্ট গিরিজামোহনের অন্তিম আর্তি ও খোকার শেষের স্পর্ধিত দাবী– দুই মিলিয়ে *যযাতি*তে মিথের নবরূপায়ণ উপলব্ধি করা যায়– যেখানে জীবন যৌবন ও শরীরের অসামান্য ভোগের পরেও অশরীরী মনের প্রতিক্রিয়ায় অতৃপ্তি জেগে থাকে নিরন্তর। *যযাতি* প্রসঙ্গে সমালোচকের অভিমত:

Dhaka University Institutional Repository

> দেবেশ রায়ের *যযাতি* এমনই একটি উপন্যাস যেখানে গোষ্ঠীজীবন চর্চা উদ্ভূত পুরাণ অঅধুনিক ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী যুগের স্বতন্ত্র জীবন আঙিনায় নব্যপুরাণ নির্মাণ করেছে। মাত্র তিনটি প্রধান চরিত্রকে মুখ্য করে আত্মকথনরীতির ভিতর দিয়ে বিবরণধর্মী ভঙ্গিতে স্বল্পায়তন পরিসরে যা উপস্থিত করেছেন তা গ্রিক ট্রাজেডির সমতুল। (অপর্ণা, ২০১৩ : ৮৬)

যযাতি পরিবারভিত্তিক কাহিনী হয়েও কোনো পারিবারিক উপাখ্যান নয়। পিতার কাছ থেকে এক আত্মজের বিচ্ছিন্ন হতে চাওয়ার কাহিনী এটি। অথচ উত্তরাধিকার থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করতে না পারার করুণ হৃদয় বিদারক যন্ত্রণা নিয়ে এ উপন্যাসের কেন্দ্রভাবের নির্মাণ। যৌবন, সম্পদ, ঐশ্বর্য তথা জীবন উপভোগ্যতার এই নিদারুণ ও করুণ অপারগতা যেন বুর্জোয়া ধনতন্ত্রের তথা আধুনিক মানুষের যুগযন্ত্রণারই নব্য কথকতা হয়ে ওঠে।

খ. শরীরের সর্বস্বতা

শরীরের সর্বস্বতার প্রথম পর্ব বা প্রথম আখ্যান হল *ব্যক্তিগত ফ্যাসীবিরোধী যুদ্ধ নিয়ে একটি উপন্যাস*। যেখানে ষাট পেরিয়ে যাওয়া বিবাহিত এক নারী নেহা তার দীর্ঘ বছরের পেরিয়ে আসা যৌনজীবন নিয়ে ভাবে। ষাটোর্ধ্ব নারী নেহা, যাকে এখনো 'পয়তাল্লিশ বলে চালানো যায়' (দেবেশ, ২০১৩ : ১৫) কিংবা যে বরাবরই প্রেমে পড়ার মত সুন্দর আর তার 'শরীরও লুব্ধ হওয়ার মত ভঙ্গিল' (দেবেশ, ২০১৩ : ২১) ; আর যাকে অন্যের লুব্ধতার আক্রমণ থেকে কৈশোর থেকেই আত্মরক্ষার কৌশলও শিখে যেতে হয়েছিল, তাকে দীর্ঘ সাতাশ বছরের দাম্পত্য জীবনের শেষে ভাবতে হয়– "সে তার জীবন জানেইনি, কাকে বলে শরীর, তার নিজের শরীর, কাকে বলে উল্লাস, তার নিজের শরীরের, কাকে বলে মেয়েদের নিজস্ব রমণ।" (দেবেশ, ২০১৩: ২৩)। কারণ যে একমাত্র পুরষের সাথে তার লিঙ্গসম্পর্ক, তার স্বামী অর্থাৎ দেয়া-র বাবা, সেই পুরুষ নেহাকে রমণ দিতে অসমর্থ হয়েছে; "যে-রমণ একমাত্র নারীরই, অথচ যে-রমণ লিঙ্গনির্ভর।" (দেবেশ, ২০১৩ : ২৩)।

নেহার স্বামীর লিঙ্গটা অপুষ্ট, ছোট ও সরু– এ কথাটা নেহা নিজেকে ও অন্যদেরও জানাতে চায়। কিন্তু কথাটা সোজা করে জানা ও জানানোর ভাষা নেহা আয়ত্ত করতে পারেনা, আর ভাষা জানা থাকলে "কথাটা বলার, ভাবারই দরকার হত না। এ সবসময়ই খুব বিপদের, যখন মানুষের কাজকর্ম

Dhaka University Institutional Repository

ভাবনাচিন্তার খোলনলচে বদলে যায় অথচ ভাষা বদলায় না।" (দেবেশ, ২০১৩ : ২৪)। শরীর সম্পর্কে নেহার মনে বিকট শূন্যতার বোধ, আত্মকথন ও আত্মজিজ্ঞাসার মধ্য দিয়ে আমরা তার আংশিক মনোবিকারের আভাস পাই। যে মনোবিকারের ভাবনায় নেহা তার জীবনাভিজ্ঞতা তথা শরীর-অভিজ্ঞতার প্রতিপক্ষ যুক্তিগুলো পরস্পর সাজায় :

> নেহার তো জানা আছে ঐ ষাট-পঁয়ষট্টি বছর আগের বর্ণমালা, শরীরের। তার স্বামী যে আঁটকুড়ে নয়, তার প্রমাণ তো তাদের মেয়ে। তার স্বামী যে তেমন পুরুষ নয়, যে তার সঙ্গম-অংশী নারীকে নারীর রমণে নিয়ে যেতে পারে, তার প্রমাণ তো নেহা, নিজে। গর্ভ আর যোনি আলাদা হয়ে গেল। তার ভাষা বদলাল না। (দেবেশ, ২০১৩ : ২৪)।

আর প্রকাশের কিংবা ধারণ করার সংকট থেকে নেহার মনোবিকারের নানা চিহ্ন দেখি বর্ণনায়– প্রথমত নেহা নিজেকে কখনও কখনও তার নিজের মেয়ে দেয়া হিসেবে ভাবছে ও তার পঁচিশ বছর বয়সী শরীরের তরুণ যৌনতা আয়ত্ত করতে চাইছে। জীবনভর অপ্রাপ্তির শূন্যতা থেকে এই মনোবিকৃতিই যেন স্বাভাবিক, ঔপন্যাসিকের ব্যাখ্যা– "নেহার আর উপায় কী পুরনো ভাষার মনোবিকারের দৃশ্য বিপর্যয়, নিজের মেয়েকে হিংসা, এ-সব না ঘটিয়ে।" (দেবেশ, ২০১৩ : ২৪)।

নেহার মনোবিকারের দ্বিতীয় প্রকার– সে তার স্কিজোফ্রেনিয়ার দৃশ্য বিপর্যয়ের মধ্যে তার স্বামীর লিঙ্গ সরু ও ছোট একথা বললেও- "সে তার এই রমণহীনতাকে শুধু তার স্বামীর শরীরের খামতি দিয়ে বোঝাতে চায় না। বরং সে এমন একটা অর্থই দিতে চায় যে– তখনকার পুরুষরা এসব খুব একটা জানতই না। তার স্বামী, তার সমবয়সিনীদের স্বামীদের মতই, রতিবিলাসহীন। নিজের বীর্য পড়ে গেলেই তাদের সঙ্গম শেষ। যেন, নেহার স্বামীর লিঙ্গ বড়, মোটা ও শক্ত হলেও নেহার নারীরমণ ঘটত না।" (দেবেশ, ২০১৩ : ২৪)। মনোবিপর্যয়ে সমতা রক্ষার্থেই যেন নেহা আর সব বঞ্চিত নারীর যৌনজীবনকে তুলনা ক'রে পুরুষের চর্চিত যৌন প্রভুত্বকে স্বাভাবিক করে তুলতে চায়। এই চেষ্টা কিংবা ভাবনা বরং তার মনোবিকারকে আরো বাড়িয়েই তুলছিল।

দাম্পত্যজীবনের মোড়কটা কেবল বজায় রেখে নিঃসঙ্গ নেহার শরীর ও মন পৃথক হয়ে গেল– অথচ এখানেও তার নিজের সাথে চলে শঠতা ও প্রতারণা– "মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে, দুজনের দু-রকম কাজ, দু-রকম সময়, কথাবার্তা আবার কী নিয়ে হবে ! এই ছলনাটা যে নেহা ভাঙতে পারল না–

Dhaka University Institutional Repository

সেটাই নেহার তঞ্চকতা।" (দেবেশ, ২০১৩ : ৩০)। তার এই আরোপিত তঞ্চকতা এবং সব কিছু অতিক্রান্ত জীবন-ক্লান্তি বাড়িয়ে তোলে নেহার আত্মজিজ্ঞাসা; চলমান জীবনজিজ্ঞাসা। তার জীবন তথা যৌনতার ইতিহাস এক অকথিত, অপ্রমাণিত ইতিহাস। "কারণ বাচ্চা এলেও, সেটা লোকটার যৌনতার প্রমাণ নয় বা তাদের দুজনের সঙ্গমে পেটে বাচ্চা এলেও সে সঙ্গমে যৌনতা নেই।" (দেবেশ, ২০১৩ : ৩৭)। কর্মযজ্ঞে সপ্তাহের দিনগুলো সাজিয়ে আলাদা ঘরে ঘুমিয়ে নিজের কাছে একক ও আলাদা হতে চায় নেহা। "নেহা এটুকু পর্যন্তই করতে পেরেছে– দেয়ার বিয়ের পর নিজের শরীরমনের একাকীত্বে তার যে আবিষ্কার– আমার এই শরীরটার কোনো মানসম্মান বা আদরযত্নই হল না সারাজীবন– তার মূল্য তৈরি করতে, সেই আবিষ্কারের মূল্য তৈরি করে সে, তার স্বামীকে, ইতিহাসের ভিতর ঢুকিয়ে দেয়, আর ইতিহাসের আশ্রয়ে নেহা তার স্বামীর ওপর নিজের জীবন নিয়ে অভিযোগগুলি চাপিয়ে রাখে।" (দেবেশ, ২০১৩ : ২৬)।

এক জীবনে অন্তর্গত হওয়ার পর আবার সেই জীবন থেকে আলাদা হয়ে যাবার ঐকান্তিক প্রয়োজনে নেহার কাজের অবসরই যেন তৈরি হতে চায় না; সংসারে সে যেন থেকেও নেই, বা না থেকেও আছে এ কথা চারপাশে বা নিজেকে জানাতেই নেহার কর্ম-আয়োজন– সপ্তাহে একদিন ধ্রুপদ গানের রেওয়াজ, কখনও তাকে "বৌদ্ধ জৈনতত্ত্ব, রাধাকল্পনার যৌথতা, কার্ল পপারের দর্শন, অস্তিত্ববাদ ও রজনীশ-অরবিন্দ-রবীন্দ্রনাথ শুনতে হয়, পড়তে হয় বা ভাবনার একটা সংলগ্ন সংগঠন তৈরি করতে হয়। ... তবু সেই গান বা কাজটুকুতে নিজেকে এতটাই জড়িয়ে ফেলা নেহার, কেবল তার নিজের সঙ্গে নিজের নির্বাচিত জীবনের তফাৎ ও দূরত্বটা বেড়া দিয়ে বা দেয়াল তুলে বা খাল কেটে স্পষ্ট করে তুলতে, যেন কেউ বলতে না পারে আমরা তো কিছু বুঝিনি।" (দেবেশ, ২০১৩ : ২৮)। নেহার শূন্যতার বোধেই সম্পৃক্ত তার জৈব-শরীর জিজ্ঞাসাগুলোও। যখন শরীরের ভেতর শরীর তৈরি হতে শুরু করেছে– নরনারীর লিঙ্গ যোনির যে সংযোগ-সংঘাত থেকেই প্রাণ তৈরি হয়ে যায়, তা কি নিজের ভিতরে অচেনা আলোড়ন তোলে না ? কবে কোন সঙ্গম থেকে গর্ভাধান ঘটে তা কেউ বলতে না পারলেও নেহার রতি-বিলাসশূন্যতা এ ব্যাপারে কোনো আলোড়ন আর আনুমানিক সংকেতও স্মৃতিতে এনে দেয় না। এই পুনরাবৃত্ত সংকেতহীনতাই নেহার যৌনতার শূন্য ইতিহাস গড়ে। আর সাতাশ বছর পরে তার শূন্যতার জিজ্ঞাসাকে নেহা ঠিক বুঝতে পারে না– 'এটা আমার আত্মজিজ্ঞাসা, নাকী লিঙ্গজিজ্ঞাসা ?' (দেবেশ, ২০১৩ : ৫৩)।

Dhaka University Institutional Repository

নেহার যৌন-নিষ্ফলতার এই অনুভবই তার শরীর মন ব্যক্তিত্বকে তীব্র আঘাত করে, নিজেকে তার অসম্মানিত মনে হয়। কখনও কখনও সে তার মাতৃত্বকে অস্বীকার করতে উন্মুখ হয়, যে মাতৃত্ব সবার তারিফ আর স্বীকৃতি কুড়ায়, অথচ "যেন নেহার শরীরটাকে একটা দলিল করে ফেলে, এই মাতৃত্ব, যে এই-যে এই একটা শরীর, আর যৌনতা থেকে তৈরি হয়েছে এই প্রমাণ, এই-যে একটা শরীর যা নিজেকে ভোগ করেছে সম্পূর্ণ, সেই ভোগের ফল বইবার কষ্টসহ, সম্পূর্ণ।" (দেবেশ, ২০১৩ : ৩৩)। অথচ তা ঘটেনি, "কোনো একবারও নেহার কোনো রকমের যৌন আনন্দ ঘটেনি।" (দেবেশ, ২০১৩ : ৩৯)।

সঙ্গমকালে পুরুষসঙ্গীর অর্থাৎ স্বামীর দ্রুততা, আবেগশূন্যতা, যান্ত্রিকতা ও প্রতিক্রিয়ায় নেহার ক্রমাগত শরীরী অতৃপ্তির ব্যাপারটি বহুদিন নেহা তাকে প্রকাশ করতে চেয়েছে; কিন্তু তার কর্তৃত্বের ও গোয়ার্তুমির কাছে পরাজিত হয়েছে সে, প্রথম স্ত্রী চলে যাবার কারণ জিজ্ঞাসা করলেও লোকটির উদ্ধত প্রত্যুত্তরে থেমে গেছে ; বরং বিয়ের সাত মাসের মধ্যেই নেহার সম্পূর্ণতার অভাব উবে যায় স্বামীর কর্তৃত্বের বিজিত স্বরে :

> ডাক্তারের চেম্বার থেকে বেরিয়ে লোকটা নেহাকে প্রথমেই বলেছিল– তা হলে এটা অন্তত প্রমাণ হল যে আমার দোষ নেই। বলেছিলে না? ... নিজের প্রথম বাচ্চা হওয়ার সম্ভাবনায় লোকটির মনে এই কথাটাই প্রথম এল ? কেন? (দেবেশ, ২০১৩ : ৩৬)

নেহা তখনকার মত যুদ্ধটা থামিয়ে দিল বটে, তবে শরীরে নতুন শরীর উৎপাদন প্রক্রিয়া মেনে নিয়ে; প্রাকৃতিক জন্মপথের বিকল্প মানবিক ও বৈজ্ঞানিক জন্মপথ তথা 'সিজারিয়ান সেকশন' প্রয়োগে ডাক্তারের পেশাগত অধিকারকে নিশ্চিত ক'রে; সর্বোপরি পঁচিশ বছর বয়স পর্যন্ত মেয়ে দেয়া-কে সর্বোচ্চ সামর্থ্যে লালন-পালন আর জীবনযাপনের একটা পথ পরিক্রমাতেও ঢুকে যেতে পারে নেহা। তারপর নিজের সংকট চিনতে চিনতে ষাটোর্ধ্ব নেহা মনোবিকারেরও অভ্যাস করে নেয়। নেহার 'মনোবিকার' বা স্কিজোফ্রেনিয়া আরো স্বীকৃতি পেয়ে যায় পেশাদার মনোবিদ ডাক্তারের প্রভুত্বের স্বরে। মানুষের মুখের ভাষা আসলে নানারকম সংবাদ দেয়। ভাষা একপ্রকার শরীরী বহিঃপ্রকাশ। জ্যাক লাঁকার (১৯০১-১৯৮১) তত্ত্বানুযায়ী প্রকাশিত ভাষা অসংজ্ঞানে ঘনীভূত এবং চয়িত বর্তমান ভাষাকে চিহ্নিত করে দেয়। উপন্যাসে ডাক্তার নেহার দীর্ঘ অবদমিত চেতনাকে ও পরিণতিতে একপ্রকার 'বিকৃতিকে' তার পঠিত মনোবিদ্যার ভাষায় চিহ্নিত করেন 'স্কিজোফ্রেনিয়া' বলে। শব্দের

Dhaka University Institutional Repository

সাথে সামাজিক অর্থের সম্পর্কের যে নিয়ন্ত্রণের জায়গা, দ্যোতকের সাথে দ্যোতিতের একমাত্র সম্পর্ক নির্মাণের মধ্য দিয়ে অর্থের জগতকে নিয়ন্ত্রণের আধিপত্য এভাবেই তৈরি হয়। আজীবন বঞ্চিত-প্রতারিত নেহাকে একরকম ভাষিক আধিপত্যের সম্মুখীন হতে হয় কিন্তু এর প্রতিবাদ করতে সে সম্পূর্ণ অপারগ হয়। দেবেশের উপন্যাসে 'ব্যক্তিগত ও গোপন' ফ্যাসিবাদ রূপ নেয় আখ্যানের মোড়কে। সমালোচকের মতে :

> দেবেশের একেবারে ভিন্ন ধরনের প্রচেষ্টা *ব্যক্তিগত ফ্যাসিবিরোধী যুদ্ধ নিয়ে একটি উপন্যাস*। সেখানে আমাদের পরিচিত পৃথিবীর ভাষাব্যবস্থার মধ্যে দিয়ে, অধিবাচনের মধ্যে দিয়ে যে নারীত্বের ধারণার নির্মাণ করা হয় এবং যে ধারণাকে, যে প্রত্নকল্পকে একটুও অস্বীকার করতে চাইলেই অস্বাভাবিকতার দোহাই দিয়ে সমাজ ও রাষ্ট্র যে বহিষ্কারের শাস্তি নামিয়ে আনে, রাষ্ট্রের সেই ফ্যাসিস্ট রূপকে সামনে আনেন আখ্যানকার। সামনে আনেন উপন্যাসের প্রোটাগনিস্ট 'নেহা'র মধ্য দিয়ে। (শান্তনু, ২০১১ : ৭৬)

কাঠামোর আধিপত্যবাদী ক্রমকে প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে ভাষা কেমন করে 'ফ্যাসিস্ট' হয়ে ওঠে, দেবেশ সে বিষয়ে লিখেছেন :

> যে ভাষায় লিঙ্গের ডাকনাম কত জানা নেই সে ভাষা ফ্যাসিস্ট হয়ে যেতে পারে– শুদ্ধতা-সৌন্দর্য-ব্যাকরণ-মান্যতা ভাষাকে শাস্ত্র করে তোলে– শাস্ত্র মাত্রই ফ্যাসিস্ট। (উদ্ধৃত, শান্তনু, ২০১১ : ৭৬)

মনোবিদ ডাক্তারের প্রেসক্রিপশন নেহা মেনে নিয়েছিল মাথা বা মনের চিকিৎসায় ভাল হয়ে যাবে বলে নয়; বরং পরাজিত ক্লান্ত জীবন এবং শেষপর্যন্ত তার নিজের অব্যাখ্যাত শরীর ও পুরোপুরি অব্যক্ত মন নিয়ে ডাক্তারের ব্যাখ্যাত অসুখের ভেতর ঢুকে যায় সে। মানুষের সঙ্গে মানুষের একান্ত ব্যক্তিগত সম্বন্ধনিপাতের ভেতরেও থাকে ফ্যাসিবাদ, *শরীরের সর্বস্বতা*-র ভূমিকায় দেবেশ রায় এই কঠিন সত্যকে গুরুত্ব দিয়ে বলেছেন– "শরীরের অনৈচ্ছিক পেশিকে ইচ্ছার অধীনস্ত করা নিশ্চয়ই বৈজ্ঞানিক কীর্তি কিন্তু সেই কীর্তি অভিলাসী বিজ্ঞান কেন পুরুষের যৌনতাবৃদ্ধিকেই প্রাথমিক কর্মসূচি হিশেবে বেছে নেয়? ... নারীর জন্য নির্দিষ্ট থাকবে শুধু হিস্টিরিয়া? বিজ্ঞানের নৈর্ব্যক্তিকতার আশ্রয়ে কি পুষ্ট হয় না ব্যক্তিগত ফ্যাসিবাদ?" *শরীর সর্বস্বতা*-র প্রথম আখ্যান বা পর্ব *ব্যক্তিগত ফ্যাসিবিরোধী যুদ্ধ নিয়ে একটি উপন্যাস*-এ নেহাকে একজন যুদ্ধ-পরাজিত মানুষ হিসেবেই দেখি।

□

Dhaka University Institutional Repository

সন্তান জন্মের শরীরী সামর্থ্য-অসামর্থ্য ও তা নিয়ে মনোবৈচিত্র্যের প্রকাশ নিয়ে নির্মিত হয়েছে *শরীরের সর্বস্বতা* 'নভেলের' আরো দুই অনুচ্ছেদ *জন্ম* ও *আঙিনা*-র কথকতা। *জন্ম* উপন্যাসে রয়েছে এক নিঃসন্তান দম্পতি কুচি ও নৈমিষের সংকট। কুচি ও নৈমিষ তাদের বিবাহিত জীবনের দশ বছর পরে সন্তান ধারণের অক্ষমতা নিয়ে 'ডাক্তারি ইনভেস্টিগেশনে' জানতে পারে নৈমিষের হর্মোনাল কম্পোজিশন অসম্পূর্ণ ও অপরিণত। অথচ নির্দোষ একটি গর্ভধারণযোগ্য শরীর তার আছে– এই কথাটা কুচি ডাক্তারের নানা পরীক্ষায় জেনেছিল আগেই। বাকি ছিল নৈমিষের টেস্ট, রক্ত পরীক্ষার রিপোর্ট নেবার আগে নার্ভাস নৈমিষের এবং সহজ হতে চাওয়া কুচির চেষ্টাকৃত আচরণ দিয়ে গল্পের শুরু। এক পর্যায়ে নলজাতক বা কৃত্রিম ভ্রূণ প্রজননের জন্যও এই দম্পতি তৈরি হয়ে যায়, কিন্তু নৈমিষের অসম্পূর্ণ হরমোন বা অক্রিয় শুক্রানু দিয়ে সে ব্যবস্থাও সম্ভব নয় বলে ডাক্তার জানান। সেটা হতে হলে কুচির শরীরে স্থাপন করতে হবে অন্য কারুর 'ডোনেটেড স্পার্ম'– যেটা তারা মেনে নিতে পারে না ।

"আমাদের শরীর আর একটা শরীর তৈরি করতে পারেনি, আমরা জীবনে অসম্পূর্ণ শরীরের মানুষ হিসেবে প্রমাণিত হয়ে গেছি"– এ কথাটা পারিবারিক বা সামাজিক পরিবেশের অন্তর্গত হয়ে গেলেও খুব সহসাই ব্যাপারটা মনের ভেতর প্রতিষ্ঠা করা যায় না। কুচি ও নৈমিষ তাদের দীর্ঘ দশ বছরের দাম্পত্যের মনোরম শরীরী মিলনের সাফল্য শেষে– আশাহীন মনে এই অপ্রতিহত ও অচেনা সংকটের মুখোমুখি দাঁড়ায়। দীর্ঘ দশ বছর যেন সম্পূর্ণ অবান্তর হয়ে যেতে চায় তখন। "শরীরের তিনভাগ জল, একভাগ স্থল। সেই জলের অসংখ্য অজ্ঞাত মিশ্রণ আর ক্ষরণের সামান্য একটি তথ্য তারা জেনেছে, সেই তথ্যটুকু না জেনেই তারা বড় হয়ে উঠেছে বিয়ে করেছে। দাম্পত্যজীবন গড়ে তুলেছে।" (দেবেশ, ২০১৩ : ১৪৪)। ভেতরের শরীর আর বাইরের শরীরের মধ্যে কোনো সঙ্গতি নিশ্চিত হওয়া কঠিন, অথচ সেই সঙ্গতির কল্পনাতেই মানুষের বেড়ে ওঠা, পরিণত হওয়া। এভাবে মানুষ নিজের ভেতর থেকে একটি মানুষ তৈরি করে। কিন্তু "সেই সঙ্গতির কল্পনা যখন বিজ্ঞানের পরীক্ষায় ভুল প্রমাণিত হয়ে যায়, তখন মানুষ কোথায় তার বিকল্প খুঁজবে ? মানুষ তো জন্ম থেকে শুধু বেঁচে থাকতেই জানে, জন্মের পর থেকে শুধু বেঁচে থাকতেই জানে। ইচ্ছায় মানুষ বাঁচে না, প্রবৃত্তিতে মানুষ বাঁচে না, আসক্তিতে মানুষ বাঁচে না। মানুষ মরতে জানে না বলে বেঁচে থাকে। বাঁচাটুকু নিয়েই সে মায়ের জঠর থেকে বেরিয়েছিল।" (দেবেশ, ২০১৩ : ১৭৪)। বেঁচে থাকার সাথেই আশাবাদিতা সম্পর্কিত; কুচি ও নৈমিষকে চূড়ান্তরূপে তাদের বা নৈমিষের একার অসামর্থ্যের কথা স্পষ্ট করে

Dhaka University Institutional Repository

জানিয়ে দিলেও তারা এর বিকল্প সমাধানের আশাকে আঁকড়ে ধরে ডাক্তারকে অসহায় আবেদনে বলতে থাকে ভিন্ন কোনো একটা উপায় সন্ধানের কথা। নৈমিষের হরমোন 'ডেফিসিয়েন্সি'টাই এ জন্য একমাত্র দায়ী একথা জেনে যাবার পর নিজের দোষহীন শরীর নিয়ে ডাক্তারের চেম্বারেই নিজেকে ভীষণ অপরাধী বোধ করতে থাকে কুচি, ঔপন্যাসিকের ভাষায় কুচির সে আত্মগ্লানির দৃশ্যায়ন :

> কুচি একবার আড়চোখে নৈমিষের দিকে তাকায়। লোকটা নিজের অসম্পূর্ণতার ভারে গুঁড়োগুঁড়ো হয়ে যাচ্ছে অথচ এমন ভাঙন বইবার কোনো প্রস্তুতি তার জীবনে তৈরিই হয়নি। ... কুচি নৈমিষের মাথা বুকে চেপে ধরতে চায়, অন্তত একটা হাত তুলে নিতে চায় হাতে। কেন, নৈমিষ একা-একা কেন দায়ী হয়ে গেল তাদের সন্তানহীনতার জন্য ? কেন কুচিও সমান দায়ী হল না, বা অন্তত অংশত দায়ী ? কী লাভ কুচির এমন ত্রুটিহীণ সম্পূর্ণতায়? (দেবেশ, ২০১৩ : ১৫৪)

যেন নারী-শরীরে শরীর জন্মাবার দায় নারীর বলে ভ্রূণ নির্মাণের জন্য সুস্থ গর্ভ কিংবা প্রয়োজনীয় আর সব উপকরণের ব্যত্যয় নারীর শরীরের পক্ষেই মূলত ঘটা স্বাভাবিক; সন্তান জন্ম নিয়ে কুচির এ অপরাধবোধ পুরুষতান্ত্রিকতারই প্রতিফল, সে কারণে বরাবরের মতই তার শরীরের পরীক্ষাই আগে করানো হয়েছিল; কিন্তু কুচির শরীরের অভ্যন্তরীণ সুসঙ্গতি, তার শূন্যতা আর ভ্রূণ ধারণে অক্ষমতার যন্ত্রণাকে বাড়িয়ে দিল বরং। আর এ কারণেই শরীরের নিভৃততম জায়গায়, নৈমিষের বদলে সম্পূর্ণ অপরিচিত অজ্ঞাত একটি লোকের বীর্য স্থাপনের যান্ত্রিক-বৈজ্ঞানিক সমাধানের প্রস্তাবের জটিলতায় ভীষণ অসহায় হয়ে পড়ে কুচি। আর হঠাৎই দশ বছরের চেনা মন ও শরীর একটা রিপোর্টের ডাক্তারি ব্যাখ্যায় বদলে যায়, দুজনের মুখোমুখিও যেন তারা হতে পারে না আর। নৈমিষের কেনা ও ভীষণ শৌখিন গতিশীল মোটরসাইকেল ইয়ামাহা-র শরীরী গর্জনের সাথে তাদের নিথর ও নিস্পন্দ মন ও শরীর নিয়ে ডাক্তারের কাছ থেকে বাড়ি ফেরে কুচি-নৈমিষ। আর ব্যস্ত হয়ে যেতে চায় দৈনিকের কাজে, "এখন এই প্রতিদিনের (সাংসারিক) কাজটিই তাদেরকে যেন পরস্পরের সম্মুখতা থেকে বাঁচাবে। ওখানে তাও তাদের মধ্যে ডাক্তার ছিলেন। এখন তাও টিভি আছে, বাইক আছে, রান্না আছে, খাওয়া আছে। তারপরও কি আজ তারা আজ ঘুমিয়ে পড়তে পারবে ? কুচি জানে নৈমিষের রক্ত পরীক্ষার রিপোর্টে তাদের সবকিছু আমূল বদলে যেতে পারে। সে সেই বদলের মুখোমুখি হওয়া এড়াতে পারবে না। এড়ানো যাবেও না।" (দেবেশ, ২০১৩ : ১৬৮)।

Dhaka University Institutional Repository

অপরিবর্তিত নিয়মের জীবন অভ্যাসে কেবল নতুন এই একটা ব্যাপারই ঢুকে যায়; বাড়ি ফিরে প্রথমবার তারা নিজেদের মুখোমুখি হতে ভয় পায় তাই "সেই বিষয়ের অবিশ্বাস্যতা, বিস্ময়, উপায়হীনতা ও তাদের জীবনের সঙ্কট টিভির বিজ্ঞাপন আর কর্মসূচির সময়ের সঙ্গে মিশে যায়।" (দেবেশ, ২০১৩ : ১৭০)। কিন্তু কুচি জানে কথাটা তো উঠবেই; "টিভির ছবি শেষ হবে, তারা খেতে বসবে, শোবে, কথাটা উঠবে না?" (দেবেশ, ২০১৩ : ১৭১)। যেন তাদের জীবনের অভূতপূর্ব সংকটের মধ্যে তাদের দৈনন্দিন অভ্যাস ঢুকে যায়; কিন্তু তাদের পুরো কর্মসূচি হয়ে পড়ে আড়ষ্ট; পরিত্রাণ খোঁজার ব্যর্থ অথচ অর্জিত মানবিক স্বভাবের দ্বারা তাড়িত হয়ে তারা সহজ হতে চাইলেও তা আর হয়ে উঠতে চায় না :

> দশ বছরের বেশি তারা পরস্পরকে বিছানায় যে-ভঙ্গিতে অভ্যস্ত করে তুলতে-তুলতে, ভুলে গেছে, তাদের শোয়ার বা ঘুমবার আলাদা-আলাদা ভঙ্গিতেই তারা দশ বছরের বেশি সময় কাটিয়েছে, আজ সেই ভঙ্গির মধ্যে কখন কোথা থেকে একটা নিরর্থকতা এসে গেল। (দেবেশ, ২০১৩ : ১৭৫)

নিজের শারীরিক অসামর্থ্য নিয়ে বিশেষত কুচির কাছ থেকে নৈমিষের একলা হয়ে যাওয়ার প্রক্রিয়া যেন তৈরি হয়। ভবিষ্যত সমাধানের আশায় তখন কুচির মরিয়া সান্ত্বনা- হর্মোন ইনজেকশান কিংবা আরো কোনো টেকনোলজির সম্ভাবনা; হোমিওপ্যাথ অথবা অলীক কোনো শুশ্রূষার উন্মুখ আকাঙ্ক্ষা ক্ষণিকের জন্য তাদের দুজনকেই যেন নিজেদের সম্পর্কে নিঃসংশয় করে তোলে। নৈমিষের বীর্য থেকে কোনো বাচ্চা হবে না– এ কথাটা অপ্রধান হয়ে যায়। নৈমিষের পৌরুষ তখন কুচিকে আর্ত শরীরী জিজ্ঞাসা করে– কুচিকে সে সবসময় সম্পূর্ণ তৃপ্তি দিয়ে এসেছে কী না– যেন কুচির নির্মল স্বীকারোক্তিই এখন প্রধান ব্যাপার :

> অনির্দিষ্ট দেশকালের অনাবিষ্কৃত টেকনোলজির ওপর ভরসা করে এখন কুচি নৈমিষকে এই সান্ত্বনাটুকুতে আশ্বস্ত করতে চায় যে সে কুচিকে সম্পূর্ণ তৃপ্তি দিতে পারে, দিয়ে থাকে, কুচির কাছে নৈমিষের কোনো অসম্পূর্ণতা নেই, কুচির কাছে নৈমিষ সমর্থতম পুরুষ। (দেবেশ, ২০১৩ : ১৮৫)

নিজেদের সঙ্গমলিপ্ত শরীরের তৃপ্তি বা অন্য ব্যাপারের অভাব নেই– এ অনুভব তাদের যন্ত্রণাকেই শতগুণ বাড়িয়ে তোলে : "আমাদের সব সম্পূর্ণতা ঐ একটা অভাবে ভেসে যাবে, আমরা সবার কাছে একটা নিষ্ফলা স্বামী-স্ত্রী হয়ে থাকব ? কেন থাকব ? আমাদের তো আর কোনো দোষ নেই।"

Dhaka University Institutional Repository

(দেবেশ, ২০১৩ : ১৮২)। দশ বছরের যতিহীন যৌনতায় অভ্যস্ত দুটি শরীর তাই অজানা অস্থিরতা আর বিপুল তৃষ্ণায় মিলিত হয়; আর সঙ্গম শেষে মধ্যরাতের নিথর নিস্তব্ধ পরিবেশে দুজনের জন্যই অপেক্ষা করে থাকে অন্তহীন কান্না। নিজেদের জীবনের নিখিল নাস্তির সাথে বিনিময় ঘটে যায়, সেই বিনিময়ের জন্য শক্তিও সংগ্রহ করতে হয় আর সেটা দুজনকে একা থেকে একেবারে একা হয়েই তা করতে হয় :

> কান্নায় নিঃশরীর হয়ে গেলেও, ওরা এখন, বা কখনো, পরস্পরের দুর্গতুল্য আড়াল ভাঙবে না। এই সন্ধ্যা থেকে পরস্পর নিঃশেষে বিচ্ছিন্ন একক হয়ে গেছে দাম্পত্যের অখণ্ডতার ভিতরে।
>
> চোখে জলধারা আর যোনির ভিতরে কত কোটি মৃত ভ্রূণবীজ ? কেউ যদি মধ্যরাতে নিজেকে মৃত বীজের উদ্‌গীরক আর মৃত বীজের ভাগাড় মনে করে কাঁদে, অঝোর, সে কান্না থামাবে কোন টেকনোলজি? (দেবেশ, ২০১৩ : ১৮৭)

□ *আঙিনা* উপন্যাসে শরীরে ভ্রূণ জন্মাবার ঘটনা কিংবা সামর্থ্যই আবার হয়ে ওঠে 'মিরাক্‌ল' বা প্রায় অস্বাভাবিক। কলকাতার একটা প্রাইভেট ক্লিনিকে উনিশ বছরের একটা মেয়ে গাড়ি অ্যাক্সিডেন্টের পরে কোমাটোজ হয়ে ভর্তিরত। বেড নং ৩০৫-এর এই মেয়েটি কলকাতার উচ্চবিত্ত পরিবারের মি. খান্নার কন্যা, বিয়ে ঠিক হওয়া পাত্রের সাথে বেড়াতে গিয়ে গাড়ি-দুর্ঘটনায় কেবল সে-ই বেঁচে যায়, অনেকটা জীবন্মৃতের মত। ক্লিনিকে নিউরোলজিক্যাল চিকিৎসা চলাকালীন সময়ে পাঁচ মাস পরে নিঃসাড়ে পড়ে থাকা ৩০৫ নং বেডের রোগীর জরায়ুতে স্পন্দন বা ভ্রূণের অস্তিত্ব টের পায় সবাই। এরকম ব্যাপার প্রথমত অদ্ভুতুড়ে মনে হয় সবার; কারণ "ছোট একটা হাসপাতাল, চল্লিশজন রোগী, তার ভিতর একটা কোমাটোজ পেশেন্ট প্রেগন্যান্ট হয়ে গেল। ... একটা উনিশ বছরের মেয়ে নিঃসাড়ে পড়ে আছে অথচ তার শরীর চলছে।" (দেবেশ, ২০১৩ : ২৭৩)। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ ও ডাক্তাররা সবাই প্রথমেই অত্যন্ত আশঙ্কা বোধ করেন এই ভেবে যে– রোগীটিকে হাসপাতালেই কেউ রেপ করেছে, সুতরাং এই দায় সবার ওপরেই বর্তে যায়। তারা মিডিয়া ও আদালতের ভয়েও ভীষণ বিব্রত হয়, কারণ প্রাথমিকভাবে দায় ঐ হাসপাতালেরই। রোগীর প্রেগন্যান্সিকে পাবলিক না করার চেষ্টা করতে মনস্থ করেন কোনো কোনো ডাক্তার; কিন্তু সেটা সম্ভব হয় না শেষ পর্যন্ত। এ ব্যাপারে ভিজিটিং কনসালটেন্টদের বিপদ অনুভূত হয় সবচেয়ে বেশি, কেননা তারা কেউ সপ্তাহে একদিন বা দু'দিন ৩০৫-এর রোগীকে ভিজিট করেন। ব্যাপারটা ডাক্তার ও কর্তৃপক্ষের মিলিত সিদ্ধান্তে মি. ও

Dhaka University Institutional Repository

মিসেস খান্না অর্থাৎ রোগীর বাবা-মাকে জানানোর সিদ্ধান্ত নেয়া হয়; তাদের কাছ থেকে তীব্র প্রতিক্রিয়াসহ কোর্ট-কাছারির সম্ভাবনা জেনেই বিষয়টা তাদেরকে অবগত করা হয়; কিন্তু বিস্ময়ের ব্যাপার হল মি. খান্না তার উনিশ বছরের কোমাটোজ মেয়ের এই রকম দুর্ঘটনায় কেঁদে ফেলা ছাড়া কোনো ভিন্ন প্রতিক্রিয়াই দেখাতে পারেন না। তারা মেয়ের 'অ্যাবর্সন' করাতেও রাজি হন না, বরং গভীর মমতায় তাদের মেয়ের অনাগত সন্তানকে জন্মদানের স্বীকৃতি দিয়ে ফেলেন। হাসপাতালে রেপ না হলে একজন কোমাগ্রস্ত রোগী কী করে প্রেগন্যান্ট হবে- এমন স্বাভাবিক জিজ্ঞাসাও ক্রমে "আবছা হয়ে গেল, কারণ খান্নারা এ নিয়ে কোনো উচ্চবাচ্য করেননি ও প্রেগন্যান্সি মেনে নেন।" (দেবেশ, ২০১৩ : ৩২৬)।

সুতরাং এখন প্রধান সংকট কিংবা গুরুত্বের বিষয় হয়ে দাঁড়ায় কোমাটোজ পেশেন্টের ডেলিভারি, যার নিজের চলবে নিউরোলজি আর পেটের বাচ্চার চলবে গাইনোকোলজির চিকিৎসা। আর ঠিক হল– রেপ যে করেছে সে যদি এসে পরিচয় দেয়, তা হলে তার নামই বাবার নাম হিসেবে খান্নারা বার্থ সার্টিফিকেটে দেবেন ও তার প্রতিদানে তাকে যথোপযুক্ত ক্ষতিপূরণও দেবেন।

ব্যতিক্রমী বিষয়ের এই আখ্যানে একজন কোমাটোজ নারীর শরীর ও তার ভেতরে থাকা শরীরের চলমানতার ছবিই বারবার মূর্ত হয়েছে; কখনও ডাক্তার, সিস্টার, জমাদার, কখনও পাশাপাশি থাকা বেডগুলোর রোগীর দৃষ্টিকোণে। ঔপন্যাসিকের বর্ণনা :

> দিনরাত, রাতদিন সম্পূর্ণ জ্ঞানহীন চেতনাহীন একটা শরীর দেখতে কেমন অস্বস্তি হয়, অনাত্মীয়তা ঘটে যায়। যেন রোগীদের রোজকার জীবনে এ একটা বাধাই। অনেক রোগী চেষ্টা করে যাতায়াতে ৩০৫-এর দিকে না তাকাতে। তবে, শেষ পর্যন্ত তাকিয়েই ফেলে। দু-একজন বয়স্কা রোগিণী কখনও-সখনও ৩০৫-এর পাশে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন, ৩০৫-এর মুখে দিকে তাকিয়ে থাকেন, হাত নেড়ে-নেড়ে ওর মুখের ওপর হাওয়া দেন, এমনকী টুল নিয়ে পাশে বসে ওকে সঙ্গও দেন। কেউ-কেউ ওর হাতে হাত বুলোতে বুলোতে গুনগুনিয়ে কথাও বলেন। ৩০৫ আছে– এই রোগীদের এমনই সব নানা উল্টোপাল্টা টানের ভিতরে। এক রোগী আর কদিন থাকে ? বড়জোর আট-দশদিন, খুব বড়জোর বারো-চোদ্দদিন। কিন্তু ৩০৫ তো থেকেই যাচ্ছে– একই বেডে, একই ভাবে। আর তাকে নিয়ে রোগীদের এই নানা টানও বয়ে যাচ্ছে– একই ভাবে। কোনো কোনো পুরনো, বা এমনকী নতুন রোগী যেন জেনেই আসে, বে-চা-রা ! আমার পা আছে,

Dhaka University Institutional Repository

চলা নেই। বেচারার প্রাণ আছে, জাগা নেই। জাগবে একদিন– এত ডাক্তার-বদ্যি! (দেবেশ, ২০১৩ : ৩০১)

৩০৫-এর সেই রোগীর আপাত স্থবিরতার বিপ্রতীপে বহমান সময় ও শরীরের গতি এবং শেষ পর্যন্ত অস্বাভাবিক শরীরের স্বাভাবিক (প্রাকৃতিক) উপায়ে সন্তান-জন্মদানই এই উপন্যাসের মূল তাৎপর্য। ডাক্তারেরা ৪০ সপ্তাহে শুরু হওয়া আগেই রোগীর অপারেশনের কথা ভেবে রেখেছিলেন। কিন্তু ৩৮ সপ্তাহের শুরুতেই ডাক্তারকে অবাক করে দিয়ে রোগীর শরীরে প্রাকৃতিকভাবে সন্তান জন্মদানের লক্ষণ দেখা যায়। "ডা. চন্দ্রাবলী পরীক্ষা করে হেসে বললেন, 'আরে, এর পেটে ছুরি কাঁচি বসাব কী করে, এর তো লেবার শুরু হবে। ডিসচার্জ হয়েছে, ডাইলেশন শুরু হয়ে যাবে মনে হচ্ছে, ড্রিপ দিতে বলেছি, এ কেসের সবই অদ্ভুত।" (দেবেশ, ২০১৩ : ৩২৯)। সুতরাং কোমাটোজ পেশেন্টের ন্যাচারাল লেবার নিয়ে শুরু হল তোলপাড়– অন্য ডাক্তারের বিস্ময় : "একজন কোমাটোজ মহিলা, অবিবাহিতা, মানে ধরে নেয়া যায় সেক্স লাইফের কোনো অভিজ্ঞতা নেই, কী করে প্রেগন্যান্ট হল কেউ জানে না, জানা গেল, যখন পাঁচ মাস পেরিয়ে গেছে, পুরো প্রেগন্যান্সিটা তো মেয়েটা ক্যারি করল, এখন বলছেন লেবারও শুরু হয়েছে !" (দেবেশ, ২০১৩ : ৩৩০)।

প্রসব-মুহূর্তে আস্তে আস্তে 'লেবার পেইন' বাড়তে শুরু করলে মেয়েটির এতদিনকার স্থিত শরীরটা নড়ে ওঠে; যুদ্ধক্ষেত্র-অভিজ্ঞ আর্মেনিয়ান নার্স রাহ্ নিশ্চিত করে মেয়েটির শরীরের ঐ মৃদু নড়াচড়া; দিশেহারা প্রশ্ন তোলে সে– "প্রসব করাটা তো শরীরের কাজ। তবে আমরা ওর শরীরটা বুঝতে পারি না কেন? ও তো শুধুই শরীর।" (দেবেশ, ২০১৩ : ৩৩৩)। শরীরের নড়াচড়া দেখে ড. চন্দ্রাবলী বলে ওঠেন, 'ওটা ওর শরীরই করছে। দেখছ-না, মন ছাড়াও শরীর কত কী করতে পারে?" (দেবেশ, ২০১৩ : ৩৩৯)।

প্রসবরত মা সম্পূর্ণ অজ্ঞান বলে এত চেনা জায়গাও অতগুলো ডাক্তারের কাছে কেমন অচেনা হয়ে যায়। তবু কোমাটোজ সেই প্রেগন্যান্ট মেয়েটা কোমার ভেতরেই স্বাভাবিক প্রসবের দিকে যায়। সন্তান জন্মের কৃত্রম পদ্ধতির অর্থাৎ আবিষ্কৃত টেকনোলজিকে ব্যর্থ করে দিয়ে আট ঘন্টা পর সন্তানের স্বাভাবিক জন্ম হয় এবং রোগী নিজে তাতে সহযোগিতা করে। আর্মেনিয়ান নার্স রাহ্ প্রথম দেখে প্রসব মূহূর্তে ৩০৫-এর খোলা ও দৃষ্টিময় দুটো চোখ। "রাহ্ সে-দৃশ্যের সম্মুখে স্থির হয়ে যায়, যেমন

Dhaka University Institutional Repository

কোনো প্রসিদ্ধ পর্বতগুহাতে স্থির হতে হয় কোনো এমন মূর্তির সম্মুখে যা বহুপরিচিতি, বহুকথিত, বহুজ্ঞাত অথচ যা প্রত্যেক সম্মুখতায় অদৃষ্ট, অজ্ঞাত, আবির্ভূত।" (দেবেশ, ২০১৩ : ৩৪২)। অপারেশন থিয়েটার জুড়ে চলতে থাকে ডক্টর ও নার্সের বিস্ময়াভিভূত অভিব্যক্তি– 'মির‍্যাকল্। ৩০৫ ওর বাচ্চাকে দু-হাতে বুকে জড়িয়ে বুকের দুধ দিচ্ছে স্যার।' 'দশ-দশটা মাস যে-মেয়েটি চোখের পাতা খোলেনি, আঙুল পর্যন্ত নাড়েনি, সে তার বাচ্চার প্রথম কান্না শুনেই..." (দেবেশ, ২০১৩ : ৩৪২)।

আঙিনায় শিশুর আদি-অকৃত্রিম জন্মই হয়ে যায় মিরাক্‌ল। অথচ ঔপন্যাসিকের মতে শরীরের ভেতরে শরীরের বেড়ে চলা কিংবা সৃষ্টি আসলে আগাগোড়াই মিরাক্‌ল, কেবল তা দৃষ্টির অভ্যাসে পুরনো হয়ে গেছে। প্রকৃতিবিজ্ঞানের বড় অংশ এই দেহবিজ্ঞান বা Physiology। জীবন কিংবা প্রাণের প্রবহমানতার সত্যকেই প্রখর করে তোলেন ঔপন্যাসিক এই আখ্যানে– আর্মেনিয়ান নার্স রাহ্-এর দৃষ্টিকোণে প্রলয় ধ্বংসের পরে নব যাত্রায় নূহের মিথ ফিরে আসে বারবার, কোমাটোজ নারীর গর্ভে শিশুর স্বাভাবিক জন্মের পর রাহ্ ভোরবেলার পশ্চিম আকাশের তারার কথা জিজ্ঞেস করে, সে বলে, "সব তারা ডুবে গেলে, আমাদের ওখানে, এই তারাটা ওঠে আরারাত পর্বতের মাথায়। কেউ-কেউ নাকী কখনো–কখনো এই হেস্পারিয়া তারার আলোতে এই সময়ে দেখতে পায়, আরারাত পাহাড়ে নোঙর-করা নোহার নৌকো প্রলয়ে ভাসছে। আজ এখন বোধহয় সে-রকম দেখা যাচ্ছে।" (দেবেশ, ২০১৩ : ৩৪৩)।

□

লগন গান্ধার-এ এর কেন্দ্র চরিত্র সুরঞ্জনাকে দেখি ভিন্ন জীবন-মন অন্বেষণ ও বাস্তবতায়। যেখানে রয়েছে দাম্পত্য জীবন, সন্তান জন্ম প্রভৃতি প্রায় জৈবিক প্রয়োজনীয়তার বাইরের প্রেমের নবতর এক রূপায়ণ। *লগন গান্ধার* উপন্যাসের পরিকল্পনা বা বিষয় ভাবনা প্রসঙ্গে ঔপন্যাসিক লিখেছেন :

> ভাবতাম 'লগন গান্ধার' লেখার সময়, সন্তানের জন্ম দেয়ার ব্যক্তিগত কোনো আকাঙ্ক্ষা নেই, দাম্পত্যের প্রয়োজনবোধও আর তেমন তীব্র নেই, নিরাপদ সর্বসম্মত স্বস্তিকর এমন এক জীবনের আশ্রয়ের বাইরে গিয়েও একজন নারী ও একজন পুরুষ পরস্পরের প্রেমিক-প্রেমিকা হয়ে ওঠার দুরাধিগম্য প্যাশনে উদ্বেলিত হয়ে উঠতে পারে। একটা মাত্র জীবনে আমাদের কতই-না জীবনান্তর ঘটল। (দেবেশ, ২০১৩ : ১০)

Dhaka University Institutional Repository

লগন গান্ধার-এর সুরঞ্জনার প্রেম বিষয়ে ঔপন্যাসিক অনুসন্ধানটি বিবেচ্য। সুরঞ্জনা এ উপন্যাসের নায়িকা, যার বয়স একচল্লিশ, সে বিধবা এবং তার একটি মেয়ে ও ছেলে রয়েছে– যাদের বয়স যথাক্রমে উনিশ ও চোদ্দো। আর সুরঞ্জনা যাকে ভালবাসে এবং কাউকে না জানিয়ে যার সঙ্গে তার রেজিস্ট্রি বিয়ে হয়েছে, সেই আলোকময়ের বয়স হল সাতাশ, এমন অসম বয়সী প্রেম বাংলা উপন্যাসে খুব বেশি চর্চিত হয়নি।

উপন্যাসের শুরু ও শেষ সুরঞ্জনার জীবনের গভীর সংকট ও দ্বিধা দিয়ে; নিজের সন্তান দুটিকে নিয়ে আলোকময়ের সাথে সুরঞ্জনার নতুন করে বাঁচার ইচ্ছেটা সামাজিক কিংবা পারিবারিক কারণে প্রায় অসম্ভব হয়ে ওঠে। "আলোকময়ের সাথে সম্পর্কের সূত্রেই সে তার এই বর্তমান অনিশ্চয়তায় দাঁড়িয়ে আছে, সেই সম্পর্ক নতুন একটা গড়ন পেতে চাইছে। সেই নতুন গড়ন পাওয়াটা যুক্তিসঙ্গত ও স্বাভাবিক। অথচ সুরঞ্জনা বুঝে উঠতে পারছে না, সম্পর্কের এই নতুন গড়নটা সে দিতে পারছে কী না।" (দেবেশ, ২০১৩ : ১৯২)। তাদের দু'বছর ধরে বিয়ের রেজিস্টেশন হয়েছে, যখন হয়েছে তখন থেকেই তারা ঠিক করেছিল তারা একসঙ্গে থাকবে, কলকাতায় সুরঞ্জনার কোয়ার্টারে আলোকের থাকা মুশকিল, কেননা সুরঞ্জনার মেয়ে ইস্কাপন কিছুতেই আলোককে মেনে নেবে না; আবার কলকাতায় আলোকের বাড়িতে সুরঞ্জনার থাকাও প্রায় অসম্ভব, কারণ একই শহরে ছেলেমেয়ে শহরের এক প্রান্তের বাড়িতে, আর তারা শহরের আরেক প্রান্তের বাড়িতে থাকবে তা সম্ভব হয় না। সুরঞ্জনার এই গভীর মনো-সংকট বা যন্ত্রণা জটিল আকার নেয়; কেননা :

> ইস্কাপন বা তাতা যেমন আছে তেমন নেই, বা, আলোক আর তার সম্পর্ক যেমন আছে তেমন নেই– এ-রকম কোনো আশঙ্কাকে সে প্রশ্রয় দিতে চায় না। বরং সে মাত্র পাঁচ-বছরের মেয়ে আর এক-বছরের ছেলে নিয়ে বিধবা হওয়ার পর, তার স্বামীর অফিসে স্বামীর মৃত্যুর কারণে চাকরি পাওয়ার পর, এই চৌদ্দ-পনের বছর ধরে নিজেকে যে-ভাবে ভেঙেছে ও গড়েছে তাতে ইস্কাপন আর তাতা যেমন সত্য, আলোকময়ও তেমনি সত্য। এখন এই একচল্লিশ বছর বয়সে এই দুই সত্যের কোনো একটিকেও হারিয়ে সে নতুন করে বাঁচার কথা ভাবতে পারে না। (দেবেশ, ২০১৩ : ১৯৩)

সুরঞ্জনা দুই সত্যের কোনোটিকেই না হারিয়ে জীবনটাকে কীভাবে এগিয়ে নেবে– তার প্রধান দ্বন্দ্ব তখন সেখানেই। কখনও তার মনে হয় সে তার ও আলোকময়ের সম্পর্কের বর্তমান ব্যবস্থাতেই সন্তুষ্ট থাকতে চাইছে– এই ব্যবস্থা ততদিন চলুক, যতদিন না ইস্কাপন পড়াশোনা শেষ করছে কিংবা

Dhaka University Institutional Repository

তাতারের উচ্চমাধ্যমিক পড়া হয়ে যাচ্ছে। এইসব দ্বিধাতে সেই প্রায় দুই-আড়াই বছর কাটিয়ে দেয়। শেষপর্যন্ত অফিসে তার বিয়ের খবর জানিয়ে ও 'উইডো পেনশন' না নেবার সিদ্ধান্তে অফিস-প্রধানকে চিঠি দিতে মনস্থ করে। এই চিঠিও সে বহুদিন দিতে চেয়ে পারে নি; কিন্তু মনের অস্থিরতার সঙ্গেও সে পেরে ওঠেনা। কারণ কিছু না বললেও আলোকময়কে দীর্ঘদিন ধরে অপেক্ষা করতে বলা যায় না; "সে অপেক্ষার অর্থই বা কী হবে? তার ছেলেমেয়ে ততদিনে আরো বড় হবে। তাদের তরফ থেকে বাধা তখন আরো প্রবল হতে পারে। শেষে কি মেয়ের বিয়ে দিয়ে নিজের পূর্ব দাম্পত্যের কর্তব্য শেষ করে সুরঞ্জনা নিজের নতুন দাম্পত্যের ব্যবস্থা করবে ? সুরঞ্জনা বরং আজকাল এ-কথাই বেশি করে ভাবে যে তারা বড় বেশি দিন অপেক্ষা করে ফেলল না কী? এত বেশি দিন অপেক্ষা, যার পরে সম্পর্কের আর নতুন হয়ে ওঠার ক্ষমতা থাকে না ?" (দেবেশ, ২০১৩ : ২০৩)।

চিন্তার এই জটিলতা থেকে সুরঞ্জনা নিজেকে ছাড়াতে চায় এমনকি এর কোনো আঁচও সে আলোককে দিতে চায় না। কারণ এমনিতেই তার মনে হয় তার একচল্লিশ বছর বয়সের ভারে সাতাশ বছরের আলোককে সে বুড়ো বানিয়ে দিয়েছে। সুরঞ্জনা ভোলে না সে আলোকের চাইতে চৌদ্দ বছরের বড়। যদিও উপন্যাসে সুরঞ্জনাকে একচল্লিশ বছর বয়স্কা হিসেবেও দেখতে যথেষ্ট কম বয়সী ও 'ফিগার-সচেতন' হিসেবেই দেখা যায়। তবু তার মনে হয়, আলোকের সঙ্গে তার মেয়ে ইস্কাপনের বয়সের তফাৎ মাত্র আট বছর। "আলোকের সঙ্গে যদি তার সমবয়সী বা একটু ছোটো কোনো ছোটো কোনো মেয়ের সম্পর্ক হত তা হলে সে তার যৌবন দিয়ে আলোককেও আরো যৌবনময় করে তুলতে পারত, ... আলোকময় (যেন) তার সাতাশ বছর বয়সটাকে যতটা সম্ভব ঠেলে তোলার চেষ্টা করছে সুরঞ্জনার একচল্লিশের দিকে।" (দেবেশ, ২০১৩ : ২০৪)।

আলোকের সাথে সম্পর্কের পথচলায় সুরঞ্জনার প্রেম শারীরিক হয়েও ওঠে কখনও কখনও, কিন্তু সমাজ-চর্চিত অনুশাসন থেকে পাওয়া দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ও মনোজটিলতার কারণে এই সম্পর্কের স্বাভাবিকতা কিংবা শারীরিকতা বাধাগ্রস্ত হয়; বরং সুরঞ্জনার প্রেমবোধে আলোক তার কাছে হয়ে ওঠে এক গভীর মানসিক আশ্রয়স্থল। সুরঞ্জনা এর বিকল্প গড়ে নিতে অক্ষম, তাই সে অফিস-কর্তৃপক্ষকে তার ও আলোকময়ের সম্পর্কের বিষয় জানিয়ে চিঠি দেয় এবং অনুভব করে :

Dhaka University Institutional Repository

> এ সম্পর্ক সম্পূর্ণ তার নিজের তৈরি, কারো হাত সে আলোকময়ের কাছে পৌছয়নি, আলোকময়কে সে অর্জন করেছে। (দেবেশ, ২০১৩ : ২২৯)

অফিস কর্তৃপক্ষকে জানানো ও কলিগদের প্রতিক্রিয়ার মুখোমুখি হয়েও স্বাভাবিক থেকে সুরঞ্জনা নিজেকে প্রায় নির্দ্বন্দ্ব করে ফেলতে সক্ষম হয়। বাড়ি ফিরে ইস্কাপন ও তাতাকে বলবে– একথাও ভাবে। মন খোলসা করে সে ছেলেমেয়েদের বলে তার 'রিম্যারেজ' ও উইডো পেনশনের ফিরিয়ে দেওয়ার কথা এবং বলে– বিয়ের জন্য আরো দু-চার বছর অপেক্ষা করা তার পক্ষে সম্ভব নয়। স্বাভাবিকভাবে তা শুনে ইস্কাপনের প্রতিক্রিয়া ভয়ংকর হয়। "সে সুরঞ্জনার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। সুরঞ্জনার চুল ধরে এক হ্যাঁচকা টানে তাকে মেঝের উপর ফেলে দেয়, তারপর সুরঞ্জনার গাল খিমচে ধরে, 'লজ্জা করে না তোমার? কেন মেন নেব? আমার সঙ্গে বিয়ে দেয়া যায় এমন বয়সের একটা লোককে এই বয়সে বিয়ে করতে লজ্জা করে না তোমার?" (দেবেশ, ২০১৩ : ২৫৬)। সুরঞ্জনাকে শারীরিক লাঞ্ছনা করার পর ইস্কাপনের আর নতুন করে কিছু করার ছিল না। তাই কান্নাই তার সম্বল হয়, কিন্তু সুরঞ্জনা পড়ে এক গভীর আতান্তরে। সে অনুভব করে, এই আঘাত ইস্কাপনের একার দেওয়া নয়, "তার অফিস; তার কোয়ার্টারের লোকজন; তার পাড়া-প্রতিবেশী সবাই মিলে ইস্কাপনের হাত দিয়ে তাকে মারল।" (দেবেশ, ২০১৩ : ২৫৮)। পীড়িত মনে সে ভাবে তার সমাজের আর সব বিধবা নারীর মত বেঁচে কিংবা তাদের ভিড়ে সে এক হয়ে থাকতে পারে নি; সে ব্যতিক্রমী হয়েছিল, যেন তাদের ভিড়ে "মিশে যেতে পারলে বেঁচে যেত সুরঞ্জনা।" (দেবেশ, ২৫৮)। অথচ সে জানে, আলোকময়কে ভালবেসে সে একা, 'তার এই একক ব্যতিক্রমকে রক্ষা করা ছাড়া তার আর ভবিতব্যও নেই।' (দেবেশ, ২০১৩ : ২৫৮)। মধ্যরাতের ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে থাকা বিধ্বস্ত অথচ বিদ্রোহিনীর ভূমিকায়, আলোকময়ের সাথে সে গভীরতম দাম্পত্যে ব্যাপ্ত হয়ে যায়। কোনো এক অনির্দিষ্ট অতীত থেকে যেন তাদের দাম্পত্য দীর্ঘ দীর্ঘ সময় ধরে চলে এসেছে। সুরঞ্জনা দেখে সামনে এ সংকটের কোনো স্থায়ী সমাধান নেই, তারা কোথায় থাকবে, ছেলেমেয়েদের সঙ্গে আলোকময়ের কী সম্পর্ক গড়ে উঠবে, আলোকময়ের সঙ্গে তার, সুরঞ্জনার কী সম্পর্ক গড়ে উঠবে সবই অনিশ্চিত, কোনো কিছুর পূর্ব নির্দিষ্ট সমাধান নেই, তাকে ও আলোকময়কে এই জীবনটা যাপন করতে-করতে এই জীবনটা তৈরি করতে হবে।" (দেবেশ, ২০১৩ : ২৫৯)।

□

Dhaka University Institutional Repository

নারী ও পুরুষের আদি এবং বিস্তৃত বিভাজনটা কতটা সঠিক– এ জিজ্ঞাসা নিয়ে রচিত *শরীরে সর্বস্বতা*-র আর এক অনুচ্ছেদ *অতল তলের জলে*। উপন্যাসের শুরু গুরুং নামক এক তেইশ বছরের ছেলের লিঙ্গ পরিবর্তনের চমকিত ঘটনাপট দিয়ে। ঘরোয়া পরিবেশে টিভিতে সিরিয়াল দেখতে থাকা এক মা-কে (চিনি) ছেলে গুরুং সকালে ঘুম থেকে উঠে বাথরুম থেকে জানায় যে, সে তার লিঙ্গ পরিবর্তন অনুভব করছে বা সে মেয়ে হয়ে গেছে বলে তার মনে হচ্ছে। ঘটনাটা হতভম্ব চিনির কাছে অত্যন্ত অদ্ভুত মনে হয় এবং সে তার ছেলে গুরুং-কে নিয়ে মহা বিপদে পড়ে। চিনির পক্ষে এটা "সর্বনাশা ও বিপজ্জনক। তার তেইশ বছরের ছেলে মেয়ে হয়ে গেছে– এটা এমন একটা বিপদ, যে সে কাউকে ডাকতে পারছে না, কী করণীয় তাও ঠিক করতে পারছে না। তার শরীরের ভিতরে আত্মরক্ষার আদিম অনুভবে সে টের পেয়ে যায়, যে, চিনিই আক্রান্ত। চিনিই আক্রান্ত হবে, কারণ সে-ই তো প্রথম বলবে– এই ঘরের বাইরেকে বলবে, সে ডাক্তারকেই হোক আর তার স্বামীকেই হোক।" (দেবেশ, ২০১৩ : ৬৩)।

এমন দুর্ঘটনায় স্বামীর মুখোমুখি সে কেমন করে হবে এ নিয়ে চিনির ভীষণ দুর্ভাবনা হয়, কারণ সে আর কণ্ঠাই (গুরুং এর বাবা) গুরুংকে রচনা করেছে এক শূন্যতা থেকে। "তেইশ বছর পর চিনি যদি বলে, গুরং মেয়ে, তা হলে কণ্ঠা তো তাকে বিশ্বাসহন্তী ভাববেই।" (দেবেশ, ২০১৩ : ৬৪)। অর্থাৎ ছেলের মেয়ে-তে পরিণত হওয়াটা এক বিরাট অপরাধ এবং সে দায় তার মায়েরই– এমন মানসিক বিপদই চিনিকে পীড়িত করে। স্বামী কণ্ঠা অফিস থেকে ফেরত আসবার আগেই সে গুরুং-এর ছবি তুলতে চায় প্রমাণ রাখতে যে গুরুং স্বয়ক্রিয়ভাবেই হঠাৎ মেয়ে হয়ে গেছে। এ যেন তার আত্মরক্ষারই প্রস্তুতি :

> স্বামী-স্ত্রীর সহবাসের চুক্তি, স্বামীর প্রতি স্ত্রীর অলঙ্ঘ্য যৌন আনুগত্য, টিভির সায়েন্স চ্যানেলে লিঙ্গ বদলের ব্যাখ্যা, মেয়েদের গুপ্তবিদ্যা নিয়ে শোনা সব উপকথা আর ডিজিটাল ক্যামেরা, চিনিকে একটা বিপর্যয় আর উদ্ধার-ইচ্ছার ঘূর্ণিতে টেনে নিচ্ছে। যেন, যেমন হঠাৎ মেয়ে হয়েছে গুরুং, তেমনই হঠাৎই, চিনিকে প্রতিরক্ষাহীন রেখে গুরুং পুরুষ হয়ে যেতে পারে। (দেবেশ, ২০১৩ : ৬৪)

ক্যামেরার ফ্রেমে শুধুই গুরুং-এর কিশোরী নগ্নতার সূক্ষ্ম সব নকশা তুলতে তুলতে চিনি নিজের কিশোরী সময়ের অনুভব ফিরে যায় যেন। "এখনো পুরুষের সংপর্শ বা দৃষ্টি পায়নি এমন এক

Dhaka University Institutional Repository

স্বয়ংসম্পূর্ণ নারী শরীর দেখে চিনি।" (দেবেশ, ২০১৩ : ৬৫)। আর মেয়ে শরীর নিয়ে গুরুং নিজেও এক বিস্ময় নিয়ে নিজেকে দেখে:

> গুরুং দেখে তার লতানো ঘাড়, তার নোয়ানো চিবুক, তার কিশোরী স্তন, তার রেখাময় কোমর আর তার খোলা দুই পায়ের বিভঙ্গ। সে কেমন কাঁপা গলায় বলে ওঠে, 'এই এখন আমি? নিজেকেই তো চিনতে পারছি না। তুমি কী করে চিনছ? তোমার ফটোতে বোধহয় বেশি মেয়ে দেখাচ্ছে। ছেলে আর মেয়ের কি এতটা তফাত? কখনো তো মনে হয় নি। (দেবেশ, ২০১৩ : ৬৫)

বিস্মিত হলেও গুরুং-এর সময়-পরিবেশে ছেলে-মেয়ের শরীরী পার্থক্যের সামাজিকতা কিংবা এ নিয়ে চর্চা যেন হয়ে গেছে আদিম-সেকেলে ব্যাপার। নিজেকে তাই দ্রুতই সামলে নেয় সে এবং মায়ের কাছে বলে- 'আসলে মেয়ে আর পুরুষ ব্যাপারটাই বোগাস– বেটাছেলে আর মেয়ে ছেলে মূলত দুটো চিহ্নের ব্যাপার। একজনের টিউব আছে, থলি আছে, ডিম পাড়ে। আর-একজনের টিউব বাইরে, সেটা দিয়ে জল ঝরে।" (দেবেশ, ২০১৩ : ৬৭)। চিনি গুরুংকে তার প্রেমিকা ইন্টুর কাছে নিজেকে লুকোতে উপদেশ দিলে গুরুং রাজি হয় না। কারণ মেয়ে হয়ে যাবার পর সেক্সের ক্ষেত্রে কোনো শারীরিক বাধা আছে বলে আধুনিক গুরুং মনে করে না– সে বিশ্বাস করে, এটা ইন্টুর কাছেও হয়তো আরো ভাল লাগবে। লাইফস্টাইলের সামান্য হাঙ্গামা ছাড়া ইন্টু ও তার 'পার্টনারশিপকে' সে কোনো সমস্যাই মনে করেনা। কিন্তু বিপত্তিটা ঘটে গুরুং-এর বাবার দিক থেকে। গুরুং-এর লিঙ্গ পরিবর্তনের এই আকস্মিকতা তিনটি চরিত্র তথা– গুরুং, তার মা ও বাবা যথাক্রমে চিনি এবং কণ্ঠার দৃষ্টিকোণ থেকে ধারণ করা হয়েছে উপন্যাসে; রয়েছে ঔপন্যাসিকের নিজস্ব নারী-পুরুষ ভাবনাও।

ছেলে গুরুং-এর মেয়ে হয়ে যাবার ঘটনায় বাবা কণ্ঠার তীব্র প্রতিক্রিয়া হয়, প্রাথমিকভাবে সে এটা মেনে নিতে সম্পূর্ণ রূপে অপারগ হয় এবং প্রচণ্ড আক্রোশ ও নোংরামি নিয়ে ছেলে গুরুং-এর শরীরকে আক্রমণ করে; যেন আঘাত করে সে যাচাই করে নিতে চায় সত্যিই গুরুং মেয়ে হল কী না। ছেলের সাথে এ নিয়ে তুমুল তর্কে সে বলে–

> 'মেয়েরা লিঙ্গহীন।'(দেবেশ, ২০১৩ : ১২০)

ছেলে গুরুংকে হিজড়া সম্বোধন করে এবং বলে সমাজে 'হিজড়ের বাপ' হয়ে থাকা তার পক্ষে সম্ভব নয়। চিনির দৃষ্টিকোণে গুরুঙের প্রতি এক গভীর সহানুভূতি দেখা যায়, নিজে নারী হিসেবেই কেবল

Dhaka University Institutional Repository

নয়; পুরুষতান্ত্রিকতার প্রতি বহন করা প্রবল ঘৃণাবোধ থেকেও। সে বরং খুশিই হয় একথা ভেবে যে, "চিনি সংসারের মেয়েছেলে আর কণ্ঠেশ্বর সংসারের বেটাছেলে। গুরুং তো একটা বেটাছেলেই। কণ্ঠেশ্বরের অভ্যস্ত তিরস্কারে যেন চিনির চিন্তা ভাবনার কোনো এক সীমারও শেষে, দিনের বেলার বিদ্যুৎ চমকের মত অস্পষ্ট এক ন্যায়বোধ খেলে যায়– একজন প্রভু অন্তত দাস হয়ে গেল। গুরুং।" (দেবেশ, ২০১৩ : ৮৭)। স্বভাবের অচেতন মাত্রায় সমাজ-নারীরা তথা এই চিনিরা কোনো গল্প-সমাবেশে বেটাছেলে কিংবা তাদের স্বামীদের 'কর্তালি' নিয়ে অনর্গল কথা বলে। এই 'কর্তালি' দিনের পর দিন নারীর সহ্যও হয়ে যায়। কাউকে নালিশ কিংবা আপত্তি করার মত কিছুই ঘটে না; "এটা এতই পুরনো যে, চিনির স্বভাবেও একটা প্রক্রিয়া তৈরি হয়ে গেছে– প্রথমত বিরক্ত না-হওয়ার প্রক্রিয়া, দ্বিতীয়ত বিরক্তি থেকে সরে থাকার প্রক্রিয়া, তৃতীয়ত বিরক্তিটাকে চাপা দেয়ার প্রক্রিয়া। ... এখন সে এই ভাবনায় পৌঁছে গেছে যে বর্বরতা ছাড়া স্বামী হয় না। স্বামী আর স্ত্রীর মধ্যে কোনো বিনিময়ের পরিসর নেই। আর, স্ত্রী-হওয়া মানেই নিরবচ্ছিন্ন অপমানিত হওয়া।" (দেবেশ, ২০১৩ : ৯৪)। চিনির মনে হতে থাকে যে সব দাম্পত্যই পুরুষের আধিপত্যের সূচক। সে জানে, দাম্পত্য ভেঙে দিলেও পুরুষের লাভ আর মেয়েদের ক্ষতি। তার কাছে মনে হয়– "সব কোড পুরুষের কোড, সব কোড কর্তৃত্বের কোড।" (দেবেশ, ২০১৩ : ৯৭)। নিজের যন্ত্রণা, দাম্পত্য-বিরক্তি ও আত্মরক্ষার অবরোধ গড়ে তোলা– এ সকল অনুভূতিতেই চিনি একা; সম্পূর্ণই একা ও সঙ্গহীন হয়ে পড়ে। ঔপন্যাসিকের বিবরণ :

> নারীর যৌনতা তার নিজের, চিনির একার। যৌনতা কোনো একটা শারীরিক কাজ নয়। তেমন একটা শারীরিক যৌনতার জন্য হয়তো স্বামী-স্ত্রী হওয়াই ভাল। সেই শারীরিক সঙ্গম তো চিনির অজস্র অগণন যৌনতা ধ্বংস করে দেয়। দাম্পত্য যখন তৈরি হয়েছিল, তখন নারীর যৌন স্বতন্ত্র হয়ে ওঠার বয়সই হয় নি। এখন নারীর যৌনতা তার ভিতরে একটা ভুবন তৈরি করে ফেলেছে। সেই যৌন-ভুবনের ধ্বংসের ওপর দাম্পত্য টিকে আছে। (দেবেশ, ২০১৩ : ১০৪)

একে অপরের শরীর না জেনেই দীর্ঘ বছরের দাম্পত্য ঘটছে বিনিময়; সারাজীবনের সঙ্গ যার সাথে– সে তার শরীরই জানেনি। শরীরে ও মনে এমন নিঃসঙ্গ নারী চিনি তার ছেলে গুরুং-এর এই শরীরী-পরিবদলে গভীরভাবে সহমর্মী হয়ে ওঠে। অবচেতনে নিজের যৌনতার ভুবনে সে তার শরীর-মন আর তার মেয়ে-তে পরিণত হওয়া গুরুং-এর নতুন, নগ্ন, তরুণ শরীর (যা কোনো পুরুষের দখলে যায়নি) মিলে একীভূত সত্তায় রূপান্তরিত হতে থাকে।

Dhaka University Institutional Repository

অতল তলের জলে-র বিষয় ভাবনা নিয়ে ঔপন্যাসিকের বিস্তৃত মত আছে উপন্যাসের ভেতরে এবং *শরীরের সর্বস্বতা*-র ভূমিকায়। উপন্যাসটির বিষয় নিয়ে পরিচিতজনের কাছ থেকে বিরূপ সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়েছে বলে ভূমিকায় জানিয়েছেন দেবেশ। তবে *শরীরের সর্বস্বতা*র অন্যান্য উপন্যাসের মতই মানব শরীর-জিজ্ঞাসায় *অতল তলের জলে*-র শরীর-ভাবনাও স্বতন্ত্র বিষয়-মর্যাদার দাবিদার। উপন্যাসে দেবেশ পাশ্চাত্য নারীবাদী চিন্তাদর্শগুলোও বিচার করেছেন।

শরীর একটা আলাদা বিজ্ঞান, কিন্তু শরীরী ক্রিয়া বিশেষত যৌনক্রিয়া কী করে বিজ্ঞান-ভুবন ও আদি প্রাকৃতিকতা থেকে মানবের বিশ্বাসকৃত, চর্চিত সমাজ-দর্শন ও মনোবিশ্লেষণিক চেতনার সাথে সম্পৃক্ত হল, সে সম্পৃক্তির প্রকারও কত বৈচিত্র্যিক ও রূপান্তরিত হয়েছে এবং প্রতিনিয়ত হচ্ছে ঔপন্যাসিক তা অন্বেষণ করার চেষ্টা করেছেন *শরীরের সর্বস্বতা*-য়। তবে দেবেশের ভাবনা কেবল নরনারীর শারীরিক সম্পর্ক তথা যৌনতা বিষয়ক নয়। সৃষ্টিবিজ্ঞান হিসেবে শরীরের আজব ও আদি নিয়ম এবং চেতনার সাথে সম্পৃক্ত কিংবা বিবিক্ত শরীরের প্রক্রিয়া তিনি এক নিরপেক্ষ নির্মোহ বিজ্ঞান ও শুদ্ধ শিল্পের দৃষ্টিতে বিবেচনা করেছেন। *শরীরের সর্বস্বতা*-র শরীর ভাবনাও এ কারণে হয়ে ওঠে প্রথাবিরোধী ও প্রবল চর্চার প্রতিস্রোতে ভিন্ন এক সাহিত্য পরিক্রমা।

Dhaka University Institutional Repository

টীকা

১ ধনতন্ত্র সম্পর্কে কথাটা বলেছিলেন ফ্রান্সের চিন্তাবিদ, দার্শনিক চার্লস ফুরিয়ের (১৭৭২-১৮৩৭)। (উদ্ধৃত, শিপ্রা, অনমিত্র, ১৯৯৮ : ভূমিকা-অংশ)

২ 'Decadene of Capitalism' সম্পর্কে মার্কসের বক্তব্য প্রসঙ্গে দেবেশ রায় লিখেছেন : "ধনতন্ত্র শুধু তার নিজের সংকটের সময় আত্মসমালোচনাপ্রবণ হয়, 'টাইম অব ডেকাডেন্স'-এ 'সেলফক্রিটিসিজম'।" (দেবেশ, ১৯৯১ : ৭৫)।

৩ ১৯৩২ সালে বেঙ্গল সরকার হিন্দু সমাজের মধ্যে সবচেয়ে নীচু শ্রেণির লোক অর্থাৎ অস্পৃশ্য জাতিকে বোঝাতে 'তফশিলি সম্প্রদায়' প্রতিশব্দটির ব্যবহার করেন। (বিস্তারিত জানতে দ্রষ্টব্য : S. K. Gupta রচিত গ্রন্থ *The Scheduled Castes in Modern Indian Politics : The Emergence as a Political Power*, 1985)

৪ ভারতীয় জনগণের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর প্রক্রিয়ার একটি পদক্ষেপ হিসেবে প্রাদেশিক আইনসভা গঠন বিষয়ে ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক জারিকৃত একটি নীতিনির্ধারণী দাপ্তরিক নির্দেশনা বা রোয়েদাদ। এই রোয়েদাদ আইনসভায় বিভিন্ন সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্ব এবং আনুপাতিক আসনসংখ্যা নিরূপণের পদ্ধতি নির্ধারণ করা হয়। রোয়েদাদে বিধৃত নীতিমালা পরবর্তী সময়ে ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনে চূড়ান্ত রূপ লাভ করে এবং এরই ভিত্তিতে আইনসভার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

৫ "প্রান্তবাংলার প্রেক্ষাপটে অজস্র চরিত্র নির্মাণ ও উপকাহিনীর বয়ানে *বরিশালের যোগেন মণ্ডল* হয়ে উঠেছে এক মহাকাব্যিক উপন্যাস। যে যোগেন মণ্ডল সম্পর্কে কোনো দায় নেননি জাতীয়তাবাদীরা, ইতিহাসের সে দায়ই নিজের কাঁধে তুলে নিয়ে লেখক দেবেশ হয়ে উঠলেন নতুন ইতিহাসের নির্মাতা। *বরিশালের যোগেন মণ্ডল* যুগপৎ উপন্যাস ও ইতিহাস গ্রন্থ হিসেবে মর্যাদা পাবে।" (ড. তপন বাগচী, '*দেবেশ রায়ের বরিশালের যোগেন মণ্ডল* : যুগপৎ উপন্যাস ও ইতিহাস' প্রবন্ধ থেকে উদ্ধৃত)

তথ্যসূত্রঃ (http://himalayanaltitudes.blogspot.com/2013/02/blog-post_6.html)

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থপঞ্জি

অপর্ণা পাল (২০১৩)। *ভিন্ন স্রোতের ঢেউ/বাংলা উপন্যাস (১৯৪৭-৬৭)*। পুস্তক বিপণি, কলকাতা।

কল্যাণ মিরবর (১৯৯৯)। *সাম্প্রদায়িকতা : বিধ্বস্ত স্বাধীনতা*। পুস্তক বিপণি, কলকাতা

জয়া চ্যাটার্জী (২০০৩)। *বাংলা ভাগ হল/হিন্দু সাম্প্রদায়িকতা ও দেশবিভাগ (১৯৩২-১৯৪৭)*। আবু জাফর (অনুদিত)। দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা।

দেবেশ রায় (১৯৯১)। *যযাতি*। দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা।

দেবেশ রায় (১৯৯২)। *ইতিহাসের লোকজন*। দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা।

দেবেশ রায় (২০১০)। *বরিশালের যোগেন মণ্ডল*। দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা।

দেবেশ রায় (২০১৩)। *শরীরের সর্বস্বতা*। দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা।

মোহাম্মদ আবদুল মান্নান (২০০৭)। *বঙ্গভঙ্গ থেকে বাংলাদেশ/ঢাকা-কলকাতাকেন্দ্রিক শত বছরের রাজনীতি ও হিন্দু-মুসলিম সম্পর্ক*। কথামেলা, ঢাকা।

পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯৯৮)। 'দেবেশ রায়ের উপন্যাস-গল্প : এক পাঠকের পাঠক্রিয়ায়।' *পঞ্চাশের দশকের কথাকার* [সম্পা. উজ্জ্বলকুমার মজুমদার]। পুস্তক বিপণি, কলকাতা। পৃ. ২২৮-২৪৭

শান্তনু সরকার (২০১১)। 'প্রতিরোধের ভাষা, অন্তর্ঘাতের নন্দন : সাম্প্রতিক বাংলা আখ্যানে।' *বাংলা আখ্যান : বহুমাত্রিক পাঠ*। [সম্পা. বেলা দাস ও বিশ্বতোষ চৌধুরী]। রত্নাবলী, কলকাতা। পৃ. ৬৮-৮০

শিপ্রা সরকার, অনমিত্র দাশ [সংকলিত] (১৯৯৮)। *বাঙালির সাম্যবাদ চর্চা*। আনন্দ পাবলিশার্স প্রা. লি. কলকাতা

Dhaka University Institutional Repository

সুমিত সরকার (১৯৯৩)। *আধুনিক ভারত (১৮৮৫-১৯৪৭)*। কে পি বাগচী অ্যান্ড কোম্পানী, কলকাতা।

Anupama Rao (2007). 'Ambedkar and the Politics of Minority : A Reading.' *From the Colonial to the Postcolonial India And Pakistan in Transition*.

Dipesh Chakrabarty, Rochona Majumder, Andrew Sartori (Edt.). Oxford

University Press (Published in India), New Delhi.

B. R. Ambedkar (2008). *Gandhi and Gandhism*. Critical Quest, New Delhi.

Dwaipayan Sen (2018). *The Decline of the Caste Question : Jogendranath Mandal and the Defeat of dalit Politics in Bengal*. Cambridge University Press, US.

S. K. Gupta (1985). *The Scheduled Castes in Modern Indian Politics : The Emergence as a Political Power*. Published by Munshiram Monoharlal, New Delhi.

সহায়ক পত্রিকা

পার্থ চট্টোপাধ্যায় (১৪২১)। 'যোগেন মণ্ডলের একাকীত্ব'। *কঙ্ক* (দেবেশ রায় সম্মাননা সংখ্যা), ইম্প্রেশন, কলকাতা। পৃ. ২৯০-২৯৭।

আলতাফ পারভেজ (৩০ অক্টোবর, ২০১৭)। 'বরিশালের যোগেন মণ্ডলকে কি কারও মনে পড়ে?'। *প্রথম আলো* (মতামত), ৩০ অক্টোবর, ২০১৭ সংখ্যা, ঢাকা।

সৌভিক ঘোষাল (২০১৭)। 'রাজনীতির নতুন সমীকরণ এবং *বরিশালের যোগেন মণ্ডল*'। *চার নম্বর প্ল্যাটফর্ম (ইন্টারনেটের নতুন কাগজ)*, ১ মে ২০১৭ (সূত্র : 4numberplatform.com)।

Dhaka University Institutional Repository

Dhaka University Institutional Repository

উপসংহার

সময়ান্বিত জীবনে ব্যক্তির দ্বন্দ্ব, ব্যক্তি ও মানব সম্পর্ক, সংগ্রাম-সমন্বয়, গতি, অস্তিত্ব-জিজ্ঞাসা তথা জীবন-কাঠামোর বিচিত্র সম্পর্কের বয়ানই হল উপন্যাস। কাল পরিক্রমায় বয়ানরীতির বদল হলেও জীবনের বৈচিত্র্যিক অন্তর্বয়নই উপন্যাসের বিশেষ অন্তর্লক্ষণ। ঔপন্যাসিক কথিত বিবরণ, অন্তর্গত চরিত্রের মনোলোক ও বহির্জাগতিক কার্যক্রমের অভিব্যক্তি উপন্যাস-নির্মিতির মৌলসূত্র। সমকালে উপন্যাস সম্বন্ধীয় তাত্ত্বিক জিজ্ঞাসায় উপন্যাসের বিবরণ, চরিত্রের কার্যক্রম, কথক, পাঠক সর্বোপরি ভাষা-বিষয়ক ধারণার বিস্তর রূপান্তর ঘটেছে।

উপন্যাসের সৃজনরীতির নবত্ব অন্বেষণ, উপন্যাসের ইতিহাস, শিল্পতত্ত্ব অনুসন্ধান সর্বোপরি ইতিহাস ও সময়ের একজন বিশ্লেষণপ্রয়াসী ও একনিষ্ঠ পাঠক হিসেবে দেবেশ রায় নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। আখ্যানের ভাষ্য ও গড়ন নির্মিতিতে তাঁর শিল্পপ্রয়াস অব্যাহত আছে এক স্বাতন্ত্র্যবোধের পরিচিহ্নে, সেখানে রয়েছে শিল্প-স্বভাবের এক দ্বিমুখিতাও, যা কেন্দ্রের আধিপত্য ও তার বিরুদ্ধে পরিধিস্থ মানুষের বৈপরীত্যকে চিহ্নিত করতে সচেষ্ট। উপন্যাসের অর্ন্তবস্তু-প্রকরণ-মূল্যবোধ, প্রতিনিয়ত এর নিরবচ্ছিন্ন বিনির্মাণের প্রয়াস এবং এ বিষয়ক যে নন্দনতাত্ত্বিক প্রস্তাবনা উপস্থাপন করেন দেবেশ রায়; সেটি গভীরভাবে জাতীয় ইতিহাস-মনস্তত্ত্ব-নৃতাত্ত্বিক ও ভৌগোলিক পরিসর এবং তাঁর প্রজ্ঞা ও নন্দনবোধের সংশ্লেষণ থেকেই উৎসারিত। এভাবেই সতত চলমান আছে তাঁর ঔপন্যাসিক সংবেদনা, নিজস্ব শিল্প-স্বভাবের স্ববিরোধিতার নিয়ত খোঁজ।

সমাজ, সময় ও ইতিহাসধৃত ব্যক্তিমানুষের রূপ ও জটিল আন্তঃসম্পর্ককে উপন্যাসের অন্বিষ্ট করেছেন দেবেশ রায়। এ কারণে বদলে যাওয়া জীবন ও মানুষের সংজ্ঞার্থও শিল্পীকে বারংবার খুঁজতে হয়েছে। দেবেশের উপন্যাসের বিষয়-বিবেচনায় রাজনীতি, সমাজ, ইতিহাস ও ব্যক্তিমানুষকে স্বতন্ত্র বা বিশেষ উপজীব্য হিসেবে শনাক্ত করা যায় না– বরং তাঁর কথন পরিসরে এই বহুস্তরিক উপাদানপুঞ্জ সামগ্রিক জীবনায়ন ও অস্তিত্বের অভীপ্সা হিসেবে অন্তর্বয়িত হতে থাকে। আখ্যানের নন্দন, সমাজতত্ত্ব ও ইতিহাস দেবেশের কাছে অপরিহার্য, এগুলোর বিচ্ছিন্ন পাঠও তিনি প্রত্যাখ্যান করেন। পার্টি-রাজনীতির সংগ্রামশীল দীর্ঘ ইতিহাসের সঙ্গে তাঁর সম্পৃক্তি এবং ঐকান্তিক অভিজ্ঞতার বাস্তব চিত্রায়ণ দেবেশের কোনো কোনো ‘বৃত্তান্ত’ ও ‘প্রতিবেদন’-এ আছে। দ্বন্দ্বমুখর সময় ও রাজনীতির জটিল,

Dhaka University Institutional Repository

বহুভঙ্গিম চারিত্র্যকে গভীর জ্ঞানে ও অভিজ্ঞতার বিস্তারে বুঝে নিয়েছেন তিনি। গড়ে তুলেছেন রাজনৈতিক আখ্যানের ভিন্নতর সংজ্ঞা। তাঁর অনেক উপন্যাসে ও রচনায় রাজনীতিবোধ গভীর শিল্পাভিব্যক্তি পেয়েছে।

নিজের চোখ দিয়ে বাস্তবকে জানার; যা ঘটছে তাকে দেখানোর মধ্য দিয়েই সাহিত্যস্রষ্টার যা অভিপ্রেত ও স্বাভাবিক, তাকে দেবেশ রায় মনে করিয়ে দেন অবিরত; হয়ে ওঠেন ব্যক্তি, স্থান ও সময়ের প্রতীতির ব্যতিক্রমী কথাকার। আমাদের প্রাত্যহিক বাস্তবের অন্তরালে স্থিত বিপরীত বাস্তবও নির্মাণ করেন তিনি; তাঁর দেখা বাস্তব সময়-সমকাল সংলগ্ন অথচ কখনও তা সময়ের সঙ্গে আন্তর-বৈপরীত্যে অবস্থান করে। বাস্তবতার এই রূপায়ণ তাঁর কাছে কেবল রূপরীতির কৌশল নয় বরং তা মানুষের জীবন অবলোকনের সমগ্রতাবোধ থেকে উত্থিত ও বিন্যস্ত। সামাজিক-সাংস্কৃতিক-রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক ও প্রযুক্তির অতি বিস্তারে জীবনের বিমানবায়ন কখনও তাঁর আখ্যানকে করে তোলে ব্যক্তির অসামঞ্জস্য ও অনন্বয়ের কথকতা; সমকালের অভিজ্ঞতার বিরুদ্ধে শিল্পীর প্রতিরোধকে মূর্ত করতে তিনি খোঁজেন প্রত্যাখ্যানের ভাষা। ফলে তাঁর উপন্যাসে আসে বাঘারু, কাদাখোয়া, মাদারির মা, মাদারি, কেলু, রাধিয়াসহ অসম্বোধিত, অসংজ্ঞায়িত অর্থনীতি-তত্ত্ব ও উৎপাদন কাঠামোর স্তরে বাস করা এবং উন্নয়নের কাঠামো থেকে প্রত্যাখ্যাত সেই সব সময়হীন, ভাষাহীন মানুষেরা; যাদের বৃত্তান্ত নির্মাণের অবলম্বন খুঁজতে কাহিনিবিহীন আখ্যানের কাছেও সমর্পিত হন ঔপন্যাসিক। যাদের আখ্যান গ্রন্থনায় নিজেকে একান্ত অনধিকারী বলেও মনে করেন তিনি। ব্যক্তির স্বতন্ত্র ঐতিহাসিকতাও তাঁর কথন-কৌশলে সমন্বয়িত হয়ে যায়; আখ্যান হয়ে ওঠে এক একজন ব্যক্তির নান্দনিক, জীবনময় ইতিহাস, আর সে ইতিহাস হয়ে ওঠে অনিশ্চিত, অসমাপ্ত যাত্রার বৃত্তান্ত।

পরিবর্তনশীল সময় ও সমাজস্বভাবের বহুমাত্রিক চিহ্নায়কগুলো আখ্যানে ধারণ করতে দেবেশ রায় উপস্থাপন করেন তাঁর বৃত্তান্ত ও প্রতিবেদনমূলক উপন্যাসসমূহ। আখ্যানবিশ্বের এই নব প্রকল্পে, বিশেষত প্রতিবেদনে পরিবেশিত হয়েছে জীবন-বাস্তবতার ভিন্নমাত্রিক পাঠ। ব্যক্তি, দেশ, কাল ও সময়ের বহির্বৃত ব্যাখ্যানের পাশাপাশি বয়ানে অন্তর্বৃত সত্যও অঙ্গীভূত হয় দেবেশের সাহিত্যিক সাংবাদিকতায়। সমকালে যে মিডিয়া হয়ে উঠেছে বিশ্বকোষ, তার বিষয় হিসেবে শেষপর্যন্ত থাকে মানুষই– কখনও প্রকৃতিসৃষ্ট দুর্যোগ, কখনও সাম্প্রদায়িক বিরোধ ও দাঙ্গা, কখনও পুঁজি ও শিল্পায়নের প্রতিঘাত এবং এরকম নিয়ত ঘটমান বাস্তবতার প্রতিফল-আক্রান্ত অনুষঙ্গ রূপে মানুষ ও তার জীবনই

Dhaka University Institutional Repository

হয়ে ওঠে সংবাদ। দেবেশের ভিন্নগোত্রীয় ঔপন্যাসিক-প্রতিবেদনে সেইসব তথ্যের অন্তর্লীন সত্য হয়ে উঠেছে প্রতিবাদী ও বিনির্মাণপন্থী, সংবাদের এই উপন্যাসন প্রক্রিয়া সেখানে সর্বদা বাস্তবানুগও।

ইতিহাস-চিন্তার বিন্যাসেও দেবেশের আখ্যান স্বতন্ত্র; ইতিহাসের অন্তঃস্থ ও বহিঃস্থ পরিসরসহ ইতিহাসজ্ঞান উপস্থাপিত হয় সেখানে। জ্ঞান ও সত্যের প্রচলিত ডিসকোর্স পাঠে কেন্দ্রের আধিপত্য বিষয়ে সচেতন ও বিশ্লেষণাত্মক প্রকাশ ঘটে দেবেশের আখ্যানগুলোতে। ব্যক্তির ওপর ক্ষমতার রাজনৈতিক বিন্যাস, শ্রেণিস্বার্থের সম্পর্ক-সংঘাত– এক কথায়, ব্যক্তির সংগ্রামশীল ইতিহাস নতুন দৃষ্টিকোণে উন্মোচিত হয় তাঁর উপন্যাসে। ব্যক্তি– যে ইতিহাসে বিচ্যুত হচ্ছে অথবা হয়ে যাচ্ছে অনৈতিহাসিক, দেবেশ তাকেই করে তোলেন তাঁর ইতিহাস-পাঠের কিংবা বিনির্মিত আখ্যানের অংশ।

শরীর ও যৌনতার সম্পর্কের অতি পরিচিত ও পুরনো অনুষঙ্গও দেবেশের বয়ানে প্রথাগত নয়। শরীরের জৈবক্রিয়ার স্বাভাবিকতা কিংবা কোনো প্রকার বৈকল্য, বিকৃতি নিয়ে ব্যক্তির বিচিত্র মনস্তত্ত্বের নির্মোহ-নির্দ্বিধ রূপায়ণ দেখা যায় দেবেশের উপন্যাসে। সৃষ্টিবিজ্ঞান হিসেবে শরীরের আজব ও আদি নিয়ম এবং চেতনালোকের সাথে সম্পৃক্ত কখনও বা বিবিক্ত শরীরের চলমান ও অব্যাহত প্রক্রিয়াকে দেবেশ এক নিরপেক্ষ, নির্মোহ বিজ্ঞানদৃষ্টিতে বিবেচনা করেছেন, সেইসাথে তাকে করে তুলেছেন নান্দনিক। নর-নারীর শারীরিক সম্পর্ক, যৌনতার বঞ্চনা, মনোবিকার প্রভৃতি বিষয়ক ভাবনার প্রকাশেও প্রাতিস্বিক হয়ে ওঠেন তিনি।

উপন্যাসের সমাপ্তি-বাচন বলে দেবেশের উপন্যাসে তেমন কিছু নেই। শ্রেণিচরিত্র হিসেবে উৎপাদন ব্যবস্থা-সমাজ-অর্থনীতি-রাজনীতি এবং ইতিহাসের বহমানতায় ব্যক্তিমানুষের নিয়ত সংকট-সংঘাতের বিনির্মিত শিল্প-অভিপ্রায় রূপে তিনি উপন্যাসকে বিবেচনা করেন। উপন্যাসে প্রাবন্ধিকের মতই রাষ্ট্র-সমাজ-ধর্ম-অর্থনীতি-উৎপাদন সম্পর্ক-রাজনীতি ও ইতিহাসবোধ তথা অর্জিত জ্ঞানের তাত্ত্বিক বয়ান পেশ করেন ও তাকে করে তোলেন উপন্যাসের অংশ। ঔপন্যাসিক হিসেবে নয়, ভাষ্যকার হিসেবেও আখ্যানের নির্মাতা তিনি; এ নির্মাণ একজন প্রতিবেদক-প্রাবন্ধিক, ইতিহাসবিদ, সমাজতাত্ত্বিক ও রাজনৈতিক ভাষ্যকারের মতই; যে ভাষ্যকে ছাড়া আধুনিক আখ্যান দাঁড়ায় না। আলাদা আলাদা ‘এপিসোড’-এ অনবরত আখ্যানকে, রচনাকে বাড়িয়ে তোলা, ভাঙন ও বিনির্মাণ– সবটাতেই

Dhaka University Institutional Repository

আখ্যানের মুক্তি খোঁজেন তিনি। কেবল বিষয়বস্তুর স্বাতন্ত্র্য নয়, গল্প বলার পদ্ধতিটাকেই বদলে দেয়ার চেষ্টায় একাধিক বিকল্প পথান্তরের খোঁজ দেবেশের রচনার অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

উপন্যাসের ভেতরে উপন্যাসের বিষয়বস্তু ও গঠন-পরিকল্পনা সম্পর্কে ঔপন্যাসিকের আত্মপ্রক্ষেণমূলক বক্তব্য যোগ করা দেবেশ রায়ের প্রায় সহজাত। কোনো কোনো পর্যায়ে উপন্যাসকে অভিসন্দর্ভ-স্বরূপ করে তোলাতে তাঁর শৈল্পিক-দ্বিধা নেই বললেই চলে, বরং এই করণ-কৌশলে তাঁর উপন্যাস-পাঠকও অভ্যস্ত হয়ে যান। গদ্যকথক হিসেবে বর্ণনরীতি, বিষয়-বৈচিত্র্যের বয়ন-বিন্যাস ও ভাষাকে শিল্পবস্তুতে পরিণত করা তাঁর উপন্যাসীকরণের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দিক। যদিও ভাষাকে উপন্যাসের বিষয় থেকে আলাদা করা কঠিন, আর উপন্যাসের শিল্পভুবনের কেন্দ্রে থাকে সংলাপ, যা মূলত গল্পনির্ভর নয়। বাখতিন-কথিত সংজ্ঞার্থে উপন্যাস যেমন সাংলাপিক কল্পনা; লেখকের বিবরণ যেমন দ্বি-স্বরিক ডিসকোর্স, তেমনি দেবেশের নন্দনভাবনায়ও চরিত্র-ভাষা-শব্দ বহুস্বরিক। যে শব্দ আর অর্থ দিয়ে গল্প লেখা হয়; তাতে নানা অভিজ্ঞতার স্তর, নানা মূল্যনিরূপণের স্তর, বহমান শতাব্দীর নানা ঘটনার অভিঘাতে অর্থের বহুভঙ্গিম, বহুস্তরিকতা অনুভব করতে চান ঔপন্যাসিক; আর উপন্যাসে তা ধারণ করেন গদ্যভাষার সহজ স্বাচ্ছন্দ্যে। বিশেষত বৃত্তান্তগুলোতে তাঁর ভাষাগত নিরীক্ষা প্রচ্ছন্ন থাকেনি। কোথাও কোথাও ভাষা প্রয়োগে পরিব্যাপ্ত আঞ্চলিক আবহ, স্থানিকতা, ভৌগোলিকতার বিস্তৃতি লক্ষণীয় তাৎপর্যে চিহ্নিত।

এভাবে উপন্যাসের শিল্পরূপ নিয়ে নানা ধরণের মনোযোগী পরীক্ষা করেছেন দেবেশ রায়। কথাসাহিত্যের প্রথাগত 'মডেল' বা 'ফর্মের' বিকল্প অনুসন্ধান ও শৈল্পিক সংকটকে শিল্প-সাহিত্য সৃজনের চলমান পথ-পরিক্রমার অংশ হিসেবেই ধারণ করে আছেন তিনি। কথনের নতুন প্রকরণ সন্ধানে নিরন্তর নিয়োজিত থেকে, জীবনের বৈচিত্র্যময় জিজ্ঞাসা ও ব্যক্তিমানবের নানামাত্রিক ইতিহাস রূপায়ণের মধ্য দিয়ে উপন্যাসের নন্দনকে ভিন্নরূপে অনুভব করান তিনি। সাধারণ অর্থে উপন্যাসকে তিনি দেশ-সময়-ব্যক্তিসাপেক্ষ শিল্পরূপ হিসেবেই পাঠ ও নির্মাণ করেছেন, সেই সঙ্গে প্রত্যাশা করেন স্বনির্মিত আত্মচেতনার জোরে গড়ে ওঠা 'অন্তর্দেশগঠক, আকারধ্বংসী ও আত্মপাঠক' আধুনিক ঔপন্যাসিককে।

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি ও পত্র-পত্রিকা

ক. মূলগ্রন্থ (কালানুক্রমিক)

দেবেশ রায় : ১৯৮৮, *তিস্তাপারের বৃত্তান্ত*, প্রথম প্রকাশ, দে'জ পাবলিশিং, কলিকাতা

১৯৮৯, *মফস্বলি বৃত্তান্ত*, পরিবর্ধিত দে'জ সংস্করণ, দে'জ পাবলিশিং, কলিকাতা

১৯৯০, *আত্মীয় বৃত্তান্ত*, প্রথম প্রকাশ, দে'জ পাবলিশিং, কলিকাতা

১৯৯১, *যযাতি*, প্রথম প্রকাশ, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা

১৯৯৩, *সময় অসময়ের বৃত্তান্ত*, প্রথম প্রকাশ, দে'জ পাবলিশিং, কলিকাতা

১৯৯২, *ইতিহাসের লোকজন*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা

২০০৭, *প্রতিবেদন*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা

২০১০, *বরিশালের যোগেন মণ্ডল*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা

২০১৩, *শরীরের সর্বস্বতা*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা

Dhaka University Institutional Repository

খ. সহায়ক গ্রন্থ

অচ্যুত গোস্বামী — ১৯৬৮, *বাংলা উপন্যাসের ধারা*, দ্বিতীয় সংস্করণ, পাঠভবন, কলিকাতা

অনিন্দ্য ভট্টাচার্য — ২০১২, *কথাগঠন*, প্রথম প্রকাশ, সুজন প্রকাশনী, কলকাতা

অপর্ণা পাল — ২০১৩, *ভিন্ন স্রোতের ঢেউ/বাংলা উপন্যাস (১৯৪৭-৬৭)*, প্রথম প্রকাশ, অক্ষর প্রকাশনী, কলকাতা

অরুণকুমার ঘোষ — ২০১১, 'ঈপ্সিত প্রকরণের ঐকান্তিক সন্ধানে : দেবেশ রায়ের তিনটি উপন্যাস।' *বাংলা উপন্যাস : বীক্ষা ও অন্বীক্ষা* (সুবল সামন্ত সম্পাদিত), ২য় সংস্করণ, এবং মুশায়েরা, কলকাতা ৭০০০৭৩

অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় — ২০০৪, *বাংলা কথাসাহিত্য জিজ্ঞাসা*, প্রথম প্রকাশ, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা

অলোক রায় — ২০০০, *বাংলা উপন্যাস : প্রত্যাশা ও প্রাপ্তি*, প্রথম প্রকাশ, অক্ষর প্রকাশনী, কলকাতা

অশোক দাশ — ২০১১ 'দেবেশ রায়ের প্রতিবেদনমূলক উপন্যাস : উপনিবেশোত্তর চেতনার আখ্যান প্রকল্প', *বাংলা আখ্যান : বহুমাত্রিক পাঠ* [সম্পা. বেলা দাস ও বিশ্বতোষ চৌধুরী], প্রথম প্রকাশ, রত্নাবলী, কলকাতা

আকিমুন রহমান — ১৯৯৩, *আধুনিক বাংলা উপন্যাসে বাস্তবতার স্বরূপ (১৯২০-৫০)*, প্রথম প্রকাশ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা

অ্যাঁলা রবগ্রীয়ে — ২০১১, *নব উপন্যাসের পক্ষে* (শামসুদ্দিন চৌধুরী অনুদিত), প্রথম প্রকাশ, বর্ণায়ন, ঢাকা

কল্যাণ মিরবর — ১৯৯৯, *সাম্প্রদায়িকতা : বিধ্বস্ত স্বাধীনতা*, প্রথম প্রকাশ, পুস্তক বিপণি, কলকাতা

Dhaka University Institutional Repository

কার্তিক লাহিড়ী ২০১৪, *বাস্তবতা ও বাংলা উপন্যাস*, প্রথম প্রতিভাস পরিবর্ধিত সংস্করণ, প্রতিভাস, কলকাতা-৭০০০৭২

জহর সেনমজুমদার ২০০৭, *নিম্নবর্গের বিশ্বায়ন*, পুস্তক বিপণি, কলকাতা ৯

জয়া চ্যাটার্জী ২০০৩, *বাংলা ভাগ হল/হিন্দু সাম্প্রদায়িকতা ও দেশবিভাগ (১৯৩২-১৯৪৭)*, (আবু জাফর অনুদিত), প্রথম প্রকাশ, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা

ড. রামেশ্বর শ' ২০০৬, *আধুনিক বাংলা উপন্যাসের পটভূমি ও বিবিধ প্রসঙ্গে*, পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ. পুস্তক বিপণি, কোলকাতা

তপোধীর ভট্টাচার্য ১৪২০, *কথার সময় : সময়ের কথা*, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা ৭০০০০৯

তপোধীর ভট্টাচার্য ২০১৩, *আখ্যানের সাতকাহন*, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা

তপোধীর ভট্টাচার্য ২০০৭, *আখ্যানের স্বরান্তর*, প্রথম প্রকাশ, দিবারাত্রির কাব্য, কলকাতা

দেবীপদ ভট্টাচার্য ২০০৩, *উপন্যাসের কথা*, পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত প্রথম দে'জ সংস্করণ, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ৭০০০৭৩

দেবেশ রায় ১৯৯১, *উপন্যাস নিয়ে*, প্রথম প্রকাশ, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭০০০৭৩

দেবেশ রায় ২০০৩, *তারাশঙ্কর : নিরন্তর দেশ*, প্রথম প্রকাশ, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭০০০৭৩

দেবেশ রায় ২০০৬, *উপন্যাসের নতুন ধরণের খোঁজে*, প্রথম ও পরিবর্ধিত দে'জ সংস্করণ, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭০০০৭৩

দেবেশ রায় ২০১০, *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় : নিরন্তর মানুষ*, প্রথম প্রকাশ, এবং মুশায়েরা, কলকাতা

দেবেশ রায় ২০১৬, *জলের মিনার জাগাও (আত্মকথা)*, প্রথম প্রকাশ, প্রাচী-প্রতীচী, সঙ্গীতা এনক্লেভ, কলকাতা-৬১

Dhaka University Institutional Repository

দেবেশ রায় ২০১৮, *উপন্যাসের বিবিধ সংকট*, প্রথম প্রকাশ, প্রতিভাস, কলকাতা-৭০০০৭২

নাসিম মহিউদ্দিন ২০০৩, *প্রসঙ্গ : কথাসাহিত্য*, প্রথম প্রকাশ, কাগজ প্রকাশন, ঢাকা

পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায় ১৯৯৮, 'দেবেশ রায়ের উপন্যাস-গল্প : এক পাঠকের পাঠক্রিয়ায়।' *পঞ্চাশের দশকের কথাকার* [সম্পা. উজ্জ্বলকুমার মজুমদার], প্রথম প্রকাশ, পুস্তক বিপণি, কলকাতা

প্রদীপ বসু ১৯৯৮, *নকশালবাড়ীর পূর্বক্ষণ : কিছু পোস্ট মডার্ন ভাবনা*, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা-৭৩

প্রিয়কান্ত নাথ ২০০৭, *কাল-বিভাজিত বাংলা উপন্যাস*, প্রথম প্রকাশ, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা

বীরেন্দ্র দত্ত ১৯৯৮, *বাংলা কথা সাহিত্যের একাল (১৯৪৫-১৯৯৮)*, প্রথম প্রকাশ, পুস্তক বিপণি, কলকাতা-৭০০০০৯

বেগম আকতার কামাল ১৪০৭, *বিশ্বযুদ্ধ জীবন ও কথাশিল্প*, প্রথম প্রকাশ, নিউ এজ পাবলিকেশন্স, ঢাকা

বেগম আকতার কামাল ২০১০, 'তিস্তাপারের বৃত্তান্ত : নদী-অন্বিত শরীর, ব্যক্তি ও ইতিহাস'। *মহাবিদ্রোহের আখ্যানতত্ত্ব ও কথাশিল্প*, প্রথম প্রকাশ, ধ্রুবপদ, ঢাকা

মিলান কুণ্ডেরা ২০১২, *উপন্যাসের শিল্পরূপ* (সঞ্জীবন সরকার অনুদিত), প্রথম প্রকাশ, সন্দেশ, ঢাকা

মোহাম্মদ আবদুল মান্নান ২০০৭, *বঙ্গভঙ্গ থেকে বাংলাদেশ/ঢাকা-কলকাতাকেন্দ্রিক শত বছরের রাজনীতি ও হিন্দু-মুসলিম সম্পর্ক*, কথামেলা, ঢাকা

রণবীর লাহিড়ী ২০১১, *আখ্যানতত্ত্বের আখ্যান, প্রথম প্রকাশ*, চর্চাপদ, কলকাতা-৭০০০১২

রফিকউল্লাহ খান ২০১১, *আখ্যানতত্ত্ব ও চরিত্রায়ণ*, প্রথম প্রকাশ, চারুলিপি প্রকাশন, ঢাকা

রফিকউল্লাহ খান ১৯৯৭, *বাংলাদেশের উপন্যাস : বিষয় ও শিল্পরূপ*, বাংলা একাডেমী ঢাকা

Dhaka University Institutional Repository

রণেশ দাশগুপ্ত ১৯৭৩, *উপন্যাসের শিল্পরূপ*, পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত ২য় সংস্করণ, কালিকলম প্রকাশনী, ঢাকা

রবিন পাল ২০১১, *উপন্যাসের বর্ণময় ভুবন*, প্রথম সংস্করণ, অক্ষর প্রকাশনী, কলকাতা

রবীন্দ্রনাথ গুপ্ত ১৯৭১, *উপন্যাস প্রসঙ্গে*, তুলি-কলম, কলিকাতা-৯

রাহুল দাশগুপ্ত ২০১৭, *রাশিয়ার উপন্যাস ও ঔপন্যাসিক*, প্রথম প্রকাশ, প্রতিভাস, কলকাতা-৭০০০৭২

রুশতী সেন ১৯৯৭, *সমকালের গল্প-উপন্যাসে প্রত্যাখ্যানের ভাষা*, প্রথম প্রকাশ, পুস্তক বিপণি, কলকাতা-৭০০ ০০৯

শিপ্রা সরকার, অনমিত্র দাশ [সংকলক] ১৯৯৮, *বাঙালির সাম্যবাদ চর্চা*, প্রথম সংস্করণ, আনন্দ পাবলিশার্স প্রা. লি. কলকাতা

শিবাজী বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪০৯, *বাংলা উপন্যাসে 'ওরা'*, প্যাপিরাস সংস্করণ, প্যাপিরাস, কলকাতা ৭০০ ০০৪

সত্যেন্দ্রনাথ রায় ২০০০, *বাংলা উপন্যাস ও তার আধুনিকতা*, প্রথম প্রকাশ, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭০০০৭৩

সমীর চক্রবর্তী ১৯৯২, *উত্তরবঙ্গের আদিবাসী চা-শ্রমিকের সমাজ ও সংস্কৃতি*, প্রথম প্রকাশ, মণীষা গ্রন্থালয় প্রা. লি., কলকাতা

সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৯৭১, *বাংলা উপন্যাসের কালান্তর*, পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত সংস্করণ, সাহিত্যশ্রী, কলিকাতা

সাঈদ-উর-রহমান [অনু] ১৯৮৫, *মার্কস ও মার্কসবাদীদের সাহিত্যচিন্তা*, প্রথম প্রকাশ, একাডেমিক পাবলিশার্স, ঢাকা

Dhaka University Institutional Repository

সাদ কামালী ২০১০, *চলতি রীতি ঘরোয়া মেজাজ*, প্রথম প্রকাশ, ধ্রুবপদ, ঢাকা

সাধন চট্টোপধ্যায় ২০১১, 'ক্ষমতা, বচন : নিম্নবর্গীয় চেতনার প্রেক্ষিতে সাম্প্রতিক বাংলা আখ্যান', *বাংলা আখ্যান : বহুমাত্রিক পাঠ* (বেলা দাস ও বিশ্বতোষ চৌধুরী সম্পাদিত), প্রথম প্রকাশ, রত্নাবলী, কলকাতা-৭০০ ০০৯

সুমিত সরকার ১৯৯৩, *আধুনিক ভারত (১৮৮৫-১৯৪৭)*, প্রথম প্রকাশ, কে পি বাগচী অ্যান্ড কোম্পানী, কলকাতা

সুমিতা চক্রবর্তী ২০০৩, *উপন্যাসের বর্ণমালা*, দ্বিতীয় পরিবর্ধিত সংস্করণ, পুস্তক বিপণি, কলকাতা

সুমিতা চক্রবর্তী ২০১০, *উপন্যাস বহুরূপে*, প্রথম প্রকাশ, অক্ষর প্রকাশনী, কলকাতা-৬

সুকুমার সেন ১৪০৭, *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস* (১-৫ খণ্ড), প্রথম আনন্দ সংস্করণ (পঞ্চম মুদ্রণ), আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা ৯

সৈয়দ আকরম হোসেন ২০১০, *রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস : চেতনালোক ও শিল্পরূপ*, প্রথম প্রকাশ, একুশে পাবলিকেশন্স লি:, ঢাকা

হীরেন চট্টোপাধ্যায় ২০১১, *উপন্যাসের রূপরীতি*, প্রথম প্রকাশ, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা

হীরেন চট্টোপাধ্যায় ২০১৩, *সাম্প্রতিক কথাসাহিত্য*, প্রথম প্রকাশ, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা

Dhaka University Institutional Repository

খ. সহায়ক ইংরেজি গ্রন্থ

Abrams, M.H & Geoffrey, Galt Harpham [Edt.] 2015. *A Glossary of Literary Terms* (11th edition), Published by Wadsworth, Cengage Learning Boston, USA

Ambedkar, B. R. 2008. *Gandhi and Gandhism*. Critical Quest, New Delhi

Anupama Rao 2007. 'Ambedkar and the Politics of Minority: A Reading.' *From the Colonial to the Postcolonial India and Pakistan in Transition*. Dipesh Chakrabarty, Rochona Majumder, Andrew Sartori (Edt.), Oxford University Press (Published in India), New Delhi

Bakhtin, M. M. 1994. *The Dialogic Imagination*. Michael Holquist (Edt.), Caryl Emerson and Michael Holquist (translated). Ninth paperback edition, University of Texas press, Austin, USA

Bakhtin, M. M. 1994. 'Epic and Novel'. *The Dialogic Imagination*. Michael Holquist (Edt.), Caryl Emerson and Michael Holquist (translated). University of Texas press, Austin, USA

Berger, Morroe 1977. *Real and Imagined worlds: The novel and Social Science*. Harvard University press, UK

Chris Baldick [Edt.] 2015. *The Oxford Dictionary of Literary Terms* (Fourth edition). Oxford University Press, United Kingdom

Dwaipayan Sen 2018. *The Decline of the Caste Question: Jogendranath Mandal and the Defeat of dalit Politics in Bengal*. Cambridge University Press, US

Dhaka University Institutional Repository

Fint, Colin 2005. *The Geography of War and Peace: From Death Camps to Diplomates*, Oxford University Press, Inc. New York

Fox, Ralph 1972. *Novel and the People*. International Publication, New York

Goldman, Lucien 1975. *Towards a Sociology of the novel*. (Trans. by Alan Sheridon). Tavistock publications Ltd., London

Gupta, S. K. 1985. *The Scheduled Castes in Modern Indian Politics: The Emergence as a Political Power*. Published by Munshiram Monoharlal, New Delhi

Holquist, Michael 1990. *Dilogism: Bakhtin and his world*. Routledge, London & New York

James, Henry 1962. *The Art of Novel* (Introduction by Richard P. Blackmur), Charles Scribness Sons, New York

Kundera, Milan 1986. *The Art of the Novel* (Translated by Linda Asher). Grove press, Inc., US

Leotard, J. F. 1993. *The Postmodern condition- A Report on Knowledge*. (English Translation in 1984 by the University Minnesota Press), US

McHale, Brian 1987. *Postmodernist Fiction*. Routledge, London and New York

Northrop Frye 1971. *Anatomy of Criticism*, Princton, New Jersy

Dhaka University Institutional Repository

Rahv, Philip 2003. 'Fiction and the criticism of fiction'. *Critical Approaches to Fiction*. (Shive K. Kumar & E. Keith McKean Edt.) Atlantic publishers & Distributors, New Delhi, India

গ. সহায়ক পত্রিকা

এবং এই সময়
সম্পাদক : অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়
বাখতিন বিশেষ সংখ্যা, ১৯৯৬ : 'বাখতিন : তৃতীয় বিশ্বে'; নরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত

: 'বাখতিনের তত্ত্ববিশ্ব ও দ্বিবাচনিকতা'; তপোধীর ভট্টাচার্য

কঙ্ক
সম্পাদক– স্বপন পাণ্ডা ও উৎপল সাহা
দেবেশ রায় সম্মাননা সংখ্যা, ১৪২১ : অপরের খোঁজে বাংলা উপন্যাস : *তিস্তাপারের বৃত্তান্ত*'; অনিরুদ্ধ লাহিড়ী

: 'দেবেশ রায়ের বৃত্তান্ত'; অরুণ সেন

: 'দেবেশ রায়ের *মফস্বলি বৃত্তান্ত* : একটি আলোচনা'; দেবাশিস মহান্তি

: 'আমার শিক্ষক, অধ্যাপক দেবেশ রায়'; বিমলেন্দু মজুমদার

: 'এক অশ্বারোহী ও নিঃসঙ্গ শব্দ'; মনোরঞ্জন বিশ্বাস

: 'দেবেশ রায়ের *প্রতিবেদন* নিয়ে দুই পাঠকের বাক্যবাজি'; স্বপন পাণ্ডা

: 'যোগেন মণ্ডলের একাকীত্ব'; পার্থ চট্টোপাধ্যায়

***চার নম্বর প্ল্যাটফর্ম** (ইন্টারনেটের নতুন কাগজ)*
১ মে ২০১৭।
(সূত্র : 4numberplatform.com) : 'রাজনীতির নতুন সমীকরণ এবং *বরিশালের যোগেন মণ্ডল*';

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম আলো (জাতীয় দৈনিক)
৩০ অক্টোবর, ২০১৭ সংখ্যা : 'বরিশালের যোগেন মণ্ডলকে কি কারও মনে পড়ে?';
আলতাফ পারভেজ

Dhaka University Institutional Repository